Dhaka University Institutional Repository

Ôevsjv‡`‡ki †QvUMí : bvix-Rxe‡bi i~cvqYÕ

(nvmvb AwRRj nK, AvLZvinæ¾vgvb Bwjqvm, †mwjbv †nv‡mb I bvmixb Rvnvb)

cm½K_v

‘বাংলাদেশের ছোটগল্প : নারী-জীবনের রূপায়ণ’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে আমাকে অনেক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমার গবেষণা নির্দেশক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর কথা। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিলো আমার অন্যতম শ্রম-উৎস। বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশনা ও মীমাংসা আমার গবেষণাকর্মকে অনেক সহজসাধ্য করে দিয়েছে। বলা যেতে পারে তাঁর সার্বিক সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে শেষ পর্যন্ত গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও আমি ব্যবহার করেছি। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে গ্রন্থ-সাহায্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের আমার সহকর্মিবৃন্দ, অন্যান্য বিভাগে কর্মরত আমার বন্ধুপ্রতিম যাঁরা আছেন তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আ. ফ. ম. দানীউল হক, অধ্যাপক সৌদা আখতার, অধ্যাপক পৃথ্বিলা নাজনীন, অধ্যাপক খালেদ হোসাইন, অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কাহালি, সহকারী অধ্যাপক নাজমুল হাসান তালুকদারসহ বাংলা বিভাগের অন্য শিক্ষকদের বন্ধুসুলভ মানসিকতা, মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

বইপত্র এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে অনেকেই; তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিসহ ঢাকার সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার-এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমি এসব লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সংসারের কঠিন দায়িত্ব ও নিজের পেশাগত কর্তব্য পালন করেও এই গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে আমাকে নিরন্তর সহযোগিতা, সাহস ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন আমার স্বামী মো. জাহাঙ্গীর আলম মজুমদার। আরেকজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়; তিনি আমার একমাত্র ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. মাকছুদুর রহমান সরকার। আমার জীবনের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর অবদান ও ভূমিকা অপরিসীম, তেমনি আমার গবেষণাকর্মে তাঁর নিরন্তর তাগাদা ও উৎসাহও অন্তহীন। এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঊর্ধ্বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, আমাকে এই গবেষণাকর্মের সুযোগ করে দেবার জন্য।

(শিরিন আক্তার সরকার)
নিবন্ধন নম্বর : ০৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০

AeZiwYKv

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়-বিচার, সামাজিক সাম্য— এ সবের মূলে নারী-পুরুষের সম্মিলিত ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ নরগোষ্ঠী, বর্ণ ও শ্রেণি-বৈষম্যের পাশাপাশি নারী-পুরুষ বৈষম্য সমাজের অন্যতম গুরুতর সমস্যা যা সমাজের স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিবন্ধক। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিসরের সবদিক থেকেই যুগে যুগে নারী-সমাজ চরমভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। সময়ের বিবর্তনে সমাজে নারীর প্রতি অবমাননা ও উপেক্ষার ভাষা বা প্রক্রিয়ার হয়তো পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজে নারীর যথাযোগ্য মানবিক মর্যাদার আসনটি আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আজও ঘরে-বাইরে নারী দারুণভাবে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের প্রকৃত মুক্তি কখনোই নারীর অবদানকে অস্বীকার বা অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে নারীর গৌরবময় অবদান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সময়, সমাজ ও সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে সে-কারণেই নারীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-মানবিক অবস্থানের প্রকৃত স্বরূপ-সন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে পূর্ব-বাংলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পর তৎকালীন পূর্ব-বাংলা তথা পরবর্তী সময়ের পূর্ব-পাকিস্তানে যে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল তাকেই বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যের সূচনা নির্দেশক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। সেই সময় হতে বর্তমান কাল-পরিসরে রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্পে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি অধ্যায়, তার যাবতীয় চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পাকিস্তানের পতন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম, নারীর সামাজিক অবস্থান— এ সব কিছুই যুগের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধারণ করেছে এ সময়ে রচিত ছোটগল্পসমূহ।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাসে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহানের ভূমিকা সময় ও সমকালের তাৎপর্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাসান আজিজুল হক মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপটকে অতিক্রম করে ছোটগল্পের অবয়বে নির্মাণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস। বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোকে তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজজীবনের বহুমাত্রিক অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার ও বঞ্চনা, কখনো-বা তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনি। হাসান আজিজুল হকের গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের সমাজবাস্তবতা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে সমাজের গলিত, পঁচা অবক্ষয়ের সামূহিক স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, নিজের সঙ্গে নিজের, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিচিত্র টানাপোড়েনের কথকতা নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পে রূপায়িত নারীরা বিচিত্র বর্ণে-রূপে প্রতিভাত। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের নানামাত্রিক চালচিত্র হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের নারী-জীবনের বাস্তবধর্মী জীবন-অভিধা। মানুষের মনের অন্ধগলিতে বিহার করে তার চিন্তার বিচিত্র প্রকাশকে নাসরীন জাহান বেশ কুশলতার সঙ্গেই উপস্থাপিত করেছেন ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বর্ণিল প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তাঁদের রচিত ছোটগল্পে একদিকে যেমন দৈনন্দিন যাপিত জীবনের মধ্যেও যে আরও নানা দেখবার ও বুঝবার দিক আছে, আমরা তা নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি; তেমনি নারী-জীবনের নানামাত্রিক সমাজবাস্তবতার বিচিত্র প্রকাশও লক্ষ করি। বাংলাদেশের ছোটগল্পে নারী-জীবনের যথাযথ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সমাজচিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হতে পারে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এর আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতাকে কোনভাবেই অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করতে পারি না। তাই, বাংলাদেশের ছোটগল্পে বিশেষ করে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে নারী-জীবনের যথাযথ রূপায়ণ ও উপযোগিতার বিষয়টিকে পরিস্ফুট করতেই 'বাংলাদেশের ছোটগল্প : নারী-জীবনের রূপায়ণ'-র ওপর গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য। গবেষণার বিবেচ্য বিষয় চারজন গল্পকারের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন নিয়ে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের ছোটগল্প : নারী-জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির আলোচনার পরিধিকে সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'উপসংহার' ব্যতীত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় 'বাংলাদেশের ছোটগল্পে নারী-জীবন : প্রাসঙ্গিক পটভূমি'। শুরুতেই এখানে বাংলাদেশের ছোটগল্পের একটি বিবর্তনমূলক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন গল্পকারের গল্প আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় নারী-জীবনের প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য চারজন গল্পকারের সাহিত্য সৃষ্টির সময়কাল, স্বরূপ ও প্রবণতাসমূহ সংশ্লিষ্ট সময়কালের বিবেচনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় বিভক্ত হয়েছে দু'টি পরিচ্ছেদে— এক. 'হাসান আজিজুল হক : জীবনপ্রবাহ ও শিল্পবোধ'; দুই. 'হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবন'। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে লেখকের বেড়ে ওঠা, জীবনবোধ ও তাঁর সাহিত্যজগতে প্রবেশের প্রসঙ্গ। হাসান আজিজুল হকের জীবন-ইতিহাস ও মানসগঠনের প্রধান পর্যায়গুলো বিবেচনা করে তাঁর মানসতায় নারী-জীবন বিষয়ক ভাবনার মৌল প্রবণতা শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এ পরিচ্ছেদে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পর্যালোচনা করা হয়েছে হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান সময়ের বিবেচনায় এর প্রাসঙ্গিকতা।

'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে নারী-জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে দু'টি পরিচ্ছেদ— এক. 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : জীবনপ্রবাহ ও শিল্পবোধ'; দুই. 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে নারী-জীবন'। ছোটগল্পে উপস্থাপিত নারী-জীবনকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে গল্পকারের জীবনজিজ্ঞাসা ও সমাজ-মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ধারণা লাভ করা অনিবার্য। এ কারণেই প্রথম পরিচ্ছেদে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবন ও শিল্পবোধ গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক সমাজবাস্তবতার স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে।

চতুর্থ অধ্যায় দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে— এক. 'সেলিনা হোসেন : জীবনপ্রবাহ ও শিল্পবোধ'; দুই. 'সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে নারী-জীবন'। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে লেখকের বেড়ে ওঠা, জীবনবোধ, অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল ও তাঁর গল্পরচনার নেপথ্য-সূত্র। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চালচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে সমাজসত্যের আলোকে।

পঞ্চম অধ্যায়েও রয়েছে দু'টি পরিচেছদ— এক. 'নাসরীন জাহান : জীবনপ্রবাহ ও শিল্পবোধ'; দুই. 'নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে নারী-জীবন'। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে সমকালের অভিজ্ঞানে লেখকের মানস-প্রবণতার মৌল সূত্রসমূহ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নাসরীন জাহানের ছোটগল্পের ধারাবাহিক বিবরণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সমাজবাস্তবতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম, 'চারজন গল্পকারের রচনায় নারী-জীবন : তুলনামূলক বিবেচনা'। এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে নারীবাদ ও নারীবাদী মতবাদ-বিষয়ক তাত্ত্বিক পটভূমি। একই সঙ্গে নারী-জীবন বিষয়ক আলোচনা ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতার তাৎপর্যও এ অধ্যায়ের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। এরই সমান্তরালে আলোচ্য চারজন গল্পকারের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন বিষয়ক আলোচনার তুলনামূলক বিবেচনা উপস্থাপিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুগত আলোচনার সমান্তরালে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'উপসংহার' অংশে আলোচ্য বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে; যার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকের অর্জিত অভিজ্ঞানের সারাৎসার। সবশেষে সংযুক্ত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

Ôevsjv‡`‡ki †QvUMí : bvix-Rxe‡bi iƒcvqYÕ

(nvmvb AwRRyj nK, AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm, †mwjbv †nv‡mb I bvmixb Rvnvb)

শীর্ষক অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ

শিল্প-বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোল্যুশনের পর ইউরোপে যে জীবনধারা তৈরি হয় তাকে কেন্দ্র করেই জন্মলাভ করে ছোটগল্প। সামন্ত-প্রথার অবলুপ্তির ফলে যে নতুন সামাজিক বিন্যাস ঘটেছে তার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ছোটগল্পের জন্ম দিয়েছে। ব্যক্তি এখন আগের মতো আর গতানুগতিক জীবন প্রবাহে ব্যক্তিত্বহীন বা একছকে গড়া মানুষ নয়। নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মানুষ এখন অনেকটা নিজের অধিকার অর্জনে সক্ষম। ব্যক্তি বড় বড় পরিবার থেকে বেরিয়ে নিজের একক পরিবার গড়ছে। অনেকটা লাভ করছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিটি মানুষ যে আলাদা, ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সে বোধ জাগছে এবং এই বোধকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির ভালো লাগা না-লাগা, তার মানস-স্বাস্থ্য ও বিকলন, তার চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব ও উপরে ওঠার প্রক্রিয়া নানা অবস্থান তৈরি করছে, তৈরি করছে নানা সিচুয়েশন— এইসব বিষয়-আশয় ছোটগল্পের বিকাশকে করছে বিস্তৃত। ব্যক্তি-জীবনের হাজারো ক্যালেইডস্কোপিক বিচ্ছুরণ ছোটগল্পের আধেয়কে করেছে বলিষ্ঠ। পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্যন্তর সীমাবদ্ধতার চাপে, অসহ সময়-প্রতিবেশের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে ও সময়ের শাসনে মানুষ যতই যান্ত্রিক হয়েছে, ছোটগল্প-সাহিত্যের বিকাশ ততই হয়েছে সমৃদ্ধ। কেননা একথা অনস্বীকার্য যে, শিল্পীমনে যুগের প্রভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখকদের অনুভবে ক্রমাগত আবর্তিত হয় যুগধর্ম, সেই অনুভব-বলে লেখকের রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে একটি যুগ তার যাবতীয় চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার ভয়াবহ পরিণতিতে বাংলার জনজীবন যখন বিপর্যস্ত ও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ধ্বংসের মুখোমুখি, তখন লেখকদের সৃষ্টিকর্মে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো সমকালীন দেশ ও মানবতার বিধ্বস্ত প্রতিচ্ছবি। তারপরে দেশ যখন একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ নেয় এবং সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মর্মান্তিক পরিণতি শুরু হয়, তখন কথাসাহিত্যিকদের রচনায় সেই সব জীবন-বাস্তবতার রূপায়ণই প্রধান হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে ইতিহাস অধিকতর নতুন দিকে বাঁক পরিবর্তন করে। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পাকিস্তানের পতন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাঙালির জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ ও ব্যর্থ-স্বাধীনতার তিক্ত অনুভূতি— এ সব কিছুই যুগের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধারণ করেছেন ছোটগাল্পিকগণ ছোটগল্পের জমিনে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে পূর্ব-বাংলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পর তৎকালীন পূর্ব-বাংলা তথা পরবর্তী সময়ের পূর্ব-পাকিস্তানে যে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল তাকেই বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যের সূচনা নির্দেশক হিসেবে

ধরে নেওয়া হয়। সেই সময় হতে বর্তমান কাল-পরিসরে রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমিতে উদ্ভাসিত হয়েছে সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গ। সময়, সমাজ ও যুগধর্মের অনিবার্য প্রবহমানতায় আধুনিক সমাজ-জীবনে নিয়ত সংঘটিত নানামাত্রিক অস্থিরতা ও অরাজকতায় যেন—

> বৈষম্যের ধস নেমেছে, তার জন্যে যন্ত্রণাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে মানুষকে। বিংশ শতাব্দীর ভাবাদর্শই হচ্ছে প্রাচীন মূল্যবোধের বদলে জীবন-চিন্তায় নতুন ভাবনার আরোপ। আজকের মানুষ বুঝেছে প্রেমের কোনো শাশ্বত মূল্য নেই, প্লেটনিক প্রেম অর্থহীন, একটা বুর্জোয়া চালাকি মাত্র; গুরুজনকে ভক্তি করাও কার্যকর ব্যবস্থা নয়। ধনী যে আর পাঁচজনের ভাগ মারছে— পূর্ব সুকৃতির জন্যে সে রাজা, আর অন্যে গরীব, এই অন্তঃসারশূন্য ধাপ্পাবাজি আজ বেশ ভালোভাবেই ধরা পড়েছে, ফলে সমাজে অসন্তোষ বেড়েছে। জীবনের বিভিন্ন দিকেই অস্থিরতা ও অবক্ষয়। সুস্থ সংহত উচ্চাসনের বা লক্ষ্যের হদিস মেলে না, কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাসের সিঁড়িভাঙ্গার কাজ শুরু হয়েছে, এর ফলে এবং মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্যেই প্রাচীন আদর্শের লেখা আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। কেননা আজকের লেখক জানেন যে তিনি একা, তাঁর জীবন ঘিরে যন্ত্রণার পরিমণ্ডল।*

বলা বাহুল্য, নানা সমস্যায় জর্জরিত এই সংক্ষুব্ধ-জীবনই অনিবার্যভাবে বাংলাদেশের ছোটগল্পের পটভূমি ও আধারে শিল্পিত ব্যঞ্জনায় নির্মাণ পেয়েছে।

নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজের সার্বিক গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়-বিচার, সামাজিক সাম্য— এ সবের মূলে নারী-পুরুষের সম্মিলিত ভূমিকার তাৎপর্য অনস্বীকার্য। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুষম সমাজ গঠন এবং সমাজের নারীপুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। লক্ষণীয় যে, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে স্বাধীনতার ৪২ বছরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। দেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সিটি করপোরেশনের মেয়র, পুলিশ ও সেনাসদস্য, বৈমানিক, বিচারক, উদ্যোক্তা, ক্রিকেটার তো বটেই; বাংলাদেশের নারীর বিজয়-পতাকা উড়েছে এভারেস্ট চূড়ায়ও। কিন্তু এটিই শেষ কথা নয়। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর অগ্রগতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও এখনও নারীরা নানামাত্রিক বৈষম্যের শিকার। নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে বহুবিধ আইন ও বিধি-বিধান প্রণীত হলেও নারীর মানবাধিকার নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। যদিও পাল্টাচ্ছে নির্যাতন ও নিগ্রহের প্রকরণ কিন্তু ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা। প্রকৃতপক্ষে, সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার

* শুদ্ধসত্ত্ব বসু, evsjv mwn‡Z¨i bvbvi|c, কলকাতা, ১৩৮৫ ব. পৃ. ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

আসন ও নারীর মানবাধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনও ঘরে-বাইরে নারী দারুণভাবে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের প্রকৃত মুক্তি কখনোই নারীর অবদানকে অস্বীকার বা অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে নারীর ভূমিকা ও অবদান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সময়, সমাজ ও সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে সে-কারণেই সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত অবস্থান ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ তাৎপর্যের স্বরূপ-সন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিটি স্পন্দন ধারণ করে জীবনবাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, সে-কারণে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন আমাদের দৈনন্দিন যাপিত-জীবনের মধ্যেও যে আরও নানান দেখবার ও বুঝবার দিক আছে, আমরা তা নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি তেমনি এর মধ্য দিয়েই অতীত থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিতে সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটি মূর্ত হয়ে উঠবে। সমাজে নানা ধরনের অসমতা বিদ্যমান তবে নরগোষ্ঠী, বর্ণ ও শ্রেণি-বৈষম্যের পাশাপাশি নারী-পুরুষ বৈষম্য বা অসমতা অন্যতম সামাজিক সমস্যা যা সমাজের সুষ্ঠু বিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কাজেই বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই প্রকারান্তরে উন্মোচিত হতে পারে সমাজের যথার্থ বাস্তবতা।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাসে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান-এর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচিত ছোটগল্পের পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোকে প্রকারান্তরে ঘুণে ধরা, অবক্ষয়পীড়িত সমাজের রুগ্ন-ভঙুর দেশচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে। ছোটগল্পলেখক হিসেবে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও সেলিনা হোসেন ষাটের দশকের বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। পুরো ষাটের দশক একটি অনিশ্চয়তার দশক, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দশক, নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের দশক। এ সময়কালে 'একদিকে সামরিক শাসনের পেষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অবাঙ্গালী পুঁজির বিকাশ; অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই সময়কে অস্থির করে তোলে।'* পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে তাই পুরো ষাটের দশক এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়কাল হিসেবে বিবেচিত। অস্থিতিশীল, সংগ্রামমুখর অসহ সময়-পটভূমিতে মানুষের মধ্যে বিশেষত মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সামূহিক অনিশ্চয়তার জন্ম হয়েছিলো স্বাভাবিকভাবেই তার গভীর প্রভাব পড়েছে এ দশকের বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর। হাসান

* আহমদ কবির, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্ড়র : বিষয় ও প্রকরণ : প্রসঙ্গ– ছোটগল্প', GK‡ki ceÜ 88, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল, বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে ষাটের দশকের বাংলাদেশের উন্মাতাল, সংক্ষুব্ধ স্বরূপটি প্রকৃত অর্থেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সামাজিক-রাজনীতিক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অস্থিতিশীলতা, বিদেশি সাহিত্য পাঠের প্রভাব, মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের নৈঃসঙ্গ্য ও অবক্ষয়, সংশয় ও দুরাশা, সংকল্প ও অন্তঃসারশূন্যতা— এরকম একটি অসহনীয় পটভূমিতে ষাটের দশকের আলোচ্য গল্পকারগণ যে সব গল্প লিখেছেন তা বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে নানাভাবে স্বতন্ত্র হলেও তার মূল স্রোত চেতনার দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। অন্যদিকে আশির দশকের অন্যতম বহুপ্রজ লেখক নাসরীন জাহান। আশির দশকের গল্পকারগণ সম্মিলিতভাবে যে কাজটি করেছেন তা হচ্ছে মধ্যবিত্ত জীবনের হালকা কাহিনিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পণ্যে পরিণত করার বদলে তাঁরা জীবনমুখী গল্প রচনার চেষ্টা করেছেন। আশির দশকের ছোটগাল্পিকগণ নষ্ট সময়ের বিরুদ্ধ স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালেন তারুণ্যের দ্রোহ নিয়ে প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে বলা যেতে পারে : 'স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বোধ করি এই যে, এ সময় আমাদের ছোটগাল্পিক-চেতনা হয়ে উঠে অনেক বেশি রাজনীতিসচেতন ও জনজীবনমূল-অন্বেষী। বস্তুত, আশির দশকের গল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা সমধিক প্রযোজ্য।'* আশির দশকের গল্পকারগণ ষাটের দশকের গল্পের উত্তরাধিকারকে বহন বা পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সমকালীন সংকট, চাপ, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অভিঘাত স্বীকার করেও নাসরীন জাহান ছোটগল্পের শরীর তৈরি করেছেন নিরাসক্ত বাস্তবতা দিয়ে। তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চিত্রায়ণে প্রমূর্ত হয়েছে অসহ সময়-প্রতিবেশের তরঙ্গাঘাত, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও সমকালের অভিজ্ঞান। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় ষাটের দশক ও আশির দশক স্বাভাবিকভাবেই তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল-পরিসর হিসেবে বিবেচিত। হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান— প্রমুখ ছোটগাল্পিকগণ এই দুর্মর কালবেলার কথকতাকেই শিল্পিত করে তুলেছেন ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে।

ষাটের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের যে নবযাত্রা ঘটেছিল তার অন্যতম প্রাণপুরুষ এবং জীবন ও পরিবেশের অভিজ্ঞ রূপভাষ্যকার হাসান আজিজুল হক। জীবনকে তিনি দেখেছেন সৃষ্টির নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে। ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমিতে বস্তুবাদী জীবনপ্রত্যয়ে হাসান আজিজুল হক সমাজজীবনের হতাশা, অবক্ষয়, দারিদ্র্য এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতায় নিষ্পিষ্ট নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আর্তি, বিক্ষোভ ও প্রতিরোধকে সমাজবাস্তবতার আলোকে শিল্পিত করেছেন। সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের

* বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡`‡ki mvwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৯৪

জটিলতা, নারী-পুরুষের অসম সামাজিক পটভূমি, সম্পর্কের বহুতলিক বিন্যাস, নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত স্বরূপ— এককথায় যাপিত-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বিচিত্র আধারে তাঁর গল্পে একদিকে যেমন নারীর গুহায়িত জীবন-রহস্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, তেমনি এরই সমান্তরালে ব্যক্তি, সময় ও সমাজের জটিল-মিশ্র জীবন-অভিধানের বহুমাত্রিক স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজসত্যের আলোকে। হাসান আজিজুল হকের আটটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত মোট পঞ্চান্নটি গল্প লেখকের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, প্রখর মেধা ও সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সার্থক শিল্পভাষ্য। 'শকুন' গল্পে সময় ও সমাজের অবক্ষয়পীড়িত অসহ পটভূমিতে নিম্নবর্গের অসহায়, ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের মধ্যে নারীর অবস্থান যে আরো শোচনীয় ও মর্মন্তুদ সেই সমাজসত্য উচ্চকিত হয়েছে। যে অবৈধ ও সমাজ-গর্হিত সম্পর্কের সূত্র ধরে কাদু শেখের বিধবা বোনের নবোজাত শিশুর মৃতদেহের স্থান হয় মৃত শকুনের পাশে, সে-অবৈধ সম্পর্কের দায়ভার সম্পূর্ণতই আরোপিত হয় কাদু শেখের বিধবা বোনের উপর, ফলে দিনের আলোয় তাকে দেখা যায় না। মৃত শকুনের মতোই সে ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে। 'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী' গল্পে রাহেলার অবয়বে বঞ্চিত-অতৃপ্ত নারী-জীবনের হতাশা ও অচরিতার্থতাজনিত যৌন-বাসনার শিকার নারীর সামাজিক অবক্ষয় এবং দেশবিভাগজনিত মানবিক বিপন্নতার সমান্তরালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজবাস্তবতায় নারীর অধিকতর অবমাননা ও লাঞ্ছনার দেশচিত্তের উন্মোচন ঘটেছে। 'মা-মেয়ের সংসার' গল্পে মা ও মেয়ের যৌথ-জীবনযাপন প্রত্যাখ্যান করে প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সমাজের অচলায়তনকে, এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করা হয় চাপিয়ে দেওয়া নানা মূল্যবোধকে। যে মূল্যবোধের পাকে পাকে জড়ানো থাকে নানা ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা এবং আত্মপ্রতারণা। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক পরিসর ও পটভূমিতে ঘুরে ফিরে এরূপ বিষয়ই বিচিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গল্পের পরিসরে নারীচিত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নারীরা খুবই বাস্তব ও জীবন-সংলগ্ন। তাঁর গল্পমালায় যেন নারীচরিত্র বর্ণময় মিছিল। কুলটা বাগদী বৌ থেকে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহিণী, অসহায় দুঃসাহসী গ্রাম্য প্রেমিকা থেকে শহরের বিষণ্ন উদ্বাস্তু ছাত্রী, নিঃসঙ্গ শিক্ষিকা থেকে বিকারগ্রস্ত পতিতা, স্বামী পরিত্যক্তা রমণী থেকে মুক্তিযোদ্ধার ক্ষুধাভীতা পলাতকা ঘরণী— ছোটগল্পের স্বল্পায়তনে এরা নির্মিত হলেও এদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিচিত্র ব্যক্তিসত্তা আছে, আছে ব্যক্তিত্বও। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবনের রূপায়ণ ঘটেনি। তাছাড়া কোনো নারীচরিত্রই লেখকের আরোপিত ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বরং সমাজবাস্তবতা ও অসহ সময়-প্রতিবেশের যথাযথ স্বরূপ-উন্মোচনের নিরিখেই হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের বিচিত্র পরিমণ্ডলে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবন-অভিধার রূপায়ণ ঘটেছে।

ষাটের দশকের উন্মাতাল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দীপ্র আবির্ভাব। ১৯৪৩ থেকে ১৯৯৭ প্রায় ৫৪ বছরের জীবনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাঁচটি গল্পগ্রন্থ, দু'টি উপন্যাস এবং একটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন। প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্য-সাধনার কৃতিত্ব হিসেবে তিনি মাত্র তেইশটি গল্প লিখেছেন। কিন্তু প্রসারতা দিয়ে যেমন গভীরতা মাপা যায় না তেমনি সংখ্যাগত মূল্যে নয় বরং গুণগত উৎকর্ষে তাঁর রচনার স্বল্পায়তন তীর এক ঝাঁক সবুজের প্রাণময় স্পর্শে শিল্প-সুন্দর, উজ্জ্বল ও সজীব। হাতে গোনা যায় এমন সংখ্যক স্বল্পায়তন গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে—

> ফুটে উঠেছে জীবনের বিচিত্র প্রান্ত, উপলব্ধির বহুবর্ণিল জগৎ। তাঁর Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i (১৯৭৬) গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে মানবিক সম্পর্কের আন্তত্যন্তিক বিনষ্টি, †Lvqvwi-তে (১৯৮২) যুব-মানসের নির্বেদ; 'afv‡Z DrcvZ-এ (১৯৮৫) নিরন্ন মানুষের জীবনে অমোঘ নিয়তিশাসন, আর †'vR‡Li Ig (১৯৮৯) গ্রন্থে নেতি থেকে ইতিতে উত্তরণের কথকতা।*

লেখকের পঞ্চম ও শেষ গল্পগ্রন্থ Rvj ¯^c, ¯^‡ci Rvj-এ (১৯৯৭) স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও এরই সমান্তরালে নতুন করে স্বপ্ন দেখার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে। পুরনো ঢাকার ক্ষয়িষ্ণুতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা এবং জীবনসংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পভুবন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের বিশ্লেষণে সময় ও সমাজের প্রতিটি স্পন্দন, তার তীব্র আলোড়ন, বিকার, হতাশা ও নৈরাশ্য সবই গল্পের বিচিত্র বিন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাঁর গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক বিন্যাস অনিবার্যভাবেই অসহ সময়-প্রতিবেশ ও সমকালের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ-সন্ধান সূত্রেই বিবেচনাযোগ্য। 'উৎসব' গল্পে বর্ণিত সালেহা, মিসেস পারভেজ, মিসেস ইশরাত হোসেন চৌধুরী, ইকবাল সাহেবের পাঞ্জাবি স্ত্রী— প্রমুখ নারী চরিত্র নবোদিত স্বপ্নাহত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তাদের অন্তঃসারশূন্যতা এবং একই সঙ্গে শ্রেণি ব্যবধানজনিত বিবমিষার প্রকৃত বাস্তবতার উন্মোচন-সূত্রে পটভূমি বা প্লট হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে উজ্জ্বলতর করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর-কালে ক্রমশ পরিবর্তমান জীবনের ভেতর বেঁচে থাকা পূর্ব-প্রজন্মের একজন পিসীমাকে, যিনি সমকালের জীবন-প্রতিবেশে হয়তো অনেকাংশেই বাহুল্য, কিন্তু বেঁচে আছেন পূর্ববর্তী নানা ঘটনা-অনুভূতির সাক্ষ্য হয়ে। পিসীমা হয়ে উঠেছেন দুই প্রজন্মের যোগসূত্রের ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিমানুষের ক্রমবিচ্ছিন্নতা ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিভূ প্রতীকে। 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে বৃদ্ধা আতমন্নেসা চরিত্রের অবয়বে বাংলাদেশের অগণিত নারীর ভাগ্য-বিড়ম্বিত অসহায়-বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভ-প্রবঞ্চনা, শঠতা, তাদের অন্তর্গূঢ় সংঘাতের বাস্তবচিত্র উন্মোচিত। মানুষের জীবনে ন্যায্য অধিকার ব্যাহত হওয়ায় যে চাপা-অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভ স্বাভাবিক জীবন-প্রবাহকে দুর্বিষহ

* বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/4 বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮৮

করে তোলে, আতমন্নেসার বঞ্চিত-জীবনের নানামাত্রিক অভিক্ষেপে তারই জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষণীয়। সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-জীবনের অতলান্ত ব্যর্থতা, হতাশা, ক্ষোভ, অবমাননার শৈল্পিক প্রতিবেদন 'তারাবিবির মরদ পোলা' গল্পটি। আজীবন বঞ্চনা ও অতৃপ্তির কারণে যারা পরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য করতে পারে না— তাদের মনোবিকৃতির স্বরূপ ও কারণ পারিবারিক জীবনের আবহে রূপায়িত করে এই গল্পে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে নারীর চিরন্তন বঞ্চনা, বেদনা ও হতাশাকেই মূর্ত করে তুলেছেন তারাবিবি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অধিকাংশ গল্পে নানাভাবে সময় ও সমাজের প্রতিটি স্পন্দন এভাবেই রূপায়িত নারী-জীবনের অনুষঙ্গে শিল্পিত হয়েছে। ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসরে নারী-জীবনের নানামাত্রিক চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ-মনস্ক সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যুগপরিবেশ, সময় ও সমকালের দন্দ্বদহনের কালবেলাকেই প্রমূর্ত করেছেন।

বাংলাদেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছে, সেই সম্পর্কের ভেতরকার অসংগতিগুলো কী— পাঠকের দৃষ্টি, ভাবনা আর বোধের সীমায় এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আসা— ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসর ও বিন্যাসে রূপায়িত নারী-জীবনের অনুষঙ্গে সেলিনা হোসেন নিরন্তর এই কাজ করে চলেছেন। 'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পে ওজুফা অন্যের সন্তানের মা হতে বাধ্য হলেও মাতৃত্ব নষ্ট করে না। 'বৈশাখী গান' গল্পে ইকতির কাছে মানবিক সম্পর্কই প্রধান বিবেচ্য। এ অনুভবই ইকতিকে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজনীতির অসার অবস্থানের বিপক্ষে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। 'আকালির স্টেশনের জীবন' গল্পের 'তুচ্ছ কাজের মেয়ে' ও 'বেশ্যা' উপাধি প্রাপ্ত অসহায় দরিদ্র মেয়েটি রাজপুত্রের মতো দেখতে বাড়ির মালিকের ছেলের সঙ্গে শরীরিক সম্পর্কে জড়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। 'হৃদয় ও শ্রমের সংসার' গল্পে ফুলবানু তার সমস্ত মনোবল ও সাহসিকতায় সমাজ-সংসারের প্রচলিত অন্যায় বিধি-বিধানের বিপক্ষে অবস্থান নিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না। কেবল পিতা নয় বরং স্বামী কাশেম খানের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ফুলবানু তার ওপর নেমে আসা সমাজ-প্রসূত পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার দেয়াল অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর। সে অনুভব করেছে এই সামাজিক সত্য যে, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি যদি নাই থাকে, তবুও না-বলার শক্তি থাকা নারীর জন্য প্রয়োজনীয়। 'লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর' গল্পে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে লিপিকা চরিত্রের অবয়বে। 'পারুলের মা হওয়া' গল্পে পারুলের কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চকিত হয়েছে প্রথাবদ্ধ সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার অর্জনের দীপ্ত অঙ্গীকার। পারুল নিম্নবর্গের অসহায়-বঞ্চিত নারীর আসন থেকে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের অগণিত নারীর আত্মমুক্তির প্রেরণা-উৎসে। কয়েক দশকের কথাকার হিসেবে সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে ঘুরে ফিরে এসব বিষয়ই বিচিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত।

সৃষ্টিশীল জীবনের শুরু থেকেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য। প্রথম পর্যায়ে সচেতনভাবে নয়, অনেকটা অসচেতন অথচ লেখকের সংবেদনশীল অনুভূতি দিয়ে তিনি ছোটগল্পে নারীর বহুমাত্রিক জীবনচিত্রের উন্মোচন করেছেন। আর এখন তিনি নারীবাদ সম্পর্কে সচেতন হয়েই গল্প লিখছেন। বলা যেতে পারে যে, নারী অধিকার, মুক্তিযুদ্ধ, গ্রাম কিংবা শহরের মধ্যবিত্ত, প্রচ্ছন্ন রাজনীতি, অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তা তাঁর গল্পের মৌল কাঠামো নির্মাণ করেছে। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পের পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের বিচিত্র অবয়বে নারীর মানবাধিকার, আত্মবোধ ও আত্মচেতনা, লৈঙ্গিক-শোষণ, মুক্তিভাষ্য শিল্পিত মাত্রা পেয়েছে। গল্পের পটভূমিতে সেলিনা হোসেন নারীবাদী ভাবনায় উচ্চকিত হয়ে নারীকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন। এরই সমান্তরালে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও প্রথাগত ইমেজকে করে তুলেছেন প্রশ্নবিদ্ধ। সেলিনা হোসেনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় ছোটগল্পে রূপায়িত নারীর অবয়ব। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পের নারী তাই অধিবাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। তারা পুরুষতন্ত্রকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে আত্মমুক্তির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে বদ্ধ পরিকর। ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোকে প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ-উন্মোচন— দৃষ্টিভঙ্গির এহেন স্বকীয়তাই সেলিনা হোসেনের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা-শক্তি। একটিমাত্র কাহিনি নয়, একক কোনো গল্প নয়— টুকরো টুকরো নানা কাহিনির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারী-জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ভাসিত ছোটগল্পের পটভূমে। বাংলাদেশের নারীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে— সেই যাপিত-জীবনের নানামাত্রিক চালচিত্রকে সেলিনা হোসেন গল্পের পটভূমি ও উপজীব্য করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই একথা বলা যেতে পারে যে, সেলিনা হোসেনের গল্প মানেই নারীর গল্প, বাংলাদেশের নারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনের গল্প।

নাসরীন জাহানের গল্পের বিষয় হিসেবে এসেছে ব্যক্তি মানুষের ক্ষয়, ক্লেদ, মনোবিকলন, নারীর নিজস্ব পৃথিবী, একই সমাজে বাস করা একজন পুরুষের আর একজন নারীর ভিন্ন— প্রায় বিপরীতধর্মী-বাস্তবতা, এই সমস্তকিছু। মানুষের মনের অন্ধগলিতে বিহার করে তাঁর চিন্তার বিচিত্র প্রকাশকে নাসরীন জাহান বেশ কুশলতার সঙ্গেই উপস্থাপন করেছেন ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে। শিল্পচৈতন্যের এরূপ প্রকাশে বাস্তব কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজেকে জাহির করে না; পরাবাস্তব এরূপ ক্ষেত্রে তার রহস্যময় প্রকাশে বাস্তবতার ঘনিষ্ট সহচর হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নাসরীন জাহানের গল্পের বিচিত্র পরিসর ও বিন্যাসে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। রহস্য ও কল্পনার ঘেরাটোপে বাস্তব জীবনের নতুন অবয়ব নির্মাণ করেন নাসরীন জাহান গল্পের জমিনে। সেই অবয়বে সময়, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচিত্র স্বরূপ যেমন উন্মোচিত, তেমনি এরই সমান্তরালে নারী-জীবনের গুহায়িত রহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে সময়, সমাজ ও পরিপার্শ্বের প্রকৃত বাস্তবতা। ‘পরগাছা’ গল্পে নিছক জীবিকার সন্ধানে, বেঁচে থাকার দুর্মর

আকাঙ্ক্ষায় কাজ করতে আসা অসহায় দরিদ্র মেয়েটি রক্ষা পায়না গৃহকর্তা নামক নরপশুর বিকৃত লালসার হাত থেকে। 'জনক' গল্পে বর্ণিত কথক নারী নিজ গর্ভে ধারণকৃত সন্তানের পিতৃ-পরিচয়ের আত্ম-সঙ্কটে ক্ষত-বিক্ষত। নিজেকে প্রকাশ করতে না-পারার ব্যর্থতাজনিত আত্মগ্লানি ও বিচিত্র টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই নারী। 'সুন্দর লাশ' গল্পে বিরূপ প্রতিবেশে বেড়ে ওঠা জিনাত নামের তরুণীটি পুরুষদের, মানুষদের কঠিনভাবে চিনতে চিনতে এমন হয়ে ওঠে যে কোনো পাখি, কোনো জ্যোৎস্না-রাত তাকে এক মুহূর্তের জন্য আর স্পর্শ করতে পারে না। এক অব্যক্ত গ্লানিময় দাম্পত্য-জীবনের বোঝা বয়ে ক্রমাগত নিজেকে রিক্ত-নিঃস্ব করে তোলে জিনাত। 'পথ, হে পথ' গল্পে মইন ও খুকির অপ্রেম সংসারের একঘেয়ে টবপ্রতিম জীবনের সজ্জায় কৃত্রিমতায় হাঁসফাস করা যাপিত-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে নারী-জীবনের অন্তর্গত জটিলতার দ্বান্দ্বিক স্বরূপ সময়-প্রতিবেশের নিরিখে বিবেচ্য। 'ছেলেটি, শিশুটি, তার অনুভব' গল্পে বর্ণিত ছেলেটির অনুভবের দ্যোতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজ-বাস্তবতায় নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার বর্বরোচিত জীবনাখ্যান। নাসরীন জাহানের অসংখ্য গল্পের বিষয়-আশয় এসবই। মূলত কিছুটা রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে নাসরীন জাহান বর্তমানের অসহিষ্ণু জীবনাচরণ, অস্থির সমাজ-ব্যবস্থাপনা এবং দিন-দিন বেড়ে ওঠা জন্ম-সমস্যার চাপে নুয়ে পড়া সমাজ-জীবনের নানামাত্রিক অনভিপ্রেত দিকগুলোর জীবন-ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে শিল্পিত করে তুলেছেন গল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গে। নষ্ট সময়ের ভিটের উপর দাঁড়িয়ে নাসরীন জাহান গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে নারী-জীবনের আলোকে প্রকারান্তরে সমাজ-সংসারের জীর্ণশীর্ণ চালচিত্র ও হতাশায় নিমজ্জিত মানুষের কুৎসিত দিকের কার্যকারণের ন্যায়সঙ্গত সম্বন্ধ যোজনা করে তার সমাজবাস্তবতা উন্মোচন করেছেন। লক্ষণীয়, বাংলার নারী লেখকদের সমাজপিষ্ট মানসের উল্লম্ফনে যে পুরুষবিরোধী চিন্তার একরৈখিকতা আমরা লক্ষ করি, বহুলখ্যাত নক্ষত্র উপম ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেখান থেকে দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় নাসরীন জাহান স্বতন্ত্র। কেননা ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-চরিত্রকে তিনি সমাজ-আর্থ-রাজনীতির বাইরে নিয়ে শূলে চড়াতে যান না। বরং সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থাপন করেন বলেই গল্পে রূপায়িত নারী-জীবন হয়ে ওঠে বাস্তব-জীবনেরই অনিবার্য অনুষঙ্গ। নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে নারী-জীবনের রূপায়ণ-সূত্রে তাঁর নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ তাই আরোপিত বা তাত্ত্বিক হয়ে পড়েনা বরং গল্পের ভেতরে এমনভাবে তিনি নিজস্ব ভাবনাকে, নিজস্ব অন্বিষ্টকে রূপদান করেন যে, গল্পের কাহিনি বা চরিত্রের বিকাশ স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে সঞ্চরণশীল থেকে পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন ও সংশোধনকল্পে নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের উন্মোচন তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

সামগ্রিক আলোচনায় হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক বিশ্লেষণে একথা মনে হতে পারে যে, নারী ও পুরুষের সম্পর্কের

ক্ষেত্রে পুরুষ খলচরিত্র, সকল নষ্টের গোড়া। আদপে এ ধারণা ভ্রান্ত ও সত্য-বিবর্জিত। নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রিক তথা সামূহিক দুরবস্থার জন্য ব্যক্তিগতভাবে পুরুষ দায়ি নয়; দায়ি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। সমাজ নারী-পুরুষকে যেমন ছাঁচে ফেলে ঢালাই করেছে, তারা তেমনিভাবে গড়ে উঠেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সকল পুরুষ যেমন জালিম বা স্বৈরাচারী নয় তেমনি সকল নারীও কর্তব্য ও কঠোর শ্রমের যথার্থ উদাহরণ নয়। কিন্তু পুরুষসুলভ ও নারীসুলভ সামাজিক ভূমিকা সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও পুরুষকে ঐ দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। মত ও পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আলোচ্য গল্পকারগণ একমত যে, নারী নির্যাতিত, সামাজিক কাঠামোর প্রান্ত সীমায় তার অবস্থিতি এবং এই অবস্থান থেকে সামাজিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে উত্তরণ সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। বিভিন্নতা থেকেই পরিবর্তনের আবশ্যকতা প্রস্ফুটিত হয় এবং অর্থপূর্ণ, কার্যকর দিকনির্দেশনা উন্মোচিত হয়— চিন্তাধারা থেকে কর্মপন্থায় উত্তরণ ঘটে। আলোচ্য গল্পকারদের ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমি ও পরিসরে রূপায়িত বহুমাত্রিক নারী-জীবনের যথার্থ সমাজবাস্তবতা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে কেবল সমাজের প্রকৃত চেহারাই প্রতিবিম্বিত হয় না বরং এরই সমান্তরালে নারীর প্রকৃত অবস্থানটিও সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে; একই সঙ্গে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যথার্থ পথ-পরিক্রমারও নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। নারীমুক্তি না-ঘটলে যে বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়, সে-কথাই প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়েছে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান রচিত ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে। তাঁদের গল্পে গল্প আছে ঠিকই কিন্তু পরিণামে তা থিতু হয়েছে বৌদ্ধিক স্তরে এসে, যা সার্বিকভাবে কেবল নারী-জীবনের প্রকৃত সমাজসত্যের পরিসীমায় সীমাবদ্ধ থাকে না বরং নারীর আয়নায় উদ্ভাসন ঘটে সময়, সমাজ ও বিরূপ-প্রতিবেশের সার্বিক চালচিত্র। ফলে তাঁদের রচিত গল্পগুলো একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সমাজ-বাস্তবতার দালিলিক প্রমাণ ও নারীর মানবিক মুক্তির অনন্য শিল্পভাষ্য।

c_g Aa¨vq

evsjv‡`‡ki †QvUM‡í bvix-Rxeb : cvmw½K cUfwg

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে সন্ধান করলে ছোট আকারের গল্প অতি প্রাচীন কাল থেকেই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সচেতনভাবে :'সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব আধুনিক কালের ঘটনা।'[১] আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বহুমাত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও ঘটেছে নানা রূপান্তর; ব্যক্তির সমস্যা এখন আর একরৈখিক নেই, নানারকম অসঙ্গতি ও অব্যবস্থা যেমন তার ওপর চেপে বসেছে, তেমনি সে নিজেও ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বিস্তৃত ভূগোলে। বলা যেতে পারে : 'বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় উৎপন্ন 'ব্যক্তির' বিশেষ কোনও সমস্যা কি সংকটকে কেন্দ্রবিন্দু করে তাকে তীক্ষ্ণভাবে দেখার জন্যে ছোটগল্পের চর্চা হয়ে আসছে আজ দেড়শো বছর ধরে।'[২] ফলে ব্যক্তির কোনো একটি বিশেষ সমস্যার সঙ্গে আধুনিক গল্পকে ধারণ করতে হচ্ছে তার একাধিক সমস্যা-সঙ্কটকে। ব্যক্তিকে বৃহত্তর সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ করতে গিয়ে ছোটগল্পের বিষয় যেমন হয়ে পড়েছে বিস্তৃত, তেমনি আঙ্গিক-ভাষাও হয়ে উঠেছে জটিলতর। ছোটগল্প তার সৃজনকালের বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক দূরে সরে এসে ক্রমে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে নতুন নতুন পথে অভিক্ষেপ করে চলেছে। লক্ষণীয় যে :

> আধুনিক মানবচৈতন্যের সমুদ্র বিস্তৃতি ও বিভঙ্গতা, বহুভুজ বিসঙ্গতি ও বিপর্যয়, অন্তর্গূঢ় বেদনা ও উজ্জ্বল আশাবাদ— এই সব প্রবণতা প্রকাশের অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন শিল্প-আঙ্গিকরূপে ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ। পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্যন্তর সীমাবদ্ধতার চাপে, সময়ের শাসনে মানুষ যতই যান্ত্রিক হয়েছে, ছোটগল্প-সাহিত্যের বিকাশ ততই হয়েছে ঋদ্ধ। পূর্ণ জীবন নয়, বরং বৈরী পৃথিবীতে জীবনের খণ্ডাংশই মানুষের কাছে প্রাধান্য পেল। এ অবস্থায় উপন্যাসের পরিবর্তে ছোটগল্প উঠে আসলো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কেননা, একক অনুষঙ্গের আধারেই ছোটগল্পে ফুটে উঠলো পূর্ণ জীবনের ব্যঞ্জনা— পদ্মপাতার শিশিরে যেমন হেসে ওঠে প্রভাতের সম্পূর্ণ সূর্য।[৩]

বাংলা ভাষায় ছোটগল্প রচনায় প্রয়াস লক্ষ করা যায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কিন্তু প্রকৃত অর্থে : 'উনিশ শতকের নব্বুইয়ের দশকে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু এবং লেখাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) হচ্ছেন সে-যাত্রার পথিকৃৎ।'[৪] লেখক সমাজ বিচ্ছিন্ন কেউ নন, সমকালীন যুগপরিবেশ-রাজনীতি-সমাজ অনিবার্যভাবে লেখকের ওপর প্রভাব ফেলে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ-সন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান রচিত ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসরে বিস্তৃত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সমাজবাস্তবতা উন্মোচনের লক্ষ্যে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে প্রকারান্তরে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

বহুমাত্রিক নারী-জীবনের ছবি। একই সঙ্গে এরই মধ্য দিয়ে অতীত নয়, যে অগ্নিগর্ভ বর্তমানের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, যা এই মুহূর্তে আকার পাচ্ছে, সেই সময়কেই চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়াসও লক্ষণীয়। হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহানের গল্পের বিশ্লেষণ ও আলোচনার ক্ষেত্রে, তাঁদের জীবনোপলব্ধির স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়োজনে একই সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি ও সমকালীন সাহিত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কেননা তাঁদের মানসগঠন, জীবনবীক্ষা, সমাজ-সচেতনতা ও শিল্পাদর্শ গড়ে উঠেছে সময়ের তরাঙ্গাঘাতে আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও সমকালের অভিজ্ঞানে।

বাংলা ছোটগল্পের জন্ম হয়েছিল এবং শৈশব-কৈশোরে এটি পরিচর্যিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো এক মহান শিল্পীর হাতে। রবীন্দ্রনাথের গল্পচর্চার সময়কাল খুব বেশি নয়— অথচ এই সময়ের মধ্যেই বহুবিচিত্র বিষয় ও চরিত্র, আর নির্মাণকৌশলের চমৎকারিত্বে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছিল বাংলা গল্পের ভুবন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে নারী। রবীন্দ্রনাথ নারীকে এঁকেছেন শব্দ-তুলির হরেক আঁচড়ে। কখনও সেই নারী সুখে সুখে বহুবর্ণা উজ্জ্বল, কখনও সাদাকালো-মলিন, কখনও-বা ধূসর জীর্ণ। সেই নারী কখনও পূর্ণ, কখনও অপূর্ণ অবস্থাতেই তাদের জীবন সমাপ্তির দিকে চলে গেছে। আবার কখনও মনে হয়েছে জয়ী হবার জন্যই নারীর জন্ম। আর রবীন্দ্রনাথও নারী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। তখন মনে হয় এই নারী কুহক জানে। ধূম্রজালের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে রোমান্টিকতার মোহময় আবেগ। তবে : 'যাই হোক না কেন সবটুকুই তাঁরই আবিষ্কার। সেই আবিষ্কার রবীন্দ্রমনের, রবির কিরণে ঝলকিত। তিনি তো বলেছেনই—

> 'আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা
> তুমি আমারই, তুমি আমারই মম জীবন-মরণ বিহারী।[৫]

নারীকে তিনি সাজিয়েছেন যেমন জীবনের নানা অভিজ্ঞতা দিয়ে তেমনি দুঃখ-গ্লানি, হাসি-কান্না, সুখ-বিচ্ছেদেও ভরিয়ে দিয়েছেন। ছোটগল্পের নারী-চরিত্রগুলোকে রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রেম-পরিণয়-তৃষ্ণা এসবেই বেধে রাখেননি। তিনি সেগুলোকে নিয়ে গেছেন আরও দূরে, অনেক বেশি উচ্চতায়। সেখানেই তাঁর স্রষ্টামনের পরিচয় মেলে। নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বাস্তব চিত্রায়ণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের নানা গল্পে। বলা যেতে পারে যে : 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নারী-চরিত্রগুলি সমধিক পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল।'[৬] 'প্রতিহিংসা' গল্পটি একটি উৎকর্ষ উদাহরণ। ইন্দ্রাণীকে তার প্রভুপত্নী অপমান করেছিল। ইন্দ্রানীর রূপ ছিল, ইন্দ্রাণীর অহংকার ছিল আর ছিল স্বাতন্ত্র্য। বলাই বাহুল্য, প্রভুপত্নীর তা ভালো লাগেনি। তাই নানাভাবে তাকে অপমান করেছিল। ইন্দ্রাণী সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পেরে মনে মনে আহত ছিল। অবশেষে এল প্রতিশোধ নেবার মুহূর্ত। প্রভু

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার যখন ঋণে আকণ্ঠ মগ্ন, যখন তাদের কোথাও অর্থ সংগ্রহের পথ নেই তখন ইন্দ্রাণী তার সমস্ত অলংকার দিয়ে জমিদারি উদ্ধার করে তারপর সে তার প্রভুবংশকে দান করে দিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবার পর আর কোনো বেদনা রইল না তার মনে। নারীর অভিমান ও অপমানবোধের প্রস্তর-কাঠিন্য রূপ লক্ষণীয় 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা চরিত্রে। স্বামীকে সে মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমা করেনি। 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা, কিংবা 'দিদি' গল্পের শশীতে যে দৃঢ়তা ও মর্যাদা-সচেতনতা লক্ষ করা যায়, তা অনেকখানি যেন 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের মতো তেজস্বিনী নারী রবীন্দ্র ছোটগল্পের এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'দেনাপাওনা' ও 'হৈমন্তী' গল্পে নিরুপমা ও হৈমন্তী, পুরুষের অবিচারের জবাব দিয়েছে আত্মনিগ্রহের পথে। তাদের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্ম-অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে। অবশ্যই নিরুপমা নিজের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় নি, কিন্তু মৃত্যুও হয় নি তার। কিন্তু হৈমন্তী আর দশজন বঙ্গ-রমণীর মতো স্বামীগৃহের ধিক্কারপূর্ণ জীবনকে মেনে নিতে পারে নি, মুক্তি খুঁজেছে মৃত্যুর মধ্যে। 'মানভঞ্জনে'র গিরিবালাই কেবল অনেকখানি মৃণালের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। তবে, গিরিবালার সংগ্রাম ছিল কেবল স্বামীর বিরুদ্ধে, মৃণালের সংগ্রাম সমগ্র সংসারের বিরুদ্ধে। এবং তাও কেবল নিজের জন্য নয়, অন্য একজন নির্যাতিতা নারীর পক্ষ নিয়ে। মোটকথা, সংসারে নারী-জাতির প্রতি প্রবল উপেক্ষা ও নির্যাতন মৃণালকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। সমাজে নারীর উপর অবিচার ও নির্যাতনে বিক্ষুব্ধ হয়ে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের মধ্য দিয়ে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাও অনেকখানি তেমনি। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রশ্নে প্রত্যেককেই সংসারে আপন অধিকার বুঝে নিতে হবে, অধিকার কখনো চেয়ে নেবার জিনিস নয়। মৃণাল চরিত্র ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পিত। লক্ষণীয় : 'রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এইখানে যে, তাঁরা সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে নারীকে অধিকার দান করতে চেয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ সেখানে বললেন, অধিকার অন্যের কাছে দান স্বরূপ হাত পেতে নেবার বস্তু নয়; আপন অন্তরের শৌর্যে তাকে আয়ত্ত করতে হবে।'[৭] প্রথাবদ্ধ সমাজের অচলায়তন ভাঙ্গার দুর্মর অভীপ্সা ও বিক্ষোভ রূপ লাভ করেছে মৃণালের মধ্য দিয়ে। মৃণালের সমগ্র জীবনকাহিনিই হচ্ছে স্বার্থপরতা-আচ্ছন্ন পুরুষ সমাজের প্রতি একটি প্রচণ্ড বিদ্রূপ। এভাবেই আমাদের জীবনের সুখদুঃখের পরিচিত কথা ও পরিচিত পৃথিবী বারবার রবীন্দ্রনাথের গল্পের উপাদান হয়ে এসেছে। তিনি : 'কখনোই পাঠককে চমক দিয়ে বিমূঢ় করতে চাননি, উচ্ছ্বাসে বিহ্বল করতে চাননি, স্বাভাবিকভাবে গল্পগুলো বিকশিত হয়েছে। অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত তাঁর গল্পসাহিত্যে বিরল।'[৮] আর এই স্বাভাবিকতার পথ ধরেই সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যম হিসেবে রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নারী-জীবনের বিকাশ ও পরিব্যাপ্তি ঘটেছে অনবদ্য শিল্প-কুশলতায়।

রবীন্দ্র সমসাময়িককালে প্রভাতকুমার মুখোপধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) খুবই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তাঁর ছিল স্বল্প পরিসরে গল্প জমিয়ে ফেলার দক্ষতা, ছোটগল্পে হাস্য-কৌতুকের সঙ্গে মানুষের প্রতি এক গভীর মমতার

মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি পাঠকহৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁর কথক ভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। তাঁর গল্পে, পাঠকের কৌতূহলের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যাদানের প্রবণতাও চোখে পড়ে। প্রভাতকুমারের পর বাংলা সাহিত্যের আরেক প্রতিভাধর শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের তিনিই প্রথম এবং এখন পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাঠকপ্রিয় লেখক। তিনি তাঁর জীবনকালেই যেমন এই জনপ্রিয়তার স্বাদ পেয়েছিলেন, তেমনি মৃত্যুর এই এতদিন পরও তাঁর জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। শরৎচন্দ্রের বিষয়-নির্বাচন এবং বর্ণনাভঙ্গিতে এমন এক জাদু আছে যে পাঠককে তা আবেগপ্রবণ করে তুলবেই। বলা যেতে পারে যে : 'শরৎচন্দ্র হচ্ছেন বিশ্বসাহিত্যের সেই বিরলতম লেখক, যিনি একটি জাতির তেমনই একটি আবেগবিন্দুকে খুব ভালোভাবে শনাক্ত করেছিলেন আর নিজের করণ-কৌশলকে সেই বিন্দুর অনুগামী করে তুলেছিলেন। তিনি জেনে ফেলেছিলেন, ঠিক কোন বিন্দুতে টোকা পড়লে বাঙালির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।'[৯] শরৎচন্দ্রের গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য খুবই কম— নিতান্ত পারিবারিক বা সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমস্যাই তাঁর কাহিনির প্রধান অবলম্বন। সেই সমস্যার মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় উপাদান হল নারীমন। বাংলার পল্লীসমাজ, মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার অবসিত প্রথা ও মধ্যবিত্ত জীবনের সুখদুঃখের কেন্দ্রে নারী। এই : 'নারী ও সমাজকে শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের অন্যান্য লেখকদের চেয়ে অনেক ভালো করে জানতেন। গভীর সমবেদনা ও ততোধিক অভিজ্ঞতায় এই জীবনকে তিনি দেখেছেন, ফলে যখনই তিনি লিখেছেন তখনই তাঁর মানবিক অনুভূতি তাঁর শিল্পির নিস্পৃহতাকে ঢেকে দিয়েছে।'[১০] যদিও শরৎপ্রতিভা মূলত ঔপন্যাসিকের এবং এত জনপ্রিয় লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছোটগল্প বেশি লেখেননি তবুও যা লিখেছেন তার মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু ছোটগল্প–– 'মন্দির', 'একাদশী বৈরাগী', 'মামলার ফল', 'পরেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'সতী', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'বিলাসী', 'হরিলক্ষ্মী', 'মেজদিদি', 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের পর বাংলা ছোটগল্প প্রথমবারের মতো বাঁক পরিবর্তন করল 'কল্লোল' গোষ্ঠীর তরুণদের হাতে। এঁরা ছিলেন আধুনিক মনস্ক, জীবনের ক্লেদাক্ত চিহ্নগুলোও উপেক্ষা করবার বিষয় নয় তাঁদের কাছে, নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরীরই যে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে— একথা বলতে দ্বিধা করলেন না তাঁরা। মূলত তাঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য-দর্শন প্রভাবিত যুবক— মার্কসীয় দর্শন, ফ্রয়েডের যৌন-মনস্তত্ত্ব, স্বদেশের মাটিতে স্বাধীনতাকামী যুবকদের মুক্তি-আন্দোলন নিশ্চয়ই তাঁদেরকে আলোড়িত করেছিল। এ সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)— এই তিন প্রতিভাবান তরুণের সঙ্গে জুটেছিলেন পূর্বসূরি জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) মতো এক অনন্য শক্তিমান গল্পকার। আরও ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মনীশ ঘটক। প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের

ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতা, অবক্ষয় হতাশার মধ্যেও মানুষের সম্ভাবনাকে খুঁজেছেন, ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেননি মোটেই, চরিত্র-চিত্রণে ছিলেন সচেতনতার অধিকারী এবং প্রকরণে সিদ্ধহস্ত। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ, তাদের জীবন ও বাস্তবতা যেমন তাঁর গল্পে জায়গা করে নিয়েছে' তেমনি এক অতলপ্রবাহী রোমান্টিকতায় তাঁর গল্পের নর-নারীরা গল্পের বিচিত্র পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে মাধুর্যময় ব্যঞ্জনায়। 'পুন্নাম', 'গোপনচারিণী', 'শুধু কেরানী', 'স্টোভ', 'ভূমিকম্প', 'রবিনসন ক্রুসো মেয়ে ছিলেন', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'সাগর সঙ্গম' ইত্যাদি গল্পে শিল্পিত হয়েছে তাঁর প্রতিভার সৌকর্য। মানুষের অবচেতন মনোজগতের খুঁটিনাটি বুদ্ধদেব বসুর কলমে উঠে এসেছে এক আশ্চর্য কুশলতায়, আর তাঁর ছিল সেই অনুপম ভাষামাধুর্য— যে-কোনো লেখকের জন্যই যা ঈর্ষার বস্তু। সেই সংস্কারাচ্ছন্ন সময়টিতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিতর্কিত লেখক। অশ্লীলতার অভিযোগে তুমুলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সমকালে তাঁর মতো ঋদ্ধ কথকোবিদ, সাহিত্য সমালোচক বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি নিজেই শুধু সাহিত্য রচনা করেন নি, বাঙালি পাঠকের কাছে অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলেও ধরেছেন। সে হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলের নাম বুদ্ধদেব বসু। তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সাহিত্যসম্ভারের কাছাকাছি তাঁর সৃষ্টিকর্ম। চুয়াল্লিশটি গল্পগ্রন্থ ছাড়াও রয়েছে কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ও ভ্রমণকাহিনি। বুদ্ধদেব বসুর গল্প সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মর্তব্য—

> বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে প্রতিভাসিত হয়েছে আধুনিক মানব-চৈতন্যের পীড়িত সত্তার সঙ্কট, মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক যন্ত্রণা এবং মানুষের চিত্ত জাগতিক বিপন্নতা। ... অঙ্কন করেছেন দ্বন্দ্বপীড়িত মধ্যবিত্ত মানুষের নৈঃসঙ্গ্যের দুর্ভর বেদনা, আত্মদহনের তীক্ষ্ণমুখ জ্বালা, বিচ্ছিন্নতার দুর্মর যন্ত্রণা, সৌন্দর্য ও ভালোবাসার আত্মমুখী এক স্বপ্নলোক। আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ বুদ্ধদেবের গল্পজগৎ। বুদ্ধদেবের গল্প বস্তুত, তাঁর কবি-আত্মার নির্জন শব্দ-স্বাক্ষর।[১১]

বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহ যথাক্রমে 'রজনী হলো উতলা', 'এমিলিয়ার প্রেম', 'আমরা তিনজন', 'সুপ্রতিম মিত্র', 'মা-বোন-ভাই', 'একটি লাল-গোলাপ' 'একটি কি দুটি পাখি', 'জয়জয়ন্তী', 'তুমি কেমন আছো' ও 'আবছায়া'। তাঁর সামগ্রিক গল্পের চরিত্রসমূহ সম্পর্কে সমলোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> বুদ্ধদেব বসু প্রেমের আশ্রয়ে মানবজীবনের রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস, গীতিময়তা, হৃদয়াবেগ এবং মধ্যবিত্তমানসের নৈঃসঙ্গ্যানুভূতির আবেগীরূপ উন্মোচন করেছেন, প্রেমকে সন্ধান করেছেন প্রত্যক্ষতার সীমানায়। ... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক বিপন্নতার প্রেক্ষাপটে, মধ্যবিত্ত মানুষের সামূহিক বিচ্ছিন্নতা, বিযুক্তি ও নৈঃসঙ্গ্যের শিল্পরূপ অংকন করেছেন। ... বুদ্ধদেব বসুর নায়ক-নায়িকারা নিমগ্ন হয়েছে প্রেমের স্মৃতি আধাওে; আত্মখনন, আত্ম-উন্মোচন, আত্মহনন ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তারা প্রকাশ করেছে হার্দ্য কথকতা। ... বুদ্ধদেব বসু মূলত অংকন করেছেন প্রেমের আধারে অ-প্রেমের যন্ত্রণা।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর (১৯০৩-১৯৭৬) গল্পগুলো মনস্তাত্ত্বিক— সেই সঙ্গে তাঁর ভাষা আলঙ্কারিক। সবদিক দিয়েই তাঁর গল্পের বহুমাত্রিকতা পাঠককে মুগ্ধ করে অবলীলায়। জগদীশ গুপ্ত ছিলেন এ সময়ের এক আশ্চর্য লেখক। প্রেম ও মমতা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ, সুস্থতা এবং সৌন্দর্যবোধ এইসব যাবতীয় ভালো ভালো কথাবার্তা তাঁর গল্পে চিরদিনই নির্মমভাবে উপেক্ষিত থেকে গেছে। একজন লেখক কীভাবে সারাজীবন ধরে শুধু জীবনের ক্লেদাক্ত-পরাজিত-জঘন্য-নির্মম-নিষ্ঠুর অর্থাৎ যাবতীয় নেতিবাচক পরিণতির কথা এত নির্মোহ-নিরাসক্ত ভঙ্গিতে লিখে যেতে পারেন— তাঁর গল্পে বিধৃত জীবন ও চরিত্রের অবয়বে পরিলক্ষিত হয় তারই প্রচ্ছাপ। 'দিবসের শেষে', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', 'আদিকথার একটি', 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' এরকম আরো বহু গল্প তাঁর নৈরাশ্যপীড়িত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। চিন্তার এহেন প্রকাশে সিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর পুরুষেরা, তাঁর নারীরা। এই সময়ের আরেক লেখক মনীশ ঘটক— যাঁর গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণির, বিশেষ করে অপরাধী বলে পরিচিত মানুষদের নিয়ে এমন নিরাসক্ত-নির্মোহ বর্ণনা আছে যেগুলোকে বলা যায়, 'বিশ-তিরিশের দশকের কলকাতার অসামাজিক মানুষের মানবিক দলিল'। সব মিলিয়ে এই সময়ের লেখকরা যেমন রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে আনতে চেয়েছেন তেমনি রোমান্টিকতাকেও বিসর্জন দেননি। বলা যায় : 'বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার এক ধরনের সুষম সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন এই সময়ের লেখকরা।'[১৩]

'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের তুমুল সক্রিয়তার সময়েই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটল তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এ তিনজনই একে অপর থেকে যথেষ্ট রকমের আলাদা, কিন্তু তাঁরা সম্মিলিতভবেই যেন তৈরি করেছিলেন এক সমগ্রতার বোধ— এ বোধ মানবস্বভাব, সমাজজীবন ও দার্শনিক উপলব্ধির। এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালে বাঙালি পাঠককে এত তুমুলভাবে আলোড়িত করেছেন যে, এর তুলনা মেলা ভার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও উপন্যাসে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দবিহারী, সুদূরপ্রসারী ও সফল তবু গল্পের মধ্য দিয়েও তিনি পাঠককে নতুন একটি আস্বাদ দিতে পেরেছিলেন। গ্রামীণজীবনকে উপজীব্য করেছিলেন তিনি, তার রূপায়ণেও যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন এবং প্রথমবারের মতো ব্যবহার করেছিলেন আঞ্চলিক শব্দাবলি আসাধারণ শিল্প-কুশলতায়। 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ', 'ছলনাময়ী', 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'তিন শূন্য' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাভিজ্ঞতার গভীরতা ও লেখনী-শক্তির প্রখরতার পরিচয়বাহী। এই সময়ের লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খানিকটা ব্যতিক্রম। বিষয়বস্তু হিসেবে তিনিও বেছে নিয়েছিলেন গ্রামকেই, তবু তাঁর গ্রামগুলো যেন একটু আলাদা। সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর বাস্তবতার চেয়ে 'ছায়া-সুনিবিড় গ্রামখানি'র চিত্রই বেশি চোখে পড়ে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের দারিদ্র্য আছে, গ্লানি ও পরাজয় আছে, কিন্তু একই সমান্তরালে বেঁচে থাকার প্রেরণাও আছে। নিত্যদিনের ক্লেদাক্ত জীবন-যাপনের চেয়ে তাঁর কাছে বৃহত্তর জীবনবোধই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, ফলে তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীরা কোনো-না-কোনোভাবে

তাদের সমস্যাগুলো পাশ কাটিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণায় উজ্জীবিত। এক গভীর মমতা ও ভালোবাসায় তাঁর নর-নারীরা নির্মিত হয়, গ্রামগুলো চিত্রিত হয়— যা পাঠককে আবিষ্ট করে তোলে। 'মেঘমল্লার', 'মৌরিফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নর দল', 'বেনীগীর ফুলবাড়ী', 'নবাগত', 'তালনবমী', 'উপলখণ্ড', 'বিধু মাস্টার', 'ক্ষণভঙ্গুর', 'অসাধারণ' ও 'মুখোশ ও মুখশ্রী' ইত্যাদি তাঁর গল্পের বই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আজও অদ্বিতীয়, সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, বিশিষ্ট এবং স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল লেখক। মানিক এজন্যই বিশিষ্ট যে তিনি আগাগোড়া আধুনিক জটিল অথচ জঙ্গম। যুগব্যাধি, কালের কালকুট, জলন্ত বাস্তবতা— সে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, মানুষ যাই হোক না কেন তাঁর সাহিত্য শরীরে-শিরায়-শোণিতে ছড়িয়ে আছে নানা বৈচিত্র্যে, রঙে-রহস্যে, বিপন্ন বিষে ও বিক্রমে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি 'এতটাই জটিল, জনান্তিক, গভীর ও গম্ভীর, সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ যে সকলেই সেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় না। তিনি অভাবিত জীবন, অনালোকিত সমাজ, অ-উন্মোচিত মন ও অপরিজ্ঞাত আধির শিল্পী। সে কারণে তাঁর লেখা আজও নতুন নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে এবং অনুসন্ধানের ও আবিষ্কারের।'[১৪] সংখ্যায় নয়, ওজোগুণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বিশিষ্টতা, অনন্যতা। 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ফাঁসি', 'ভূমিকম্প', 'হলুদ পোড়া', 'হারাণের নাতজামাই', 'মিহি ও মোটা কাহিনী', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'ফেরিওলা', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'র মতো গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে। রোমান্টিকতার পরিবর্তে জীবনের অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতাই যে সবচেয়ে সত্য— এই উপলব্ধি ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্পভূমির পরতে পরতে, তাঁর নর-নারীর বিচিত্র অবয়বে। এই 'লেখক সারাটা জীবন ধরে লিখেই গেছেন। কি বলব, ব্রতই যেন তাঁর লেখালেখির কমিটমেন্ট-এ।'[১৫] অকল্পনীয় দক্ষতায় জীবনের অমৃতস্বাদ আর বিষাক্ত লাভাস্রোতকে একই পাত্রে ঢেলে তিনি পরিবেশন করেছেন। তাঁর গল্প সে-নিদর্শনেরই বাহক।

কল্লোল ও বন্দ্যোপাধ্যায়ত্রয়ের পথ ধরেই এলো চল্লিশের দশক। একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন— '৪০ দশকের আগ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের মানুষ ও তাদের জীবন প্রায় উপেক্ষিতই ছিল। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর কোনো উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা এই সময়ে চোখে পড়ে না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জলধর সেন, আবদুল ওদুদ, এমদাদ আলী, ইমদাদুল হক প্রমুখের লেখায় মুসলমান জনজীবনের চিত্র খানিকটা ধরা পড়লেও সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, অনুল্লেখযোগ্য। '৪০ দশক থেকে পূর্ববাংলার মানুষ এবং বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী নিজেদের ছবি দেখা শুরু করল বাংলা কথাসাহিত্যে। এই দিক থেকে সময়টি বাংলা কথাসাহিত্যের জন্য একটি বাঁক ফেরার মুহূর্ত। লক্ষণীয় 'প্রাক-সাতচল্লিশ পর্বে পূর্ববঙ্গের ছোটগাল্পিক-চেতনাপুঞ্জ প্রবাহিত হয়েছে দুটি ভিন্ন

স্রোতে। একটি স্রোতের উৎসে ছিলেন সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী গল্পকাররা; অন্যটি সৃষ্টি হয়েছে উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী কথাকোবিদদের সাধনায়।'[১৬] প্রথম পর্যায়ের কথাসাহিত্যিক হিসেবে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আর দ্বিতীয়টি আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু রুশদ, সিকান্‌দার আবু জাফর, সোমেন চন্দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দিন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে :'অসম সমাজবিকাশের কারণে বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসলোকে বুর্জোয়া ভাবধারার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল এবং সত্যস্পর্শী।'[১৭] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন কিংবা বন্দে আলী মিয়ার গল্প শিল্পমূল্যে নয় বরং পূর্ববাংলার গল্পসাহিত্যের বিকাশ ধারায় তাঁদের প্রয়াস ঐতিহাসিক কারণে বিশিষ্ট। তাঁদের গল্পে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের ধর্মাশ্রিত সংস্কারস্নিগ্ধ প্রথাচল জীবনপ্রত্যয় রূপায়িত হয়েছে সরল প্লটের আশ্রয়ে, সাবলীল ভাষায়। সামন্ত মূল্যবোধের প্রতি প্রবল আসক্তি এবং উনিশ শতকী জীবনধারণা তাঁদের সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের a‡bi gÄix, wkiYx, cqjv RjvB, wk‡ivcv ; এবং বন্দে আলী মিয়ার †gNKgvix, gMcix, nwiY, Ai‡Y¨i wefxwlKv প্রভৃতি ছোটগল্প-সঙ্কলনের নাম। যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়, কল্লোলীয় ভাবোচ্ছ্বাস ও মনোবিশ্লেষণ এবং মুসলিম সমাজের সংস্কারাচ্ছন্নতা-স্বপ্নচারিতা নিয়ে গড়ে উঠেছে আবুল ফজলের গল্পভুবন। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সৈনিক আবুল ফজলের ছোটগল্পে উদার মানবতাবাদী চেতনা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিশীলিত মননের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মৃতের আত্মহত্যা', 'নিহত যম', 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর', 'কান্না' প্রভৃতি গল্প আবুল ফজলের প্রগতিশীল সমাজভাবনা ও ইতিহাসবোধের পরিচয়বাহী। ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক গল্প রচনায় আবুল মনসুর আহমদের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। Avqbv, dW Kbdv‡iÝ প্রভৃতি গ্রন্থে আবুল মনসুর আহমদ সমাজের নানামাত্রিক অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন এবং একই সঙ্গে প্রত্যাশা করেছেন মানবিক অন্তঃসঙ্গতির উদ্বোধন। আবু রুশদ আমাদের প্রথম গল্পকার যিনি নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে তাঁর গল্পের উপজীব্য করেছেন। মুসলিম মধ্যবিত্তের সংস্কারচেতনা ও চিত্তের প্রবঞ্চনা, নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি ও জীবনবোধের দীনতা এবং দেশভাগের আবেগ-উচ্ছ্বাস-উদ্বেগে সিক্ত আবু রুশদের গল্পভুবন। kvox evox Mvox, g‡n›' wgóvb fvÐvi, ivRavbx‡Z So ও c_g †hŠeb গল্পগ্রন্থের গল্পভূমে নাগরিক মধ্যবিত্তের চিত্তপ্রবঞ্চনা, অসঙ্গতি এবং অনন্বয় শিল্পিত ভাষ্যে রূপলাভ করেছে। গল্পের পুরুষ চরিত্রগুলোর প্রায় সবাই মোটামুটি উচ্চশিক্ষিত, কলকাতাবাসী, চাকররিজীবী, স্মার্ট, প্রাণবন্ত, আধুনিক তরুণ। শুধু তাই নয় নারী চরিত্ররাও শিক্ষিত, স্মার্ট, আধুনিক, আত্মসচেতন, সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা তরুণী। নারী-পুরুষের সম্পর্কও সহজ, মুক্ত। যে সময়ে এসব গল্প রচিত হয়েছিল তখন মুসলমান মধ্যবিত্তের গড়পরতা চেহারা এমন ছিল না, তবে এসব চরিত্রের মধ্যে লেখকের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে। দক্ষিণ বাংলার গরীব-নিম্নবিত্ত মানুষের

প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পসাহিত্য। যুদ্ধোত্তর-পটে মানুষের অন্তহীণ দুর্ভোগ-নির্বেদের গল্পরূপ সৃজনেও তিনি রেখেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। 'পথ জানা নাই', 'দুই হৃদয়ের ঢেউ', 'অনেক দিনের আশা', 'রক্তের স্বাদ' প্রভৃতি গল্প তাঁর প্রখর সমাজবোধের পরিচায়ক। সোমেন চন্দের গল্প বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা। বাংলা সাহিত্যে সমাজবাদী চিন্তার শিল্পরূপ নির্মাণে তিনি পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। তাঁর গল্পে মানুষের মুক্তিকামনা উচ্চারিত হয়েছে, ধ্বনিত হয়েছে মানবাত্মার বিজয়গাথা। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বনস্পতি', 'একটি রাত', 'ইঁদুর', 'সঙ্কেত' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখযোগ্য। শিল্পবোধ ও জীবনচেতনার প্রশ্নে পূর্বাপর সতর্ক, সপ্রতিভ এবং বিশ্ববিস্তারী কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পসমূহ বাংলা সাহিত্যের ধারায় সংযোজন করেছে স্বকীয় মাত্রা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প 'নয়নচারা', 'জাহাজী', 'মৃত্যুযাত্রা', 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'স্তন', 'কেরায়া', 'মতিনউদ্দিনের প্রেম', 'মানুষ', 'ছায়া', 'দ্বীপ', 'মানসিকতা', নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' 'মাঝি', 'নকল', 'রক্ত ও আকাশ', 'না কান্দে বুবু' প্রভৃতি। গল্পগুলো গভীর জীবনদর্শন সমৃদ্ধ ও উন্নত শিল্পমানসম্পন্ন। এগুলোর কোনো-কোনোটি সব মিলিয়ে সৃষ্টি করেছে জীবন সম্বন্ধে এক গভীর দার্শনিক বোধ, কোনো-কোনটির রচনারীতি ও নির্মাণকৌশলের চমৎকারিত্ব পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে, কেনোটি আবার উপস্থাপন করে চিরন্তন প্রশ্ন। মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ bqbPviv এবং 'B Zxi I Ab¨vb¨ Mí-এ সংকলিত মোট সতেরটি গল্পের গভীর রহস্যময়তা, কুশলী প্রতীকময়তা, অসামান্য দার্শনিকতা, চমৎকার নির্মাণশৈলী আজো পাঠককে আপ্লুত করে। তাঁর গল্পের পুরুষেরা, নারীরা যে শ্রেণি-পেশারই হোক না কেন— তাদের দৈনন্দিন জীবনের নির্মম বাস্তবতার চেয়ে তাঁর কাছে তাদের মানসজগতটিই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষের মনোজগতের নানাবিধ কার্যকলাপ আর দার্শনিক ভাবনাচিন্তা রূপায়ণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাফল্য প্রশ্নাতীত। এ কথা অনস্বীকার্য যে : 'একটি নতুন দেশে তিনি খুলেছিলেন কথাসাহিত্যের এক নতুন স্কুল যার ভাষা-বিষয়-দার্শনিক প্রতীতি ছিল তাঁর পূর্বসূরিদের চেয়ে আলাদা— আজকের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা সেই স্কুলেরই গর্বিত ছাত্র।'[১৮] এ সময়ের আরেক উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান। ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে শওকত ওসমান তাঁর গল্পভূমে প্রকাশ করেন তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাস্রোত এবং সে চিন্তাস্রোতে সিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর পুরুষেরা, তাঁর নারীরা। Rb¥ hw' Ze e‡½, gw`be I Zvnvi KKi, Ck‡ii cwZØ›Øx প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে শওকত ওসমান বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা নৈপুণ্যের সঙ্গে উন্মোচন করেছেন। আঙ্গিক নিরীক্ষা, চরিত্রানুগ ভাষা-প্রয়োগ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক-প্রতীক ব্যবহার শওকত ওসমানের গল্পের অন্যতম সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য। বিভাগ-পূর্ববর্তীকালে বাংলা ছোটগল্পের আসরে যে সব লেখক আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই গল্পের শিল্প-উপাদান গ্রহণ করেছেন গ্রামীণ জীবন থেকে। প্রাক্-সাতচল্লিশ কালপর্বে বাংলাদেশের ছোটগল্পের এই ঋদ্ধ উত্তরাধিকারের উপরই নির্মিত হয় পঞ্চাশ-ষাট-সত্তুরের গল্পভুবন। আলোচ্য পর্বের গল্পকারদের

আন্তরিক ও চিন্তাশীল ও লক্ষ্যমুখী পদচারণা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিল একটি সম্ভাবনাময় পথ।

বাংলাদেশের সাহিত্যে পঞ্চাশের দশক নানা দিক থেকেই বিহ্বলতার। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আর ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত তখনো শুকোয়নি, রয়েছে দেশবিভাগজনিত আবেগ-বিহ্বলতা ও হাহাকার। দু-বাংলার শেকড়হীন মানুষ— উদ্বাস্তু, অসহায়; নতুন দেশে বসবাসের জন্য যাদের চোখ স্বপ্নে নয় বেদনায় ম্লান। এরই মধ্যে ঘটে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে; হতাশা-অবক্ষয় বাড়ছে, চারদিকে ধ্বংসযজ্ঞ, মানবতার নির্মম পদদলন, মূল্যবোধ বলতে বা আশাবাদী হবার মতো কোথাও আর কিছু অবশিষ্ট নেই, বেঁচে থাকাটাই যেন এক বেদনাদায়ক, ক্লান্তিকর, গ্লানিময় অভিজ্ঞতা আর অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে এক ভীষণ অর্থহীন বিষয়— মানুষ যেন হঠাৎই উপস্থিত হয়েছে তার চূড়ান্ত পরিণতির সামনে। এক বিস্ময়কর বিপন্নতা ঘিরে রেখেছে পঞ্চাশের দশকের লেখকদের; কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র এবং তখনকার আবেগ-মূল্যবোধগুলো ছিল এসবের বিরুদ্ধে। বিভাগোত্তর কালে প্রথম দশকে ছোটগল্প রচনায় যাঁরা ব্রতী হন, তাঁদের মধ্যে সরদার জয়েনউদ্দীন, মিরজা আবদুল হাই, শাহেদ আলী, আবু ইসহাক, আশরাফ সিদ্দিকী, মিন্নাত আলী, শহীদ সাবের, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ. হাসান হাফিজুর রহমান, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ শিল্পীর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭, সময়ের এ পর্বে প্রকাশিত ছোটগল্পসমূহ প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক ঘটনাংশ আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের 'বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বোধকরি এই যে, আমাদের ছোটগল্প এ পর্বেই প্রথম হয়ে ওঠে মৃত্তিকামূলস্পর্শী ও জাতিসত্তার শিকড়-অন্বেষী।'[১৯] এসময়কার ছোটগল্পসাহিত্যে যাঁরা এলেন তাঁরা অনেকটা নীরবেই একটি যুদ্ধ করে গেছেন— রাষ্ট্রের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল উপেক্ষা করে নিজ ভাষাকে টিকিয়ে রাখার, নিজের ভাষায় সাহিত্য রচনার এবং এর একটি মানসম্মত রূপদান করার যুদ্ধ। পঞ্চাশের গল্পকার হিসেবে যাঁরা সুপরিচিত, তাঁদের প্রধান প্রবণতা সমালোচক নির্দেশ করেছেন এভাবে :

> তাঁরা ছিলেন প্রবলভাবে জীবনবাদী ও সমাজসংলগ্ন। তাঁদের গল্পের বিষয়ে যেমন দেশবিভাগ পূর্বকালের জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছে তেমনি আছে বিভাগ-পরবর্তী কালের। উদ্বাস্তুসমস্যা, মন্বন্তর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দাঙ্গা ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা গল্প লিখেছেন, তবে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলাদেশের গ্রামজীবন। গ্রামের বা শহরের যে ধরনের বিষয় তখনকার গল্পকারেরা অবলম্বন করুন না কেন, গল্পে যাপিত জীবনের সংকট সমস্যার আলেখ্যই তাঁরা রচনা করেছেন। কোন কোন শিল্পীর রচনায় শ্রেণীসংগ্রামও প্রমূর্ত হয়েছে।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

গল্পকাররা বিষয়ের সঙ্গে প্রকরণ-পরিচর্যার প্রতিও ক্রমশ মনোযোগী হয়ে ওঠেন এ সময়েই। বিষয়াংশ উপস্থাপনার অভিনবত্ব এবং নিরীক্ষাশীল ভাষারীতি দিয়ে এ পর্বের শিল্পীরা সূচিত করে দেন ষাটের দশকে বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের প্রকরণ-প্রসাধনের ঋদ্ধ পথযাত্রা।

বাংলাদেশের গল্প প্রথমবারের মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য বাঁক পরিবর্তন করে ষাটের দশকে। অস্থিরতার সময় ছিল সেটি; কী আমাদের পরিচয়— এই প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন। ততোদিনে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মোহ কেটে গেছে, ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে পাকিস্তানিদের প্রকৃত স্বরূপ, বাঙালি দাঁড়িয়ে আছে তার আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন সামনে নিয়ে, ভাবতে শুরু করেছে স্বাধিকারের কথাও। একদিকে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে সমস্ত মানবতা অন্যদিকে চলছে আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিরোধ। পূর্ববর্তী অর্থাৎ পঞ্চাশের লেখকেরা কিছুটা হতভম্ব ছিলেন নতুন রাষ্ট্র-প্রাপ্তিতে, ষাটের লেখকেরা অনেক বেশি স্থির হয়ে উঠেছিলেন আত্ম-পরিচয়ের প্রশ্নে। এই অর্থে সময়টি নানাদিক থেকে সংকট ও নির্মাণেরও বটে। পুরো ষাটের দশক একটি অনিশ্চয়তার দশক, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দশক, নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের দশক। উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বৃহত্তর ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে যে স্বাধীনতা-আন্দোলন হয়েছে সে আন্দোলনে রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) ও মুসলিম লীগ (১৯০৬) বা সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দু ও মুসলমান এক হতে পারেনি। লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) তাই রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির প্রস্তাব করা হয়, পরিণামে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা (১৯৪৭) দেয়। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি ভ্রান্ত প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান স্বাধীন হলেও সে সময় এ স্বাধীনতা পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানদের স্বপ্নের অন্তর্গত ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তি তাদের আনন্দিত করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের কাজ শুরু হয়, শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা-ষড়যন্ত্র, সর্বত্র গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্থ হতে থাকে। রাষ্ট্রভাষা ষড়যন্ত্রের কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের পূর্বাংশে ধর্মের চেয়ে ভাষা ও ঐতিহ্যের সংকট বড় হয়ে দেখা দেয়। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য পূর্ব-বাংলার মানুষ রাজপথে রক্ত দেয়— এই রক্তপাতের ঘটনা পূর্ব-বাংলার বাঙালিকে মানসিকভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির মৌল ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-আচারে তাঁরা হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত থাকবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে থাকেন। মুসলিম লীগের ওপর পূর্ব-বাংলার মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে শুরু হয় পশ্চিম-পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের আরেক অধ্যায়। সামরিক শাসনের কারণে এ

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে গণতন্ত্রের চর্চা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বহিষ্কারের পর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বন্দি করা হয়, কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করা হয়। এ সংক্ষুব্ধ সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, সাংবাদপত্র হারায় বাকস্বাধীনতা ও অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মী স্বীয়-রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আইয়ুব খানের শাসনামলে পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রবল হয়ে ওঠে। বাঙালিরা সরকারের উচ্চ পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামী ও বুর্জোয়া প্রভাবিত শাসকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে কেন্দ্র করে পূর্ব-বাংলায় ছাত্রদের আন্দোলন নতুন উদ্যোমে শুরু হয়। আইয়ুব খান সরকারের কার্যকলাপের বিরোধিতা ক্রমশ আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ, অসংখ্য নেতা-কর্মী কারাগারে, যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের অনেককে দেয়া হয়েছে বাধ্যতামূলক অবসর— এহেন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ছাত্ররা নিজেদের দূরে রাখতে পারেন নি। তাঁরা আন্দোলনে নামেন, তাঁদের হাতেই মূলত এ সময়ের আন্দোলন গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবতীয় অপশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা তাঁদের আন্দোলনের গতিকে বেগবান করে তোলেন। ’৬৪ সালে ছাত্রদের ২২ দফা আন্দোলন, ’৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ’৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং তার প্রতিবাদে গড়ে ওঠা তুমুল আন্দোলন অবশেষে ’৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ’৬৯-এর আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে কৃষক ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মধ্যে। সরকারি নিপীড়ন-ষড়যন্ত্র, ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলন-সংগ্রামের উন্মাদনায় পুরো ষাটের দশকে বাংলাদেশ ছিল মুখরিত। ’৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পরেও এই অস্থিতিশীল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেনি, শেষ হয়নি ষড়যন্ত্রের। বরং এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই নির্বাচিত আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব-বাংলার মানুষের ওপর সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। শুরু হয় আরেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামমুখর ইতিহাসের। যে বর্বর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন, রাহাজানি, সম্ভ্রমহানি ও ঘৃণ্যতম নৃশংসতার দীর্ঘ ইতিহাসের পথ অতিক্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়। পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে তাই পুরো ষাটের দশক এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়কাল হিসেবে বিবেচিত। অস্থিতিশীল, সংগ্রামমুখর এ পটভূমি মানুষের মধ্যে বিশেষত মধ্যবিত্তের মধ্যে যে অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই তার গভীর প্রভাব পড়েছে এ দশকের বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর। ষাটের দশকে বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে একটি নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল, বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে রচিত এ কালের ছোটগল্পে ষাটের দশকের বাংলাদেশের উন্মাতাল, সংক্ষুব্ধ স্বরূপটি প্রকৃত অর্থেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ সময়কালে :

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে সামরিক শাসনের পেষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অবাঙ্গালী পুঁজির বিকাশ; অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই সময়কে অস্থির করে তোলে। এই সময়ে অগ্রজ গল্পকারেরা যখন গল্পের জগৎ থেকে এক প্রকার প্রস্থান করেছেন, তখন উঠে এসেছেন নতুন প্রজন্মের গল্পকাররা।[২১]

ষাটের দশকের বাংলাদেশের ছোটগল্প প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

> আলোচ্য পর্বে ছোটগাল্পিকচৈতন্যে আমরা লক্ষ করি দুটি প্রবণতা। একদিকে রয়েছেন সেইসব শিল্পী, যাঁরা সামরিক শাসনের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে আশ্রয় নিলেন বেতার-টেলিভিশন-বি এন আর-প্রেসট্রাস্টের নিরাপদ সৌধে। এঁদের রচনায় এলো পলায়নী মনোবৃত্তি, ফ্রয়েড-এলিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঁরা নির্মাণ করলেন মৈথুন সাধনার শব্দমালা। অপরদিকে আছেন সেই সব শিল্পী যাঁরা বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বাস করেও সমকালচঞ্চল জীবনাবেগ, যুগসংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ-বিদ্রোহ অঙ্গীকার করে গল্পের শরীরে জ্বেলে দিয়েছেন সমাজ-প্রগতির আলোকবর্তিকা। স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বাস করেও এঁরা ছিলেন সত্যসন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল সমাজ ভাবনায় উচ্চকিত।[২২]

ষাটের দশক থেকেই আধুনিক নগরায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গণজীবনের একটা অংশ ক্রমশ শহরমুখী হতে শুরু করে। কিন্তু শহরের জীবন মানুষের সমস্যাকে আরো প্রকট ও জটিলতর করে তোলে। শহরের জীবনযাত্রার অসম প্রতিযোগিতার বাহুল্যে, কদাকার ভ্রষ্টাচারে নাগরিক জীবন পদে পদে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হতে থাকে। ব্যক্তিক ও সামাজিক সমস্যার, ক্লেদাক্ত, অন্তঃসারশূন্য রূপটিকে এ সময়ের ছোটগল্পকারগণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন। জীবনের রূঢ় বাস্তবতার যথার্থ স্বরূপটি কঠোর বস্তুবাদী বিশ্লেষণে এ সময়ের ছোটগল্পকারগণ প্রতিবিম্বিত করেন তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে। পরিমার্জিত রূপকল্পের আধারে জীবনবাস্তবতার জটিল সত্যরূপের প্রকাশ ঘটাবার তাগিদেই এ সময়ের গল্পকারগণ নতুন শিল্প-কৌশল অবলম্বন করেন সুনিপুণভাবে। তাই দেখা যায় :

> এ সময়ের ছোটগল্পে বাংলাদেশের নগরজীবন যেমন তার বহুমুখী জীবন জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তেমনি পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ জীবনও তার যুগোপযোগী সমস্যা নিয়ে অবলীলায় সেখানে স্থান করে নিয়েছে। তবে যুগ যে পাল্টাচ্ছে তা বোঝা যায়, যখন দেখি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা থেকে উৎসারিত জীবনের যন্ত্রণা, উদ্বেগ, অবসাদ, মর্মান্তিক আত্মনিপীড়ন এবং বাধাবন্ধনহীন উচ্ছৃংখলতাকে এ যুগের গল্পকারগণ অগ্রজদের অনুবৃত্তি করেও স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বরচিত গল্পের ধারায় বিধৃত করেছেন।[২৩]

স্থিতি ও স্বস্তিহীন ষাটের দশকে গল্পলেখক হিসেবে যাঁরা সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন, তাঁরা হচ্ছেন— নাজমুল আলম (১৯২৭–), সুচরিত চৌধুরী (১৯৩০-১৯৯৪), মুর্তজা বশীর (১৯৩২-), সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ (১৯৩৩-১৯৯৮), মাফরুহা চৌধুরী (১৯৩৪-), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫-), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), শওকত আলী (১৯৩৬-), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৩৯-), হাসনাত আবদুল হাই

(১৯৩৯-), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-), রাহাত খান (১৯৪০-), বুলবন ওসমান (১৯৪০-), মাহমুদুল হক, দিলারা হাশেম (১৯৪১-), রশীদ হায়দার (১৯৪১-), আবদুস শাকুর (১৯৪১-), মাহবুব তালুকদার (১৯৪১-), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), আহমদ ছফা (১৯৪৩-১৯৯৯), আবদুল মান্নান সৈয়দ, সুব্রত বড়ুয়া (১৯৪৫-), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-), কায়েস আহমদ (১৯৪৮-১৯৯২) প্রমুখ। এঁদের হাত ধরেই বাংলাদেশের গল্প প্রথমবারে মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য বাঁক পরিবর্তন করে। পাকিস্তান সৃষ্টির (১৯৪৭) পর থেকে পূর্ববাংলায় অস্তিত্বের প্রশ্নে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হয় তা প্রকট হয়ে ওঠে ষাটের দশকে। এই আন্দোলন-সংগ্রামের কালে সচেতন যুবসম্প্রদায় আক্রান্ত হয় নিঃসঙ্গতার বোধে, লেখক-চৈতন্যকে এই নৈঃসঙ্গ্য বিক্ষুব্ধ করে তোলে; তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীলতা-বিরোধী মনোভাব, অন্ধ আভিজাত্য ও গতানুগতিকতার প্রতি ক্ষোভ দানা বাঁধে। অস্থিতিশীল এই ক্রান্তিলগ্নে : 'তাঁদের পরিবর্তিত লেখক-চৈতন্য বাতিল করে পুরনো সাহিত্যাদর্শের প্রচলিত রীতিনীতি। রাষ্ট্রশাসকের ভেদনীতির যথেচ্ছ ব্যবহার ও চাপে ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকারের পুনরুদ্ধার ঘটে এবং ষাটের লেখকরা পাকিস্তানের সরকারি সংস্কৃতি খারিজ করে দেন।'[২৪] সামাজিক-রাজনৈতিক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অস্থিতিশীলতা, বিদেশি সাহিত্য পাঠের প্রভাব, মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের নৈঃসঙ্গ্য ও অবক্ষয়, সংশয় ও দুরাশা, সংকল্প ও অন্তঃসারশূন্যতা— এরকম একটি অসহনীয় পটভূমিতে ষাটের দশকের গল্পকারগণ যে সব গল্প লিখেছেন তার মূল স্রোত চেতনার দিক থেকে না হলেও বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে পূর্ববর্তী দশকের গল্প থেকে নানাভাবে স্বতন্ত্র। ষাটের দশকেই আধুনিক নগরের যাবতীয় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নিয়ে ঢাকা গড়ে উঠেছিল, বিকশিত হচ্ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। লক্ষণীয় : 'এই শ্রেণী কৃষি ও শ্রমজীবী বৃহৎ মানবগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা, অর্থাৎ জীবনের নানা বৈভব ছিলো তাদের অনায়ত্ত।'[২৫] একদিকে না-পাওয়ার হাহাকার, অন্যদিকে পাওয়ার জন্য নানারকম স্বার্থপরতায় বিভ্রান্ত ছিল এই মধ্যবিত্ত মানসিকতা। এই শ্রেণির মূল অবস্থান যেহেতু নগর, তাই তাদের জীবনকে গল্পের বিষয় করতে গিয়ে ষাটের দশকের গল্প প্রধানত নগর-পটভূমির গল্প হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে আধুনিক নগরের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছোটগল্পের উদ্ভব ঘটেছে এই ষাটের দশকে। নগর-পটভূমির বাইরে অর্থাৎ গ্রামকে উপজীব্য করে লেখা এ দশকের গল্পেও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নবতর মাত্রা লক্ষণীয়। পঞ্চাশের দশকের গল্পের প্রেম-ভালোবাসা, একান্নবর্তী পরিবারের বিষয়-আশয়ের পরিবর্তে ষাটের দশকের গল্পকারদের গল্পে রাজনৈতিক অবক্ষয়, হঠকারিতা, মধ্যবিত্তের আত্মদ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদ, অন্তঃসারশূন্যতা, মনোজটিলতা আর ব্যক্তির অথৈ-নৈঃসঙ্গ্য জীবনসংলগ্ন ও সমাজবাস্তবতার নিরিখে উদ্ভাসিত।

সত্তরের দশক বাংলাদেশের জন্য নিয়ে এসেছিল এক অভূতপূর্ব ও অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও সত্তরের প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের দাগ তখনো শুকোয়নি এই দেশ থেকে— তার মধ্যেই এল একাত্তর। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। শতাব্দী শতাব্দীতে এরকম ঘটনা একবারই ঘটে। সুমহান ত্যাগ ও বীরত্বের গৌরবে ভাস্বর, আকাশ-সমান স্বপ্ন, অপরিমেয় রক্তপাত ও নারীর সম্ভ্রমহানি, নিরীহ-নিরস্ত্র একটি জাতির হঠাৎ যোদ্ধা হয়ে ওঠার অভূতপূর্ব ঘটনা, একটি শোষণহীন মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয়— এসব নিয়েই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। মূলত সত্তর ছিল এক দ্বন্দ্বমুখর বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার দশক। ত্যাগ ও স্বপ্ন মিলে জাতীয় জীবনে যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল— স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরখানেকের মধ্যে শাসককুলের অদূরদর্শিতার কারণে তাতে ধুলো জমতে থাকে। লক্ষণীয় : 'যে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাংলাদেশ যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল সেই সামরিক জান্তাই ভিন্ন রূপ নিয়ে দখল করল এই দেশ। ক্ষমতার মসনদে সদম্ভ প্রত্যাবর্তন ঘটল ঘাতকদের। এসব মিলিয়ে সত্তর ছিল প্রায় সম্ভাবনাহীন নেতিবাচকতার দশক।'[২৬] এমন একটি সময়েই বেড়ে উঠেছিলেন সত্তরের লেখকরা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পে জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের বিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। যুদ্ধোত্তর সময়ে সর্বব্যাপী হতাশা, নির্বেদ ও বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পিমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্যে সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানসভূমি— কোন কোন ছোটগাল্পিকের রচনায় এ জাতীয় অভিজ্ঞান মুক্তিযুদ্ধোত্তর ছোটগল্পসাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক। স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে-সব গল্পকার বাংলাদেশের সাহিত্যে আবির্ভূত হন, তাঁরা হচ্ছেন— মালিহা খাতুন, হেলেনা খান, কাজী ফজলুর রহমান, আবুবকর সিদ্দিক, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, রাবেয়া খাতুন, রাবেয়া সিরাজ, খালেদা সালাউদ্দিন, মকবুলা মনজুর, আল মাহমুদ, খালেদা এদিব চৌধুরী, নাজমা জেসমীন চৌধুরী, নয়ন রহমান, জুবাইদা গুলশান আরা, আমজাদ হোসেন, আবু কায়সার, হুমায়ুন আহমেদ, আবুল হাসান, শহিদুর রহমান, জুলফিকার মতিন, আরেফিন বাদল, বুলবুল চৌধুরী, শান্তনু কায়সার, আফসান চৌধুরী, তাপস মজুমদার, সৈয়দ ইকবাল, ইমদাদুল হক মিলন, আতা সরকার, আবু সাঈদ জুবেরী, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, শহীদুল জহির, মামুন হুসাইন, আহমদ বশীর, মুস্তাফা পান্না, সিরাজুল ইসলাম, জাফর তালুকদার, সেলিম রেজা, কাজী শামীম, মঈনুল আহসান সাবের, ইসহাক খান, এহসান চৌধুরী, সাইয়িদ মনোয়ার, ইমরান নূর, সারোয়ার কবীর, রেজোয়ান সিদ্দিকী, সুশান্ত মজুমদার, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চৌধুরী, মহীবুল আজিজ, মনি হয়দার, লুৎফর রহমান রিটন প্রমুখ শিল্পী। এ পর্বে : 'অধিকাংশ ছোটগাল্পিক যুদ্ধোত্তর হতাশা-অবক্ষয় আর নৈরাজ্যের শব্দরূপ নির্মাণে সচেষ্ট হলেন; উৎসাহী হলেন যন্ত্রণাদগ্ধ তারুণ্যের নষ্ট-জীবনের শিল্পমূর্তি-সৃজনে।'[২৭] এই দশকের ছোটগল্পকারগণ যে যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন তার সব কিছু আত্মসাৎ করেছেন ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমিতে। গ্রাম ও শহর উভয়বিধ পটভূমি উঠে এসেছে এ সময়ের ছোটগল্পের শরীরে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে : 'এ সময় আমাদের ছোটগাল্পিক-চেতনা হয়ে উঠে অনেক বেশি রাজনীতিসচেতন ও জনজীবনমূল-অন্বেষী।'[২৮]

ষাটের গল্পকারদের তুমুল সক্রিয়তার ফলে গল্পের গতিমুখ নির্ণীত হয়ে যাওয়ার পরও সত্তরের জনপ্রিয় সাহিত্যের ডামাডোলে কিংবা লেখকদের গল্পকার পরিচয়টি ম্রিয়মাণ হয়ে যাওয়ার ফলে স্পর্শকাতর গল্পমাধ্যমটি ঘোর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আশির দশকে যাঁরা এলেন, প্রথমেই তাঁদের প্রয়োজন হয়ে পড়ল এই নষ্ট স্রোতের বিরুদ্ধে তারুণ্যের দ্রোহ নিয়ে দাঁড়াবার। একটি লক্ষ্যহীন-আদর্শহীন-নীতিহীন-স্বপ্নবিহীন সময় ছিল সেটি। রাষ্ট্রযন্ত্রই বলে দিচ্ছিল— কী কী বলা যাবে না, কী কী করা যাবে না। সামরিক শাসনের নামে এমনই এক বীভৎস, ভয়ংকর, পৈশাচিক শাসন চেপে বসেছিল সারা জাতির বুকের ওপর। শুধু তই নয়, সময়টি ছিল এমনই যে, সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছিল অবিশ্বাস-দ্বন্দ্ব-সন্দেহ, যেন কেউ কারো ওপরে আস্থা রাখতে পারছে না, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আশির দশকের ছোটগাল্পিকগণ নষ্ট সময়ের বিরুদ্ধ স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালেন তারুণ্যের দ্রোহ নিয়ে, প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনকে অবলম্বন করে। দেশের দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী ও সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক ম্যাগাজিনগুলো যখন পাঠক-মনোরঞ্জনে ব্যস্ত, জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যকে যাবতীয় আশ্রয়-প্রশ্রয়-প্রেরণা দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, তখন অনেকটা নিঃশব্দেই লিটল ম্যাগাজিনগুলো আশ্রয় দিয়েছে তরুণ লেখকদের। সম্ভবত এ কারণেই ষাটের পর আশির দশকে এসে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এরকম একটি সময়ে গল্পলেখক হিসেবে আগমন ঘটল অশোক কর, আন্দালিব রাশদী, আবদুল আউয়াল চৌধুরী, আহমাদ কামরুল মীজান, ইমতিয়ার শামীম, ইশতিয়াক আলম, ওয়াসী আহমেদ, ওয়াহিদ রেজা, কাজল শাহনেওয়াজ, জাহিদ নেওয়াজ, জাহিদুর রহিম, ঝর্ণা রহমান, তমিজউদ্দিন লোদী, তপন বড়ুয়া, তারেক শাহরিয়ার, দেবাশিষ ভট্টাচার্য, নাজিব ওয়াদুদ, নাসরীন জাহান, পারভেজ হোসেন, প্রলয় দেব, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, বুলবুল সরওয়ার, মনীষ রায়, মনি হায়দার, মাখরাজ খান, মামুন হুসাইন, মাহবুব রেজা, মোস্তফা হোসেইন, মুসা কামাল মিহির, মুজতাহিদ ফারুকী, রফিকুর রশীদ, রাশেদ উন নবী, শহীদুল আলম, শহীদ খান, সেলিম মোরশেদ, সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ, স্বপ্না রেজা, হামিদ কায়সার, হাসান জাহিদ, হুমায়ুন মালিক প্রমুখ। সাম্প্রতিক মানুষকে তুলে ধরার তাগিদে নিটোল গল্প বেড়ে তাঁরা তৈরি করেছেন নানা সঙ্কটের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত ছোটগল্পের খরখরে শরীর। আশির দশকের গল্পকারদের প্রধান বৈশিষ্ট্য— এদের নিরীক্ষাপ্রবণতা। সম্ভবত নতুন কিছু সৃষ্টির নেশায় এ সময়ের গল্প-শিল্পীরা নিরীক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কি বিষয়ে, কি আঙ্গিকে, কি ভাষায় তাঁরা অচিরেই নির্মাণ করেছিলেন স্বতন্ত্র একটি গল্পের ভুবন— পূর্বের গল্পঐতিহ্য থেকে যা বেশ খানিকটা আলাদা। আশির দশকে লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা খুব সঙ্গত কারণেই সাধারণ

পাঠকদের কাছে পৌঁছতে পারেননি যেমন, তেমনই নিয়মিত লেখালেখি থেকে দূরেও থেকেছেন কিছুদিন; হয়তো লিটল ম্যাগাজিনের স্বল্পতা এর একটি বড় কারণ। কোনো এক অজ্ঞাত এবং অনির্ণেয় কারণে হাতে-গোনা কয়েকজন ছাড়া আশির দশকের অনেক লেখকই কেন তাঁদের লেখালেখিতে দীর্ঘ ছেদ টানলেন সেটা বোঝা মুশকিল। সেলিম মোরশেদ, শহীদুল আলম, পারভেজ হোসেন, মাখরাজ খান এঁরা সবাই দীর্ঘ বিরতি দিয়েছেন। সামসুল কবির নিষ্ক্রিয়, সঞ্জীব চৌধুরীও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গল্পে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এঁদের অসাধারণ সম্ভাবনা— অতি অল্প সময়ে যা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, এখন একেবারেই ম্রিয়মান হয়ে আছে। তবে : 'নিষ্ক্রিয়তার উদাহরণ যেমন আছে, তেমনি তুমুল সক্রিয়তার উদাহরণও আছে এই সময়েই।'[২৯] নাসরীন জাহান ও ইমতিয়ার শামীম নিজেদেরকে নিরন্তর সক্রিয় রেখেছেন। মামুন হুসাইন, হুমায়ুন মালিকও নিয়মিতই লিখে গেছেন। আশির লেখকরা দাঁড়িয়েছিলেন দ্রোহ আর প্রতিবাদ নিয়ে। তাঁদের এই প্রতিবাদের একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়েছে আমাদের সাহিত্যজগতে। তাছাড়া সে সময়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রটি এত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ছিল যে, শিল্প-সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাজনীতিকে মোকাবেলা করাটাই ছিল মুখ্য। আশির দশকের গল্পকারগণ সম্মিলিতভাবে যে কাজটি করেছেন তা হচ্ছে : 'মধ্যবিত্ত জীবনের হালকা কাহিনীকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পণ্যে পরিণত করার বদলে তাঁরা জীবনমুখী গল্প রচনার চেষ্টা করেছেন। ষাটের দশকের গল্পের উত্তরাধিকারকে বহন বা পুনরুজ্জীবিত করেছেন।'[৩০]

বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয় যেহেতু হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান রচিত ছোটগল্পের আলোকে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ সন্ধান, সেহেতু উল্লিখিত লেখকদের মানসগঠন ও জীবনোপলব্ধির স্বরূপ-অন্বেষণের প্রয়োজনেই সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি এবং বাংলাদেশের সাহিত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন জরুরি। এই নিরিখেই বাংলাদেশের ছোটগল্পের পথ-পরিক্রমার একটি ধারাবাহিক বিবেচনা উপস্থাপনের লক্ষ্যে আশির দশক পর্যন্ত আলোচনার পরিসরকে বিস্তৃত করা হয়েছে। কেননা হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের ষাটের দশকের বিশিষ্ট গল্পকার। অন্যদিকে নাসরীন জাহান আশির দশকের অন্যতম বহুপ্রজ গল্পকার। সমকালীন যুগপরিবেশ-রাজনীতি-সমাজ অনিবার্যভাবেই তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলেছে। সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের গল্প কেবল শিল্পসৃষ্টির পরিসীমায় সীমাবদ্ধ থাকে না বরং গল্প বলার ভেতর দিয়ে তাঁরা পরিবর্তনশীল সমাজ ও ব্যক্তির সংগ্রাম বা অবমুক্তির প্রক্ষেপণটি তুলে ধরেন। তাঁদের রচিত ছোটগল্পে একদিকে যেমন দৈনন্দিন যাপিত-জীবনের মধ্যেও যে আরও নানান দেখবার ও বুঝবার দিক আছে, আমরা তা নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি; তেমনি নারী-জীবনের নানামাত্রিক সমাজবাস্তব অনুষঙ্গের আলোকে প্রকারান্তরে সমাজ-ব্যবস্থাপনার বহুমাত্রিক চালচিত্র উন্মোচিত হতে দেখি। বাংলাদেশের ছোটগল্পে নারী-জীবনের যথাযথ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপটি অনুধাবন করা সম্ভবপর। বর্তমান

সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এর আবেদনকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারিনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ-সন্ধানের আলোকে বর্তমান অভিসন্দর্ভে প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতার প্রকৃত চিত্রায়ণের প্রয়াসও লক্ষ করা যাবে।

তথ্যনির্দেশ

১। শিশিরকুমর দাশ, evsjv †QvUMí, প্রথম পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ভূমিকা-ক

২। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে?' AgZ‡jvK ৬৯, শারদ ১৪০০, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পৃ. ৯৪

৩। বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৬৯

৪। প্রাগুক্ত

৫। চন্দন চৌধুরী, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্প : প্রসঙ্গ পণপ্রথা', mgKv‡ji †Pv‡L wPiKv‡ji iex›'bv_ (সম্পাদক : নূহ-উল-আলম লেনিন), সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১২, পৃ. ১০৯

৬। শিশিরকুমার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

৭। আনোয়ার পাশা, iex›' †QvUMí mgxÿv, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৭৭

৮। শিশিরকুমার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

৯। আহমাদ মোস্তফা কামাল, 'বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার' nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, পৃ. ৭০

১০। শিশিরকুমার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

১১। বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), ex‡'e emi †kô Mí, আজকাল প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪, পৃ: ১০

১২। বিশ্বজিৎ ঘোষ, ex‡'e emi Dcb¨v‡m ˆbtm½¨‡PZbvi i/cvqY, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩১০

১৩। আহমাদ মোস্তফা কামাল, nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১৪। গাজী আজিজুর রহমান, Ô‡QvUeo : বিপন্ন মানুষের বিক্রমের গল্প', DËiwaKvi, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ৩৬ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩১

১৫। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিকীতে অবলোকন', DËiwaKvi, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯

১৬। বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

১৭। উদ্ধৃত, বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

১৮। আহমাদ মোস্তফা কামাল, nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

১৯। বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

২০। আহমদ কবির, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ : প্রসঙ্গ— ছোটগল্প', GK‡ki ceÜ 88, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২২। বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

২৩। আজহার ইসলাম, evsjv‡'‡ki †QvUMí : welq-fvebv, ¯'i/c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩১৭

২৪। সুশান্ত মজুমদার, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প : সাফল্য ও সম্ভাবনা', gwU, গল্পসংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৫৮

২৫। সারোয়ার জাহান, evsjv Dcb¨vm : †mKvj-GKvj, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৯৬

২৬। আহমাদ মোস্তফা কামাল, nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

২৭। বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

২৯। আহমাদ মোস্তফা কামাল, nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৩০। আহমেদ মাওলা, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ও আঙ্গিকচেতনা', nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡”Q‘

nvmvb AwRRj nK : Rxebcevn I wkí‡eva

বাংলাদেশের ছোটগল্পের প্রাঙ্গণে হাসান আজিজুল হক অনন্য ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের যে নবযাত্রা ঘটেছিল তার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন হাসান আজিজুল হক। উত্তাল চল্লিশের দশকের প্রবেশমুখে রাঢ়বঙ্গে জন্ম নেওয়া এই খ্যাতিমান কিংবদন্তিতুল্য কথাশিল্পী দেশে-বিদেশে ঈর্ষণীয় আকর্ষণ কেড়েছেন পাঠক-সমালোচকের, অতিক্রম করেছেন একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি। তাঁর হাতে বাংলা ছোটগল্পের বাঁকবদল ঘটেছে। জীবন ও পরিবেশের অভিজ্ঞ রূপভাষ্যকার তিনি। জীবনকে তিনি দেখেছেন সৃষ্টির নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে। তাছাড়া :

> কল্পনাসর্বস্ব জীবনানুভূতি তাঁর মননে কোনো প্রভাব সঞ্চার করতে পারে নি। ফলে তাঁর গল্পগুলো বস্তুবাদী জীবন চেতনায় ভাস্বর। বস্তুবাদী চেতনার প্রকাশ-কল্পে হাসান আজিজুল হল তাঁর ছোটগল্পে সমাজ-জীবনের হতাশা, অবক্ষয়, দারিদ্র্য এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতায় নিষ্পিষ্ট নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আর্তি, বিক্ষোভ ও প্রতিরোধকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন।[১]

হাসান আজিজুল হকের জন্ম পশ্চিম রাঢ়ে, বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার আওতাধীন যবগ্রাম গ্রামে ১৯৩৯-এর ২ ফেব্রুয়ারি। পিতা মোহাম্মদ দোয়া বখ্শ, মাতা জোহরা খাতুন। তিন কন্যা ও এক পুত্রের জনক হাসান আজিজুল হকের স্ত্রীর নাম শামসুন নাহার। নিজ গ্রামেই তাঁর স্কুলের শিক্ষাজীবন। প্রাথমিক শিক্ষা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাঠশালায়। ১৯৫৪ সালে যবগ্রামের মহারানী কালীশ্বরী উচ্চবিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে বছরই খুলনা নিবাসী ভগ্নিপতির আমন্ত্রণে দৌলতপুরের ব্রজলাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৬ সালে দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। ছাত্রজীবনে রাজনীতির বামধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রে ঐ কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। ভর্তি হন রাজশাহী সরকারি কলেজে এবং সেখান থেকেই দর্শনশাস্ত্রে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৮ সালে। ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন। ৭০ দশকে উচ্চশিক্ষার্থে বৃত্তি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যান এবং অত্যন্ত ব্যক্তিগত কারণে শিক্ষা শেষ না করেই দেশে ফিরে আসেন। ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি রাজশাহীর সিটি কলেজ, সিরাজগঞ্জ কলেজ, খুলনা গার্লস কলেজ ও দৌলতপুর বিএল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৩-তে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে সম্পত্তি বিনিময় করে চলে এসে খুলনার ফুলতলীতে বসতি স্থাপন করেন। হাসান আজিজুল হকের সাহিত্য প্রচেষ্টার শুরু কৈশোর থেকেই। কালীশ্বরী

উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজা সৌমেদ্র চন্দ্র নন্দীর আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রশস্তিবাচক একটি রচনা দিয়ে তাঁর সাহিত্য-রচনার হাতেখড়ি। তখন তিনি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ম্যাট্রিক পাশের পরপরই লিখে ফেলেন 'মাটি ও মানুষ' নামে একটি উপন্যাস যা অপ্রকাশিত। কলকাতার মাসিক স্মৃতি উপন্যাস প্রতিযোগিতার জন্য ১৯৫৭ সালে লেখেন 'শামুক' নামে আর একটি উপন্যাস। তাঁর লেখক জীবনের প্রাথমিক পর্বের কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয় নোয়াপাড়া (যশোর) থেকে প্রকাশিত নাসিরউদ্দিন আহম্মদ সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকায় এবং ব্রজলাল কলেজ বার্ষিকীতে। 'মুকুল'-এ প্রকাশিত একটি গল্পের নাম 'মাটি ও পাহাড়'। কলেজ বার্ষিকীতে মুদ্রিত প্রথম ছোটগল্পের নাম 'লাঠি', 'কবিতা', 'সাগর পারের পাখিরা'। অপর একটি কলেজ বার্ষিকীতে মুদ্রিত গল্পের রাম 'পাষাণ দেবী', সে সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৫৭ সালে একসঙ্গে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন তিনি, যার অধিকাংশই অপ্রকাশিত। 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠীর হাস্যরসের লেখক 'সম্বুদ্ধ', যাঁর প্রকৃত নাম অমূল্য দাশগুপ্ত, তাঁর কলেজ শিক্ষক ছিলেন। বলতে গেলে তিনিই লেখক হিসেবে হাসান আজিজুল হককে প্রথম প্রেরণা যোগান। কলেজ বার্ষিকীর একটি সংখ্যায় তিনি তাঁর ছাত্রের তিনটি গল্প একসঙ্গে ছাপিয়ে দেন, অন্যান্য লেখার তুলনায় সম্ভাবনাময়, এই দাবিতে। লেখক হিসেবে নিজেকে তৈরি করার সিদ্ধান্ত তাঁর ১৯৬০ সালে। ঐ বছর সিকন্‌দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শকুন' গল্পের জন্য ব্যাপকভাবে আলোচিত হন। তাঁর দ্বিতীয় গল্প 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে' প্রকাশিত হয় রাজশাহীর 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায়, ঐ একই বছরে। এরপর ৬০ এবং ৭০ দশকে 'পূবালী', 'কালবেলা', 'গণসাহিত্য', 'ছোটগল্প' এবং বিশেষ করে 'নাগরিক', 'পরিক্রম', 'কণ্ঠস্বর', 'পূর্বমেঘ' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' মুনীর চৌধুরীর উদ্যোগে লেখক সংঘের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালেই।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'-এর জন্য হাসান আজিজুল হক আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭০ সালের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে– তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের জন্য। অন্যান্য অর্জিত পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), আলাওল পুরস্কার (১৯৮৩), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), ফিলিপ্‌স সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮), কাজী মাহবুবউল্লাহ ও বেগম জেবুন্নিসা পুরস্কার এবং একুশে পদক। হাসান আজিজুল হকের বেশ কিছু গল্প ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, রুশ ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> আমেরিকার মিনেসোটা য়্যুনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক, 'ব্রিটিশ ওরিয়েন্টাজিম এ্যান্ড বেঙ্গল রিনাসান্স' খ্যাত ডেভিড কফ তাঁর পাঁচটি গল্প (শকুন, মন তাঁর শঙ্খিনী, আমৃত্যু আজীবন, কৃষ্ণপক্ষের দিন, ঘরগেরস্থি) ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৫) আলী আনোয়ারকৃত চারটি গল্পের (ফেরা, পাতালে

Dhaka University Institutional Repository

> হাসপাতালে, ঘরগেরস্থি, সমুখে শান্তি পারাবার) ইংরেজি অনুবাদ 'সিলেক্টেড স্টোরিজ অব হাসান আজিজুল হক' এই নামে। আমেরিকা প্রবাসী অধ্যাপিকা কল্পনা বর্ধন অনূদিত পাঁচটি গল্পের (আত্মজা ও একটি করবী গাছ, ভূষণের একদিন, সুখের সন্ধানে, আমৃত্যু আজীবনসহ অন্য আর একটি) ইংরেজি অনুবাদ কলকাতার 'থেমা' পাব্লিকেশান থেকে প্রকাশিতব্য। 'পাতালে হাসপাতালে' গল্পটির চেক অনুবাদ করেছেন ড. হানা প্রাইনহিলটেরোভা। 'নামহীন গোত্রহীন' গ্রন্থটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। লেখক নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তাঁর 'সক্রেটিস' গ্রন্থের শেষ কয়েকটি পাতা এবং 'কেউ আসে নি' গল্পটি।[২]

নরম কাদা-জলে যে অবয়ব নির্মাণ করা হয় তাকে ভালোভাবে না পোড়ালে সেটি যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু কেউ কেউ আছেন যিনি পোড়ামাটি দিয়েই আকার বা প্রতিকৃতি নির্মাণে নৈপুণ্য দেখান এবং এটি এরকম পোড়ামাটি যে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করলেও ভাঙতে চায় না। হাসান আজিজুল হক হলেন সেইসব পোড়ামাটির শিল্পীদের একজন যাঁদের জীবনের পাটাতনে লুকিয়ে আছে ভূমিচ্যুত মানুষের বেদনা, লুকিয়ে রয়েছে উদ্বাস্তু অভিবাসী মানুষের গভীর মর্মযন্ত্রণা। বলা যেতে পারে :

> উত্তরবাংলার গ্রামীণ জনপদের ভাঙন, সামাজিক শোষণ, কখনো প্রতিবাদ, বাঁচার সংগ্রাম– এইসব কথা নিয়ে হাসানের গল্পজগৎ। তাঁর সব গল্পেরই মূলে আছে, বাঁচা জান্তবভাবে বাঁচা, শিশ্নোদরপরায়ণভাবে বাঁচা, স্থূলতম শারীরিকভাবে বাঁচা এবং সেই বাঁচার ন্যূনতম অস্তিত্বের নানান চেহারা, আর তার থেকে মুক্তির রূপও হরেক রকম। আর তা থেকে পরাজয়ের রূপও হরেক রকম। টিকে থাকার, বাঁচার, হেরে যাওয়ার বিস্বাদ, কটু, প্রায় নিয়তিবাদী উপলব্ধি, শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায় 'নিরুচ্ছ্বাস আর্তি' নিয়ে গড়ে উঠেছে হাসানের ধ্রুপদী বিশাল গল্পভুবন।[৩]

হাসান আজিজুল হকের গল্পে আছে তিনটি পর্ব। প্রথমত, প্রাক্ মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ যখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামের বাসিন্দা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ পর্ব, যে সময়ে লেখক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন আর শেষ পর্বটি তাঁর বর্তমান পর্ব বা উত্তরকাল পর্ব– যে পর্বে এখন তিনি নতুন করে আবার তাঁর আখ্যানশৈলীর ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। ঐতিহাসিক উত্তেজনা-আবেগ, সংকট এবং ভিন্ন দুই রাষ্ট্রের ব্যাপক মানুষের অনিশ্চিত মানবেতর জীবনের কালো অন্ধকার হাসান আজিজুল হকের গল্পে যেমন নির্মম আবেগহীনতায় রূপায়িত হয়েছে তেমনি রাঢ় মৃত্তিকার রুক্ষ আঞ্চলিক জীবন, সামন্ত জীবনের নিগড় ছিঁড়ে গোষ্ঠী জীবনের উদ্ভাস, সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় ক্ষতবিক্ষত সংখ্যালঘু মানুষের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিসরে শিল্পিত হয়েছে। উত্তরকালে তাঁর গল্পে বহুভাবেই জন্মান্তর ঘটেছে কিন্তু সবসময়ই মনে হয় হাসান আজিজুল হকের গল্পের এক কেন্দ্রীয় টান তৈরি হয়েছে ১৯৪৭-এর দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ তাঁর গল্পের এক মৌল দিক হলো দেশভাগ। হাসান আজিজুল হকের গল্পে : 'পূর্ণাঙ্গ অবয়বের মানুষ নয়, ব্যবচ্ছেদ করা মানুষের দেখা পাওয়া যায় বেশি। নিপাট বাস্তবতার খরখরে পাটাতনে রেখে তিনি মানুষের মজ্জা আর কাঠামোকে আলাদা করে সাজিয়েছেন এবং চৈতন্যের নানা কলকবজা দিয়ে নির্মাণ করেছেন মনুষ্যত্বের অন্য রূপ।'[৪] জীবনের কর্কশ অভিজ্ঞতার ওপর প্রলেপ বুলিয়ে চলতে অনভ্যস্ত ছিলেন হাসান আজিজুল হক,

একারণেই প্রতারক সৌন্দর্যবিলাসী জীবনের বান্ধব ছিলেন না তিনি। তাঁর বিশ্লেষণে : 'উঠে এসেছে আগুনপোড়া রাঢ়ের ঝলসানো তাপ, লাল কঙ্করের রূঢ়তা। বিশ্লেষণের এই তীক্ষ্নতা অব্যাহত থাকে তাঁর সত্তর-পরবর্তী গল্পসমগ্রেও। নিরাপদ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, সময় ও সমাজের ব্যবচ্ছেদ করা হাসানের শিল্পস্বভাবের নিগূঢ় দিক।'[৫] রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণে লেখক যেমন প্রবেশ করেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনমূলে তেমনি নির্মোহ তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন পরিবর্তিত সমাজ ও সময়স্বভাবকে। সময় ও সমাজ-বিধৃত নরনারীর দুর্মর অস্তিত্ব এবং তার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন, কখনো-বা সরল বর্ণনার অনবদ্য আবেদনে উন্মোচন করেছেন মানবচরিত্রের বহুমাত্রিকতা। কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমতটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> শিশুর হিংসা কতখানি সরল আর অবুঝ, কতখানি নিষ্পাপ আর হিংস্র– তাও তাঁর অজানা নয়। পৃথিবীর ভেতরকার অনন্ত আগুনের মতোই যে বয়স ও শারীরিক বৃদ্ধি বেসামাল তার পরিণতি যে কতখানি অমোঘ এবং সেখানে মৃত্যু যে বৃক্ষপতনের মতোই ভয়াবহ ও মহৎ সে কথা তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান। তার পাশাপাশি তিনি বলেছেন, নারী তুমি দুর্জ্ঞেয়। সেখানে প্রমত্ত পুরুষও শিশু, নিরুপায়, দিকহীন। আবার এই নারীর পাশেই কৈশোর একটি তীক্ষ্নশলার মতো নিজেকে বাঁচিয়ে চলার জন্যে আমূল বিদ্ধ করে সেই নারীকেই। এসবের সঙ্গে মিশে আছে নিসর্গ। তার রং। তার বীর্য। তার অন্ধ নিস্পৃহ দিকটিও। অন্ধ প্রকৃতি, দুর্জ্ঞেয় নারী, শিশুর সারল্য, কোটি কোটি বছরের জনজীবন– তার বিশ্বাস, ভীতি, পাগলামো কী নয়? এই সবই হাসান একজন পাকা, রসিক, নির্মোহ রিং-মাস্টার বা ক্লাউনের স্টাইলে চাবুক হাতে এগারোটা বাঘকে ছেড়ে দিয়ে দর্শক ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ... তাই বলে হাসান আজিজুল হক দেশকাল সম্পর্কে আদৌ অনবহিত নন। দেশ ভেঙে খান খান করার পর ভাঙা টুকরোগুলো এদিকওদিক ছড়িয়ে পড়লেও তাদের হদিশ লেখকের নখদর্পণে।[৬]

হাসান আজিজুল হক বেড়ে উঠেছেন ৬০/৬৫ জন মানুষের বিরাট পরিবারের মধ্যে। লেখকের জবানী থেকে জানা যায় যে : 'এমন পরিবার যে, কে কখন খাচ্ছে কি না-খাচ্ছে, কোথায় সারা দিন কোন শিশু কাটাচ্ছে তার খোঁজ নেবারও সুযোগ হয়ে ওঠে না মায়ের পক্ষে। অতএব পিতার সান্নিধ্য পাওয়া তো দূরের কথা, মার কাছ থেকে আদরযত্ন পাওয়াও দুর্লভ ছিল।'[৭] লেখকের স্মৃতিচারণে জানা যায় যে, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মুক্ত হরিণ শাবকের মতো শিশু কিংবা বালক হাসান আজিজুল হক ঘুরে বেড়াতেন সারা দিন। তাছাড়া সুযোগ পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়েন, কারো কোনো আমন্ত্রণ তিনি 'মিস' করেন না। বিয়ে কিংবা ঐ জাতীয় কোনো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পেলে হয়তো, অজো পাড়াগাঁ, দশ পনেরো মাইল-এর পথ, অসম্ভব রকমের কাদাপানি কিংবা মোটেই সুখকর যাত্রা নয়, কিন্তু লেখক হাসান আজিজুল হক সাধারণত সে সুযোগ ছাড়তেন না। এতে করে আর যাই হোক, লাভবান হয়েছি আমরা, কেননা, এই অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা থেকেই তো শিশুমনে আহরিত হয়েছে মানুষ এবং প্রকৃতি থেকে স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা। পরিণত বয়সে লেখক হাসান আজিজুল হক জন্মগ্রহণ করেছেন এ সবকিছুকে নিয়েই। এ প্রসঙ্গে লেখকের স্মৃতিচারণায় জানা যায় যে : 'আমার প্রতিটি গল্প আমার

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো গল্প আমি লিখি না।'[৮] লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর বাড়ির পরিবেশ, পরিপার্শ্ব ও পরিবারের সদস্যদের নানামাত্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিশাল পরিবারে বেড়ে উঠবার সময়টিতে মানবচরিত্রের বহুমাত্রিকতা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত নানা ভাবনা লেখকের চেতনাকে আলোড়িত করেছে– যা তাঁর স্মৃতিচারণায় বর্ণিল রূপ পেয়েছে। হাসান আজিজুল হকের পিতা তাঁর কাছে এক বিস্ময়কর চরিত্র হিসেবে বিবেচিত। স্মৃতিচারণায় এ প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিমত উল্লেখযোগ্য :

> খুব যে লেখাপড়া তিনি জানেন এমন নয়, রোগাপাতলা বেটেখাটো মানুষ, দারুণ দাপটের লোক ছিলেন এক সময়, পাঁচ-দশ গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত মান্যগণ্য ব্যক্তি, খুলনায় আসার আগে পর্যন্ত তিনি বরাবর গ্রামেই কাটিয়েছেন, জমি-জমা দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু মানবচরিত্রের ওপর অদ্ভুত তাঁর দখল, সেই সঙ্গে রাঢ় অঞ্চল, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর আয়ত্তে যে কী আর বলব, তাঁর চরিত্রে সমস্ত রাঢ়কে ধারণ করে আছেন তিনি, এবং বলতেও পারেন তেমনি![৯]

এভাবেই হাসান আজিজুল হকের মানসলোক অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ হয়েছে আর সমৃদ্ধ সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিকর্মের বিচিত্র পটভূমিতে। হাসান আজিজুল হকের গল্প ধারণ করে আছে দুই বঙ্গের দুটি ভিন্নতর ভূগোল– একদিকে আছে ধূসর, রুক্ষ, বৃক্ষবিরল রাঢ় এবং অন্যদিকে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে সজল-শ্যামল নরম পলির দেশ খুলনা এলাকা। মানুষ তো বটেই, সেই সঙ্গে সহজীবী নিসর্গ, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য, আলো-আঁধারি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিশে আছে তাঁর গল্পে যে, বর্ণিত চরিত্রাবলি থেকে তাঁকে আলাদা করে ভাবা যায় না। বরং বলা যেতে পারে যে :

> তাঁর গল্পের চরিত্রাবলী এবং এই প্রকৃতি যেন একে অপরের পরিপূরক। জীবনকে এমন নির্বিকার, ক্ষমাহীণ নিষ্ঠুরতায় বোধ করি আর কেউ চিত্রিত করেন নি গল্পে তাঁর মতো, আর সেই সব চরিত্রের, সেই সব গল্পের জন্মদাতা হাসান আজিজুল হক, নিজের গল্পে বর্ণিত চরিত্রাবলী সম্পর্কে বললেন, জানেন, বাস্তবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এমন করে লিখেছি, কিন্তু নিজের লেখা গল্পগুলো যখন পড়ি তখন মানুষগুলোর জন্য আমার চোখের পাতা ভিজে আসে।[১০]

হাসান আজিজুল হক গল্পের বিচিত্র পরিসর ও পটভূমিতে নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোনো নির্দিষ্ট ছকবাঁধা পথে এগোননি এমনকি বিশেষ কোনো পূর্ব পরিকল্পনা থেকে উৎসারিত নয় তার গল্পভূমির বিচিত্র জগৎ। গল্প লিখতে গিয়ে সেটা গল্প হচ্ছে কি-না সেটা নিয়েও লেখক কখনো ভাবেন নি। এ প্রসঙ্গে লেখকের জবানীতে জানা যায় :

> গল্প লিখবো বলে এবং গল্পের কোন একটা সংজ্ঞা মনে ঠিক করে নিয়ে আমি কখনোই গল্প লিখিনি। কিছু কাজ করতে চেয়েছি। যে দেশকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে, সমাজের মানুষকে নিয়ে কিছু কথা আমার জমেছে, সেই কথাগুলো বলতে চাওয়াই আমার লেখা। বলতে গিয়ে নানা দৈর্ঘ্যের লেখা বেরিয়েছে, কোনোটা বেশ দীর্ঘ হয়েছে– তখন সেটা কেউ বড় গল্প বলেছেন, কেউ বলেছেন ছোটগল্পই কিন্তু বেশ বড় আকারের ছোটগল্প, কেউ বলেছেন নভেল হয়েছে। আমার

Dhaka University Institutional Repository

> বলার কথাগুলোকে যে আকারে প্রকারে বলেছি তাকে কি বলা যাবে, গল্প বলা যাবে, কি নভেল বলা যাবে, কি ছোটগল্প বলা যাবে তা অন্যদের ব্যাপার। হতে পারে সাহিত্য সমালোচকের ব্যাপার, হতে পারে সাহিত্যপাঠকের ব্যাপার, আমার ব্যাপার না।[১১]

তাছাড়া গল্প লিখবার সময়ে হাসান আজিজুল হক কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণের হিসেব মেনে চলেন না এবং সেটা আদৌ সম্ভব বলেও তিনি মানেন না। কেননা তাঁর মতে :

> লেখা আসলে অনেকটা ক্লিক করার ব্যাপার। লেখা কখনো কখনো দাঁড়িয়ে যায়, তার ওপর লেখকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। কোনো লেখক বোধহয় বলতে পারেন না যে, আমি যেমন লিখি সব সময়েই তেমন লিখতে পারবো। ... সাধারণত আমি গল্প একবার মাত্র লিখি। লেখার পরে, যেটাকে বলে খুব ক্লোজ রিডিং– খুব মন দিয়ে গল্পটা আমি পড়ি। সেইসময়ে লেখায় যোগ সাধারণত আর কিছু হয় না। বরং ঝরেই পড়ে বেশি। ... লেখার নানান রকম ব্যাপার আছে। অনেক লেখার হয়তো একটি বাক্য বছরের পর বছর মগজে গাঁথা থাকলো। বছরের পর বছর হয়তো ঐ লেখাটা আমি লিখলাম না। ভেবে চিন্তে আটঘাঁট বেঁধে গল্প লিখতে লিখতে হঠাৎ নিজেকে বড় ক্লান্ত অবসন্ন মনে হয়। যেন কলমটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভেবে রেখেছি গল্পটা, কিন্তু লিখতে গিয়ে কিছুই হলো না। আবার হয়তো ৮ বছর কিছুই লিখিনি, কিন্তু একটা বড়ো লেখার ফাঁকে দ্রুতবেগে ৩ দিনের মধ্যে একটি গল্প বেরিয়ে গেলো, যেটা নিয়ে তেমন কিছুই ভাবি নি। কখনও সব কিছু সত্ত্বেও অসহায় হয়ে কলম কামড়াতে হয়। আবার কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে লেখা চলে আসে।[১২]

কেবল সময়, সমাজ ও পরিপার্শ্বের বিচিত্র পরিসরই হাসান আজিজুল হকের অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলকে বিস্তৃত করেনি বরং একই সমান্তরালে বিভিন্ন অঞ্চলের নানামাত্রিক প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষার প্রতিও এক দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেন লেখক। যেহেতু লেখকের মূল কাজ হলো– সমস্ত সমস্যাকে হৃদয়ঙ্গম করা, সমাজে যতো ব্যাধি আছে, সবটাকে অনুধাবন করা এবং ধারণ করা। মানুষের জীবনের খুব কাছাকাছি পৌঁছানোর উপায় হলো তার মুখের ভাষার কাছে যাওয়া এবং তার মধ্য দিয়েই জীবনের গভীর স্রোতে অবগাহন করা। এ ক্ষেত্রেও হাসান আজিজুল হকের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে :

> আঞ্চলিক কথ্যভাষা বা নানা উপভাষা বাংলা ভাষার আছে। তাদের বৈচিত্র্য, গূঢ় ধন-সম্পদ, অপার প্রকাশ-ক্ষমতা এবং অসম্ভব জীবনলগ্নতা আমাকে চিরকালই মুগ্ধ করেছে। আমাদের এই বাংলাদেশের দু-একটি কথ্যভাষা ছাড়া বাকি আঞ্চলিক কথ্যগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় ও বিচিত্র। আমার বাড়তি সুবিধা হচ্ছে পশ্চিমবাংলারও নানা কথ্যভাষার সঙ্গে আমার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। এর ফলে আমার ভাষার ভূগোলেরও বিস্তৃতি ঘটেছে এবং বাংলা ভাষার বিপুল বৈভবের সঙ্গেও খানিকটা চেনা হয়েছে।[১৩]

অভিজ্ঞতার এই নানামাত্রিক অনুভবজ্ঞানের জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর গল্পের পরতে পরতে। লেখার মধ্য দিয়েই হাসান আজিজুল হক জনসাধারণের অধিকার আদায়ের পক্ষে আপন ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

গভীর দায়িত্ব বোধের আলোকে। গরিব শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা, করুণা, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা এরকম কোনো কথা বলে লেখক হাসান আজিজুল হক আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চান না বরং তিনি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন যে, এরকম কোনো কথা বলবার তাঁর কোনো অধিকার নেই– ও-সব বুদ্ধিজীবী, নাগরিক সুবিধে-আরামে থাকা সুশীল সমাজের নিজস্ব ব্যাপার। ও-সব দাঁত না-মাজা মুখের বাসি কথা, এমনকি নৈতিকতার জায়গা থেকেও কোনো কথা তিনি কপচাতে চান না। পাওনা ঠিক করো, যার পাওনা তাকে দাও, দিতে হবে। দয়া সহানুভূতি বিবেচনা-টিবেচনার কোনো কথা নয়। শেকল-ছেঁড়ার দ্রোহে উস্কানি জোগানোয় তিনি আপত্তির কিছু দেখেন না। লেখার মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের বিচিত্র অবয়বে বঞ্চিত-অবদমিত অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকারই ব্যক্ত করেছেন হাসান আজিজুল হক। লেখকের কাজ দেখা, তাঁর জটিল অভিজ্ঞতার বিশাল, অস্পষ্ট ও নিদারুণ বিশৃঙ্খল জগৎটিকে লেখায় অবয়ব দিয়ে হাজির করাটাই হল লেখার কাজ, সৃষ্টির কাজ। লেখক হাসান আজিজুল হকের জবানীতে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে :

> এরকমভাবে লেখার ভিতর দিয়ে তৈরি হয় বাস্তবের সমান্তরাল বাস্তব, জীবনের প্রতিরূপ জীবন। যে-বাস্তব থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ করি, সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই নির্মাণ করি দ্বিতীয় বাস্তব। এই দ্বিতীয় বাস্তব– লেখার বাস্তব– মূল বাস্তবের প্রতিরূপ ছায়া; অলীক নয়, মিথ্যা বা মায়া নয়। তা মূল বাস্তবের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, আর নতুন নতুন মাত্রা নির্মাণ করে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয় বাস্তবেরই ভিতরে।[১৪]

সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সমান্তরালে স্বাভাবিক বা অনিবার্য প্রভাবেই হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চিত্রায়ণ ঘটেছে। তাঁর গল্পের পরিসরে নারীচিত্রণ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নারী-চরিত্ররা খুবই বাস্তব এবং জীবনসংলগ্ন। আমাদের চেনাজানা পরিধির বহু নারী চরিত্র সব একটা বিশেষ আবেদনে বাস্তবতার অনুষঙ্গে পরিণতি বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছোটগল্পের পটভূমিতে। তাঁর গল্পমালায় যেন নারীচরিত্র বর্ণময় মিছিল। কুলটা বাগদি বৌ থেকে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহিণী, অসহায় দুঃসাহসী গ্রাম্য প্রেমিকা থেকে শহরের বিষণ্ণ উদ্বাস্তু ছাত্রী, নিঃসঙ্গ শিক্ষিকা থেকে বিকারগ্রস্ত পতিতা, স্বামী পরিত্যক্তা রমণী থেকে মুক্তিযোদ্ধার ক্ষুধাভীতা পলাতকা ঘরণী– ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে এরা নির্মিত হলেও এদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিচিত্র ব্যক্তিসত্তা আছে, আছে ব্যক্তিত্বও। এরা এদের মতো করে ভাবে; জীবনের জটিল অঙ্কে এইসব ভাবনা যদিও প্রায়শই কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না তবু তারা অসম্ভব জীবন্ত, তাদের নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাঠকেরা পেয়ে যায় এবং পাঠকের বোধের দরজা খুলে সেখানে সমাজবাস্তবতায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক, জটিলতা, পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজে নারী-জীবনের নানামাত্রিক ছবি উন্মোচিত হয়ে পড়ে সমাজসত্যের অনুষঙ্গে। মানব যাত্রায় নারীপুরুষ পাশাপাশি রয়েছে। বিষয়টি এতটাই স্বাভাবিক যে, লেখার সময়ে হাসান আজিজুল হক পৃথকভাবে কেবল নারীদের নিয়েই তাঁর ভাবনাকে জারিত করেন নি এবং সেটা

সম্ভবপরও নয় বরং সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপটিকে উন্মোচনের প্রয়োজনেই তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিমণ্ডলে রূপায়িত হয়েছে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চালচিত্র। লেখকের মতে :

> আমার এসব লেখা নারীবাদী লেখা নয়, নির্বিশেষে নারীকেন্দ্রিকও নয়। সব নারীই নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাঁধা। এদের নিয়ে কেউ তত্ত্বের ছাঁচে ফেলুক তা আমি চাই না, বরং নাকের নিচে বাস্তবটা দেখুক– এই আমি চাই। সমাজ-সংসার-রাষ্ট্র-অর্থনীতি-রাজনীতি কাদের উপর তীব্রতম প্রহার চালায় তা যে-সব লেখায় দেখাতে চেয়েছি সেগুলোই বোধহয় নারীকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। আমার ধারণা এটাই বাস্তব যে, অন্তত আমাদের এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় (নিজের দেশের কথাই বলছি) নারীরাই সবচেয়ে উপদ্রুত, সবচেয়ে নিঃস্ব, সবচেয়ে বঞ্চিত, অপমানিত, অধিকারচ্যুত। গোটা সমাজের বঞ্চনা দেখাতে গেলে এটাকেই সামনে আনা দরকার। এখানে হাহাকার, মারণাহতের আর্তনাদ, তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্র-শাসকদের রাজনীতি-অর্থনীতি-ক্ষমতার উপর ধিক্কারের থুথু পড়ে।[১৫]

ছোটগল্পের পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোকে লেখক প্রকারান্তরে ঘুণে ধরা, অবক্ষয়পীড়িত সমাজের রুগ্ন-ভঙ্গুর দেশচিত্রটি উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। হাসান আজিজুল হক নিজেই বলেছেন : ‘আমার কাছে বার বার মনে হয়েছে, আমাদের এই অসম্ভব সমাজের চেহারাটা যদি লেখায় তুলে ধরতে পারি তাহলে যাঁরা সুস্থতার সন্ধান করছেন তাঁদের বলতে পারবো– না, এই অবস্থাটা চলতে দেয়া যায় না। এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের পুরোপুরি নিরাময় হওয়া দরকার।’[১৬] সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন ও সংশোধনকল্পে হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের স্বরূপ-উন্মোচন তাই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর iPbvmsMn-1[১৭] ও iPbvmsMn-2[১৮]-এর অন্তর্ভুক্ত মোট আটটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আটটি গল্পগ্রন্থে সব মিলিয়ে পঞ্চান্নটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলো লেখকের সমৃদ্ধ-অভিজ্ঞতা, প্রখর মেধা ও সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সার্থক চিত্রায়ণ। বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। অতএব, হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর যে-সব ছোটগল্পে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চিত্রের প্রতিফলন ও উন্মোচন ঘটেছে, কেবল সে-সব ছোটগল্পই এখানে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Z_¨wb‡©k

১. আজহার ইসলাম, evsjv‡`‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯^i/c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৬

২. আবু জাফর, nvmvb AwRRj n‡Ki M‡íi mgvRev¯ÍeZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৮

৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡‘‡ki mvwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮৪

৪. চঞ্চলকুমার বোস, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা', MíK_v (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৬. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক), wbewPZ Mí : nvmvb AwRRj nK, কলকাতা, ১৯৭৫, দ্রষ্টব্য. ভূমিকা

৭. হায়াৎ মামুদ (সম্পাদক), D‡bœwPZ nvmvb, হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬২

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৯. হাসান আজিজুল হক, wd‡i hvB wd‡i Awm (আত্মস্মৃতি), ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩৩

১০. হায়াৎ মামুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১১. সুশান্ত মজুমদার (সম্পাদক), mvÿvrKvi : nvmvb AwRRj nK, m‡›‘k, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৭

১২. হায়াৎ মামুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১

১৩. হাসান আজিজুল হক, mvÿvrKvi I Ab¨vb¨ iPbv, একুশে বাংলা প্রকাশন, ২১/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৮

১৪. হায়াৎ মামুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪

১৬. হাসান আজিজুল হক, 'আমার লেখালেখি', evPwbK AvZ¥ReewbK, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, মে ২০১১, পৃ. ৯০

১৭. হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-1, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১ (iPbvmsMn-1-এর অন্তর্ভুক্ত চারটি গল্পগ্রন্থ যথাক্রমে mg‡‘i ¯c kx‡Zi AiY¨, AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ, Rxeb N‡l Av¸b এবং bvgnxb †MvÎnxb)

১৮. হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-2, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১ (iPbvmsMn-2-এর অন্তর্ভুক্ত চারটি গল্পগ্রন্থ যথাক্রমে cvZv‡j nvmcvZv‡j, Avgiv A‡cÿv KiwQ, †iv‡‘ hv‡ev এবং gv-‡g‡qi msmvi)

wØZxq cwi‡"Q‡`

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবন

mg‡`i ¯c k©‡Zi AiY¨

হাসান আজিজুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ mg‡`i ¯c k©‡Zi AiY¨[১]। গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোট দশটি গল্প। গল্পগুলো যথাক্রমে 'শকুন', 'তৃষ্ণা', একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', 'উত্তর বসন্তে', 'বিমর্ষ রাত্রি : প্রথম প্রহর', 'মন তাঁর শঙ্খিনী', 'সীমানা', 'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী', 'আবর্তের সম্মুখে' এবং 'গুনিন। গল্পগুলোর অবয়বে : 'বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোয় তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজজীবনের বহুমাত্রিক অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার ও বঞ্চনা, কখনো-বা তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনী।'[২] সামাজিক অবক্ষয়ের আসল কারণ যে আর্থ-রাজনীতিক জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে– তার আভাসও কোনো কোনো গল্পের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত হয়েছে। হাসান আজিজুল হক প্রথম পর্বের গল্পে যৌনতা এবং মানুষের আদিম কামনার শিল্পভাষ্য নির্মাণে ছিলেন উৎসাহী। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে তাঁর গল্প মোটামুটি ভাবে যৌন সর্বস্বতাবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও প্রকারান্তরে এর মধ্য দিয়ে : 'ব্যক্তির যৌন জীবনের পদস্খলন যা আমাদের সমাজের মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে পাপাচরণের নামান্তর মাত্র– হাসান তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হবার চেষ্টা করেছেন।'[৩] একই সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে বিরূপ সময় ও সমাজবন্দি নরনারীর অন্তর্জাগতিক জটিলতা এবং তার অবচেতনার বহুভুজ রহস্যময় প্রবৃত্তির নানামাত্রিক চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। যুদ্ধোত্তর বিশ্বের বিপর্যস্ত সামাজিক-নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধের পটভূমিকায় আধুনিক মানুষ মনোজগতে অবতীর্ণ হয় নিজেরই বিরুদ্ধে। বিশৃঙ্খল নেতিবাচক সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির এই দ্বন্দ্বময় আত্মজিজ্ঞাসা জন্ম দেয় মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটের। হাসান আজিজুল হকের গল্পে :

> অন্তর্গত মানুষ তীব্র সংবেদনা নিয়ে উপস্থিত, কায়া ও ছায়ার দ্বৈত অস্তিত্বে তাঁর গল্পের নরনারী রূপবান হয়ে ওঠে। ফলে প্রথাগত কাহিনি বা আখ্যান পাঠককে আপ্লুত করে রাখে না বরং জীবন ঘষে আগুন জ্বালানোর মতো দুরূহ কাজে মেতে ওঠেন গল্পকার। এই অগ্নিময় জীবনের সংবেদে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি জীবনের ভিন্নতর দিগন্ত সন্ধানে।[৪]

রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণে গল্পগুলোর বিচিত্র ক্যানভাসে লেখক যেমন প্রবেশ করেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনমূলে, তেমনি নির্মোহ তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন পরিবর্তিত সমাজ ও সময়স্বভাবকে। সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা, নারী-পুরুষের অসম

সামাজিক পটভূমি, সম্পর্কের বহুতলিক বিন্যাস, নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি– এক কথায় যাপিত জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বিচিত্র আধারে গল্পগুলো হয়ে উঠেছে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবনঘনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি। গল্পগুলোতে নারী-জীবনের নানামুখী সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নারীর গুহায়িত জীবন-রহস্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তেমনি এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি, সময় ও সমাজের জটিল-মিশ্র জীবন অভিধানের বহুমাত্রিক স্বরূপটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজসত্যের পটভূমিতে।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'শকুন'-এর মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক সমকালীন সমাজজীবনের অবক্ষয়-পীড়িত রুগ্ন-বিদীর্ণ সমাজবাস্তবতার জীবনঘনিষ্ঠ দেশচিত্রটি উন্মোচন করেছেন অত্যন্ত শিল্পকুশলতার সঙ্গে। চারপাশের জীবনের পরিকীর্ণ-বিষণ্নতা, রুগ্নতা, হতাশা-বঞ্চনা একসঙ্গে সাধারণ মানুষকে কিভাবে দারুণ অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে : 'এক অন্ধকার থেকে আর এক নিরন্ধ অন্ধকারের দিকে নিক্ষিপ্ত করছে, হাসান খুব কাছের থেকে গল্পের মধ্যে তা ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।'[৫] 'শকুন' গল্পে গ্রামের কয়েকটি ছেলে দিনের আলোয় ফিরতে না পারা একটি শকুনকে নিয়ে সাংঘাতিক খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। তাদের অত্যধিক মত্ততার কবলে পড়ে শকুনটা শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হলো। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তারা সবাই মিলে খেলাচ্ছলে শকুনটির গা থেকে একটি একটি করে সমস্ত পালক খসিয়ে নিয়ে তাকে অসুন্দরের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ছাড়লো। শকুনটা মূর্তিমান একটি কদাকার প্রতীকে পরিণত হলো। গল্পটিতে শকুনটি অত্যাচারী বা নিপীড়নকারীর ভূমিকায় প্রতীকায়িত হয়েছে। সহজতর ভঙ্গিতে লেখক আলোচ্য গল্পের অবয়বে প্রকারান্তরে অবক্ষয়-পীড়িত সমাজের মর্মমূল ধরে নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন। কেবল তাই নয়; গল্পটিতে একই সঙ্গে সময় ও সমাজের অবক্ষয়-পীড়িত অসহ পটভূমিতে নারীর সামাজিক অধস্তনতার করুণ চিত্রটিও শিল্পিত হয়েছে। কিশোর বালকেরা ক্লান্ত শরীরে টলতে টলতে গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই তালগাছ ও ন্যাড়া বেল গাছের আবছা ছায়ায় সাদা মতো কি যেন দেখতে পেলো। সেটা অন্য কিছু নয়– কাদু শেখের রাঁড় বোনের সঙ্গে জমিরুদ্দির অবৈধ যৌন মিলনের ফলে জাত একটি অপূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর অস্পষ্ট দৃশ্য। এক পর্যায়ে কথাটা জানাজানি হয়ে যেতেই দলে দলে গ্রামের মানুষ মৃত শিশুটির পাশে জড়ো হতে থাকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। সবাই আসলেও কেবল দেখা যায় না কাদু শেখের সেই রাঁড় বোনটিকে। গল্পে বিষয়টি রূপায়িত হয়েছে এভাবে :

> ন্যাড়া বেলতলা থেকে একটু দূরে প্রায় সকলের চোখের সামনেই গতরাতের শকুনটা মরে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বমি করেছে। কত বড় লাগছে তাকে! ঠোঁটের পাশ দিয়ে খড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে। ... দলে দলে আরও শকুন নামছে তার পাশেই। কিন্তু শকুন শকুনের মাংস খায় না। মরা শকুনটার পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনের দল। চিৎকার করতে করতে। উন্মত্তের মত। আশেপাশের

Dhaka University Institutional Repository

> বাড়িগুলি থেকে মানুষ ডেকে আনছে মৃত শিশুটি। ... শুধু কাদু শেখের বিধবা বোনকে দেখা যায় না। সে অসুস্থ। দিনের চড়া আলোয় তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ('শকুন', mg‡'i ¯c k¨‡Zi AiY¨, iPbvmsMn-1 : ২১)

কাদু শেখের বিধবা বোনকে আলোচ্য গল্পে দরিদ্রঘরের ভাগ্য-লাঞ্ছিত অসহায় নারীর উপায়হীনতা ও অবরুদ্ধ অবদমিত কামনার বিকৃত প্রকাশের অনুষঙ্গে রূপায়িত করা হয়েছে। যে অবৈধ ও সমাজ গর্হিত সম্পর্কের সূত্র ধরে কাদু শেখের বিধবা বোনের নবোজাত শিশুর মৃতদেহের স্থান হয় মৃত শকুনের পাশে, সে অবৈধ সম্পর্কের দায়ভার সম্পূর্ণতই আরোপিত হয় কাদু শেখের বিধবা বোনের উপর, ফলে দিনের আলোয় তাকে দেখা যায় না। মৃত শকুনের মতোই সে ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে। এহেন সম্পর্কে নারীই কেবল বিব্রত বোধ করে থাকে। সমাজ আরোপিত বিধি-নিষেধের যূপকাষ্ঠে নারীকে যতটা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়; একই আচরণের সমঅংশীদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের ক্ষেত্রে এ নিয়মের শিথিলতা সহজেই লক্ষণীয়। ফলে গল্পটির কোথাও জমিরুদ্দির বিব্রত বোধ করা বা অসহায়ত্বের সামান্যতম ইঙ্গিতও পরিস্ফুট হতে দেখা যায় না। সমাজ নিরূপিত ন্যায়-অন্যায় বোধের বিবেচনার ক্ষেত্রভূমিতে নারী-পুরুষের অসম বিভাজন রেখাটি এভাবেই আলোচ্য গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গল্পটি হয়ে উঠেছে সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থা ও নারীর প্রতি একপেশে সামাজিক সংকীর্ণ মানসিকতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি। পরবর্তী গল্প 'তৃষ্ণা'-র পাত্র-পাত্রীর জীবনে কোন স্বপ্ন নেই, লক্ষ্য নেই, প্রত্যাশা নেই– তারা শুধু দারুণ অবক্ষয়ের গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান। অলস-অবশ ও লক্ষ্যহীন জীবনে অনিবার্যভাবেই কখনো উদগ্র হয়ে ওঠে কামুকতা, কখনো-বা নির্লজ্জ পেটুকতা। এ গল্পে বাশেদ চরিত্রটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক হিসেবে অবধারিতভাবেই জারজ সন্তানের অবাঞ্ছিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রবল কামুকতা ও মাত্রাহীন পেটুকতার অতৃপ্ত-জ্বালায় সর্বদাই তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে চলেছে। অচরিতার্থ কামনা-বাসনা তাকে বারংবার দিকভ্রষ্ট করছে। বাশেদ শুধু পেটের ক্ষুধায় যন্ত্রণাকাতর হয় না, সে যৌনক্ষুধায়ও দারুণভাবে ছটফট করে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে সে ক্ষুধা মিটাতে হলে সমাজে বিয়ে করার যে রীতি প্রচলিত আছে, তা তার পক্ষে সম্ভব নয়– কারণ সামাজিক জীবনে তার কোনো আর্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদা নেই। দারুণ অবক্ষয়ের সন্তান ঢ্যাঙ্গা বাশেদ– তার জীবনের সমুদয় আচরণ ও স্বভাব সেই কারণেই বিকৃত, ধিক্কৃত ও নিন্দিত। গল্পটিতে বাশেদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে অবক্ষয় পীড়িত সমাজচিত্রটি প্রতিভাত হলেও এরই অবয়বে নারী-জীবনের এক বিশেষ মাত্রার সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটে। বাশেদ সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত। তার মায়ের স্বীকারোক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> বাশেদের মা অন্ধকার একা ঘরে বিড়বিড় করতে থাকল, আঃ, ছেলেটো ই সংসারে অতিথ গো! ইয়া আল্লা, কত গোনা করলাম আল্লা! মিনষেটো ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার সব্বোনাশ করলে। আমি ছাড়া বাচেদের আর ক্যা আচে? ই সংসারে উ ভাত ক্যানে পাবে? বাচেদের বাপ তো বাচেদের বাপ লয়! ইয়া আল্লা, আমি বুঝতে পারি নাই। সেই মিনষেটোর সাজা দিও, ই বান্দার গোনা লিও না! ('তৃষ্ণা', mg‡'i ¯c k¨‡Zi AiY¨, iPbvmsMn-1 : ২৪)

বাশেদের মায়ের এই স্বীকারোক্তি প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতায় নারীর অসহায়ত্ব ও পুরুষ কর্তৃক প্রতারিত জীবনচিত্রকেই উন্মোচিত করে তোলে। একই সঙ্গে পুরুষের লাম্পট্য ও ভোগলিপ্সার লোলুপতার দৃশ্যপটটি প্রতিভাত হয়ে সমাজবাস্তবতায় নারী-নিগ্রহের পশ্চাতে নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সঙ্কট ও অসহায়ত্বের স্বরূপটিকেও মূর্ত করে তোলে। সমাজে নারী ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়; এমনকি অক্ষম-অথর্ব পুরুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকেও নারীর মুক্তি নেই— এই সমাজসত্যটি গল্পে বাশেদের দুর্মর যৌনাকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে অসাধারণ শিল্পকুশতায় রূপায়িত হয়েছে এভাবে :

> এই সখি হাসিস না, লোক জানতে পারবে।
>
> পারুকগো, পয়সা বার কর।
>
> না, আগে—
>
> উঁহু, আগে পয়সা বার কর, তার পর কথা।
>
> আবার রিন্‌রিন্‌ করে হেসে উঠল মেয়ে, দু'আনা লয়, দু'আনা লয়, তিন আনা করে দিতে হবে।
>
> ইঃ, ভারি লাটসাহেব। তিন আনা লাফাইচে।
>
> তবে চললোম।
>
> বাশেদের আবার সেই তীক্ষ্ণ ইচ্ছাটা সূক্ষ্ম তীর হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। ... আমি কিছুতেই মরতে চাই না, মরব না, আমি মরব না, আমি উই ঝোপটার কাছে যাব, সিকিটো ছুঁড়ে দোব সখির আচলে, এই লে, আমি বাচেদ, আমি—। ('তৃষ্ণা', mg‡'i ¯c k¦‡Zi AiY¨, MímsMn-1 : ৩০-৩১)

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে'-র মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে : 'সেই একই অসুস্থতা, একই বিকৃতি, একই বিবর্ণ ও বিস্বাদ জীবনের পদপাত।'[৬] ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চার পাশের অসুস্থ আবেষ্টনী গল্পের নায়ক সতীনাথকে সুস্থ চিন্তার অধিকারী করে নি। চরিত্র হননের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভকেই সে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছে। সতীনাথ চরিত্রের অবয়বে : 'হাসান আজিজুল হক অসম সমাজ-ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত অপাংক্তেয় জীবনকে গল্পরূপ দিয়েছেন।'[৭] এক গেঁয়ো মুদি দোকানদার সতীনাথের অসততা আর নারীর সতীত্বনাশে আগ্রহের আরতি শরীরে মেখে বেড়ে উঠেছে গল্পটির কাঠামো ও কাহিনির পরিসর। রায়বাড়ির বিধবার মেঘের মতো ভারী ও ফলবতী রঙের দিকে সতীনাথের লোভাতুর চোখ পড়ে। পানের রঙে ঠোঁট রাঙিয়ে সন্ধ্যার সময় সড়ক ছেড়ে আলপথে উদ্ধতবুকে এগিয়ে আসা ভামিনীর জন্য ঘরদোর-অন্ধকার রাতের প্রয়োজন— সব ব্যবস্থা করে দেয় সতীনাথ। সতীনাথ অশিক্ষিত, বাবার কাছে

পরিবারের কাছে 'ভ্রষ্টচরিত্র' কথাটা ছাড়া আর কিছুই শেখা হয়নি তার। সতীনাথের ভাবনার আলোকে আলোচ্য গল্পে সমাজে নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও নারী-পুরুষের মধ্যকার সমাজ নির্মিত অসম বিভাজন ও সামাজিক অসঙ্গতির বাস্তব চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে অবলীলায় :

> সে ভ্রষ্টচরিত্র। আর মেয়েলোকটা নষ্টা। নষ্ট কথাটা শিখেছে যখন তখন ব্যবহার করতে পারার মত। অভ্যাস করে করে। যেমন করে হাঁটতে শেখে, ভাত খেতে শেখে, রাগতে, হিংসা করতে আর গালাগালি দিতে শেখে। শিখেছে যখন বাগ্দীরা বলে, মেয়েটা সতী লয়, লষ্ট। কিন্তু ভ্রষ্টচরিত্র কথাটা শিখেছিলে বাবার কাছে। তোলা কাপড়ের মতো কথাটা। যখন তখন ব্যবহার করা যায় না। নিজেকে বিচার করতে গেলে ভ্রষ্টচরিত্র কথাটা যেন ভালো শোনায়। অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। আমি তো ভ্রষ্টচরিত্র! কিন্তু মেয়েটা যে নষ্টা। ('একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', mg‡'i ¯c k¤‡Zi AiY¨, iPbv msMÖn- 1 : ৩৬)

অসাধারণ অনুভূতি-প্রখর সত্য উপস্থাপনে এভাবেই সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসঙ্গতিকে রূপায়িত করেছেন হাসান আজিজুল হক। আমাদের প্রচলিত সমাজবাস্তবতায় পুরুষের চরিত্রহীনতাকে সমাজ আদরের চোখে দেখে; খুব প্রয়োজন না হলে পুরুষকে কেউ কিংবা নিজেরা ভ্রষ্ট বলতে অভ্যস্ত নয়; এমনকি যদি-বা বলার অথবা ভাববার প্রয়োজন পড়ে, তখন এর মধ্যে একটা আভিজাত্যও উপলব্ধি করে তারা। পুরুষের চরিত্রের অসততার জন্য প্রকারান্তরে নারীকেই দায়ী করবার হীন প্রবণতা আমাদের সমাজবাস্তবতায় একেবারে বিরল কোনো ঘটনা নয়; বরং এটিই প্রকৃত চিত্র। অসাধারণ নৈপুণ্যে গল্পটিতে : 'নারীপুরুষকে বিচারের এই যে ভিন্ন চোখ, সমাজের আর দশটা অনিয়মের মধ্যে এটাও যে দেখবার কিংবা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে, সে কথা কী কৌশলে গল্পনির্মাতা হাসান আজিজুল হক তাঁর পাঠককে জানিয়ে দিলেন!'[৮] 'উত্তর বসন্তে' গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে পূর্ববাংলার এক নিম্নবিত্ত, যন্ত্রণাখিন্ন, দাঙ্গাতাড়িত পরিবারের অসহ জীবনালেখ্য। পরিবারে বাবা-মা, তিনভাই, দুই বোন ছিল, কিন্তু লিপি নামক বোনটি বর্তমানে অকালমৃত। গল্পের সূচনায় ঘর-বাড়ি, পরিপার্শ্বের বর্ণনা যেন চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত সত্তাকেই তুলে ধরে। 'অন্ধকার জমে আছে বাড়িটাতে। আশেপাশে আম, জাম, কাঁঠাল বাগানের মধ্যে হতাশ অন্ধকার দলা পাকিয়ে আছে।' কিংবা 'জনমনিষ্যি নেই– ছি ছি ছি, এমন দেশ ভূভারতে দেখি নাই–' পাশাপাশি বর্ণিত হয় 'দিনের বেলাতেও মশারির ভিতর হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে পাথরের মতো বসে থাকেন আব্বা আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠেন কারণে অকারণে।' পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, প্রাণহীন, নিষ্প্রভ চরিত্রগুলি তাদের পরিত্যক্ত বাসভূমিতেই অনাগত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সঞ্চিত সুখ-স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে চলে এসেছে। বেঁচে থাকাই এখন তাদের কাছে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। গল্পে ঘটনাক্রমে বাণীর সঙ্গে দেখা হয় তার মৃত বোনের প্রেমিক কবীরের। কবীর বাণীকে নতুন জীবনে, নতুন প্রত্যাশার শরিক করে নিতে চাইলে বাণীর অশ্রুসিক্ত উচ্চারণ : 'আমাকে লোভী করে তুলো না। আমরা সবাই অসুস্থ। আমাদের লোভী করতে নেই।

আমরা রিফ্যুজি, উদ্বাস্তু। বাবা-মায়ের কাছে মনে হয় জীবনটা জীর্ণ ন্যাকড়ার মতো বাতাসে উড়ছে। এ বাড়ির সবকটি মানুষ অসুস্থ। আমাদের কোন অধিকার নেই জীবনে।' ('উত্তর বসন্তে', mg‡'i ¯c k¦‡Zi AiY¨, iPbvmsMn-1 : ৫৪) দেশভাগের পর তারা পূর্ব বঙ্গে এসেছে। এখানে কোনোকিছুই তাঁদের পরিচিত আর প্রিয় নয়। কেননা : 'দাঙ্গা আর দেশবিভাগ মিটে যাবার পরও তার চরম চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে এই বিকৃত, পঙ্গু, অসহায় মানব জীবনগুলি, যারা সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত।'[৯] স্বাভাবিকভাবেই তাই লক্ষণীয় : 'মায়ের চোখ দুটি যেমন স্তিমিত তেমনি নিস্পৃহ। তাঁর ঘোলাটে দৃষ্টি একবারও চকচক করে না। বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা ভোগ করা ছাড়া তাঁর যেন বেঁচে থাকার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।' ('উত্তর বসন্তে', mg‡'i ¯c k¦‡Zi AiY¨, iPbvmsMn-1 : ৪৬) এভাবেই আলোচ্য গল্পে বাণী, লিপি আর তাদের মায়ের চরিত্রবিম্বে প্রতিফলিত তীব্র জীবন-বিমুখতা প্রকারান্তরে ১৯৪৭-এ দেশভাগ ও তৎজ্জনিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পাশবিকতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অস্তিত্বের সঙ্কট ও অসহায়-উন্মুলিত মানবজীবনের বিপন্ন-বিবর্ণ-রিক্ত সমাজবাস্তবতার দেশচিত্রটিকে প্রমূর্ত করে তুলেছে অসামান্য জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পদক্ষতায়। পরবর্তী গল্প 'বিমর্ষ রাত্রি : প্রথম প্রহর'-এর মধ্যে গল্প কথক তার শহুরে বন্ধু জামানকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রাপথের নানামাত্রিক দৃশ্যচিত্রের অবয়বে নির্মিত আখ্যানশৈলী। গল্পকথকের স্বগতভাষ্যে এবং স্মৃতির পর্দায় জীবনের বহুবিধ বঞ্চনা-অসহায়ত্বের নির্মমতা প্রতিভাত হয়েছে। আশাহীন স্বস্তিহীন এক অপাঙ্‌ক্তেয় অসহ সময় ও সমাজের বীতশ্রদ্ধ রূপটি সমস্ত গল্পভাগ জুড়েই প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়। গল্পকথক ও তার পুরনো বন্ধুর কথোপকথনের সূত্রে বিবৃত হয় গ্রামের পথে যাত্রার উদ্দেশ্য। কথাচ্ছলে জামান বিয়ে এবং এক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রসঙ্গে গল্পকথককে জানায় :

> একটা মেয়ের খোঁজ-টোজ দাও না হে। বিয়ে করতে হয় এবার। আর কতদিন?
>
> বিয়ে করতে চাও– সত্যি?
>
> কেন বিয়ে কি করতে নেই? অত অবাক হচ্ছো কেন?
>
> আমি একটি পাত্রীর সন্ধান তোমাকে দিতে পারি– যদি তুমি সিরিয়াস হও।
>
> তাই নাকি? কোথায় ? তোমার হাতে মেয়ে ? বল কি? ... পাত্রী সম্বন্ধে আমার আইডিয়াটা তোমাকে বলি।
>
> তুমি তোমার আইডিয়া আমাকে বলেছিলে। তোমাদের মতো অধিকাংশ শহুরে যুবকরা যে বাহাদুরিটা করে আর কি! শহরের মেয়ে বিয়ে করবে না। বেশি লেখাপড়া জানা আধুনিকা হলে চলবে না। একটু লজ্জাবতী হবে, একটু গ্রাম্য, একটু লেখাপড়া জানা, হরিণীর মতো চকিত নয়না, মেষের মতো সরলস্বভাবা ইত্যাকার কথা। ('বিমর্ষ রাত্রি : প্রথম প্রহর', mg‡'i ¯c k¦‡Zi AiY¨, iPbvmsMn-1 : ৬৬-৬৭)

এই কথোপকথনের সূত্র ধরে সমাজে নারীর প্রকৃত সত্তার স্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত যুবক জামানের এহেন ভাবনা-চিন্তা কেবল পশ্চাৎপদ অবক্ষয়-পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থার রুগ্ন-জীর্ণ স্বরূপটিকেই প্রতিবিম্বিত করে তোলে না বরং পাঠকের বোধে জাগরিত হয় সেই সমাজসত্য : 'পুরুষ প্রাধান্য নারী নির্যাতনের আদর্শিক ভিত্তি। অবিবেচক, হঠকারী, বিচারবুদ্ধি-বর্জিত, ভাবাবেগ তাড়িত, অস্থিরচিত্ত নারীকে নিজ ইচ্ছায় চলতে দিলে সমাজে বিপর্যয় ঘটে যাবে। কাজেই সমাজের প্রয়োজনে নারীকে বশে রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।'[১০] পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এহেন সংকীর্ণতা আলোচ্য গল্পে সমাজবাস্তবতার নিরিখে শিল্পিত হয়েছে। একটি সংঘাতপূর্ণ ভালোবাসার আখ্যান 'মন তাঁর শঙ্খিনী' গল্পটি। শঙ্খিনী বলতে : 'বিশেষ ধরনের নায়িকাকে বোঝায়, শঙ্খের মতোই প্যাঁচানো বা রহস্যময় হয়ে থাকে তারা। এছাড়া শাকচুন্নী নামীয় পেত্নীকেও বোঝানো হয়ে থাকে এই শব্দে। অর্থাৎ শব্দটির মূলে আছে জীব– জলজ কিংবা কল্পজ।'[১১] আলোচ্য গল্পে শঙ্খিনীর মতো ভয়াবহ রহস্যময় মন নিয়ে হামিদা লীলাখেলা করেছে তার প্রেমিক শাদুর সঙ্গে। শাদু তাকে পাওয়ার জন্যে উতলা হয়। হামিদাও তাকে ভালোবাসে বলে জানিয়েছিলো। কিন্তু সেই ভালোবাসার অধিকার-বলে শাদু যখনই তার কাছে গেছে, তখনই সে তাকে বিমুখ করেছে। এমনকি শাদুর প্রতি এক নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখিয়ে হামিদা একদিন পাশের গাঁয়ের ট্যারাকে বিয়ে করে বসে। শাদুর ভাবনায় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে হামিদার চরিত্রের রহস্যময়তা : 'উ সোয়ামির কাচেও যেচে না, আমার ঘরেও আসচে না, অথচ আমাকে ফি রেতেই পেরায় ভালোবাসচে। ই সাজ্জাতিক বেপার।... শাদু বলল, ভালো না বাসলে স্বামীর কোন মর্যাদা দেবার দরকার নেই। ... অদ্ভুত গ্রাম্য নীতিবোধে নড়েচড়ে হামিদা বলে, ছি উ কথা বলিস না। সোয়ামি সব সোমায়েই সোয়ামি।' ('মন তাঁর শঙ্খিনী', mg‡'i ¯c k¤‡Zi AiY¨, iPbvmsMn-1 : ৮০) গল্পটিতে নারীর গুহায়িত হৃদয়-রহস্যের বিচিত্র লীলাখেলা হামিদা চরিত্রের অবয়বে রূপায়িত হয়েছে। একই সঙ্গে সাধ ও সামর্থ্যের বিচিত্র টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত মানব চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত অথচ নিরুপায় চালচিত্রটিও হামিদা চরিত্রের রহস্যময় আচরণের আবরণে শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'সীমানা' গল্পের শুরুটাই হয়েছে এক অসাধারণ শিল্পভাষ্যের আবরণে এভাবে : 'সবটাই একটা ভয়ের আর অপরাধের ইতিহাস। সঙ্কোচ আশঙ্কায় বুক শুকিয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার ঘটনা' ('সীমানা', mg‡'i ¯c k¤‡Zi AiY¨, iPbvmsMn-1 : ৮৫) গল্পটির শুরুতেই যে ভয়ের আর সঙ্কোচের ইতিহাস ইঙ্গিতময় হয়েছে তা আর কিছুই না, রুহুল নামক এক শহুরে যুবকের হঠাৎ করে দেশগ্রাম দেখবার ইচ্ছা, সেই অভিপ্রায়ে ট্রেনে চেপে অজানা গন্তব্যে যাত্রা এবং কোনো এক পাণ্ডববর্জিত অকুলীন পাহাড়ী জায়গায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নেমে অসুস্থ হয়ে পড়া ও অবশেষে স্টেশন মাস্টারের গৃহে আশ্রয় লাভ– এই হলো মোটামুটিভাবে গল্পভাগের উপজীব্য। ঘটনাক্রমে স্টেশন মাস্টারের বোন ইভার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ঘনিষ্টতায় জড়িয়ে পড়া এবং অবশেষে এহেন সম্পর্কের ঘনিষ্টতায় বিব্রত বোধ করার মধ্য দিয়ে আখ্যানভাগের পরিসমাপ্তি ঘটে। গল্পটিতে নর-নারীর মধ্যকার

সম্পর্কের জটিলতা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি ও পরিপার্শ্বের আন্তঃসম্পর্কের বিচিত্র টানাপোড়েনও উন্মোচিত হয়েছে রুহুল এবং ইভার মধ্যকার সম্পর্কের ইতিবৃত্তে। গল্পে বিষয়টি বিধৃত হয়েছে এভাবে :

> এরপর ওরা বসেছে। পাশাপাশিই। এবং দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসেছে। এই সময় দুজনের কথা জমাট বেঁধে দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। তারপর আর কথার প্রয়োজন হয় নি। ট্রেনের শব্দে তারা পরস্পরের হাত ছেড়ে দিয়ে চমকে উঠেছে। ... ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে ইভা। কিন্তু শিরশির ঝিরঝির রক্তস্রোত স্পন্দিত করছে তার দেহ। এই বিলের ফাঁদে অজানা নিদারুণ ভয়। ভয় রুহুলেরও। কিন্তু সে জড়িয়ে আছে ইভার একটা হাত। হঠাৎ ওরা দুজনেই চমকে উঠল একটা হাসির শব্দ শুনে। খানিক দূরে বড় ঝোপের আড়ালে একটা সাঁওতাল মেয়ে হাসছে। ... রুহুল বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিয়েছে। সঙ্কুচিত হয়ে সরে গিয়েছে ইভা। শহরের ভিড় এসেছে, খোলস এসেছে। নানাজনের আনাগোনা সেখানে। মুখোশ ফেলে আসতে পারে নি। ... ক্লান্ত পায়ের উপর ভর করে যেন আর দাঁড়ানো যায় না। কাপুরুষের সেই পা নিয়ে ভয়ে ভয়ে সাবধানে শহরে হাঁটবে। আর মেয়েটি সবটাই একটা ভয়ের আর অপরাধের ইতিহাস ভেবে ছেলেটির প্রতিবেশিত্বও স্বীকার করবে না! ('সীমানা', mg‡'i ¯c k‡Zi AiY¨, iPbvmsMÖn-1 : ৮৯-৯৩)

গল্পটিতে সম্পর্ক ও এর গভীরতার অনুভবে রুহুল ও ইভার এই যে সঙ্কটাপন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা– তা প্রকারান্তরে মানবমনের বিচিত্র রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং একইসঙ্গে প্রকাশিত হয়ে পড়ে সেই সমাজসত্য যেখানে : 'নারী-পুরুষের যৌনতা সংক্রান্ত বিষয়াদি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেই কেবল সৎ ও সতী থাকা যায়– এমন শিক্ষাই আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে দিয়ে আসছে প্রথাগত সমাজ কাঠামো। নারীর কিংবা পুরুষের অথবা মানুষের মনের তাগিদকে সমাজ কখনোই মর্যাদা দেয়নি; প্রাধান্য দেওয়াতো পরের কথা।'[১২] ইভা নামক তরুণীর চিত্ত-সঙ্কটের দোলাচলে গল্পটিতে সমাজের এবং সমাজের বাসিন্দা ও অবশ্য অংশীদার মানুষের মূলত অনগ্রসরতা, অসহায়তা এবং সামান্য পরিসরে জীবনকে আবদ্ধ রাখার সংকীর্ণ মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে অনবদ্য শৈল্পিক দক্ষতায়। 'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী' নামক গল্পে একজন উচ্চশিক্ষিতা নারী, কৈশোর-উত্তীর্ণ রেজার সঙ্গে, যাঁর ছাত্র-শিক্ষিকার সম্পর্ক– তিনিও কীভাবে এক পর্যায়ে সমাজের প্রচলিত নীতিবোধ ও তাঁর মার্জিত রুচিকে জলাঞ্জলি দিয়ে (নিদ্রিত চার বছরের একটি শিশু পাশে থাকা সত্ত্বেও) রেজার সঙ্গে যৌনসম্ভোগে রত হয়েছিলেন তার নিখুঁত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পে : 'রেজার কৈশোর-উত্তীর্ণ-মনোলোকে যৌন চেতনার উদগম এবং অবসর ক্লান্ত রাহেলার যৌন অতৃপ্তি– শহরের নির্জন-শান্ত গৃহের পরিবেশে উভয়কেই পাপাচরণের প্রান্তসীমায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।'[১৩] আলোচ্য গল্পে অবক্ষয়ের এক ভিন্নমাত্রাকে নারীচরিত্রের বিচিত্র অবয়বে প্রমূর্ত হতে দেখা যায়। উচ্চশিক্ষিতা ইংরেজি শিক্ষিকা রাহেলার সোৎসাহে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তারই ছাত্র রেজার যৌন সংসর্গের এক মূল্যবোধহীনতার ছবি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে গল্পটিতে সমাজবাস্তবতার নিরিখে। রেজার অটুট প্রতিজ্ঞা রাহেলার উপোসি শরীরের টানে ব্যর্থ হয় এবং :

> রাহেলার চার বছরের মেয়ের রাগত, ভীত, তীক্ষ্ণ, ক্রুদ্ধ গর্জনে রেজা তার আহত মুমূর্ষু রক্তাক্ত বিবেককে ডাস্টবিন থেকে তুলে নিয়েছিলো। ... উপোসি রাহেলার শরীর থেকেই কি রেজার এই পলায়ন? সমাজের স্বীকৃতি নেই বলেই কী এই অবক্ষয়? নাকি শেষ পর্যন্ত দুজনে দুজনের কাছে সৎ থাকতে পারছে না, বিশ্বাস রাখতে পারছে না সম্পর্কে। এই পলায়ন, এই আত্মরক্ষা কি রেজার নিজের অস্তিত্বের কাছেও নয়?[১৪]

স্খলিত ও অধঃপতিত রাহেলা ও রেজার আত্মরক্ষার ভাবানুষঙ্গটি গল্পে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো। ঠিক তেমনি করে কাঁপা পায়ে উঠে রেজার মুখটা দুহাতে গ্রহণ করে চুমু খেলেন বারবার। ... দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের শেষে যেন ভূমিকম্প হলো। সেই প্রচণ্ড ঝড়টা রেজার পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে এলো। এই প্রথম সে প্রতিচুম্বন করল। দৈত্যের মতো শক্তিতে আঁকড়ে ধরল রাহেলাকে। ছেলেটার অস্থির হাত খুঁজছে, খুঁজছে, যন্ত্রণাবিদ্ধ হাত অস্থির, অস্থির ও অনুসন্ধিৎসু, কম্পমান ও অস্থির ও অনুসন্ধিৎসু। ওর নতুন পাওয়া বিবেক তখন যেন দেহের বাইরে মুহ্যমান হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওরা সেই রক্তাক্ত, আহত মুমূর্ষু বিবেকটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এলো। ('একটি আত্মরক্ষার কাহিনী', mg‡'i ¯c k¨‡Zi AiY¨, iPbvmsMÖn-1 : ১০২)

গল্পটিতে কেবল রেজা এবং রাহেলার অনৈতিক সম্পর্কের চিত্রটিই বিধৃত হয় নি বরং এর মধ্য দিয়েই রাহেলা নামক নারীর অসহায়ত্ব ও একাকিত্বের যন্ত্রণার তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে। 'আমি একেবারে একা' কিংবা 'জীবনে তিনি কি চেয়েছিলেন আর জীবন তার পরিবর্তে তাঁকে কি দিয়েছে।' অথবা 'চার বছরের মেয়েকে নিয়ে নির্জন বাড়িতে বসবাস করা' ইত্যাদি বিবৃতির মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে রাহেলার অবয়বে বঞ্চিত-অতৃপ্ত নারী জীবনের হতাশা ও অচরিতার্থতাজনিত যৌন-বাসনার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় একজন পুরুষের মধ্য বয়সে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কিংবা পরনারীতে আসক্তির মতো আচরণকে যতোটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের প্রবণতা ও মানসিকতা দেখা যায়, ঠিক ততটাই বিরূপ মানসিকতা প্রদর্শিত হয় একই আচরণে অভিযুক্ত নারীর প্রতি। নারী তার অবদমিত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে হৃদয়ে চেপে রেখে এক অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করতে একরকম বাধ্যই হয়। সমাজ নারীকে সুনির্ধারিত কতিপয় নিয়মে বা স্বরূপে দেখতেই অভ্যস্ত করে তোলে। কেবল তাই নয় :

> ট্রাজেডী এই যে, স্ত্রী, মাতা ও কর্মজীবী রমণীর তথাকথিত ভূমিকা তাদের নিজেদের সৃষ্ট ভূমিকা নয়; পুরুষ, পুরুষের নির্মিত কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান এই ভূমিকাগুলোর স্রষ্টা বা নির্মাতা। ... মানুষ হিসেবে নারীও তার মনমানসকে 'নিজ' অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে স্বাধীনচেতা হতে পারে; নারী তার 'নিজ' "Self"-কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু এ পথে প্রতিবন্ধক হল পিতৃতন্ত্র।[১৫]

স্পষ্টতই লক্ষণীয় যে, একই তথাকথিত সমাজ গর্হিত অনৈতিক আচরণে অংশগ্রহণকারী দুই চরিত্র রাহেলা ও রেজার জন্য উপহাস ও পরিহাসের তীব্রতা সমাজ দুইভাবে নির্ধারণ করে রেখেছে। সমাজ এই ঘটনার জন্য রাহেলাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে বেশি আগ্রহী। এমনকি রেজার চরিত্র স্খলনের দায়ভারও প্রকারান্তরে সমাজ

রাহেলার উপরই ন্যস্ত করবে। নারীর প্রতি এহেন অসম দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজবাস্তবতার এক অতি পরিচিত অনুষঙ্গ। সমাজে নারীর পশ্চাৎপদ অসম অবস্থানের স্বরূপটি আলোচ্য গল্পে রাহেলা চরিত্রের একাকিত্ববোধ ও অসহায় অবরুদ্ধ অতৃপ্ত যৌন-কামনার অন্তরালে শিল্পিত হয়ে উঠেছে। mg‡'i ¯c k¤‡Zi AiY¨ গল্পগ্রন্থের 'আবর্তের সম্মুখে' গল্পটি স্বতন্ত্র মেজাজের, সমস্যাও ভিন্নতর। শেষ গল্প 'গুনিন'-এর বক্তব্যও ভিন্ন ধরনের। 'আবর্তের সম্মুখে' গল্পে বিপত্নীক ও অবসরপ্রাপ্ত জজ বারী সাহেবের পারিবারিক জীবনের একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, যা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে হরহামেশাই ঘটে থাকে, তারই বেদনাবিধূর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ গল্পে অবক্ষয় আছে, আছে অবক্ষয়কেন্দ্রিক নতুন মাত্রা। জন্মদাতা পিতার প্রতি সন্তানদের শ্রদ্ধা, ভক্তির অভাব এবং তাঁদের প্রতি সন্তানদের চরম দায়িত্বহীনতার অবয়বে গল্পটিতে বৃদ্ধ বারী সাহেবের পরিণত জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতা প্রকারান্তরে গলিত মধ্যবিত্ত সমাজবাস্তবতার তীব্র অন্তর্জালা ও গভীর নৈরাশ্যকে শৈল্পিক রূপ দিয়েছে। অবক্ষয়-পীড়িত আমাদের : 'সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (individualism) অনুপ্রবেশ জন্মদাতা পিতামাতা থেকে সন্তানদেরকে হৃদয়হীনভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। পুঁজিবাদী সমাজ জীবনে বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের জন্য এ যেন ভয়াবহ এবং এক দুর্মোচ্য অভিশাপ– চূড়ান্ত অবক্ষয় থেকেই এ-অভিশাপের জন্ম।'[১৬] গল্পটিতে বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত জজ বারী সাহেবের স্মৃতিকাতরতার অনুষঙ্গে তার পুত্রবধূ ও কন্যার অবয়বে নারী-জীবনের বিশেষ দিকের উন্মোচনও লক্ষণীয়। বারী সাহেবের ভাবনায় এ গল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের টুকরো টুকরো দৃশ্যপটগুলো এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য :

> ক. তিরিশের সীমায় দাঁড়িয়ে নাজমার রূপের যেন অন্ত নেই! এই আশ্চর্য রূপের জন্যেই একদিন বারী তাঁকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। ... নাজমা স্থির কণ্ঠে শুরু করে, এ রকম চেঁচামেচি রাগারাগি আমি পছন্দ করিনা। এসবের মধ্যে আমি থাকতে পারি না। এভাবে থাকা আমার পোষাবে না। ('আবর্তের সম্মুখে', mg‡'i ¯c k¤‡Zi AiY¨, iPbvmsMÖn-1 : ১০৮-১০৯)

> খ. কালো মোটা শান্ত এই মেজ বউটিকেই যা একটু পছন্দ করেন বারী। বোধহয় একটু নির্বোধ প্রকৃতির বলেই। ধমক দিলে জবাব দেয় না বলেও বটে খানিকটা। ('আবর্তের সম্মুখে', mg‡'i ¯c k¤‡Zi AiY¨, iPbvmsMÖn-1 : ১০৭)

> গ. বড় মেয়ে রাহেলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অধ্যাপক স্বামী মারা যাওয়ার পর এই বাড়িতে চলে এসেছে। কখনো কোন কারণেই এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা আসবে, তা সে চিন্তা করে নি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে সংসার বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর মেয়েদের কোন পরিকল্পনা থাকতে পারে না। ('আবর্তের সম্মুখে', mg‡'i ¯c k¤‡Zi AiY¨, iPbvmsMÖn-1 : ১১১)

বারী সাহেবের স্মৃতিকাতরতায় প্রতিভাত দৃশ্যপটগুলোতে আমরা নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বাস্তব চিত্রায়ণ লক্ষ করি। নারীর যোগ্যতার প্রশ্নে তার বাহ্যিক সৌন্দর্যই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনও আমাদের সমাজে প্রাধান্য পেয়ে থাকে যা আলোচ্য গল্পে বারী সাহেবের বড় পুত্রবধূ নাজমার রূপের প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে নারীর মধ্যে সমাজ এক ধরনের কোমলতা ও নির্লিপ্ততা প্রত্যাশা করে, এমনকি সবকিছু মেনে নেয়ার প্রবণতা ও বিনা প্রশ্নে যে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করে চলা নারী এখনও আমাদের সমাজের দৃষ্টিতে 'ভালো মেয়ে' হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নারীকে অবদমনের এ এক চমৎকার পুরুষতান্ত্রিক কৌশল যা গল্পে বারী সাহেবের মেজ পুত্রবধূর অনুষঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। সবশেষে বারী সাহেবের বড় মেয়ে রাহেলার চরিত্রবিম্বে প্রতিফলিত হয়েছে অসহায়-অবহেলিত ও উপায়হীন নারী-জীবনের অবয়ব। বিয়ের পরে স্বামী গৃহ থেকে কোন কারণে পিতার গৃহে আশ্রয়প্রার্থী নারীর জীবনের তিক্ততা ও নিগ্রহের বাস্তব সমাজচিত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে বারী সাহেবের বড় মেয়ে রাহেলার জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। 'গুনিন' গল্পটি : 'হাসান আজিজুল হকের ইঙ্গিতাত্মক শিল্পভাবনার অন্যতম নিদর্শন।'[১৭] গল্পটিতে তন্ত্রমন্ত্রের সাধক বুড়ো গুনিন গ্রামের সকলের বিশ্বাস মতে এক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। বৃদ্ধ গুনিনের জীবনকে ঘিরে গল্পটিতে এক রহস্যময়তার অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে গল্পে এক অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত ঘটেছে। লেখকের কৃতিত্ব এই যে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে গল্পের বিষয়গুলো একে একে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সেই বর্ণনায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভেধরেখা বিলুপ্ত হয়ে পাঠকের চেতনায় এক ভিন্নধর্মী আমেজ সৃষ্টি করে। গুনিনের দুই ছেলে বেঁচে নেই। কিন্তু তিন পৌত্র রহম, আলী ও রমিজ বেঁচে আছে। বৃদ্ধ গুনিনের অন্তিমকালে তিন পৌত্রের মধ্যে গুনিনের কাছ থেকে মন্ত্র শেখা নিয়ে রীতিমতো ঝগড়া বাধে। গুনিনের কাছ থেকে যে মন্ত্র শেখা নিয়ে তিন পৌত্রের মধ্যকার এই তুমুল বিবাদ তা গল্পটিতে ভিন্ন এক মাত্রার সন্ধান দিয়েছে এভাবে :

> একটা মন্তর শিখাইয়া দিমু। ... যা চাও– ধন দৌলত, মাইয়ালোক, যা চাও সব পাবি। কিন্তু মন্তর তিনোজন শিখতে পারবি না। যে কোন একজনের শিখতে হইবে। কেডা শিখবি ক। শিগ্‌গির ক। যা চাও– টাহা পয়সা, মাইয়ালোক সব পাবি– ... মন্ত্রটার এতো গুণের কথায় কেউ কোন কান দিল না– মেয়েমানুষের কথাতেই যেন ক্ষেপে উঠল ছোঁড়া দুটো। ('গুনিন', mg‡'i ¯c kx‡Zi AiY¨, iPbvmsMn-1 : ১১৮-১২১)

গুনিনের মন্ত্রের মূল আকর্ষণ ছিলো 'মাইয়ালোক'। তিন পৌত্রের মধ্যকার বিবাদ এবং গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহ সৃষ্টি অন্তরালেও বিদ্যমান ছিলো এই 'মাইয়ালোক'-এর প্রতি পুরুষের দুর্বার আকর্ষণ। প্রকারান্তরে নারীর শরীরই যে তার বহুবিধ সঙ্কটের অন্যতম কারণ– সে বিষয়টিও বস্তুবাদী চেতনায় গল্পের কাঠামোয় শিল্পিত হয়েছে। গল্পটিতে রাবেয়া নামক তরুণীর উপস্থিতি এবং তাকে কেন্দ্র করে গুনিনের তিন পৌত্রের মধ্যকার অন্তর্কলহ ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর সমাবেশ পাঠককে এই বোধে উপনীত করে যে : 'শরীরের কারণে নারী পুরুষতন্ত্রের শিকার।'[১৮] গুনিনের তিন পৌত্রের মধ্যে রাবেয়াকে পাওয়া এবং এ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্তরালে রাবেয়ার এ বিষয়ে নিজস্ব মতামতও যে থাকতে পারে– এ বিষয়টিও গল্পে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। নারীর এ-ও এক মাত্রা। যে কোন বিষয়ে এমনকি একান্ত নিজস্ব ব্যাপারেও নারীর মতামতের গুরুত্বহীনতার

এই সমাজসত্যটি আলোচ্য গল্পে রাবেয়ার মধ্য দিয়ে প্রতীকায়িত হয়েছে শৈল্পিক দক্ষতায়। স্বাভাবিকভাবেই তাই : 'যারা রহস্যপ্রিয় তারা এ গল্প থেকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত লক্ষ করে মুগ্ধ হয়।'[১৯]

AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ

হাসান আজিজুল হকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ[২০] মোট আটটি গল্পের এক অনবদ্য সংকলন। গল্পগুলো যথাক্রমে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী', 'সারা দুপুর', 'অন্তর্গত নিষাদ', 'মারী', 'উটপাখি', 'সুখের সন্ধানে', এবং 'আমৃত্যু আজীবন'। এই আটটি গল্পের মধ্যে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী' এবং 'মারী'– এই তিনটি গল্প সাতচল্লিশের দেশ বিভাগোত্তর কালে উদ্বাস্তু ও দাঙ্গাকবলিত জীবনের মর্মবিদারী নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ' 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' হাসান আজিজুল হকের প্রতীক শিল্পভাবনার এক শক্তিশালী রূপায়ণ।'[২১] স্বাধীনতার স্বাদ যে কতো তিক্ত ও বিষাক্ত হতে পারে, এর জ্বালা-যন্ত্রণা যে কতো মর্মন্তুদ হতে পারে, হাসান আজিজুল হক ভারতের মাটি থেকে উন্মূলিত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পূর্ববাংলায় পালিয়ে আসা সহায় সম্বলহীন এক বৃদ্ধ ও তার পারিবারিক জীবনের হাহাকারের মধ্য দিয়ে তা বাঙ্ময় করে তুলেছেন। বস্তুতপক্ষে, গল্পটিতে তেমন কোনো কাহিনি নেই। গ্রামের তিন বখে-যাওয়া যুবক দেশছাড়া এক বৃদ্ধের কন্যাকে ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বেরিয়েছে, পৌঁছেছে তারা বৃদ্ধের বাড়িতে, তাদের যাত্রাপথে টুকরো টুকরো কথামালা ও দৃশ্যচিত্রের অবয়বে ভেসে ওঠা নানামাত্রিক সামাজিক অবক্ষয়ের বাস্তবচিত্র, এবং অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে শাসন করে বুড়ো দুই যুবককে পাঠিয়ে দিলো আত্মজার ঘরে– এই-ই হচ্ছে আলোচ্য গল্পের আখ্যানভাগ। বলা যেতে পারে : ' 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের ঘটনাস্রোত এগিয়ে চলেছে চরিত্রের মনোলোকে– কখনো এনাম-ফেকু-সুহাস, কখনো-বা কেশো বুড়োর মনোলোকের ক্রমভঙ্গুর ভাবনায় এগিয়ে চলেছে শিল্পিতা পেয়েছে আলোচ্য গল্পের ঘটনাংশ।'[২২] সামান্য কয়েক পাতার গল্প, কাহিনি ভেঙ্গে দেখতে চেষ্টা করলে দেখা যায় সে অর্থে কোন গল্পও নেই। এক সন্ধ্যার কয়েক ঘন্টার অভিজ্ঞতা, এক মফস্বল শহরে– অথবা গ্রামে তিন অকালকুষ্মাণ্ড তরুণের সস্তায় ফূর্তি খোঁজার বিবরণ। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' দেশভাগের পরবর্তী কোন এক সময়ের ঘটনা। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সকল সহায়-সম্পদ ছেড়ে দেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে যে সব অগুনতি মানুষকে, এই গল্পের বৃদ্ধ ও তার পরিবার তাদেরই অন্তর্গত। দেশভাগের পর সব খুইয়ে সপরিবারে বৃদ্ধা আশ্রয় নিয়েছে আলোহীন-আশাহীন এক গ্রামে সেখানে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই আছে বটে, কিন্তু দিনাতিপাতের কোন অবলম্বন নেই। অবশেষে ভর করতে হয়েছে কিশোরী কন্যার ওপর। লজ্জা, ভীতি, ঘৃণা তার চেহারায়, গলার স্বরে প্রতিবিম্বিত হয় এভাবে :

> জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই– ইচ্ছে করলেই কি আর ঘুমানো যায়। ... এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কি ঠাণ্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে। ... এই তোমরা একটু আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজখবর নাও। সময় অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা! তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হতো এই জঙ্গুলে জায়গায়। ... এই দ্যাখো না, বড় মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্য– একটা শ্লেষার দলা শ্বাসনালীটাকে একবারে স্তব্ধ করে দেয়।
> (‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’, AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৩৪-১৩৫)

বস্তুত, গল্পটিতে কোনো নীতিকথা নেই, কোনো ইতিহাস পাঠও নেই। অনুক্ত সে সব কথা পাঠক যে যার মতো করে আবিষ্কার করে নেয় গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে। গল্পপাঠে পাঠকের বোধে জাগরিত হয়ে ওঠে : ‘ক্ষুধার চেয়ে বড় শত্রু আর নেই– সে কোন আব্রু মানে না, শিক্ষা মানে না, বয়স বা পদবির ওজন তার কাছে গ্রাহ্য হয় না। ... তীব্র অভাব ও ক্ষুধার মুখে সকল সামাজিক বা ধর্মীয় অনুশাসন ফুঁৎকারে উড়ে যায়, কিন্তু চেতনার গভীরে যে দ্বন্দ্ব, কঠোরতম বাস্তবতার মুখেও তা কাঁটার মতো খচ খচ বিঁধে থাকে।’[২৩] গল্পটিতে সুহাস, ফেকু, ইনাম নামক তিন তরুণের স্বপ্নহীন জীবনের অন্তর্গত যৌনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে বুড়োকে বারবার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি করে যেতে হয় ‘আমি যখন এখানে এলাম’– এই একই সংলাপের। উদ্বাস্তু জীবনের এই অসমাপ্ত সংলাপের গোপন স্রোতে প্রকৃতপক্ষে :

> ফেনিয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল আঘাতে তৎকাল এবং যুদ্ধ-পরবর্তী কালখণ্ডে বিভাজিত রাষ্ট্রের ব্যক্তিমানুষের চৈতন্যে সৃজিত নতুন অস্তিত্বসংকট, আত্মজিজ্ঞাসা ও সংবেদনার পরিপ্রেক্ষিত।... এই উন্মুলিত বোধের বাস্তবতা থেকে মুক্তি মেলেনি ব্যক্তিমানুষের। তাই ফুল নয়, সৌন্দর্য নয়; মহীরুহের সম্ভাবনা স্তব্ধ হয়ে থাকা যে ছোট্ট বীজ বিষের আধার, রোপিত হয়েছিল সেই করবী গাছ– যদিও নিতান্ত প্রয়োজনেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত সবকিছু মিথ্যের অন্ধকারে নিপতিত হয়। সত্য হয়ে ওঠে বেঁচে থাকবার অনিবার্য বস্তুসমগ্রতা নিয়ে জীবনের আর্তনাদ, যেখানে বিষের সঞ্চরণশীলতা আষ্টেপিষ্টে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরিত্যক্ত করে তোলে জীবনের স্বপ্ন ও স্বাধ– ‘এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ?’ এই কান্না অনিঃশেষ।[২৪]

আলোচ্য গল্পের কতিপয় উদ্ধৃতি সমাজ-বাস্তবতায় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপটি অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> ক. মামীর বোনেরা যা সোন্দর সে কথা আর কলাম না। তোর মামার বাড়িটা কোয়ানে, শালীরা বেড়াতি আসলে কস আমাকে— ফেকু কথা না বললেই নয়, তাই বলে। সেটি হচ্ছে না, বুজিচো— চোখ বন্ধ করে মনের আরামে বলল সুহাস। ও, তাই তুমি মাসে পাঁচবার করে ছোট মামার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতি যাচ্ছো? বুজিচি, ওখেনে তো পয়সাকড়ি লাগে না; আরামেই আছো দেহা যায়। — ফেকু চোখ মটকে বলে।

খ. মুরগিগুলো আবার কঁ কঁ করে ওঠে, কথা বলে ওঠে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তীক্ষ্ণ গালাগালি অন্ধকারকে ফাড়ে, চুপ, চুপ, মাগি চুপ কর, কুত্তী– এবং সমস্ত চুপ করে যায়।

গ. এখানে যখন এলাম– আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই ... তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ– সুহাস হাসছে হি হি হি। ... আবার হু হু ফোঁপানি এলো।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছ থেকে সুহাস, ফেকু ও ইনামের মনোলোকের রুচিহীনতার অন্তরালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায়ত্ব ও দুর্মর যন্ত্রণার অধস্তন সামাজিক রূঢ় বাস্তবতার চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। ইনাম, ফেকু, সুহাসের কথাবার্তা ও মনোচেতনার অবয়বে প্রতিফলিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রচ্ছাপ। তিন যুবকই কথায় কথায় 'শালী' শব্দ উচ্চারণ করে, অর্থাৎ অনবরত বিয়ে করতে চায়। অন্যদিকে, কেশো-বুড়োর উপায়হীনতা ও বিপণ্নতা এক ফুৎকারে পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে উড়ে যায় বলেই অবলীলায় স্ত্রীকে বলতে পারে 'মাগী চুপ কর, কুত্তী' এবং পুরুষ বলেই সে আত্মজার উপর বিস্তার করতে পারে পুরুষতান্ত্রিক দাপটতা। সামাজিক অবক্ষয় এবং দেশবিভাগজনিত মানবিক বিপণ্নতার পাশাপাশি আলোচ্য গল্পে সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকতর অবমাননা ও লাঞ্ছনার দেশচিত্রটিও উন্মোচিত হয়েছে। পাঠকের ভাবনাকে অধিকৃত করে রাখে সমাজবাস্তবতার এক নির্মম অনুষঙ্গ নারী-নিগ্রহের চিরাচরিত ভাবসত্য। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

কেশো-বুড়ো নিম্নবর্গের মানুষ– আত্মজাকে গ্রামীণ যুবকদের কাছে বিক্রি করে তাকে নির্বাহ করতে হয় সংসার। সুহাস-ফেকু-ইনাম– এরাও নিম্নবর্গ। সুহাসকে নারী-ভোগের জন্য বড় ভাইয়ের পকেট মারতে হয়, ইনাম ভিড়ের মধ্যে মানুষের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে, ফেকুকে দু'টাকা জোগাড় করতে গলদঘর্ম হতে হয়। টাকা নেই বলে ইনাম যেতে পারে না রুকুর ঘরে– এসবই বলে দেয় ওই চরিত্রগুলোর অবস্থান নিম্নবর্গে। লক্ষণীয়, এসব ক্ষমতাহীন পুরুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে নারীর কাছে। নিম্নবর্গের সমাজবাস্তবতায় নারী যে আরো নিম্নঅবস্থানে, তারা যে 'তলের তল' (bottom of the bottom), সে-কথা রুকু কিংবা তার মায়ের অবস্থা ও অবস্থান দেখে অনুধাবন করা যায়।[২৫]

গল্পটিতে সামূহিক অবক্ষয়ের অন্তরালে নারীর প্রতি পুরুষের অধিকারবোধ ফলানো বা নারীকে অবলীলায় ভোগের সহজাত প্রবৃত্তি পাঠককে এই সত্যে উপনীত করে যে :

পুরুষ-প্রধান সমাজ নারী নির্যাতনে যে খারাপ কিছু আছে তা মনে করে না। ... বয়স, স্থান, কাল নির্বিশেষে সকল নারী বস্তুত নির্যাতনের সম্ভাব্য লক্ষ্য। ... পুরুষ নির্যাতন করার অধিকারী এবং নির্যাতন সহ্য করা নারীর কর্তব্য, এই বোধ জাগ্রত করে নারীকে প্রতিবাদ বা প্রতি আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও সংস্কার নারীর মধ্যে হীনমন্যতা সঞ্চার করেছে, সে নির্যাতনকে আত্মস্থ (internalise) করে নিয়েছে।[২৬]

ফলে গল্পটি কেবল সাতচল্লিশ পরবর্তী সময় ও পরিপার্শ্বের নিদারুণ অবক্ষয়ের বস্তুনিষ্ঠ দেশচিত্রটিকেই উন্মোচন করে না বরং একই সঙ্গে সমাজের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার নির্মম-মাত্রাটিকেও প্রতিবিম্বিত করে তোলে। উদ্বাস্তুর কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় থাকে না। তার একটাই পরিচয় বাস্তু হারিয়েছে সে। এই পর্বের গল্প ‘পরবাসী’ বা ‘মারী'তেও উঠে এসেছে দাঙ্গার উন্মত্ততা বা উদ্বাস্তু জীবনের নির্মম ছবি। ‘পরবাসী’ ও ‘মারী’ গল্পের মধ্যে উন্মোচিত দাঙ্গা-কবলিত মানুষের মর্মন্তুদ জীবনালেখ্যর মধ্যে বিপর্যস্ত নারী-জীবনের করুণ ইতিবৃত্তটি খুব স্বল্প পরিসরে বিবৃত হলেও এরই মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতার এক বীভৎস নারকীয় অসহ সময়ের চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। দাঙ্গার ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপণ্নতার বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের দাঙ্গা-পরবর্তী নাজুক অবস্থার স্বরূপটি অনুধাবন করা যেতে পারে এভাবে :

> ক. দল ছেড়ে প্রাণপণে ছুটল বশির। বাড়িটা ততক্ষণে পুড়ে শেষ। ওরা চলে গেছে। বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের সাত বছরের ছেলেটা। ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ কালো একখণ্ড পোড়া কাঠের মত পড়ে আছে ভাঙা দগ্ধ ঘরে। কাঁচা-মাংসপোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী। (‘পরবাসী’, AvZ!Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৪৫-১৪৬)

> খ. হলঘরভর্তি মানুষ— বুড়ো যুবক মাঝবয়সী শিশু তরুণী যুবতী আর অকথ্য গোলমাল। কাঁথা, দুচারটে শুকনো কাঠ, এক আধটা শানকি— একটি সংসার। হলঘরে কুড়িটি পরিবার— নফর গুনে এলো— রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, গল্প, রোগের সেবা, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো সব চলছে। ... হুড়মুড় দৌড় লাগিয়ে তিরিশ বছরের তরুণী প্রায় ওপরে পরে পাশের ঘর থেকে এসে, কই কে দুধ দিচ্ছে? আমার বাচ্চাটার জন্যি— মতলেব ধমক লাগায়, দুধ লাফাচ্ছে! (‘মারী’, AvZ!Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৬৫-১৬৬)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে দাঙ্গা-পরবর্তী অস্থির ও অনিশ্চিত জীবনে বিপর্যস্ত মানবতার মধ্যে নারীর অবস্থা যে আরো বেশি মাত্রায় করুণ ও বিপন্ন হয়ে পড়ে— সে-বিষয়টিই শিল্পিত হয়েছে। বশিরের ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবতী স্ত্রীর কয়লার মতো দগ্ধ শরীর কিংবা অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যেও সমস্ত সংকোচ ও লজ্জা ভুলে যেতে বাধ্য হয়ে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো নারীর বিব্রত ও অসহনীয় অবয়বে কিংবা দুধের জন্য পাগলপ্রায় মাতৃহৃদয়ের হাহাকার প্রকারান্তরে গল্পদুটির মধ্য দিয়ে যে কোনো যুদ্ধ বা দাঙ্গাকবলিত পরিস্থিতিতে নারীর অধিকতর শোচনীয় বাস্তবতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের চেতনাকে আলোড়িত করে অসহ সময় ও সমাজবাস্তবতার সেই নিদারুণ অভিধা : ‘রাজনীতিতে যা দেশভাগ-পার্টিশন— মানুষের কাছে তা হলো ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া, শিকড় ছিন্ন হওয়া, চেনা প্রতিবেশীর পর হয়ে যাওয়া, স্বজনবন্ধুর চোখে নিজেই সন্দিহান হয়ে পড়া, একটা দেশ বা জাতির ইতিহাসে এর চেয়ে কঠিন অভিজ্ঞতা, এর চেয়ে বড়ো বেদনা আর কিছু হতে পারে না।’[২৭] আলোচ্য গল্পগ্রন্থের ‘সারা দুপুর’, ‘অন্তর্গত নিষাদ’ ও ‘উটপাখি’

Dhaka University Institutional Repository

গল্পগুলোর পটভূমি সমাজ জীবনের ব্যাপক অবক্ষয়, সংসারের নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা থেকে ছিটকে-পড়া মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও এর অন্তরালে সমকালের সর্বনাশের অসহ, বীতশ্রদ্ধ জীবন-পরিপার্শ্বের নির্মম বাস্তবতা। 'সারা দুপুর' গল্পের কিশোর কাঁকনের বিমর্ষ আত্মা অন্তর্গত নিঃস্বতা ও একাকিত্বের বোধতাড়িত। মা-বাবার স্নেহবঞ্চিত নিঃসঙ্গ কিশোরের মনোজাগতিক রূপান্তর ও উন্মূল সত্তার সমান্তরালে দ্যোতিত হয়েছে রিক্ত শীতের সর্বগ্রাসী শুষ্কতা, দাদুর মৃত্যুযাত্রা এবং মা-বাবার অবৈধ যৌনার্তির অনিবার্য-প্রতিক্রিয়া। বিদ্বেষ এবং ঘৃণা চেতন-অবচেতনে কিশোর মনে গভীর দ্বন্দ্ব-সঙ্কটের সৃষ্টি করে এবং ভার সইতে না পেরে এক পর্যায়ে আত্মহননের পথে এগিয়ে যায়। 'অন্তর্গত-নিষাদ' গল্পের 'লোকটা/মানুষটা' একদিন জীবনের সব রং সুখ আবেগ দুঃখ যন্ত্রণা ও স্বপ্নময়তা বিসর্জন দিয়ে ঝুলে পড়ে কড়িকাঠে। লোকটির কোনো নাম গল্পে উল্লেখ নেই। 'লোকটা' অথবা 'মানুষটা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। নাম নেই, অর্থাৎ : 'নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি নয়, নাম অনুচ্চার্য রেখে কেবল ব্যক্তিমানুষের বৈশিষ্ট্য উল্লেখের মাধ্যমে ব্যক্তিক বোধ উপনীত হয়েছে সামষ্টিক চেতনায়।'[২৮] ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জাগতিক বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি 'উটপাখি' গল্পের লেখকের রক্তস্রোতে সংমিশ্রিত করে দেয় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো মৃত্যুবোধ। লেখকের মাংসে রক্তে শিরায় কোষে সঞ্চারিত হয়ে যায় জীবনের প্রতি অসম্ভব বিতৃষ্ণা। প্রকৃতপক্ষে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্তূপীকৃত অবক্ষয়, অসহিষ্ণুতা, হঠকারিতা ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত প্ররোচিত করে বিষণ্নতা, বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাশ্যের অনিশ্চিত গন্তব্যে। আলোচ্য গল্পগুলোর কতিপয় উদ্ধৃতি অবক্ষয়পীড়িত, অসহ সময়-বাস্তবতায় নারী-জীবনের অধস্তন অবস্থা ও সমাজে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কের স্বরূপটিকে অনুধাবনের নিরিখে স্মরণযোগ্য :

> ক. অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁকনের ইচ্ছে হয় মরে যেতে। মাগি খুব খারাপ কথা, ছি ছি করার মতো কথা? নাকি খারাপ জিনিশ? আব্বা একটা মাগির সঙ্গে চলে গেছে? ... কাঁকন নিজেদের ঘরে এলো, ঘরের ছায়ায় বিছানায় ফরশা একটা মানুষ শুয়ে, মায়ের কোলে তার মাথা, মা ওর চুলের ভেতর আঙুল চালাচ্ছে, তারপর মা তার মাথা নামিয়ে আনে। মা বিষণ্ন চোখে কাঁকনকে দেখল, বলল কাঁকন কাউকে কিছু বলবে না। ('সারা দুপুর', AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৫৩-১৫৪)

> খ. বিকট চিৎকার চালায় সে, কোথায়? চা দাও শিগগির। মহিলা বেরিয়ে এলেন। নির্বোধ মুখে বিস্ময় সেঁটে আছে। ... লোকটা আবার নির্বিকার মুড়ি চিবোয়। অকস্মাৎ স্ত্রী রণচণ্ডী সেজে বালক-বালিকাদের অবিরত পিটোচ্ছেন। ('অন্তর্গত নিষাদ', AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৫৯-১৬০)

> গ. আমি আর কাউকে খুঁজে পেলাম না, কবিতা, দর্শন কোন কিছু আমাকে কিছু দিতে পারল না। ... মনে হলো তুমি আমাকে কিছু দিলেও দিতে পারো। ... তাঁর চোখের তীব্র আলোর সামনে ভয় পেয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপতে থাকে মেয়েটি। ... এসব কি বলছ তুমি? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। আমরা কেউ চাইনা তুমি এখানে আসবে। ওঘরে সে বসে আছে। এখুনি হয়তো আসবে এখানে। কি ভাববে তোমাকে দেখলে? ... লেখক হাসতে

> হাসতে বলেন, সংসার পাতছ, না? মেয়েরা আর কি করতে পারে? ('উটপাখি', AvZ!Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৭৮-১৭৯)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে আমরা নারীর নানামাত্রিক জীবন-জটিলতাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। 'সারা দুপুর' গল্পে লক্ষণীয় কাঁকনের বাবা একটা 'মাগি' নিয়ে ভেগে যেতে পারে, সমাজের সকলেই সেটা জানে এবং অনেকটা স্বাভাবিক আচরণ-প্রবণতা হিসেবেই বিষয়টিকে অভ্যস্ত দৃষ্টিতে বিবেচনা করে। কিন্তু কাঁকনের মায়ের ক্ষেত্রে একই অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একধরণের দ্বিধা বা সংকোচ কাঁকনের মায়ের বিষয়টি গোপন রাখতে কাঁকনকে অনুরোধের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অচরিতার্থ যৌন-কামনার জৈবিক তাড়নায় নারী-পুরুষ উভয়েই তাড়িত হলেও এক্ষেত্রে সমাজ নারীর জন্য গোপনীয়তার অনুশাসনটি জোড়ালোভাবেই বলবৎ রেখেছে। এ বিষয়ে নারীর যে দ্বিধা-সঙ্কট তা পুরুষতন্ত্র-প্রসূত সমাজবাস্তবতায় নারীর অসম সামাজিক অবস্থানটিকেই মূর্ত করে তোলে। 'অন্তর্গত নিষাদ' গল্পে নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকা 'লোকটি/মানুষটি' যেন প্রবল পৌরুষ শক্তি অনুভব করে ঘরে ফিরে স্ত্রীর প্রতি কর্তৃত্বসুলভ আচরণের মধ্য দিয়ে। বাইরে যে পুরুষ হীনম্মন্যতায় ভোগে, তাকেও দেখা যায় ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে স্ত্রীর উপর হম্বি-তম্বি করতে বা উঁচুগলায় স্ত্রীকে অবদমিত করে রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠতে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় এ অতি পরিচিত দৃশ্যপট যা প্রকারান্তরে সমাজে-পরিবারে নারীর প্রতি উপেক্ষার ভাষাটিকেই প্রতিবিম্বিত করে তোলে। 'উটপাখি' গল্পেও নারীর উপায়হীনতা ও সমাজ-প্রসূত প্রথাগত ভাবনায় নারীর চিত্ত-সঙ্কটের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষণীয়। একসময়ের প্রেমিক লেখক মেয়েটির বাসায় এলে দারুণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিব্রত বোধ করে মেয়েটি। ঘরে স্বামীর উপস্থিতি মেয়েটিকে রীতিমতো সংকোচে ফেলে দেয়। 'মেয়েরা আর কি করতে পারে?' এ বাক্যের মধ্য দিয়ে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপায়ণের ক্ষেত্রেও নারীকে যে সমাজ-পরিবারের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়, যদিও ক্ষেত্রটি পুরুষের জন্য ঠিক একইরকম সঙ্কুচিত নয়, সংসারের দায়িত্ববোধের যূপকাষ্ঠে জলাঞ্জলি দিতে হয় একান্ত ব্যক্তিক চাহিদা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে– গল্পটিতে মেয়েটির বিব্রত বোধের প্রসঙ্গটি পাঠককে সমাজবাস্তবতায় নারীর অধস্তন ও অসম অবস্থানের স্বরূপটিকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সুখের সন্ধানে' গল্পটি সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের বিবাহিতা কঙ্কুমের সবকিছু পেয়েও কি যেন না-পাওয়ার যে অস্বস্তি তারই অসুস্থতাকে নিয়ে লেখা। গল্পটিতে দেখা যায় প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যও শেষ পর্যন্ত কুঙ্কুমকে সুখের সন্ধান দিতে পারে না। সবকিছু পেয়েও সে শুধু সুখের নাগাল পায়নি তাই নয়; অহেতুক বিষাদের করাল ছায়া ধীরে ধীরে তাকে কিভাবে গ্রাস করে ফেলেছে– তারও খুঁটিনাটি চালচিত্র গল্পে বিধৃত হয়েছে। যদিও গল্পটিতে এর কার্যকারণ শৃঙ্খলার কোনো প্রত্যয়গ্রাহ্য পরিচয় পাওয়া যায় না তবুও বলতে হয় যে, কুঙ্কুমের বিষাদের ভাবকল্পটিই আলোচ্য গল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কঙ্কুমের বিষাদগ্রস্ততার স্বরূপটিকে অনুধাবনের প্রয়োজনে গল্পটির কতিপয় উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

ক. নিজেকে দেখে ফিরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করে ক্লান্ত হয়ে বাইশ বছরের কুঙ্কুম এখন বিরক্ত হয়েছে। কারণ তার কাছে কিছুই ধরা দেয় না। দুঃখ না। সুখ না। অথবা তারা আসে এবং দ্রুত চলে যায়। সে হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের দিকে। কিন্তু বিশ্রী লাগতে থাকে। সেই যন্ত্রণাটা উঠে আসে। ফাঁকা ফাঁকা লাগে বুকের কাছে। ('সুখের সন্ধানে', AvZ¦Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৮০)

খ. চমৎকার খাট, স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, বই-এর র‍্যাক ইত্যাদি যা কিছু কুঙ্কুমের প্রায় স্বপ্ন ছিল বলা চলে সেই সব এনে ঘর সাজিয়ে বাইশ আর সাতাশ বছরের দুটি যৌবন মূলধন করে সুখে জীবন কাটানোর আয়োজন হল; কিন্তু এসব আয়োজনের প্রত্যেকটির মধ্যে– যেমন বাক্স-পেঁটরায় জমা প্রত্যেক দিনের ধুলো, চালের টিন, বিস্কুটের কৌটো এই সবের মধ্যে সারাজীবন কাটানোর ক্লান্তির বীজ প্রবেশ করল। পোকার মত কুরে কুরে গর্ত করে চলল অলক্ষ্যে। ('সুখের সন্ধানে', AvZ¦Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৮১-১৮২)

গ. যখন বড় হলাম স্বপ্ন দেখতে শিখলাম। কলেজে পড়ার সময় এবং আশ্চর্য, যে স্বপ্ন দেখেছি সব সত্যি হয়েছে। রাজীবকে পেয়েছি, সচ্ছলতা পেয়েছি, শোবার ঘরে যা যা ভেবে রেখেছিলাম সব আছে– কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় যে সুখ ছিল, কাজে খেটে গেলেও সেই স্বপ্ন আমাকে আজ আর সুখ দিতে পারছে না। ('সুখের সন্ধানে', AvZ¦Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৮৩-১৮৪)

ঘ. যখন কেউ সুখে থাকে সেই খবর সে জানে না, কারণ সুখ এমন একটা জিনিশ যার সম্বন্ধে তুমি সচেতন থাকলে সে উবে যায় এবং সময়– মানে বর্তমান আর কি– প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে ঢুকে পড়ে, দাঁত বসায়, ফেড়ে ফেলে। ('সুখের সন্ধানে', AvZ¦Rv I GKwU Kiex MvQ, iPbvmsMn-1 : ১৮৩)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে কুঙ্কুমের সুখ নামক সোনার হরিণের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অস্বস্তিবোধ, তার সবকিছু পাওয়ার পরেও তীব্র বিষাদময়তার স্বরূপটি বোঝা গেলেও এর কার্যকারণ সম্পর্কে এক ধরনের জিজ্ঞাস্য পাঠকের মনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় কুঙ্কুমের মতো অগণিত নারীর সন্ধান পাওয়া যাবে যারা প্রতিনিয়ত না-পাওয়ার অজানা বিষাদকে হৃদয়ে ধারণ করে ক্রমাগত রক্তাক্ত হয়ে চলেছে। সমাজবাদী সাহিত্যিকদের মতে : 'ব্যক্তিজীবনের বিষাদ একধরনের ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়। তাঁদের মতে, এ-ব্যাধির মূল নিহিত রয়েছে অসুস্থ সমাজ জীবনের কেন্দ্রলোকে। ব্যক্তিজীবনকে সমষ্টি-স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেই এ-ব্যাধির জন্ম হতে পারে।'[২৯] অথবা আলোচ্য গল্পে কুঙ্কুম নামক নারীর এহেন বিষাদগ্রস্ততার স্বরূপটিকে অসহ-সময় পটভূমিতে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

পণ্য-উৎপাদক পুঁজিবাদী জগতে মানবিক সত্তার চরম অবমাননা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের যান্ত্রিকায়ন, শ্রম-বিভাজন, স্বাতন্ত্র্যচেতনা, কঠোর বিশেষজ্ঞায়ন, ক্রমবর্ধমান আত্মকেন্দ্রিকতা, জাগতিক পরাভব– এসব প্রবণতা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে মানুষ অনিবার্যভাবে নিপতিত হয় একাকিত্বের গভীর গুহায়। এ অবস্থায় সমাজস্থ প্রতিটি মানুষই নিরতিশয় একাকিত্ব, গভীর অনিশ্চয়তা, তীব্র উৎকণ্ঠা ও দুর্মর নিঃসঙ্গতাবোধে আক্রান্ত হয়ে পরস্পর থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন, এবং এভাবে কেটে যায় সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সঙ্গতির সুর-তাল-লয়।[৩০]

আলোচ্য গল্পের কুঙ্কুম নামক নারী-চরিত্রের অবয়বে প্রতিফলিত হয়েছে বিরূপ-কঠোর সমাজবাস্তবতায় ব্যক্তির অসহ বিচ্ছিন্নতাবোধের সেই নিদারুণ প্রতিচ্ছবি।

Rxeb N‡l Av¸b

হাসান আজিজুল হকের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ Rxeb N‡l Av¸b[৩১]। এ গ্রন্থে আছে মোট তিনটি গল্প– 'শোণিত সেতু', 'খাঁচা' ও 'জীবন ঘষে আগুন'। বাস্তবতার অনুষঙ্গে জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, সময় ও সমাজের ব্যবচ্ছেদ করা হাসান আজিজুল হকের শিল্পস্বভাবের নিগূঢ় দিক। জীবনের কর্কশ অভিজ্ঞতার ওপর প্রলেপ বুলিয়ে চলতে অনভ্যস্ত হাসান আজিজুল হকের গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে আগুনপোড়া রাঢ়ের ঝলসানো তাপ, লাল কঙ্করের রূঢ়তা। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পগ্রন্থের মধ্যেও লক্ষণীয় যে : 'অনেকান্ত প্রেক্ষাপট, বিচিত্র মানুষ এবং তাঁদের জটিল মিশ্র জীবন হাসানের গল্পের প্রতিপাদ্য।'[৩২] আলোচ্য গল্পগ্রন্থে রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণে লেখক যেমন প্রবেশ করেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনমূলে তেমনি নির্মোহ তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন পরিবর্তিত সমাজ ও সময়-স্বভাবকে। সময় ও সমাজ-বিধৃত নরনারীর দুর্মর অস্তিত্বের স্বরূপটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গল্পগুলোতে যেমন প্রতিভাত হয়েছে তেমনি কখনোবা সরল বর্ণনার অনবদ্য আবেদনে উন্মোচিত হয়েছে মানবচরিত্রের বহুমাত্রিকতা। এরই সমান্তরালে সময়, সমাজ ও মানব-অস্তিত্বের বিচিত্র টানাপোড়েনে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে নারী-জীবনের নানামাত্রিক জীবন-অভিধা।

'শোণিত সেতু' গল্পটির সমগ্র বলয়ে জীবনের সুনিপুণ আলেখ্য তিনটি সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একদিকে মানিক ও অবলাকান্ত নামক দুটি ষাঁড় পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ। অন্যদিকে দরিদ্র নিশানাথ দিনরাত লড়াই করে চলেছে ক্ষয় রোগ তথা আসন্ন মৃত্যুর বিরুদ্ধে এবং এরই পাশাপাশি শহর থেকে আগত চতুর ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে গ্রামের নিঃস্ব দরিদ্র নিম্নবিত্ত চাষিশ্রেণি লিপ্ত হয়েছে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে। লক্ষণীয় যে : ' 'শোণিত সেতু' গল্পে ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনা ত্রিভুজের তিনবাহুর মতো বিস্তৃত হলেও অভিন্ন চেতনায় ও তাৎপর্যে তারা একাত্ম। কাহিনিবৃত্তের অন্তঃগর্ভে প্রতীকের এই সমান্তরাল বহমানতা এ গল্পের বিন্যাস-কৌশলে এনেছে অভিনবত্ব।'[৩৩] তিনটি পৃথক ভিন্নধর্মী ঘটনার অবতারণা করা হলেও আন্তরসূত্রে তারা সমচেতনাসম্পন্ন এবং নিগূঢ় ঐক্যে কেন্দ্রীভূত। এক অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ ও প্রতিস্পর্ধায় রোধ করার প্রচেষ্টা গল্পটিতে শিল্পিত হয়েছে। তিনটি সংগ্রামের পরিপূর্ণ ও নিটোল চিত্রের মধ্যে কোথাও পরাভবের দৈন্য নেই– আশ্চর্য অমেয় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ী করে তুলেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে : 'সংগ্রামত্রয়ের অন্তর্গত-অনুপ্রেরণার ভাব-সত্য গল্পটির সমগ্র পরিসরে বৈপ্লবিক আমেজ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।'[৩৪] গল্পটির মধ্যে সামূহিক অবক্ষয় ও মানবতার দুর্মর প্রতিজ্ঞা ও অজেয়

প্রাণশক্তির ব্যাপক পরিচয়ের সমান্তরালে বিধৃত নারী-জীবনের এক বিশেষ দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি নিবন্ধিত হয়। নিশানাথের অসুস্থতা ও মৃত্যু আশঙ্কার চিত্রটি গল্পে যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে তাতে একই সঙ্গে সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতাটুকুও আভাসিত হয়েছে এভাবে :

> একই মায়ের পেটের একটি চমৎকার ভাই ছিল নিশানাথের। সামান্য একটু দোষ ছিল তার। বউকে বড্ডো পিটোত। আর কাঁচা পয়সা যা পেত মদ গাঁজা ভাঙ খেয়ে ফুঁকে দিত। ভাইটিকে বড্ডো ভালোবাসত সে। অদ্ভুত ব্যাপার এই, এজন্যে মার খেত নিশানাথের বউ। নিশানাথ ভাইকে ভালোবাসবে আর মার খাবে নিশানাথেরই বউ– কারণ ভাইটা সব উড়িয়ে দিচ্ছে অথচ তার বিরাট সংসারটিকে টানতে হচ্ছে নিশানাথকেই একথাটা বলায় দোষের কি আছে বোকা বউটা কোন দিন বুঝতে পারল না।' ('শোণিত সেতু', Rxeb N‡l Av¸b, iPbvmsMn-1 : ২১১)

লক্ষণীয় যে, নিশানাথের ভাইয়ের বউ এবং নিশানাথের বউ– উভয় নারীই স্বামী কর্তৃক নিদারুণভাবে নিগ্রহের শিকার। এমনকি গল্পের মধ্যেও বিষয়টি সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে একেবারেই নিতান্ত মামুলি একটি বিষয় হিসেবেই যেন উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক মূলত সমাজসত্যকে বিধৃত করেছেন। ফলে আর দশটা প্রাত্যহিক প্রবণতার মতোই যেমন, ভাত খাওয়া, গোসল করা, ঘুমানো, কিংবা দৈনন্দিন যে কোনো আচরণের মতো নারী-কে তথা স্ত্রী-কে প্রহার করাও যে নৈমিত্তিক একটি কাজ, পুরুষ এহেন আচরণের মধ্য দিয়েই নিজের অক্ষমতা আড়াল করে রাখে এবং ফাঁপা, অন্তঃসারশূণ্য পৌরুষ-শক্তিতে তৃপ্ত বোধ করে। এ কথা তো অনস্বীকার্য যে :

> পুরুষ প্রধান সমাজ নারীনির্যাতনে যে খারাপ কিছু আছে তা মনে করে না। স্ত্রীকে প্রহার মানবতা-বিরোধী, এমন অপরাধবোধ স্বামীর কদাচিৎ থাকে। ... সবল স্ত্রী রুগ্ন অক্ষম স্বামীর হাতে মার খেয়েও প্রতিঘাত করে না, কারণ সে মনে করে স্বামীর কাছ থেকে প্রহার তার প্রাপ্য। স্বামীর গঞ্জনার জবাব দেওয়া স্ত্রী বেয়াদব মনে করে। ... কে নারীকে নির্যাতন করে? জনাব পরিষ্কার– পুরুষ; বয়স, ধর্ম, বর্ণ, নরগোষ্ঠী নির্বিশেষে পুরুষ।[৩৫]

গল্পটিতে খুব সামান্য পরিসরে হলেও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে চিরন্তন নারী-নিগ্রহের বাস্তব স্বরূপটিকে জীবনঘনিষ্ঠভাবে শিল্পিত করা হয়েছে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদের কারণে ১৯৪৭ সালে যে দেশভাগ, উপমহাদেশ ভেঙে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারত-পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক পালাবদল, তার যাতাকলে পিষ্ট মানুষ-পরিবার আর পরিবেশের সরাসরি ধারাভাষ্য হাসান আজিজুল হকের 'খাঁচা' গল্পটির ক্যানভাস। অম্বুজাক্ষ-সরোজিনীর পরিবার ভারতে যাবে বাড়ি-সম্পত্তি বিনিময় করে– প্রস্তুতি চলছে; এর মধ্যে ঢুকে পড়ে কিছু পারিবারিক সঙ্কট আর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপারাদি। এভাবেই গল্পের গঠন ও অগ্রগমন। সেতারবাদক বা বলা চলে বাদ্যযন্ত্র প্রেমিক অম্বুজাক্ষ সংসারের চাপ সামলাতে গিয়ে হোমিওপ্যাথির খপ্পরে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সঙ্গীতের সংযোগ থেকে। সংসারের নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা থেকে ছিটকে-পড়া মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কটকে প্রতীকায়িত করতে গিয়ে গল্পটিতে এরকম আবহ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, নির্জন বারান্দা, ঘুমন্ত পায়রা,

শূন্য ঘরগুলো, রুগ্ন খুকির মতো বড়ো বড়ো চোখ, বাড়িতে সর্পরাজের আগমন ও তার দংশনে সরোজিনীর পুত্র অরুণের অপমৃত্যু, তক্ষকের অহেতুক ডাক, হাজার হাজার শেয়ালের চিৎকার, কালিপ্রসন্নের পক্ষাঘাতে বিপন্ন হওয়া এবং সারাজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ঢেলে তেতো কান্নার রোল তোলা প্রভৃতি কথামালা ও চিত্রের অন্তরালে হাসান আজিজুল হক হিন্দু-মুসলমানকেন্দ্রিক দেশভাগ ও দেশত্যাগের মানবিক কষ্টগুলোকে সাজাতে চেয়েছেন গল্পের কাঠামোয়। কিন্তু সমস্ত ভাবনার আড়ালে গল্পটিতে লেখক সমকালের সর্বনাশের চিত্রটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। মানুষ যেন সব স্বপ্নের মৃত্যু ঘটিয়ে কেবল মরণের পথে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে কেবল অন্ধকারের হাতছানি, ভারত অনেক বড়ো দেশ অনেক সম্ভাবনা; তারপরও বাংলাদেশের মাটির গন্ধ আর মায়া ছেড়ে যেতে মন সায় দেয় না অম্বুজাক্ষের। পাঁচ সন্তানের জননী সরোজিনীর মনও খুব একটা টানে না। সর্বোময় একটা অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা সরোজিনীর চেতনাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখে। দেশত্যাগের সময়টাতে তথাকথিত নিরাপত্তা-শান্তি-স্বস্তি প্রভৃতির দোহাই দেওয়ার অজুহাতে একটি হিন্দু পরিবারের বাংলাদেশ না ছাড়ার অভিপ্রায়, গভীর মনোবেদনা ও আর্তি শিল্পিত হয়েছে অম্বুজাক্ষের জবানিতে :

> আমরাও যাব। আমরাও যাব। বাজে। বুকের মধ্যে। এই সব পরিত্যাগ করে, এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে। সজল আকাশ, ঠাণ্ডা বাড়ি, পুকুরঘাট, শাদা পথ, লতার মিষ্টি গন্ধ, জমির শেখ, পদ্মপিসী এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওঠা। নতুন আলোয় চোখ রেখে। সেই নীল পর্বতশ্রেণী, উদ্রিক্ত সমুদ্র চেতনায় দোলে। আমরাও যাব।'('খাঁচা', Rxeb N‡l Av¸b, iPbvmsMn-1 : ২৩৭)

অম্বুজাক্ষ-সরোজিনীরা দেশ ছাড়তে পারে না। বাবা কালিপ্রসন্নের অসুস্থতাকে অজুহাত হিসেবে গল্পকার পাঠকের কাছে উপস্থাপন করলেও এ বাস্তবতাকে কোনোক্রমেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না যে : 'ততোদিনে সবকিছুর অবসান হয়ে গেছে–– স্বপ্ন-সেতারের সুর, দাঁড়াবার লাঠি, পথ দেখাবার হারিকেনের আলো– সব!'[৩৬] ফলে সরোজিনীর আশা-ভালোবাসা দিয়ে নির্মিত স্বপ্নসৌধ নিমেষের মধ্যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লে ক্ষোভে, দুঃখে সরোজিনী যেন উন্মাদ প্রায় হয়ে ওঠে। দেশভাগ ও দেশত্যাগের প্রাক্কালে বিমূঢ় ও অসহায়-স্বপ্নহীন মানুষের বিপণ্নতা ও অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটকে আলোচ্য গল্পে সরোজিনীর বিক্ষুব্ধ চিত্তের সংবেদনে রূপায়িত করা হয়েছে এভাবে :

> এই সময়ে বিকট আওয়াজ করে সেতারের খোলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেলে অম্বুজাক্ষ চোখ মেলে সরোজিনীকে দেখতে পায়। সে তখন হাতের ছোট লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হারিকেনটা তুলে নিয়েছে। সেটা চুরমার হয়ে গেলে সরোজিনী অম্বুজাক্ষের দিকে এগিয়ে আসে। অম্বুজাক্ষ বার বার চেঁচায়, মিনতি করে, সরোজিনী, আমাকে নয়, আমি নই। ('খাঁচা', Rxeb N‡l Av¸b, iPbvmsMn-1 : ২৪৭)

নির্বিবাদী এক-একটি পরিবারের ধাপে ধাপে ভাঙন এটাই যেন এ সময়ের বাস্তব ছবি। আর এই অধঃপতিত সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়েও নবোদিত সূর্যের আশায় মানুষ কঠোর, আপসহীন সংগ্রাম করে যায়, স্বপ্ন দেখে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সরোজিনী চরিত্রের অবয়বে সেই স্বপ্নের প্রতিচ্ছবিটি প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পে; একই সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় জর্জরিত মানবাত্মার রক্তাক্ত ও বিদীর্ণ চিত্তের স্বরূপটিও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে সরোজিনীর ক্ষুব্ধ প্রতিমূর্তির আদলে। আলোচ্য গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে : 'দেশবিভাগ প্রসূত সামাজিক আবহকে ছোটগল্প নামক শিল্পরূপে যেভাবে হাসান আজিজুল হক বেঁধে রাখলেন তাতে তিনি সত্যি সত্যিই সময়ের প্রহরী, এবং আমাদের সমাজমানসে এক জাগ্রত বিবেকের নাম।'[৩৭] আলোচ্য গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'জীবন ঘষে আগুন' একটি বিরাট আকারের ছোটগল্প। গল্পটির পটভূমি পশ্চিম বাংলার খরা-কবলিত ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রাঢ় অঞ্চলের গ্রামসংলগ্ন একটি মেলা। গল্পটির কাঠামো ও পরিপ্রেক্ষিত আঞ্চলিক হলেও এর মৌল প্রতিপাদ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর পতন। হলকর্ষণের মহোৎসবকে কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ নরনারী বাৎসরিক মেলায় সমবেত হয়। রাঢ়বাসীর দৈবনির্ভর জীবন, দারিদ্র্য, মহাজনী শোষণ, মেলার বিচিত্র চালচিত্র, চাকলা মহাপূণ্যভূমিতে নরবলিদান, বাবুশ্রেণির প্রতি বাগদি জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রভৃতির রূপায়ণে গল্পটি অনবদ্য শৈল্পিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাঢ় ভূখণ্ডের বৈচিত্র্যময় জীবনপ্যাটার্ন, দুর্ভিক্ষ-মারী-অনাবৃষ্টিজনিত দুঃসহ পরিবেশ এবং বাবুশ্রেণির সামন্তবাদী ভোগ-শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় মানুষের বিক্ষোভের রূপায়ণে এ গল্পের ঔপন্যাসিক বিস্তার ঘটেছে। লেখকের সর্বজ্ঞতা দিয়ে কাহিনির দৃশ্যপট উন্মোচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বয়নে গল্পটি প্রান্তিক চরিত্রসমূহের যৌথ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত এ গল্পের কাহিনি ঔপন্যাসিক আয়তনে বিস্তার লাভ করলেও এতে কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র এমনকি এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। গল্পের প্রতিটি প্রান্তিক চরিত্র নিজস্ব ভঙ্গিতে উজ্জ্বল এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র খণ্ড প্রান্তিক চরিত্র নিয়েই গড়ে উঠেছে কাহিনিবৃত্ত। গল্পটির বিচিত্র পরিসরে :

> কখনো কখনো কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ অপেক্ষা প্রান্তিক চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু জোরালো হয়ে ওঠে এবং প্রান্তিক চরিত্রের চেতনাকোণ-উৎসারিত আলোয় উদ্ভাসিত হয় গল্পের ঘটনা ও কাহিনিবলয়। ... চরিত্র কিংবা লেখকের সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দুর কারণে গল্পের আভ্যন্তর টেকস্ট বিকাশ লাভ করে, উন্মোচিত হয় চরিত্রের প্রচ্ছন্ন মনস্তত্ত্ব।[৩৮]

গল্পটির অন্তর্মূলীয় ভাবসত্যের অবয়বে উন্মোচিত হয়েছে রাঢ় বঙ্গের ভূমিহীন তেতুঁলে বাগদিদের যন্ত্রণাকাতর জীবনের বঞ্চনা ও অসহায়ত্বের ইতিবৃত্ত। যুগ যুগ ধরে এই সব ভূমিহীন মানুষের জীবনে ধর্মের কাহিনিসমূহ বাঁচার অধিকার আদায়ের চেতনাকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে থাকে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ। সেই কারণেই ঐসব ক্ষুধিত বাগদি ক্ষুধার তাড়নায় একসময় ভণ্ড ধর্ম প্রচারকের বিরুদ্ধে গর্জন করে ওঠে। নধরকান্তি আয়েসী-বাবুদের অসংযত যৌন লালসা, যা সামান্য কিছু মুদ্রার বিনিময়ে সহজেই চরিতার্থ হয়– বাগদিদের মধ্যে তার প্রবল প্রতিক্রিয়াকে সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গে আলোচ্য গল্পে সুনিপুণ ভঙ্গিতে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জীবনের অন্তর্দাহ ও বিস্ফোরণকে যেমন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত

মনে হয়েছে তেমনি ঘণ্টাবাবু ও বাগদিদের অসহায়-দরিদ্র কালী নামের মেয়েটির মধ্যকার যৌন-বাসনার ভোগলিপ্সু চিত্রটি গল্পটিতে নারী-জীবনের বঞ্চনা ও হতাশাখিন্ন বিপণ্নতার বিশেষ মাত্রাটিকেও উন্মোচিত করেছে সমাজবাস্তবতার নিরিখে। গল্পটিতে বিধৃত কতিপয় উদাহরণে সমাজে বিদ্যমান নারীর অসম অবস্থান ও নারীর প্রতি নির্যাতনের মর্মন্তুদ আলেখ্যটি প্রতিভাত হয়েছে এভাবে :

ক. ছোটনোকের হাতে জল খেঁলে জাত যাবে যি গঁ তুমার। বুলছো কি– আঁ? তাইলে ছোটজাত মানুষ বটে বুলছো– আরি বাবারে বাবা। ছোটজাতের জলে দোষ নাই বটে, বাহারি বাহা! ছোটজাতের আর কিসে দোষ থাকতে নাই বল দিকিনি বাবু? ... ছোটজেতের সবেতেই দোষ। তবে একটোতে বোধহয় দোষ নাই– কি বলো বাবু? ছোটজেতের মিয়েতে দোষ নাই। ঠিক কতা লয়, বাবু। মিয়েগুলো খায় না দায় না, তেবু তাদের গতর হয় ধাড়ি শুয়োরের মতো, লয়? ভারি মজার কতা বটে! মেয়েমানুষটির হাসি এতক্ষণে ফাটলো। ... দুটো ট্যাকা দিতে হবে মোকে। তার কমে হবে না। একটি ক্ষতির ক্ষোভ যুবকটির বুকে আঘাত করে, তার হৃৎপিণ্ড ধ্বকধ্বকায়, কারণ পিঙ্গলার বরাদ্দ আধুলিটি তার ট্যাঁকে আলাদা করাই ছিল! ... যুবকটি হেসে উঠে বলে, তাই নিবি যা। এখন চল, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ('জীবন ঘষে আগুন', Rxeb N‡l Av¸b, iPbvmsMn-1 : ২৬৯-২৭০)

খ. মেয়েটি অবশ্য খুবই ক্ষিপ্র, সে চোখের নিমেষে একটি ছেঁড়া চটের পর্দা টেনে দেয়। ... চটের ওপাশেই চপাৎ চপাৎ ভক্ষণের আওয়াজ– গলনালি অতিক্রমকারী খাদ্যস্রোত ফুঁড়ে ব্যক্তিটি আঁকুপাঁকু অস্ফুট শব্দগুলি বাইরে চালান করে, লরক, লরক। লরকে যাবি তু– কুনো বাপ আটকাইতে পারবে না তুকে– তু মাগী সোয়ামীর ছামনে লাং নিয়ে এলি গঁ– ই কি সব্বোনাশ। ভগবান শালা, তু কি দেখিস গঁ– আঁ? তু শালাও কি আমার মতুন চিৎপটাং শুয়ে মেগের ভাত গিলচিস? এই সব অভিশাপের পর আবার চপাৎ চপাৎ ভক্ষণের আওয়াজ ওঠে। ('জীবন ঘষে আগুন', Rxeb N‡l Av¸b, iPbvmsMn-1 : ২৭১-২৭২)

গ. এমনি মনে হয়েছিল যে মেয়েটি ক্রমান্বয়ে ডুবছে আর ভাসছে। ... দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে তুর মা দেখচিস লিকিন্ মা মেগো বজ্জাৎ– এই বলে কালী সম্পূর্ণত নিরাবরণ হয়েছিল। অচিরেই সে ঘরের বদ্ধ বায়ুতে সঘন নিশ্বাস বাজে, কোনো বিকট ছায়া মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয়– বিপরীতে দুটি হাত এমনি মুষ্টিবদ্ধ যে কণ্ঠের অজস্র শিরায় নির্মম টান পড়ে– দুই দন্তপঙ্‌ক্তি পরস্পরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়– একটি মাংসের শরীর শুকনো কাষ্ঠে পরিণত হয়। ('জীবন ঘষে আগুন', Rxeb N‡l Av¸b, iPbvmsMn-1 : ২৭২)

ঘ. এসবেতেই চরম বিশৃঙ্খলা– সেজন্যে কাউকে বলতে হয়, সবই আক্রা গঁ– শুধু মেয়েমানুষ শস্তা, লয়? ... উরি বাবারি বাবা, কি ভংকর বেপার বটে। মাঘের ধানে খরা পেরোয় না, ই বাদে আবার বাবু মশাইদের মিয়েমানুষ চাই–। ... আহা রি, ই পোড়া দ্যাশে কাজ নাই, এখানে অন্ন নাই, ভদ্দরনোকে ভাত ছিটিয়ে মেয়েমানুষ ন্যাংটো করবে গঁ– আঃ হায় হায় রি! ('জীবন ঘষে আগুন', Rxeb N‡l Av¸b, iPbvmsMn-1 : ২৭৪-২৭৭)

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলিতে নারী-জীবনের অবর্ণনীয় নিগ্রহ এবং বঞ্চনা-অসহায় ও বিরূপ সামাজিক অবক্ষয়পীড়িত সমাজবাস্তবতায় নারী যে আরও বেশিমাত্রায় অবহেলিত ও পদদলিত– সেই দেশচিত্রটি বস্তুনিষ্ঠতার আলোকে শিল্পিত হয়েছে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখার যে প্রবণতা এর অন্তরালে নারীর মানবিক সত্তা ও আবেদন খারিজ হয়ে যায়। যে কোনো শ্রেণিতে, যে কোনো সমাজে নারীকে তাই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় পুরুষের ভোগলিপ্সা ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে। ঘণ্টাবাবু কালীকে ভোগ করার লালসায় অর্থ খরচ করে, অন্যদিকে কালীর দেহ বিক্রিত অর্থের বিনিময়ে আহার জোটে তার অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর। ঘণ্টাবাবু এবং কালীর স্বামী– এই উভয় পুরুষের কাছেই কালী স্বীয় স্বার্থপূরণের মাধ্যম হয়ে ওঠে, উভয় ক্ষেত্রে কালীর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপমৃত্যু ঘটে। এভাবেই সমাজ নারীকে উপায়হীন, সহায়হীন করে তোলে যেখানে : 'তার আর্থ-সামাজিক জীবন সীমাবদ্ধ বা শূন্য হয়ে পড়ে, পরিসর যায় সংকুচিত হয়ে। পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। নারীর জীবন পুরুষের তুলনায় তাই অধস্তন।'[৩৯] কেবল কালী নয়, সমাজে অগণিত নারীকে উপায়হীন হয়ে কালীর মতোই অপাঙ্‌ক্তেয় জীবনের গ্লানিকে আত্মস্থ করে নিতে হয়। এ গ্লানি থেকে নারীর কোনো নিষ্কৃতি নেই, কেননা : 'নারীর দেহসৌষ্ঠব তার নিজস্ব, কিন্তু পুরুষ তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের ভোগের বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে। ... যৌন মিলনে নারীর ভূমিকা গৌন; নিজের সন্তুষ্টি নয়, পুরুষের সন্তুষ্টি বিধান নারীর যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য। পুরুষ নারীকে উপভোগ করবে, তার স্বার্থে ব্যবহার করবে– এটাই নারীর নিয়তি।'[৪০]

bvgnxb †MvÎnxb

হাসান আজিজুল হকের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ bvgnxb †MvÎnxb[৪১]। এ গ্রন্থের পটভূমি লেখকের অন্যান্য গল্পগ্রন্থ থেকে অনেকটাই আলাদা। আলোচ্য গ্রন্থের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত হয়েছে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের নানাবিধ মর্মবিদারী ইতিহাস। প্রত্যেকটি গল্প হয়ে উঠেছে বাস্তবতার এক অনবদ্য সামাজিক দলিল। গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো যথাক্রমে 'ভূষণের একদিন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', 'আটক', 'ঘরগেরস্থি', 'কেউ আসে নি' এবং 'ফেরা'। আলোচ্য : 'সাতটি গল্পের সমগ্রতায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও সমাপ্তিকে হাসান বাস্তবের আলোকে ধারণ করতে চেয়েছেন।'[৪২] সাতটি গল্পের সমগ্রতায় বাংলাদেশের একাত্তর সালের শুরু থেকে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত ঘটনাগুলো লেখকের প্রাতিস্বিক চিন্তানুভূতির দর্পণে ধরা পড়েছে। গল্পগুলোর মধ্যে চারটি গল্প মূলত গ্রাম কেন্দ্রিক। সেগুলো হচ্ছে 'ভূষণের একদিন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', 'ঘরগেরস্থি', ও 'ফেরা'। বাকী তিনটি গল্প মূলত শহরকেন্দ্রিক। গল্পগুলি হচ্ছে, 'নামহীন গোত্রহীন', 'আটক' ও 'কেউ আসে নি'। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ, যা আমাদের শহর ও গ্রামের মানুষের সম্মিলিত সাহসিকতা ও আত্মদানের রক্ত লেখায় রঞ্জিত, তার মাহাত্ম্য ও ব্যাপক গৌরব কেবল দৈশিক সমাজজীবনে সীমাবদ্ধ নয়, বৈশ্বিক

প্রেক্ষাপটেও তা এক অবিস্মরণীয় ইতিহাসের মর্যাদায় দীপ্যমান। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের কোনো গল্পই কাল্পনিক ভাবকল্পে গড়ে উঠেনি বরং গ্রন্থটিকে ইতিহাসেরই শিল্প-ভাষ্য বলা যেতে পারে। এও বলা যেতে পারে যে :

> হাসানের নামহীন গোত্রহীন' গল্পগ্রন্থের ঘটনা মূলত ইতিহাসাশ্রিত– ইতিহাসের আলোকিত পথ ধরেই তাঁর পরিক্রমণ। ...এ-ইতিহাস বাঙালিদের উপর পাক সরকারের বর্বোরোচিত আক্রমণের ইতিহাস– এ-ইতিহাস সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার ইতিহাস। এতে স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা আছে, আছে ব্যর্থ-স্বাধীনতার তিক্ততম উপলব্ধি।[৪৩]

'ভূষণের একদিন', 'নামহীন গোত্রহীন' ও 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পত্রয়ের পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর কালরাত্রি থেকে বর্বর দখলদার পাকবাহিনী অতর্কিত নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে গণহত্যার পাশাপাশি যে নারীনির্যাতন চালিয়েছিলো তারই জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তবতাকে অবলম্বন করে। 'ভূষণের একদিন' গল্পটিতে পাকিস্তানি সৈন্যর সঙ্গে বাঙালিদের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার অব্যবহিত পরের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তখন এপ্রিল মাস। জাত চাষী ভূষণের ঘরে খাবার নেই, তাই সে বেরিয়েছিলো কোন কাজের খোঁজে। মল্লিক বাড়িতে বেড়া বাঁধার কাজ করছিলো সে, এমন সময় তিনজন যুবক বন্দুক হাতে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। কথাবার্তায় তারা ভূষণকে বুঝিয়ে গেলো যে পাকিস্তান আর থাকছে না– পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালিদের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে এবং ঐ যুদ্ধে বাঙালি স্বাধীন হবেই। কিন্তু ভূষণ যুদ্ধের কোনো খবরই রাখেনা– তাই সে অবাক হয়। ভূষণ হাটে গিয়ে টের পেলো দেশ পাকিস্তানি সৈন্যের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন। হাটের অসংখ্য মানুষের মতোই পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে ভূষণ ও তার ছেলে হরিদাস নির্মমভাবে নিহত হলো। 'নামহীন গোত্রহীন' গল্পের নায়ক 'সে'। দেশের অভ্যন্তরে তখন বাঙালি হত্যার পাশবিক অনুষ্ঠান চলছে। 'সে' ট্রেন থেকে নেমে একটি শহরের রাস্তায় রাস্তায় পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বোরোচিত হত্যালীলা, নির্মক্ষিক জনপ্রাণীহীন শহরের নিস্তব্ধতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে শেষ পর্যন্ত জ্যোৎস্নালোকিত রাতে মাতালের মতো টলতে টলতে তার একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। 'মমতা' এই নাম ধরে 'সে' অনেক ডাকাডাকি করলেও কেউই সাড়া দিলোনা। ডাকলো ছোট ছেলে 'শোভন'কে। কিন্তু ঘরে ও বাইরে জমাট নিস্তব্ধতা। একসময় একটা জং ধরা কোদালে তার পা ধাক্কা খেলো। সে তার জুতো জোড়া, তার কোট, তার শার্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং এরপর তার 'শিরাবহুল পেশল হাতে' সে কোদালটি তুলে নেয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে মাটি কোপাতে আরম্ভ করে। যতই কোপাতে থাকে ততই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে মানুষের শরীরের নানাবিধ অস্থি, দীর্ঘ একরাশ চুল, একটি ছোট্ট হাতের অস্থি এবং সবশেষে বেরিয়ে এলো একটি করোটি, যেটা তার স্ত্রী মমতারই করোটি সে বিষয়ে 'সে' নিশ্চিত হলে একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ও কষ্টবোধের তীব্রতা তাকে জড়িয়ে ধরলো অক্টোপাসের মতো। পরবর্তী গল্প 'কৃষ্ণপক্ষের দিন'। রহমান, জামিল, মতিয়ুর, শহীদ ও একরাম– এরা পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটা বিল অতিক্রম করার সময় এদের পাঁচজনের বিচিত্র অনুভূতি দেশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। পাকসেনারা হিন্দু ও

মুসলমানকে কিভাবে নির্বিচারে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, বিভিন্ন পটভূমিতে সে সম্পর্কে তারা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এক সময় তাদের মাত্র চৌদ্দ বছরের সঙ্গী একরাম পাক সৈন্যের গুলিতে নিহত হলো। তারা মরা জ্যোৎস্নালোকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় গঞ্জ-সংলগ্ন একটি এলাকায় জিরিয়ে নিচ্ছিলো। এমন সময়, হয়তো কোনো রাজাকারের গোপন ইঙ্গিতে তারা পাকিস্তানি সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। নদীর কিনারায় তাদের চারজনকে নিয়ে যাওয়া হলো। শত্রুপক্ষের সৈন্যদের একজন প্রথমে গুলি করলো রহমানকে– মাত্র দুহাত দূর থেকে। তারপর শহীদকে এবং সবশেষে মতিয়ুরকে। জামিল এতক্ষণ সবই দেখলো দাঁড়িয়ে থেকে এবং তার দিকে রাইফেল তাক করার সঙ্গে সঙ্গেই সে সৈন্যটির তলপেটে প্রচণ্ড একটা লাথি বসিয়ে বিদ্যুৎবেগে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রুপক্ষীয় কয়েকজন সৈন্য জলের মধ্যে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়েও তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়। গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের ওপর নেমে আসা পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়াবহ পাশবিকতার চিত্র যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি এই পাশবিক অত্যাচারের খড়গ কীভাবে নারী-জীবনের তিক্ততম জঘণ্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে সে ইতিবৃত্তও বিধৃত হয়েছে বাস্তবতার অনুষঙ্গে। কত বীভৎস ও বিকৃতভাবে যে বাঙালি নারীদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, কত অসংখ্য নারী যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেদের মান-সম্মান, ইজ্জত এবং সর্বোপরি জীবন হারিয়েছেন– তারই মর্মান্তিক আলেখ্য বিধৃত হয়েছে গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে। নির্যাতন কেবল পাক আর্মির সিপাহি ও অফিসাররাই করেনি, বাঙালি রাজাকার এবং অবাঙালি বিহারী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ নির্মম নির্যাতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলো। নির্যাতিত হয়েছে শহরের মেয়েরা যেমন, তেমনি গ্রামের মেয়েরাও। ধনী-গরিব, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকল শ্রেণির পরিবারের মেয়েরাই নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আলোচ্য গল্পগুলোর কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> ক. একটানা শব্দ উঠলো কট্ কট্ কট্ কট্। তখন ভূষণ দেখলো গোড়া কেটে ফেললে গাছ যেমন তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ে, মানুষ তেমনি করে মাটিতে পড়ছে। ... আশি বছরের বুড়ি বুলেটে চুরমার হয়ে যাওয়া বুক অগ্রাহ্য করে কোমরে ছেঁড়া কাপড়ের কষিটা আঁটবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ... চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে তার কালো কুতকুতে বাচ্চা কোলে তেঁতুলগাছের দিকে এগিয়ে এলো। ঠাস করে একটি শব্দ হলো। মেয়েটি বাচ্চার মাথায় হাত রাখে। ভূষণ দেখে মেয়েটির হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত আসছে– শেষে রক্ত-মেশানো সাদা মগজ বাচ্চাটার ভাঙা মাথা থেকে এসে তার মায়ের হাত ভর্তি করে দিলো। মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো, বাচ্চার মুখের দিকে চাইলো, পাগলের মতো ঝাঁকি দিলো তাকে কবার– তারপর অমানুষিক তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাচ্চাটাকে; দুহাতে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেললো তার ময়লা ব্লাউজটাকে। তার দুধেভরা ফুলে-ওঠা স্তন দুটিকে দেখতে পেল ভূষণ। সে সেই বুক দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মার হারামির পুত, খানকির পুত– এইখানে মার। পরমুহূর্তেই পরিপক্ক শিমুল ফলের মতো একটি স্তন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ছিটকে এসে সে পড়ল তেঁতুলতলায়।

আক্রোশপূর্ণ ভয়শূন্য চাউনি নিয়েই সে মরে রইল। ('ভূষণের একদিন', bvgnxb †Mv‡ÎnxÎb, iPbvmsMÖn-1 : ৩০১-৩০৩)

খ. অতি দ্রুত একটি জিপ এসে ঘ্যাঁস করে ব্রেক কষে বড় রাস্তার উপরেই থেমে গেল। সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্ত্রীলোকের গোঙানি শুনতে পেল। লোকটা তখন তার বুকের ভিতর খুব একটা কষ্ট অনুভব করল। ... ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠলে একজন বিজাতীয় মানুষের নিষ্ঠুর মুখ এবং একটি মুখবাঁধা স্ত্রীলোকের অবয়ব হঠাৎ দেখে ফেলল। সে এগিয়েই যাচ্ছিল– তক্ষুণি কেউ লাফ দিয়ে জিপে উঠল এবং তীব্র গতিতে সেটা চলে গেল।... সে লাল চওড়া বারান্দায় চুপি চুপি উঠে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মোলায়েম গলায় ডাকল, মমতা আছো? মমতা? কেউ সাড়া দিল না। ... সে তার শিরাবহুল পেশল হাতে কোদাল তুলে নিল। দুবার তিনবার নাক আর মুখ থেকে হ্যাঁক হ্যাঁক করে আওয়াজ বের করে উঠোনে কোপ দিল সে। ... একে একে উঠে আসছে হাতের অস্থি, হাঁটুর লম্বা নলি, শুকনো সাদা খটখটে পায়ের পাতা। দরদর করে ঘাম ছুটছে তার সমস্ত দেহ থেকে। ... খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট্ট হাত পেয়ে গেল, সেটাকে তুলে আপনমনেই লোকটা বলল, শোভন, শাবাশ। তারপর উঠে এলো দীর্ঘ চুলের রাশ, কোমল কণ্ঠাস্থি, ছোট ছোট পাঁজরের হাড়, প্রশস্ত নিতম্বের হাড়– তারপর একটি করোটি। খুলিটা হাতে নিয়ে সে ওটার চোখের শূন্য গহ্বরের দিকে চেয়ে রইল। ফাঁকা মুখগহ্বরের ভিতরে নিঃশব্দে বিকট হাসি হাসল করোটি। ('নামহীন গোত্রহীন', bvgnxb †Mv‡ÎnxÎb, iPbvmsMÖn-1 : ৩০৯-৩১৩)

গ. এতক্ষণে নজরে পড়লো অশথ গাছটা ভর্তি হয়ে আছে শকুনে, কালচে ধূসর রঙের স্তূপে ঢাকা রয়েছে গাছটা। আশেপাশে নিশ্চয়ই মরা লাশ আছে। কদিন আগেই তো রাজাকারদের নিয়ে এখানে এসেছিলো পাক আর্মির একটা দল। হয়তো কোনো রেপ্‌ড্ মেয়েলোক পড়ে আছে ওখানে। ... পাঁচজন চেয়ে দেখে, যে গাছের নিচে তারা আশ্রয় নিয়েছিলো সেখানে অসংখ্য মানুষ এসে জমেছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধদের পরিষ্কার দেখতে পেল তারা। মেয়েরা বাচ্চা বুকে করে, বুড়োরা কাঁপতে কাঁপতে এসে পশুর মতো হুমড়ি খেয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে পড়ছে। পরনের কাপড় পর্যন্ত ফেলে এসেছে কেউ কেউ, কিছু উলঙ্গ নারী আর বৃদ্ধ চোখে পড়লো। ('কৃষ্ণপক্ষের দিন', bvgnxb †Mv‡ÎnxÎb, iPbvmsMÖn-1 : ৩১৯-৩২২)

ঘ. পুব-দক্ষিণ কোণের দিকে তিনজনে মিলে একটি মেয়েমানুষকে ন্যাংটো করছে। তার সরল ঊরু দুটি বেড়িয়ে পড়লো, তামাটে রঙের বিশাল তলপেট রোদ পড়ে চকমকিয়ে উঠলো কিন্তু জামিল শত চেষ্টা করেও তার চোখ দুটি দেখতে পেল না। কারণ দীর্ঘ কালো চুল তার মুখ ঢেকে ফেলেছে। একটি সৈন্য তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে খানার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শিকারের টুটি-কামড়ানো বাঘের মতো সৈন্যটির মাথা নড়তে লাগলো, পাগলাটে অমানুষিক হাসি ভেসে এলো, তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার সব শব্দ ছাপিয়ে তীরের মতো বাতাস কেটে চলে গেল। ('কৃষ্ণপক্ষের দিন', bvgnxb †Mv‡ÎnxÎb, iPbvmsMÖn-1 : ৩২৩)

ঙ. উলঙ্গ মানুষ আকাশের দিকে আঁকশির মতো পা উঁচিয়ে আছে আর প্রায় সবাই চেয়ে রয়েছে। রাস্তার পাশে খানার অল্প জলকাদার মধ্যে উলঙ্গ মেয়েমানুষটির মুখ আর চোখ দেখতে পায় নি জামিল। মেয়েমানুষটি মরে পড়ে রয়েছে, তার যোনি বেয়নেট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা। যে দীর্ঘ কেশরাশি দিয়ে সে আবরণ তৈরি করতে চেয়েছিলো, তারই ফাঁকে

ফাঁকে তার বিশাল নগ্ন নিতম্বদেশ জামিল দেখতে পায়– ফুটিফাটা লাল মাংসের ফাঁকে ফাঁকে শাদা চর্বিও তার চোখে পড়ে। ('কৃষ্ণপক্ষের দিন', bvgnxb †Mvî nxb, iPbvmsMn-1 : ৩২৫-৩২৬)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি-নারীর উপর নেমে আসা বর্বরোচিত নির্মম পাশবিকতার সত্যনিষ্ঠ চিত্রায়ণ। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া বাংলার লক্ষ লক্ষ পরিবারের নারীরা পাকবাহিনীর হাতে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছে তা কেবল গল্পে বর্ণিত কাহিনির পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং গল্প অতিক্রম করে এ যেন অসহায় নির্যাতিত অগণিত বাঙালি নারী-জীবনের তিক্ততম নিগ্রহের গল্প হয়ে উঠেছে। এ বাস্তবতা তো আমাদের অজানা নয় যেখানে : 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে হানাদার পাকসেনাদের দ্বারা প্রায় ১৪ লক্ষ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী-পুত্র-কন্যা বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন।'[৪৪] তাছাড়া গল্পগুলোর মধ্যে বিধৃত নারী-নির্যাতনের করুণ, বীভৎসতার চিত্রায়ণ পাঠককের চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধের নির্মম ও পাশবিক ইতিহাসের মুখোমুখি করে তোলে যেখানে :

অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত নিউজ ম্যাগাজিন 'পিক্স'-এর তথ্য অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা এদেশের তিন লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়েছেন। জনৈক ব্রিটিশ চিকিৎসক ডাঃ ম্যালকম পটস জানান যে, বাংলাদেশের মাত্র তিনটি জেলাতেই ১২ হাজার ধর্ষিতা হতভাগিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। ২ নভেম্বর ১৯৭২ যুদ্ধ অপরাধ তদন্ত এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য থেকে এও জানা যায়, পাকিস্তানিদের নয় মাসব্যাপী ত্রাসের রাজত্বকালে বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক নারী নির্যাতিতা হয়েছেন। সে সময়ের মানবতাবাদী গবেষক ডঃ জিওফ্রে ডেভিস বলেছেন, বাংলাদেশে ধর্ষণের ফলে প্রায় দু'লক্ষ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মধ্যে এক লক্ষ ৭০ হাজার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্থানীয় গ্রাম্য ধাত্রী বা হাতুরে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটান এবং বাকী ত্রিশ হাজারের মধ্যে অধিকাংশই সে সময় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।[৪৫]

ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য বিবরণীতে নারী-নির্যাতনের যে চিত্র পাওয়া যায় অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালি নারীদেরকে কতভাবে কত উপায়ে কত বিকৃতভাবে নির্যাতন করা হয়েছে– তারই সচিত্র প্রতিবেদন আলোচ্য গল্পগুলো। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'ঘরগেরস্থি', 'কেউ আসে নি', এবং 'ফেরা' গল্পত্রয়– স্বাধীনতা পরবর্তী নিঃস্ব বাংলাদেশের এক মর্মান্তিক আলেখ্য। নয় মাসের প্রচণ্ড যুদ্ধ আর রক্তপাত শেষে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল বাংলাদেশ। কিন্তু মাতৃভূমি থেকে ছিটকে পড়া ছিন্নমূল মানুষগুলো দেশে ফিরে যখন কঠোর বাস্তবতার সামনা-সামনি হয়, তখন তারা অনুভব করে যে: 'স্বাধীনতার স্বাদ মধুর হলেও জীবন কখনো বিড়ম্বনাশূন্য নয়।'[৪৬] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণে যেমন একসময় কোনো কোনো শ্রেণি বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিলো, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোনো কোনো শ্রেণির মানুষের জন্যে রাতারাতি বয়ে নিয়ে এসেছিলো অপরিমিত বিত্তের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। জাতীয় জীবনে যে কোনো সঙ্কটময় মুহূর্তে দেখা গেছে আমাদের দেশের জনসাধারণের ব্যাপক অংশ দুর্জয় সাহস আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে সঙ্কট নিরসনের জন্যে মৃত্যুঞ্জয়ী

সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ শ্রেণির মানুষ যতোখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে এমন আর কেউ করে নি। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যখন সমাজের কোনো কোনো শ্রেণি নিজেদের মধ্যে হানাহানি শুরু করে দিলো তখন অবহেলিত ব্যাপক ঐ শ্রেণির মানুষ নীরবে দূরে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো :

> আমাদের দেশের রাজনীতিতে সমাজে নির্যাতিতশ্রেণি কোনো দিনই তাদের ন্যায্য তো দূরের কথা, তাদের ন্যূনতম অধিকার লাভেও সমর্থ হয় নি– না অতীতে, না বর্তমানে। মুষ্টিমেয় চতুরশ্রেণির আত্মসার মানুষের দ্বারা তারা বার বার প্রতারিত হয়েছে। ... একাত্তরের স্বাধীনতার বৈজয়িক উল্লাসের মধ্যে সাম্যবাদের ঢক্কা-নিনাদ শ্রাবিত হলেও সেখানে ছিলো কৌশলময় শোষণেরই দুর্বিনীত-আয়োজন।[৪৭]

একাত্তরের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের পর মানুষ, বিশেষ করে নির্যাতিত মানুষ, আশা করেছিলো যে এবারের স্বাধীনতা তাদের জন্য আনন্দোজ্জ্বল জীবনের সুবাতাস বয়ে আনবে– ঘুচবে অশিক্ষার তামসিকতা, অবসিত হবে নিদারুণ জঠর যন্ত্রণার। বাস্তবতা হলো, মানুষের জীবনে দুঃখ আরো গভীর হলো, হতাশা আরো প্রগাঢ় হলো, দারিদ্র্য হলো আরো দুঃসহ ও বেদনা-মলিন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যকার অসঙ্গতি ও মানবতার নিদারুণ বিপন্নতার বাস্তব চিত্রায়ণ শিল্পিত হয়েছে 'ঘরগেরস্থি', 'কেউ আসে নি' এবং 'ফেরা' গল্পত্রয়ের বিচিত্র পরিসরে। 'ঘরগেরস্থি' গল্পের রামশরণ, তার স্ত্রী ভানুমতী ও ছোট বড় তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ইন্ডিয়া থেকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে; উদ্দেশ্য নিজের ভিটেতে ফিরে গিয়ে আবার সুখের সংসার গড়ে তুলবে। সর্বস্ব ফেলে আসার দুঃখময় মানসিক অবস্থাকে বুকে ধারণ করে নয় মাসের প্রবাস-জীবন শেষে অনেক আশায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে রামশরণ ও ভানুমতী প্রত্যক্ষ করে চারদিকে ভয়াবহ শূন্যতা– 'কালোমাটির ভাঙা-চোরা ভিটে, আধপোড়া খুঁটি, তোবরানো এনামেলের বাটি, ভাঙা ঝুড়ি, ঝাঁটা, উনুনের মাটি আর ছাই'– এই হচ্ছে তার এতকালের পরিচিত বাস্তুভিটের পরিণতি। সঙ্গত কারণেই দুর্বল রামশরণের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর থেকে যেন আগুনের হলকার মতো দীর্ঘশ্বাসের আর্তি প্রকারান্তরে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অগণিত বেদনাহত রিক্ত-নিঃস্ব মানুষের অবর্ণনীয় হাহাকারকেই প্রমূর্ত করে তোলে। 'কেউ আসে নি' এবং 'ফেরা' গল্পের পটভূমিতে এমন দুজন মুক্তিযোদ্ধার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় যাদের একজন স্বাধীনতার পরপরই শুধু অবহেলা ও অবজ্ঞার কারণে হাসপাতালে মারা যায়। 'ফেরা' গল্পে দেখা যায় একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশের অগণিত মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার নিদারুণ ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করে দেশের বুক থেকে সুবিধাবাদী শোষকদের উৎখাত করার জন্যে মনে মনে আবার শপথ নেয়, এবং সেই কারণে সে তার অস্ত্র সরকারের কাছে ফেরত দেয় নি। উভয় গল্পেই স্বপ্নাহত মুক্তিযোদ্ধা গফুর ও আলেফ প্রবল বিক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছে। মা বউকে তথা প্রিয়জনকে ছেড়ে যাওয়ার বেদনা উপলব্ধি করেছে। তারপর স্বাধীনতার পর তারা স্বাধীন দেশে প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত

হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ভাগ্যপরিবর্তন দেখা তাদের আর হয়ে ওঠেনি। তারা অনুভবই করতে পারে না যে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ আসলে কেমন। বরং নিদারুণ অসহায়ত্ব ও অন্নভাবনার দুঃসহ যন্ত্রণা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ব্যর্থ স্বাধীনতার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের জীবন ও স্বপ্নকে ক্ষত-বিক্ষত করে চলে। গল্পগুলোর মূল প্রতিপাদ্যের সমান্তরালে নারী-জীবনের যে চিত্র প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাতেও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনার তীব্রতম হাহাকার। একক কোনো নারী চরিত্র হিসেবে নয় বরং আলোচ্য গল্পত্রয়ের নারী-চরিত্রের অবয়বে বিধৃত হয়েছে অসহ সময় ও প্রতিবেশে রিক্ত-নিঃস্ব ও বিদীর্ণ মানবতার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনার মর্মন্তুদ জীবনালেখ্য। গল্পগুলোর কতিপয় উদাহরণ এই বিরূপ সময় ও অসহ প্রতিবেশকে উন্মোচনের জন্যে অনুধাবনযোগ্য :

ক. ভানুমতী এইবারে ঝেঁজে উঠলো, কি সুখটা জেবনে পাইছো আমারে এট্টু কও তো? প্যাট ভরে খাতি পাইছো কোনদিন, পরের বাড়ি খেটে খেয়ে জেবন গেল। পোলাপানদের কোনোদিন দুটো ভালো জিনিস দিতি পারিছ– এট্টু ভালো জামাকাপড় দিতি পারিছ কও? ... ভানুমতী একটানা বকে গেল, বলো, কেমন করে তোমার মনো মরিছে? পেরথম ছোওয়ালটা কেমন বিনি ওষুধে বিনি পথ্যে মরিছে, কও? পুন্নিমে মরিছে কেমন করে? ভাবনা কি? ঠিক আবার গুছিয়ে বসবানে– বললো রামশরণ। এত সব কথার পর ভানুমতীও সাধ মিটিয়ে স্বপ্ন দেখে নিল। উত্তর পুব আর পশ্চিম পোঁতার তিনটে ঘর পরিষ্কার ঝকঝকে উঠোন ঘিরে। ছেলে বউ নিয়ে আছে একটায়, একটায় তারা নিজেরা আছে, উত্তরেরটা ফাঁকা, জামাই মেয়ে এলে ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশের বউ ভানুমতী, কতোদিন ধরে সংসার করছে– কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার ! সে কি জানে না কেমন হতে হয় সুখের সংসার? গোয়াল, গাই-গরু, হাল-বলদ, জমি-জমা, পুকুরভর্তি মাছ আর গোলাভরা ধান দূরস্থিত স্বপ্নের মতো ভানুমতীকে প্রচণ্ড আকর্ষণে টানে। ('ঘরগেরস্থি', bvgnxb †Mvînxb, iPbvmsMn-1: ৩৪৯)

খ. কিন্তু উঠে বসলো ভানুমতী, শানকি টেনে নিয়ে ভাত বাড়লো দুজনের জন্যে। ভাত বেড়ে সে চুপচাপ বসে থাকলো উদাসভাবে। ... কন্যাশোক ভুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে ভাত খেয়ে যায় রামশরণ। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে শুকনো করে তুললো ভানুমতী কিন্তু ভাতের প্রথম গ্রাসটা মুখে তুলতেই চোখ আবার ভর্তি হয়ে গেল জলে। সুবিধে হবে না বুঝে আর মুছলো না ভানুমতী, ভাতে আলাদা করে আর নুন মাখানোর প্রয়োজন হলো না তার। ('ঘরগেরস্থি', bvgnxb †Mvînxb, iPbvmsMn-1 : ৩৫২)

গ. গফুর বিয়ে করেছিলো কিন্তু বউ নেই তার। যুদ্ধের আগের বছর বউ চলে গিয়েছিলো বাড়ি থেকে। তাকে খেতে দিতে পারে নি সে। বৌটা বেঁচে আছে কি না গফুর জানে না। সেই বউয়ের জন্যে গফুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। আর তার বুড়ো মায়ের জন্যে, খেতে দিতে না পারলেও যে পালায় নি। ('কেউ আসে নি', bvgnxb †Mvînxb, iPbvmsMn-1 : ৩৫৯)

ঘ. চোখ বন্ধ করেও আলেফ ঘুমোতে পারে না, ঘুম ঘুম গলায় সে জিজ্ঞেস করে, লড়াই শেষ হয়ে গিছে জানিস? দ্যাশের কি হল ক দিনি? দ্যাশ স্বাধীন হইছে– বউ যেন মুখস্থ বললো। ... আমরা রাজা বাদশা হবো নাকি বল তো?

> বউ প্রতিবাদ করল, তা ক্যানো? রাজা বাদশা হবো ক্যানো? আমাদের দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। মানে? ভাত-কাপড় পাবানি। ... মা বলে, তোরে সরকার থে ডাকবে না? আলেফ হাঁ হয়ে যায়, সরকার আমাকে ডাকপে? ক্যানো? তোরে ডাকপে না তো কারে ডাকপে? ... তোরে একা না ডাকুক, তোরা যারা নড়াইয়ে ছিলি তাদের ডাকপে না? আমি আমার এই ভিটের চেহেরা ফেরাবো আলেফ কয়ে দেলাম আর জমি নিবি এট্টু। এট্টা গাই গরু আর দুটো বলদ কিনবি– আর–। ... আলেফের বউ কথা বলল না। এখানে থাকলি খাতি পাবি ভাবিস? হয়তো খাতি পাবি না। না পাই। আবার পালাবি না তো? না। তোর যা পেটের জ্বালা! ঠিক কচ্ছিস খাতি না পেয়ে মরে গেলেও পালাবি না? আগের মতো জোরে জোরে মাথা নাড়লে ঝরঝর করে তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে। ('ফেরা', bvgnxb †Mvînxb, iPbvmsMn-1 : ৩৭১-৩৭৪)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের মধ্য দিয়ে একটি সত্যই প্রতিধ্বনিত হয় যে, আলোচ্য গল্পগুলোতে বর্ণিত নারী-চরিত্রগুলো কোন একক বা বিচ্ছিন্ন সত্তা মাত্র নয় বরং তারা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের বৃহৎ গণমানুষের যোগ্য প্রতিনিধি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট, বিপর্যস্ত জীবন ও বিপন্ন মানবতার সকরুণ আর্তনাদ আলোচ্য গল্পগুলোতে নারী-জীবনের অবয়বে শিল্পিত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অপরিসীম ত্যাগ-তিতীক্ষা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যকার অসঙ্গতি ও টানাপোড়েনের বিচিত্র দেশচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে গল্পে বর্ণিত নারী-জীবনের ধারাভাষ্যে।

cvZv‡j nvmcvZv‡j

হাসান আজিজুল হকের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ cvZv‡j nvmcvZv‡j[৪৮]। 'মধ্যরাতের কাব্যি', 'সরল হিংসা', 'সাক্ষাৎকার', 'পাতালে হাসপাতালে' এবং 'খনন'– এই পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে cvZv‡j nvmcvZv‡j গল্পগ্রন্থে। ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে ঐ গল্পগুলি রচিত হয়েছে। প্রতিটি গল্পকেই সমকালীন বাংলাদেশের দর্পণ বলা যায়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজের অবক্ষয়, নৈরাজ্য ও হানাহানির তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে। গল্পগুলোর পটভূমি মূলত শাহরিক। বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত গল্পসমূহে লেখকের তীব্র শ্লেষে প্রকারান্তরে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে ব্যক্তিচরিত্র ও সমাজচরিত্রের বিশ্লেষণ। যে কোনো অন্তর্ভেদী লেখকের কাছেই গল্পের পটভূমি, পরিপ্রেক্ষিত অমোঘ উপকরণ হিসেবে দেখা দেয়। জীবনের পটভূমি বদলে যাবার মতোই বদলে যায় গল্পের নেপথ্য আদল। তাই দেখা যায় : 'হাসানের গল্পে ব্যক্তির চিন্তাস্রোত ও নরনারীর মনোভাবনার গীতময় বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রতীকী অনুষঙ্গের সম্পৃক্তির ফলে কাহিনির উপস্থাপনা বহুমাত্রিকতা লাভ করে।'[৪৯] cvZv‡j nvmcvZv‡j গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতেও লেখকের এই প্রবণতার প্রচ্ছাপ সুস্পষ্ট। 'মধ্যরাতের কাব্যি' ও 'সরল হিংসা' গল্প দুটোর প্রেক্ষাপট ও মাত্রার মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও প্রথম গল্পটিকে দ্বিতীয় গল্পেরই প্রস্তাবনা বা সূত্রপাত বলে মনে হয়। উভয় গল্পেই অত্যন্ত চমৎকার কৌশলে ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতির বিনিময়ে বাংলাদেশের অর্জিত স্বাধীনতার অর্থহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতার

বিচিত্র প্রাহসনিক দিকটি গভীরতর তাৎপর্যে শিল্পিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। মজুর শ্রেণি গ্রামে তাদের প্রয়োজন মতো কাজ খুঁজে পায় না, গ্রামের অধিকাংশ মানুষ হয় ভূমিহীন আর না হয় কর্মহীন মজুর শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। এর উপর আছে প্রায় প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ– যা কখনো প্রকৃতি-সৃষ্ট এবং প্রায়শই শোষক শ্রেণির অত্যধিক লাভ ও লোভ থেকে সৃষ্ট। প্রায় প্রতি বছর এইসব কারণে শুধু অনাহারে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে থাকে। নিরুপায় নিঃসহায় এই ক্ষুধাপীড়িত মানুষেরা বাঁচার আশায় পাড়ি জমায় শহরের দিকে। 'মধ্যরাতের কাব্যি' গল্পের বৃদ্ধা ও তার পনের বছরের নাতনি এবং 'সরল হিংসা' গল্পের জয়তুন, তসিরুন, টেঁপি, গোলাপি, পুষ্প– এরা সবাই গ্রামে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরেই উন্মুলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়। শহরের বিচিত্র জীবন ও পরিবেশে অসহায় উন্মুলিত এই নারীরা হয়ে পড়ে আরো বেশিমাত্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় ও আশারিক্ত।

'মধ্যরাতের কাব্যি' গল্পটি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত হয়েছে। বেলতলী নামক বাংলাদেশের এক অখ্যাত গ্রামের দুর্ভিক্ষ কবলিত এক অসহায়-নিরন্ন বৃদ্ধা তার পনের বছর বয়সের সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের আরো অনেক মানুষের মতোই ট্রেনে করে ঢাকা শহরের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। এরা আশ্রয় নিয়েছে ঢাকা শহর-সংলগ্ন রেলওয়ে স্টেশনের বিরাট প্লাটফর্মের এক কোণে। আলোয়-প্লাবিত-প্লাটফর্মে খালিপেটে কখনো বসে বসে, কখনো শুয়ে শুয়ে দাদি-নাতনি দুজনে নানারকম গল্পের মধ্য দিয়ে অতীতের সুখ-সমৃদ্ধ কিংবা বেদানভারাক্রান্ত জীবনকে হাতড়াতে থাকে। বৃদ্ধা তার ঝাপসা স্মৃতির পর্দা দিয়ে দেখতে পায় কীভাবে হালের বলদ, গোয়ালের গাই গরু এবং পুকুরের মাছ চোখের সামনে শেষ হয়ে গেলো। বৃদ্ধা অতীতের পানে তাকিয়ে দেখে পর পর একনাগাড়ে তিনদিন অনাহারে থাকার পর কাজ করতে গিয়ে তার একমাত্র ছেলে হুট করে গাছতলায় কেমন করে পড়েই মারা গেল। বৃদ্ধা শুধু তার ছেলের মৃত্যুর দৃশ্য দেখে না, বরং নাতনির স্মৃতি কাতরতায় দেখতে পায় কীভাবে তাদের গ্রামের পিয়ালু, রহিম বকশ, করিমদ্দি, আলেকজান প্রভৃতি মানুষ না খেতে পেয়ে ধড়ফড় করে একে একে মারা গেল। পনের বছরের নাতনির নাকে যেন সেইসব মানুষের মৃতদেহের পঁচা গন্ধ এসে লাগে। বিভীষিকাময় সেই দিনগুলির স্মৃতিতে যখন তারা মগ্ন হয়েছিলো তার ফাঁকে ফাঁকে বুট জুতোওয়ালার আনাগোনা লক্ষণীয়। গল্পটিতে সরাসরি কোথাও বুট জুতোওয়ালার পুরো চেহারাটা প্রত্যক্ষ করা না গেলেও আভাস-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে ঐ বুটজুতোওয়ালার রিরংসা-তাড়িত অস্থির পদচারণার গোপন অভিলাষ এবং শেষ পর্যন্ত পনের বছরের ঐ মেয়েটিকে ছিঁড়ে খাওয়ার দৃশ্য পাঠকের চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'সরল হিংসা' গল্পের পটভূমিও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও বিপন্ন মানবতার করুণ আর্তি। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই সঙ্গতিহীন হয়ে পড়েছিলো, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত

হয়েছিলো হাজার হাজার মানুষ। এ সময় সহায়-সঙ্গতিহীন মানুষ নৈতিকতা-অনৈতিকতার ভেদরেখা ভুলে বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রচেষ্টায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলো। নিম্নবিত্ত অসহায় রমণীরা বেঁচে থাকার সর্বশেষ উপায় হিসেবে পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়। সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে গল্পকার স্থূলতমভাবে বাঁচার বিষয়টি 'সরল হিংসা' গল্পে উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে বিকশিত এ গল্পে দেখা যায়, সাতদিন আগে মৃত এক শিশুর দরিদ্র মা একাধারে অন্নাভাবে পীড়িত ও স্তনদান ব্যাহত হওয়ার শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর। এক রাতে জ্বরের ঘোরে নারীলোলুপ লালসাজর্জর এক বামনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। টাকার বিনিময়ে নারীর শরীর সম্ভোগের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হলে বামনের একটু আড়াল প্রয়োজন হয়। পথের ধারে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে বামন যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হলে অন্ধকার ফুঁড়ে সাত-আটটি মেয়েমানুষের আবির্ভাব ঘটে। জয়তুন, তসিরুণ, টেঁপি, গোলাপি, পুষ্প– সকলেই নিজেকে স্থূল পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে। বামনের সাড়া না পেয়ে তার হাত পা ধরে টানাটানি করে জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে। অবশেষে তারা যেন হিংস্র বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বামনকে আঘাত করতে থাকে। সুবিধামত সর্বাঙ্গে লাথি দেয়, মাংসের মধ্যে নখ ডুবিয়ে দেয়। নগরীর দিকে তাকিয়ে তারা কলহাস্যে মেতে ওঠে। গল্পের সমাপ্তি এখানেই। গল্পের শুরুতে সন্তানহারা 'মেয়েটির'র বিষণ্নতা যা গল্পান্তেও বিদ্যমান থাকে– তা ক্ষুধাকাতরতা ও বিপণ্ন অসহায়ত্বেরই নিদর্শন। টেঁপি, তসিরুণ, জয়তুন ও গোলাপিদের বামনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াও আহার সংস্থানের উপায় হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। আলোচ্য গল্পদুটির কতিপয় উদাহরণ নারী-জীবনের নানামাত্রিক বঞ্চনা ও অসহায়ত্বের স্বরূপটিকে উন্মোচনের নিমিত্তে প্রণিধানযোগ্য :

> ক. এই সময় একজোড়া বুটের আওয়াজ কেবলই তার কাছে আসে আর দূরে চলে যায়। নাতনি হিম শানের মেঝে থেকে ঘাড় তুলে জুতোঅলাকে দেখার চেষ্টা করে। বুটের শব্দ তখন দূরে চলে যায়। অন্যদিকে বেচারা ঘাড় ফেরাতেই আওয়াজ আবার ফিরে এসে তার মগজে ঢুকে পড়ে। ('মধ্যরাতের কাব্যি', cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvmsMn-2 :১৩)

> খ. এইবার আমি মরতে যাই দাদি? ...
> হায়, আমার কপাল– বলে বুড়ি উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। বুটের শব্দ শোনা যায়। মাথার কাছে। বুড়ি নড়ে না। নাতনির ফেঁপে ওঠা পলকা শরীর। তার উপর হাত রাখতেই কণ্ঠার হাড়টি মুট করে ভেঙে যায়। সেইটিকে বেশ করে চুষে চুষে খাওয়া হলো। স্তনের মাংস এর মধ্যেই ছিবড়ে হয়ে গেছে। তার চেয়ে পাঁজরের হাড়গুলো নরম– কচকচ করে খাওয়া চলে কাছিমের হাড়ের মতো। অবশ্য একছিটে চর্বি নেই। ('মধ্যরাতের কাব্যি', cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvsMn-2 : ১৭)

> গ. সারাদিনে হামি একবার খেনু– দুধ হয়ে বেরিয়ে গেলু, তবে তো হামি আর বাঁচিম না– বসে বসে মেয়েটি আকাশ-পাতাল ভাবে। তিনটি ডাস্টবিন খোঁজা হয়ে গেছে তার, খানিক আগে নেমেছিলো এক ড্রেনে, কিছুই মেলে নি। ('সরল হিংসা', cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvmsMn-2 : ১৮)

ঘ. সে জেনেছে সংসার কেমন আর কাকেই বা বলে পুরুষমানুষ। রীতিমত কাঠখোট্টা চেহারার, মোটা হাড়-অলা, কাঁচা পিঁয়াজ রসুন মাটি আর ঘামের গন্ধভর্তি জ্যান্ত পুরুষমানুষের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। গলার কাছে দম এসে আটকে গেছে যেন মরণের আগের দশা, মটমট করে ভেঙে যাচ্ছে পাঁজর, ধুপধুপ শব্দে হৃৎপিণ্ডে ঘা পড়ছে ঢেঁকির পাড়ের মতো, আগুনের স্রোত বইছে দেহে। আপন সংসারে পুরুষের কাছ থেকে এইসব জেনেছে মেয়েটি। ('সরল হিংসা', cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvmsMn-2 : ১৮)

ঙ. বামনটি চট করে একবার টাকে হাত বুলিয়ে নেয়, তারপর বেঁটে বেঁটে গলেপড়া হাত ঢুকিয়ে এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ে কি যে সে খুঁজে বেড়ায় সে-ই জানে। ... শেষ পর্যন্ত বাঁ হাতে একমুঠো টাকা বের করে এনে সে মেয়েটির মুখের সামনে সামান্য নাড়াতে থাকে, অন্য হাতে প্রথমে মেয়েটির কাঁধ স্পর্শ করে। ফলে কি যে হয় তার এক ঝটকা মেরে মেয়েটির বুকের সামান্য কাপড়-টুকরোটা সে ফেলে দেয় মাটিতে। এরপর প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে তার ডান হাত মেয়েটির বুকে গিয়ে স্থির হয়। ... বামনের হাতের মধ্যে নোটগুলো দুমড়ে-মুচড়ে রয়েছে। মেয়েটি বলে, টাকা আগে দিমেন? ... তার হাতে টাকা দিয়ে সেই হাত আর ছাড়ে না লোকটা। সমস্ত নগর তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। এখন সে টিকিট কেটে গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। ... মেয়েমানুষ সেইখানে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে চুল ছড়িয়ে ডাকিনীর মতো হাত বাড়িয়ে কয়েকবারই বলে, কই, কুনঠে তুই? ('সরল হিংসা', cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvmsMn-2 : ২০-২১)

চ. সামনে, পিছনে, রাস্তার দিক থেকে, আলোর ভিতর দিয়ে অন্ধকার সরিয়ে মেয়েমানুষেরা এগিয়ে আসে– সাত আটটি মেয়েমানুষ। তারা এসে বামন মানুষটিকে ঘিরে ধরে। ... বামনটির দিকে তারা ঘুরে-ফিরে সেলাম ঠোকে, এই যে সায়েব, দ্যাখেন, মাত্তর এট্টা টাকা আমারে দিবেন। তালিই হইবে। এইভাবে জয়তুন, তসিরুন, টেঁপি, গোলাপি, পুষ্প ইত্যাদি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়। ... বামনকে ঘিরে উলঙ্গ মেয়েমানুষেরা দাঁড়িয়ে যায়। স্বচ্ছন্দ নির্বিকার ন্যাংটো মেয়েদের একটি দঙ্গল। এই যে সায়েব, আমরা সবাই দাঁড়াইছি আপনের ছামনে– আমাদের মধ্যে থিকা কারে নিবেন ন্যান– পসন্দ করেন একজনরে। ... সবাই মিলে চিৎ করে শুইয়ে দেয় লোকটাকে। বামন সব চেষ্টা ছেড়ে দেয়, দুহাত ছড়িয়ে দেয় দুদিকে, মেলে দেয় দুই পা যতোদূর যায়। জয়তুন দুই হাত একসঙ্গে করে তাকে ঠেঙিয়ে যায়। মেয়েরা যেখানে সুবিধে পায় সেখানেই লাথি বসায়, মাংসের মধ্যে নখ ডুবিয়ে দেয়। ... তসিরুন একা সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তার মুখের উপর দুই পা তুলে দাঁড়ায়। এইবার আপন বুকে দুহাতে দমাদম আঘাত করতে করতে সে নগরীর দিকে চেয়ে খলখল করে হেসে ওঠে। ('সরল হিংসা', cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvmsMn-2 : ২১-২৫)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অবক্ষয়পীড়িত বিরূপ সময় ও প্রতিবেশের বাস্তবচিত্রটি যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি একই সঙ্গে এই রুগ্ন-বিবর্ণ সমাজে নারীর অবস্থা যে আরো বেশিমাত্রায় পদদলিত– সেই সমাজসত্যটিও শিল্পিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষকবলিত বাংলাদেশের অস্থির সময়-প্রতিবেশে শহরের রাজপথে, স্টেশনের প্লাটফর্মে, কলোনী বা বড়ো বড়ো অট্টালিকার আশে-পাশে, ফুটপাতে, পার্কে, বস্তিতে ভাতের অভাবে গ্রাম থেকে উন্মুলিত যুবতী মেয়েমানুষের ভিড়– টাকা ছিটালেই এক, দুই, তিন যতো ইচ্ছে পাওয়া যায়। 'সরল হিংসা' গল্পের জয়তুন, তসিরুন, টেঁপি, গোলাপি কিংবা পুষ্প– এরা সবাই যেন সেইসব অসহায় নারীরই প্রতিচ্ছবি। এ সকল পতিতা নারীরা : 'গরল মেশানো সরল হিংসার পথ ধরে

টাকাওয়ালা শহুরে এক বাবুকে অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে খতম করে দিয়েছে। ... তসিরুন ও দলের অন্যান্য মেয়েদের জমাট বাঁধা দুঃখ-হতাশা ও বঞ্চনাকেন্দ্রিক যন্ত্রণাময় জীবনের বিস্ফোরণ ঘটেছে প্রতিবাদী হিংস্র ভঙ্গিতে।'[৫০] 'মধ্যরাতের কাব্যি' গল্পে বৃদ্ধার হতাশাখিন্ন মর্মের তলদেশ থেকে উচ্চারিত 'আহারে কপাল' শব্দদ্বয়ের মতো হতাশ্বাসে ভরা নিঃশ্বাস ফেলার পক্ষপাতী নয় 'সরল হিংসা' গল্পের তসিরুন ও দলের অন্যান্য মেয়েরা। নারী নিয়ে তামাশা করা টাকাওয়ালা মানুষের জন্য শহর-নগর যেন অভীষ্টিত সেই স্বর্গ সেখানে পয়সার বিনিময়ে নারীকে পণ্যের মতোই খুব সহজে বেচাকেনা যায়। নারীলিপ্সু সেইসব টাকাওয়ালা ক্ষমতাবান বিবেকবর্জিত মানুষদের বিরুদ্ধে 'মধ্যরাতের কাব্যি' গল্পের বৃদ্ধা ও তার নাতনি কিছুই করতে পারে নি– তারা না-পারলেও 'সরল হিংসা' গল্পের তাদেরই শ্রেণিভুক্ত জয়তুন, তসিরুন প্রভৃতি পতিতা নারীরা নিজেদের অবস্থান থেকে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। অনিবার্যভাবেই তাই দেখা যায় :

> উদরের জন্য তাদের যৌনতাকে, তাদের নারীত্বকে, তাদের মনুষ্যত্বকে বিক্রি করতে হচ্ছে বলে,সমস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের যে অসচেতন ক্রোধ, সেই ক্রোধের আক্রোশেই তারা বামন খরিদ্দারটিকে আক্রমন করে। যে জান্তব বাঁচার স্তরে তাদের মনুষ্যত্ব নেমে এসেছে তাদের প্রতিরোধে তারা এক হিংস্র মুক্তির স্বাদ পেয়ে যায়।[৫১]

যদিও প্রতীকী প্রতিরোধ সম্পন্ন হলেও এ থেকে মুক্তির উপায় তাদের জানা নেই, তবুও বলা যেতে পারে নারীর যৌনতা অবলম্বিত হলেও ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিরোধের ঘটনাটি গল্প-বিষয়কে মহত্ব ও বিশিষ্টতা দান করেছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যাঁরাই শাসন ক্ষমতায় এসেছেন তাঁদের সবাই সদম্ভে প্রচার করেছেন যে তাঁরা দেশে অভিনব বিপ্লব ঘটিয়েছেন। যদিও একথা সুস্পষ্ট যে : 'এসব বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভেজাল বিপ্লবের মহড়া ছাড়া অন্য কিছু ছিলো না, তাই ওসবের দ্বারা বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে শুধু বর্ণাঢ্য প্রহসনই তৈরি হয়েছে। মানুষকে শুধু প্রতারণাই করা হয়েছে। বৃহত্তর দরিদ্র জনসাধারণের জীবনকে ঐ সমস্ত ভেজাল-বিপ্লব মারাত্মকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে।'[৫২] সময়ের প্রয়োজনেই বিপ্লবের মুখোশ পরে যারা জনগণকে ধোঁকা দেয় ও ক্রমাগত বোকা বানিয়ে চলেছে, সেই সব মুখোশধারী বিবেকবর্জিত ক্ষমতাবানদের শক্তির উৎস ও স্বরূপটিকে উন্মোচনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় হাসান আজিজুল হকের 'খনন' গল্পটির অবয়বে। মরহুম জিয়াউর রহমানের খাল খননের মধ্য দিয়ে দেশে তথাকথিত সবুজ বিপ্লব ঘটাবার যে আয়োজন ও উন্মাদনা, তা নিয়ে এক শ্রেণির সুবিধাবাদী মানুষের মধ্যে যে প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা– তারই চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও অন্তঃসারশূন্যতার সমাজচিত্রটি আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'খনন' নামক গল্পের মৌল বিষয়। দুজন সাংবাদিক– শাহেদ ও মুনীর সংবাদপত্রে খাল খনন সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে মফস্বল শহর থেকে দূরে এক গ্রামে হাজির হয়েছেন। সেখানে তখন বারো মাইল লম্বা এক খাল খননের কাজ পুরোদমে চলছিলো। পাঁচটা তাবু, একটাতে সমানে সারাক্ষণ কলের গান বাজাবার ব্যবস্থা, আর একটায় সাড়ম্বরে খাল খননের মাহাত্ম্য প্রচারের ব্যবস্থা। কেবল তাই নয় খাল খননকে কেন্দ্র করে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনও ছিলো চোখে পড়ার মতো। দশদিন ধরে

কাজ চলছিলো। শাহেদ ও মুনীর এ আয়োজন ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এক দালাল টাইপের লোকের কাছ থেকে খাল খনন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জেনে নিতে থাকে। একে একে কথোপকথনের সূত্রে খাল খননের পশ্চাতে সুবিধাবাদী শ্রেণির স্বার্থ-উদ্ধারের হীন উদ্দেশ্য এবং অসহায় ও রিক্ত-নিঃস্ব জনসাধারণের বঞ্চনার নির্মম বাস্তবচিত্রটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে। খাল খননকে কেন্দ্র করে সমবেত অসহায় দরিদ্র জনগণের কাতারে এক যুবতী মেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গল্পটিতে একই সঙ্গে নারীর প্রতি সামাজিক সংকীর্ণ মানসিকতার স্বরূপটিও বিধৃত হয়েছে সমাজসত্যের আলোকে। গল্পটিতে এ প্রসঙ্গে কতিপয় উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

ক. একটি যুবতী মেয়ে ছেলে কোলে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কাপড়ে শরীরের নিচের দিকটা কোনোরকমে ঢেকেছে, কিন্তু ছেঁড়া আঁচলের ফাঁক দিয়ে তার অস্বাভাবিক স্ফীত লম্বাটে গোল, শক্ত স্তন দুটি প্রায় সম্পূর্ণ বেরিয়ে আছে। ... শাহেদ দেখলো, মুনীর কলমটা টেবিলের উপর রেখে চট করে একবার ঠোঁট চেটে নিলো। ('খনন', cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvmsMn-2 : ৬৬)

খ. একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে শাহেদ বলে, ডোন্ট বি সিলি। উল্লুকের মতো ধরে নিস না আমি মাতাল হয়ে পড়েছি। কিন্তু তোকে সত্যি বলছি আমি খুব ডিস্টার্বড়, সারাদিন শালা ডিস্টার্বড়, যে যেভাবে পেরেছে আমাকে ডিস্টার্বড় করেছে। ... ধুর শালা, একটা মেয়েমানুষ জোগাড় করতে পারলে হতো। ছি ছি আবার কি? মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ, ব্যস! ... কবে আমার বউ মরেছে জানিস? দুটো ছেলে আছে, সে হারামজাদাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমি যাই করি তাতে কার কি এসে যায়? ... তা বাবা, আমার কোনো ভয় নেই– জোগাড় করে নিয়ে এসো একটি মেয়েমানুষ। ('খনন', cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvmsMn- 2 : ৭৫)

গ. মৃদু একটি শব্দ হতে মুনীর চোখ তুলে দেখলো দরজার কাছে সেই যুবতী মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তার সঙ্গে বাচ্চাটি নেই। দরজার চৌকাঠে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বুক দুটি আগের মতোই খোলা। মেয়েটির মুখে সামান্য একটু হাসি আছে। হাসিটাও তার চেহারার মতো পরিষ্কার। ('খনন',cvZv‡j nvmcvZv‡j, iPbvmsMn-2 : ৭৫)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্য দিয়ে খাল খননের ব্যাপারটা দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে বৃহত্তর দরিদ্র জনসাধারণের জীবনে ঐ প্রকল্প যে কোনোভাবেই সুফল বয়ে আনতে পারে না, এই বাস্তবচিত্রটি যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মধ্যে নারীর অবস্থান যে আরো বেশি অসহায় ও নিম্নে– তারও জীবনঘনিষ্ঠ চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। খাল খননের সুবাদে প্রকারান্তরে সরকারি খরচে জমির মালিকেরা জমির জন্যে সেচের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে, এই সরল সত্যটি গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে। খাল খননের কাজে আসা অসহায় যুবতী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মুনীর নামক সাংবাদিকের ঠোঁট চাটার দৃশ্যটি নারীর প্রতি পুরুষের ভোগলিপ্সু আচরণের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আবার দেখা যায় শাহেদ নামক সাংবাদিককে হুইস্কি আর তেমন নেশা ধরাতে পারছে না। সামূহিক অসাড়তা থেকে মুক্তি প্রত্যাশায়, ক্লান্ত-অবসাদকে ঝেড়ে ফেলার ক্ষেত্রে নারীই

হয়ে উঠেছে তার প্রার্থিত বস্তু। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে শাহেদ যখন অবলীলায় বলে, 'আমি যাই করি তাতে কার কি এসে যায়?' কিংবা 'আমার কোনো ভয় নেই– জোগার করে নিয়ে এসো একটি মেয়েমানুষ' তখন প্রথাবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের মধ্যকার অসম বিভাজন রেখাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজের একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রত্যাশী শাহেদ যতোটা সোচ্চার কণ্ঠে মেয়েমানুষের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উচ্চারণ করতে পেরেছে, ঠিক একই পরিস্থিতিতে একই বয়সী একজন নারীর জন্য একই রকমভাবে এহেন উচ্চারণের ক্ষেত্রভূমিটি সীমাবদ্ধ এবং সংকুচিত। কেননা আমাদের সমাজে : 'পুরুষের পরদার গমন ক্ষমার চোখে দেখা হয়; কিন্তু নারীর পদস্খলন গুরুতর শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়। নারীকে হীন করে পুরুষের অধীনে অধস্তন করে রাখার জন্য নারীর চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।'[৫৩] শাহেদের সংকোচহীন উচ্চারণ নারীর সেই অধস্তন অবস্থানটিকেই প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বিত করে। এ সমাজ নারীর দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের সুযোগে তার দিকে বাড়িয়ে দেয় লালসা ও ভোগের লোভাতুর হাত। অসহায় নারী ক্ষুধার তাড়নায় এক পর্যায়ে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়– তৃতীয় উদ্ধৃতিতে যুবতী মেয়েটির অসহায় অবস্থার চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে গল্পটিতে নারীর ভাগ্যবিড়ম্বিত সেই সমাজচিত্রেরই বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে।

Avgiv A‡cÿv KiwQ

হাসান আজিজুল হকের ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ Avgiv A‡cÿv KiwQ[৫৪]। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের মোট সাতটি গল্পের বিচিত্র পরিসরে : 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতি শোষণহীন সমাজ গড়ার যে-প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল, সে-প্রত্যাশা কিভাবে এবং কতোভাবে হতাশার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে'[৫৫]– তারই চালচিত্র রূপায়িত হয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক নিষ্ঠায়। হাসান আজিজুল হকের bvgnxb †MvÎnxb এবং cvZv‡j nvmcvZv‡j গল্পগ্রন্থেও মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগের ব্যর্থতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিবেচনায় আলোচ্য গল্পগ্রন্থটি যদিও বক্তব্যের দিক থেকে সম্পূরক গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে মাত্রাগত দিক থেকে এ গ্রন্থের গল্পগুলো স্বতন্ত্র মেজাজের। Avgiv A‡cÿv KiwQ গল্পগ্রন্থের কোনো কোনো গল্পে মুক্তিযুদ্ধের শোচনীয় ব্যর্থতার স্বরূপটি তাত্ত্বিক দিক থেকে যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থে সংকলিত মোট সাতটি গল্প যথাক্রমে 'আমরা অপেক্ষা করছি', 'মিনি মাগনার চুমকুড়ি', 'হাওয়া নেই', 'মাটির তলার মাটি', 'সমুখে শান্তি পারাবার', 'পাবলিক সার্ভেন্ট' এবং 'অচিন পাখি'। মুক্তিযুদ্ধের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কীভাবে অপমৃত্যু ঘটেছে, আদর্শভ্রষ্ট, নীতিবর্জিত বিবেক কেমন করে অবক্ষয়ে বিবর্ণ ও বিরূপ স্বার্থান্বেষী পয়ে পড়েছে– তারই সচিত্র প্রতিবেদন Avgiv A‡cÿv KiwQ গল্পগ্রন্থ। 'আমরা অপেক্ষা করছি' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় আট বছর পর কোনো এক গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির তারেক ও রুনু নামের দুজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী তাদের দায়িত্ব পালনকালে রুনুর ঊরুতে

গুলিবিদ্ধ হয়। আহত রুনুকে নিয়ে তারেক শীতকালের সন্ধ্যার সময় পাকা রাস্তার কাছাকাছি বড় গাছের তলায় বসে বসে মানুষভর্তি একটা বাস পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো। অপেক্ষারত অবস্থায় তারেকের ভাবনায় আট বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন টুকরো টুকরো স্মৃতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তারেকের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অকল্পনীয় আত্মাহুতির শোচনীয় ব্যর্থতাসহ ডান-বাম মিলিয়ে দেশে যত প্রকার রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছে সুনিপুণ ব্যবচ্ছেদের ভঙ্গিতে সেগুলোর অধঃপতনের মৌল কারণ একদিকে যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি অপরদিকে বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের অঙ্গীকারকে ফলপ্রসূ করার জন্য কি কি করা প্রয়োজন তারও শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে। গল্পটিতে সরাসরি রাজনৈতিক ঘটনার ও মতবাদকে মুখ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এরই সমান্তরালে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব নারীর জীবনে কতটা বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো তারও জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে। গল্পে তারেকের স্মৃতিকাতরতায় জানা যায় মুকুল নামের, বামপন্থী রাজনীতিতে যিনি বিশ্বাসী ছিলেন না বরং তিনি করতেন বুর্জোয়া রাজনীতি, এক ভদ্রলোক এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে রুনু ও তারেকের গ্রুপের সঙ্গে সীমান্ত পার হয়েছিলেন। তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী তখন ছিলেন বাপের বাড়ির গাঁয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের যে স্থানটিতে রুনু ও তারেকের দল অবস্থান করছিলো মুকুলের স্ত্রীর গ্রামটি ছিলো তার কাছাকাছি। নিতান্ত মানবিক কারণে ঐ ভদ্রলোকটির অনুরোধের প্রেক্ষাপটে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে মহিলার বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে পশ্চিবঙ্গের সীমান্তের ওপারে আনার দায়িত্ব নিয়েছিলো রুনু ও তারেক। গল্পে তারেকের স্মৃতি রোমন্থনের ফ্ল্যাশ ব্যাকে মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকা নারীর জীবনকে কতটা বিপর্যস্ত ও মর্মন্তুদ করে তুলেছিলো তারই বাস্তব চিত্রায়ণ লক্ষণীয় নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিসমূহে :

> ক. রাজাকারবাহিনী তৈরি হচ্ছে। তারা শহরের গলিঘুঁচিতে, গাঁয়ের আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়েছে। যে কোনো মেয়ে তারা ভোগ করে। ... পাকিস্তানিরা তাদের তৈরি করেছে। আমাদের ভিতর থেকে। ... আমার মা এখনো ধর্ষিত হয় নি, আমার বোনও নয়। তোমার স্ত্রী বা বোনও নয়। কিন্তু তফাৎ কি? এই কোটি কোটি মানুষের দেশে যে কোনো মা বোন ধর্ষিত হতে পারে। হচ্ছে না হয়তো, কিন্তু হতে পারে। একটি দেশের জন্যে এর চেয়ে ভয়ানক পরিস্থিতি কল্পনা করা যায়? ('আমরা অপেক্ষা করছি', Avgiv A‡cÿv KiwQ, iPbvmsMn-2 : ৮৬-৮৭)

> খ. মহিলা হামাগুড়ি দিয়ে ছই থেকে বেরিয়ে আসতে থাকেন। নৌকো টলমল করে। বেরিয়ে এসে মহিলা দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। নৌকো আরো দুলতে থাকে। তাঁর বিশাল গর্ভ আমি দেখতে পাই। সেখানে একটি পরিণত শিশু। তার জন্য সময় আছে? সে কি বাইরে আসতে পারবে? ('আমরা অপেক্ষা করছি', Avgiv A‡cÿv KiwQ, iPbvmsMn-2 : ৮৭)

> গ. উবুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছি আমরা। আমাদের দুজনের মাঝখানে মহিলা– খুব কষ্টের সঙ্গে হেঁট হয়ে আছেন। তাঁর নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। রুনু মহিলার ঘাড়ের কাছে হাত রেখেছে, তাঁকে কিছুতেই মাথা তুলতে দিচ্ছে না।

> ... মহিলা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পাশবিক শক্তিতে রুনু হাঁড়িকাঠের জন্তুর মতো মহিলাকে ঠেসে ধরে রয়েছে। আর কোন টান নেই। বিশাল গর্ভ মাটিতে চেপে উনি উবুড় হয়ে পড়ে আছেন। ('আমরা অপেক্ষা করছি', A\gi\ A‡c¨ÿv KiwQ, iPbvmsMn-2 : ৮৮-৮৯)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ ইতিহাসের সেই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে :

> পাঞ্জাবি সেনারা প্রতিটি যুবতী মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লিপ্ত হতো। ... বর্বর পাকসেনাদের উদ্ধত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে এসেছিল; মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমড়ের অংশ পাকসেনাদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে যেত। ... বর্বর পাকসেনারা গর্ভবতী মহিলাকেও নির্মমভাবে ধর্ষণ করতো, এতে অনেককেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। বহু অল্প বয়স্ক বালিকা নরপশুদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো।[৫৬]

নারীর এ-ও এক মাত্রা। কেবল অস্ত্র হাতেই সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেই তাকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বলা যায় না বরং যে ভয়াবহ নির্যাতন ও অমানবিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এ সময়কালে নারীকে চরম বীভৎসতার মুখোমুখি হতে হয়েছে– তার মূল্য বা গৌরব কোনো অংশেই একজন মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কম নয়। এর মধ্য দিয়েই নারী অর্জন করেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের সম্মানজনক অংশগ্রহণের অধিকার। নারী এভাবেই হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য, অনিবার্য এক মহান সত্তা। পরবর্তী গল্প 'মিনি মাগনার চুমকুড়ি' গল্পের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের সামূহিক অবক্ষয়ের নিদারুণ চিত্র। হাসান আজিজুল হক কেবল উঁচু তলার মানুষের জীবনের অবক্ষয়ের স্বরূপই সন্ধান করেন নি বরং বলা যেতে পারে যে : 'সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে দারিদ্র্য কিভাবে তার থাবা বিস্তার করে তাদের জীবনকে নিদারুণভাবে ধসিয়ে দিচ্ছে, ঐ আঘাত ভদ্রতার বাহ্যিক ও সৌজন্যমূলক আবরণটাকে কতো নগ্নভাবে খসিয়ে দিচ্ছে ভিন্ন মাত্রায় তার চালচিত্রও তিনি তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পের পটভূমিতে।'[৫৭] স্বাধীনতার অব্যবহিত সময়কালে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির গড় পড়তা মানুষের জীবনের সব দিক থেকে যে দুরবস্থা লক্ষ করা যায় এবং তার ফলে প্রতিমুহূর্তে যেভাবে তারা প্রায়-পাগল না হয়েই পারে না– আলোচ্য গল্পের বিচিত্র পরিসরে ঐ শ্রেণির সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থাকে স্বল্প কয়েকটি কথার আঁচড়ে শিল্পিত করা হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ হিসেবে আলোচ্য গল্পে বর্ণিত চরিত্র শফিক যখন তার দারুণ অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী মাকে নিয়ে কোনমতে লড়াই করে বেঁচে আছে, তখন খুবই আকস্মিকভাবে দুটো সন্তান নিয়ে নিরুপায় বিধবা বোন তার ঘাড়ে এসে চেপে বসার পরে তার মাথা খারাপ না হওয়াটাকেই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। শফিকের পাগল-পাগল ভাবের পেছনে এ ধরনের ঘটনা যে কতোখানি দায়ী তা লেখকের সুনিপুণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দম আটকানো এহেন অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে গল্পটিতে তথাকথিত

ভদ্রতার সব আবরণকেই নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। পোকা ধরা আসবাব বা ঘুণে ধরা বাঁশের মতো ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া শফিক এবং বাসি ফুলের মতো প্রায় বিগত যৌবনা ঐ শ্রেণিরই বিয়ে না হওয়া মেয়ে লিলির মধ্যকার বিয়ের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে গল্পটিতে প্রকারান্তরে বেঁচে থাকার অর্থশূন্যতাকেই প্রকট করে তোলা হয়েছে। গল্পে বিষয়টি বিধৃত হয়েছে এভাবে :

> হলদে আলোয় শফিক মেয়েটিকে বেশ ভালো করে দেখতে পায়। বুক দুটো খানিকটা অবনত, সব রেখাই ভাঙাচোরা, ঘাড়ের একদিকে হাতের চেটোর মতো চওড়া রগ টান হয়ে রয়েছে। ... লিলি আরো একপা এগোয় শফিকের দিকে। এত কাছে যে শফিক তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়, কেমন বাসি একটা পেতল-পেতল গন্ধও আসে লিলির মুখ থেকে। আমি আপনার সব খবর জানি– আর আমার কি জানো না তুমি? কি তুমি জানো না আমার? ... এই নাও– বলে শফিকের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সে তার নোনা ঠোঁট দুটি তুলে ধরে। একটু পরে একটি অধরোষ্ঠহীন মুখ আর একটি অধরোষ্ঠহীন মুখের উপর চেপে বসে। বড়শির মতো বাঁকানো শুকনো শাদা দাঁতে দাঁতে আটকে যাবার খটাখট শব্দ ওঠে। ঠিক তখুনি নেংটি ইঁদুরটি পাশাপাশি বিছানো দুজোড়া পায়ের পাতার হাড়ের উপর দিয়ে খরখর শব্দে চলে যায়।
> (‘মিনি মাগনার চুমকুড়ি’, Avgi v A‡c ÿ v Ki wQ, iPbvmsMn-2 : ১০৩-১০৪)

হাসান আজিজুল হক খুব হৃদয়হীনভাবে বিবর্ণতায় ও বিস্বাদে ভরা ঐ প্রতিবেশে, যেখানে প্রাণের সজীবতার সামান্য পরশও অনুপস্থিত, সেখানে ঐ শ্রেণির নরনারীর মিলন মুহূর্তে নেংটি ইঁদুরের সহর্ষ-আনাগোনাকে খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায়। শফিক কিংবা লিলি নামের বিগত যৌবনা স্বপ্নহীন মেয়েটি– এরা সবাই যেন এক অর্থে নেংটি ইঁদুরেরই সমগোত্রীয়। প্রায় বিগত-যৌবনা মেয়েটির নাক থেকে গড়িয়ে পড়া ঘামে সিক্ত নোনা ঠোঁট যখন শফিকের ঠোঁটের উপর সংস্থাপিত হয় তখন আবেগশূন্যতার মাধ্যমে সৃষ্ট অনিবার্য অর্থশূন্যতার ভাবটিই প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে : ‘একই শ্রেণীভুক্ত উপরোক্ত দুটি মানুষকে হাসান ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের ছেঁড়া ছেঁড়া অবয়বগুলিকে একত্র করে যা দেখালেন তাতে মারাত্মক এক অর্থশূন্যতার মধ্য দিয়ে টিকটিকি বা নেংটি ইঁদুরের মুখাবয়বই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।’[৫৮] আলোচ্য গল্পগ্রন্থের ‘সমুখে শান্তি পারাবার’ গল্পে স্বাধীনতা উত্তরকালের খাল খননের জন্য খ্যাত সরকারি আমলে উপবাস জর্জরিত এক গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক পরিবারের একটু একটু করে সর্বস্ব হারানোর চিত্রপট এবং বৃদ্ধ ঐ কৃষকের চোখের সামনে তার যুবতী কন্যা ও পুত্রবধূকে সরকারি মাস্তানদের দ্বারা ধর্ষণের ভয়াবহ বীভৎসতা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে লেখকের নিরাবেগ নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অবক্ষয় পীড়িত প্রাহসনিক স্বরূপটিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। খাল খননকে যারা বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো সেই সরকারেরই ছত্রছায়ায় লালিত হয়েছিলো এক শ্রেণির টাউট, ফড়িয়া ও মাস্তান। গ্রামীণ ও শহর এলাকায় এদের সদম্ভ পদপাতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। স্বাভাবিকভাবেই তাই লক্ষণীয় :

খাল খনন প্রকল্পে যেখানে সবুজ বিপ্লবসহ দেশের মানুষের চাহিদা মিটিয়েও হাজার হাজার কোটি টাকার মাছ বিদেশে রপ্তানী হবার কথা, সেখানে খালে পুঁটি মাছও দূরের কথা খনন করা খাল বছর-দুবছরের মধ্যেই সমতল ভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। অথচ ঐসব প্রকল্পের অর্থ বিতরণকে কেন্দ্র করে আমলা, মন্ত্রী, ফড়িয়া, টাউট, মাস্তান ইত্যাদি রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠে। আরও অন্যান্য হাজারটা প্রকল্পে জনগণের উন্নতির নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেও এপর্যন্ত ব্যাপক কৃষক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা তাই তাদের জীবনে এক ধরণের বর্ণাঢ্য প্রহসন ছাড়া অন্য কিছু সৃষ্টি করতে পারে নি।[৫৯]

স্বাধীনতার সুফল একটা বিশেষ সুবিধাবাদী শ্রেণি কুক্ষিগত করার কারণে বৃহত্তর জীবনে যে দারুণ হতাশা দেখা দিয়েছে আলোচ্য গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে হাসান আজিজুল হক নানান মাত্রায় ও কলা-কৌশলে তারই বিভিন্ন দিককে বাস্তবতার অনুষঙ্গে চিত্রিত করেছেন। আলোচ্য গল্পে দরিদ্র কৃষক পরিবারের ক্রমাগত অভুক্ত থাকার দুরবস্থার সময়ে শেষ সম্বল এক বিঘে জমি মাত্র পাঁচশো টাকার বিনিময়ে সরকারি পার্টির এক মাস্তান-মাতব্বর কীভাবে হস্তগত করেছে তার করুণ চিত্র যেমন আছে তেমনি যে লোকটি দুপুরের দিকে টাকা দিয়ে জমির দলিল নিয়ে গিয়েছিলো সেই লোকটিই তার দলবল নিয়ে এসে কেমন করে হামলা চালিয়ে টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে গেলো তারও নিদারুণ বর্ণনা লক্ষণীয়। কিন্তু সমস্ত কিছু ছাপিয়ে গল্পটিতে প্রকট হয়ে ওঠে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বর্বরতার এক বীভৎস আলেখ্য। টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাবার প্রাক্কালে হঠাৎ দলের একজনের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে যায় ঐ ভাগ্য বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত ও আহত কৃষকের আঠার বছরের যুবতী মেয়ের উপর। গল্পে নারকীয় সেই বীভৎসতার নির্মম চিত্রায়ণ ঘটেছে এভাবে :

অতো, অতো ফর্সা নাকি মেয়ে? আঠার বছরের মেয়ে? তিনদিন খালি পেটে থেকেও অতো ফর্সা? ছেলেরা কোনো কথা না বলে দ্রুত কাজ করতে লাগলো। বাপের কাছে এসে দুজনে তার হাত পা কষে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিল। ছেলে ছিলো দেয়ালের কাছে। আর একজন এসে তার ঘাড়ে এমন একটা রদ্দা বসালো যে সে হাঁ–ক করে চিৎকার করে পা-হাত দুমড়ে মেঝেয় বসে পড়লো। ওরা দুজনের কারো চোখ বাঁধলো না।

আমার মেয়ে সোনার তৈরি, ছেলের বউ আমার সোনার বউ। আমার চোখ দুটো তোরা বেঁধে দে– বেঁধে দে– শুয়োরের বাচ্চারা, চোখ দুটো বাঁধ– ঘরের মেঝে থেকে হিম ধাতব চিৎকার ওঠে– ভয়ানক লাথি এসে পড়ে ভিজে মাটিতে। মেয়ের গায়ে জামা ছিলো না। একটানেই চড়চড় করে শাড়ি ছিঁড়ে খসে পড়লো। ... তখুনি বোঝা গেলো চোখ বাঁধার আর কোনো দরকার নেই। চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখা যায় না। ... চোখের সামনে সব গলে যেতে শুরু করলো, শাদা ফেনা মাথায় দোলাতে দোলাতে প্রবল তোড়ে পানির ঢেউ এসে ঘর ভরে ফেললো। মেয়ে বউ যেন গঙ্গোত্রী। তাদের মুখ বেয়ে রুপোর পাতের মতো স্রোত নেমে আসছে। দুপাশের লাল মাটি গলে গলে পড়ছে– মেয়ে তুই কবে জন্মালি, মাগো তোরা কবে জন্মালি, জানোয়ারে ধরিছে তো বাপের কাছে লজ্জা কি– ও– ছেমরিরা– বাপের মাথা কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে। ('সমুখে শান্তি পারাবার', Avgiv A‡cÿv KiwQ, iPbvmsMÖn-2 : ১৩২-১৩৩)

গল্পটিতে রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে সযত্ন প্রয়াসে খুবই সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা যুদ্ধে সাধারণ মানুষের জীবনে অমৃতের পরিবর্তে কীভাবে হলাহল তুলে আনা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নানা অভিনব চাতুর্যে তাদেরকে তা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে– তারই জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পের অবয়বে। নারীর প্রতি এই যে লোলুপতা ও ভয়াবহ পাশবিকতার নির্লজ্জ প্রকাশ আলোচ্য গল্পে বিধৃত হয়েছে তা কেবল গল্পের কাঠামোয় আবদ্ধ কোনো বিষয় হয়ে থাকে নি বরং প্রতিদিন সংঘটিত সামাজিক বাস্তবতার অনিবার্য প্রামাণিক তথ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। খবরের কাগজের পাতায় নারী ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের জন্য নিগ্রহ এমনকি, হত্যা ইত্যাদি খবর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার প্রকারান্তরে শ্রেণি-শোষণ ও শ্রেণি-বৈষম্যকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। নারীর উপর পুরুষের পৈশাচিকতাকেও একই মানদণ্ডে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা :

> পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে পুরুষের চেয়ে হীন, নীচ, নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয়। পিতৃতন্ত্রের মূল কথা পুরুষের আধিপত্য ও নারীর অধীনতা। নির্যাতন চালিয়ে এবং নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে পুরুষ নারীকে পুরুষ-আধিপত্য মেনে নিতে এবং পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। নারীকে পুরুষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রেখে নারীর উপর পুরুষের সর্বময় প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য পিতৃতন্ত্রের অস্ত্র নারী নির্যাতন। ধর্ষণ নির্যাতনেরই বিশেষ প্রকার মাত্র।[৬০]

স্বাভাবিকভাবেই তাই লক্ষণীয় যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে নারীর উপর যে নির্মম অত্যাচার ও পাশবিক বীভৎসতার পরিচয় ইতিহাসের এক অনিবার্য সত্য হিসেবে বিবেচিত, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে স্বাধীন একটি সার্বভৌম দেশেও নারীর প্রতি এহেন সহিংসতা ও বর্বরতার মাত্রাগত কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। আলোচ্য গল্পেও তাই সামাজিক ধস আর অবক্ষয় ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের মানবিক বিপন্নতার পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিকতার কাছে নারীর লাঞ্ছনা এবং অসহায়ত্বের নির্মম দেশচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গে। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের ছত্রছায়ায় লালিত যুবশক্তি তথা মাস্তানবাহিনীর সদস্যের দ্বারা কেবল যে সমাজের ভাগ্যাহত সাধারণ শ্রেণির কৃষক কন্যা ও তার পুত্রবধূ ধর্ষিত হয় তাই নয় বরং কখনো কখনো সেই আঘাতটা বুমেরাং হয়ে কোনো বাঘা আমলার স্ত্রীর উপরও গিয়ে পড়তে পারে, বৈনাশিক এ আঘাত প্রকৃতির নিয়মেই যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, রাষ্ট্রপ্রধানের ডানহাত হয়েও তখন কিছুই করার থাকে না– এ রকম একটি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়েরই রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'পাবলিক সার্ভেন্ট' গল্পের পটভূমিতে। দারুণ উচ্চাভিলাষ ও অবিরাম সযত্ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মামুন রশীদ নিজেকে উঁচু পর্যায়ের একজন সফল ও সার্থক আমলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে খুবই গর্ববোধ করে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে অর্জিত এই সফলতা শেষ পর্যন্ত তাকে সেই ব্যক্তিটির কাছাকাছি এনেছে যিনি সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষস্থানটিতে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আলোচ্য গল্পে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছাবার নানামাত্রিক রাজনৈতিক

কলা-কৌশল এবং আমলাতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষণীয়। জনগণের খাদেম বা সেবক অর্থাৎ :

> যারা পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে সমধিক পরিচিত, তাদের ভেতর ও বাইরের জগৎ কতোটা অপরিচ্ছন্ন ও কলুষ-কালিমায় লিপ্ত তা বাহ্যিক চাকচিক্য ও দর্পিত জীবনের চলায়-বলায়, কেতায়-মেধায়, রঙে-ঢঙ্গে, হাঁকে-ডাকে এবং শাসন-ত্রাসনের গর্জনের আড়ালে চাপা থাকলেও হাসান তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আলো ফেলে, তার সবটাই তুলে ধরেছেন।[৬১]

রাষ্ট্র প্রধানের ডানহাতের কাছের আসনটিকে যে আমলা তার বিশ বছরের প্রশাসনিক দক্ষতা ও নির্ভেজাল স্তুতি-স্তাবকতার মাধ্যমে দখল করতে সক্ষম হয়েছেন সেই বাঘা আমলা মামুন রশীদকে আলোচ্য গল্পের অবয়বে চিরে চিরে বিশ্লেষণের প্রয়াস যেমন লক্ষণীয় তেমনি রাষ্ট্র-লালিত মাস্তান বাহিনীর দর্প-দাপট ও দেশের আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেবার বা বলা যেতে পারে সরকারের মৌন সম্মতিতে আইনকে তাদের হাতে তুলে দেবার পরিণতিতে দেশ কিভাবে শাসিত হয়েছিলো, ভয়াবহ সেই পরিস্থিতিতে বাঘা আমলা মামুন রশীদের স্ত্রী শায়েলার তথাকথিত সেই যুবশক্তি বা পালিত মাস্তান কর্তৃক ধর্ষিত হবার ঘটনার আলোকে বিধৃত হয়েছে। ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত একজন রাষ্ট্রনায়ক কর্তৃক ঘোষিত নতুন রাজনৈতিক দলে স্খলিত চরিত্রের লম্পট ও টাউট শ্রেণির লোকেরাই যে যোগ দিয়েছিলো এবং রাজনৈতিক লেবাসে যুবশক্তির আবির্ভাবের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সরকারের পক্ষে তারা মাসলম্যানের দায়িত্বই পালন করেছিলো সে বাস্তবতা যেমন গল্পটিতে শিল্পিত হয়েছে তেমনি এরই সমান্তরালে নানা ঘটনা ও ভাবনার অবয়বে আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত অবস্থান, নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা ও নারী নিগ্রহের করুণ চিত্রটিও উন্মোচিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের কতিপয় উদাহরণ নারীর নানামাত্রিক জীবন-যন্ত্রণার স্বরূপটিকে অনুধাবনের জন্যে প্রণিধানযোগ্য :

> ক. এই সোফা তাদের বড়ো প্রিয়, এতে চড়ে তারা সাত ভুবন দেখে এসেছে। সময় সুযোগ যখন মিলেছে তখন এই সোফাতেই মামুন রকমারি খাবার খেয়েছে, মুখ ফিরিয়েছে নতুন স্বাদের মাংসে। সেইসব খাদ্যের নানা গন্ধ নানা চিহ্ন এখনো হঠাৎ হঠাৎ মামুন পেয়ে যায়। সেদিন সে পেয়ে গেল এক দীর্ঘ সোনালী চুল, ফোমের ভাঁজ থেকে যখন টেনে বের করছিলো, মনে হচ্ছিল যেন দৃঢ়লগ্ন দুই স্তনবলয়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসছে এক স্বর্ণতন্তু। ('পাবলিক সার্ভেন্ট', AvgivA‡cÿvKiwQô, iPbvmsMn-2 : ১৩৫)

> খ. মেয়েরা কোনো গন্ধ পায় না। শুয়োপোকার মতো অন্ধ তারা। তাদের ঈর্ষা বড়ো ছোট জায়গায় ঘুরপাক খায়। তারা কেবল নিজেদের দেখে। আপন আপন পুরুষমানুষকে নাভিমূলের চারপাশে নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাতে চায়। মামুন সারাদিন বসে বসে আকাশের রং ফেরা দেখতে পারে। মেয়েরা তা পারে না। শুয়োপোকার দল! ('পাবলিক সার্ভেন্ট', AvgivA‡cÿvKiwQ, iPbvmsMn-2 : ১৩৬)

গ. বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে যে শায়েলাকে সে চিনেছে আজ যেন তাকে খুবই নতুন মনে হচ্ছে। একটি অশিষ্ট শব্দ সে তার মুখে কখনো শোনে নি, এতই সংগোপনে সে জীবনযাপন করেছে যে মামুন নিজের ভোগলালসাভরা দিনরাত্রি নিয়ে কখনো বিব্রত পর্যন্ত হয় নি শুধুমাত্র এই কারণে যে শায়েলা যখন হাঁটে তার পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না। ... সেই শায়েলা এখন কি কদর্য কুৎসিত কথাগুলোই না বলে চলেছে। ওর মোমের মতো শাদা মুখের উপর শঙ্কর মাছের লেজের তৈরি চাবুক দিয়ে একটি তীব্র আঘাত করার জন্যে মামুনের হাত নিশপিশ করে ওঠে। ('পাবলিক সার্ভেন্ট', Avgiv A‡cÿv KiwQ, iPbvmsMn-2 : ১৪৩)

ঘ. আমাদের কোনো সুন্দরীর প্রয়োজন নেই। আর সতীর প্রয়োজন তো নেই-ই। কিংবা সতী উচ্ছন্নে যাক– সতী অসতী আলাদা করার জন্যে কোথাও কোনো দাগ নেই– তা নিয়ে মামুন মাথা ঘামাচ্ছে না– তবে সতীপনা দেখানোর জন্যে একজন রাজপুরুষের বাড়ি উপযুক্ত জায়গা নয়। এই ব্যাপার নিয়ে দেবার মতো সময় সত্যিই তার নেই। ('পাবলিক সার্ভেন্ট', Avgiv A‡cÿv KiwQ, iPbvmsMn-2 : ১৪৪)

ঙ. একটা হাত শায়েলার কাঁধের কাছে শাড়ি আর ব্লাউজ বাম-থাবায় চেপে ধরে মুহূর্তের মধ্যে চেয়ার থেকে তাকে তুলে ফেললো। ... ঠিক তখুনি শায়েলা আর তার মাঝখানে এক মূর্তিমান যুবশক্তি এসে মামুনের কাঁধে হিংস্র ধাতব একটি রদ্দা মেরে বললো, আবে আমলার বাচ্চা, বাড়িত যা, খানিক বাদে আইস্যা নিয়া যাস, এক আধটা ফ্রি সার্ভিস দিলে কি হইবো– পইচ্যা যাইবো তর বৌ? ... কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছো, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? তখন দুটি হাত তাকে জড়িয়ে প্রায় পিষে ফেললো। মাটি থেকে উঠে গেল তার দুটি পা– অতি কঠিন একটি হাত নির্মমভাবে নিংড়ে দিল তার একটি বুক আর তার মুখের উপরে ঝুঁকে এলো একটি খোঁচা খোঁচা দাঁড়িভরা দুর্গন্ধযুক্ত মুখ। ... চুপ মাগি, গলা টিইপ্যা শ্যাষ কইরা দিমু, সতীপনা রাইখ্যা দে। অবশ হয়ে এলো শায়েলার শরীর। মুখে মুরগী নিয়ে শেয়াল যেমন ঝোপের আড়ালে যায় ঠিক তেমনি করেই সাততলা বাড়ির পুবদিকের দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকার ঝোপের তলায় তাকে নিয়ে ঢুকে গেল লোকটা। ('পাবলিক সার্ভেন্ট', আমরা অপেক্ষা করছি, iPbvmsMn-2 : ১৪৯)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজবাস্তবতায় নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবন অভিধার পরিচয়টি সমাজসত্যের আলোকে উন্মোচিত হয়েছে। বিশ বছরের চাকুরি জীবনে মামুন নামক আমলার পৃথিবীর বহু দেশ ঘোরার প্রসঙ্গে তার বহু নারীর সংস্পর্শে আসার বিষয়টিও গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের প্রমাণও মেলে তার সোফার ভাঁজ থেকে খুঁজে পাওয়া দীর্ঘ সোনালি চুলের মধ্য দিয়ে। এহেন তথাকথিত লম্পট বহুগামী আমলার কাছে তাই স্বাভাবিকভাবেই নারীদের 'শুয়োপোকার দল' মনে হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। তাছাড়া মামুনের নিকট শায়েলার চিরাচরিত কোমল-শান্ত চেহারাটাই পরিচিত ও কাম্য, প্রতিবাদমুখর নারীর স্বরূপ তার বিবেচনাতেই স্থান পায় না। কেননা:

সমাজ নারীর মধ্যে এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতমান্যতা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, পুরুষ নির্যাতন করার অধিকারী এবং নির্যাতন সহ্য করা নারীর কর্তব্য, এই বোধ জাগ্রত করে নারীকে প্রতিবাদ বা প্রতি আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। ... নারীর উপর পুরুষের ক্ষমতা দমননীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দমননীতি পুরুষের ক্ষমতার উৎস।[৬২]

সমাজ-প্রসূত সেই ক্ষমতার দম্ভে মামুন রশীদের হাত স্বাভাবিকভাবেই তাই স্ত্রী শায়েলাকে শায়েস্তা করার মানসে নিশপিশ করে ওঠে। এটা কেবল গল্পের কোনো পটভূমি বা দৃশ্যপট হিসেবেই বিবেচিত হয় না বরং আমাদের সমাজবাস্তবতায় মামুন রশীদের মতো পুরুষ চরিত্রের এই আচরণ নিতান্ত প্রাত্যহিক একটি বিষয় হিসেবেই যেন পরিগণিত হতে পারে। শায়েলার উপর নেমে আসা ভয়াবহ পাশবিক অত্যাচারের যে বিবরণ আলোচ্য গল্পে বিধৃত হয়েছে তা প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতার অসার, হতাশাখিন্ন ও অবক্ষয়-পীড়িত নিদারুণ সময় ও পরিপ্রেক্ষিতকেই প্রতিবিম্বিত করে তুলেছে। শায়েলার ধর্ষণের ঘটনাটিকে অবাস্তব মনে করার কোনই কারণ নেই। যদিও শায়েলার ঘটনা, বিশেষ করে এরকম পুলিশ প্রহরায় পরিবেষ্টিত একটি সভার প্যান্ডেলে, বাঘা-আমলা স্বামীর পাশের সিট থেকে চিলের মতো ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে গিয়ে কাছাকাছি বিল্ডিংয়ের আড়ালে ধর্ষণ করার ঘটনাটাকে অনেকটাই অস্বাভাবিক বা নাটকীয় মনে হতে পারে কিন্তু :

> তিরাশি সালের রাষ্ট্র-লালিত গুণ্ডা বাহিনীর দর্প-দাপট ও দেশের আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেবার বা বলা চলে সরকারের মৌন সম্মতিতে আইনকে তাদের হাতে তুলে দেবার কারণে দেশ কিভাবে শাসিত হয়েছিলো, ভয়াবহ সেইসব অবস্থার কথা স্মরণ করলে শায়েলা বা কৃষক কন্যা বা পুত্রবধূর ধর্ষণের ব্যাপারটাকে, তা সে স্বামী, পিতা, শ্বশুর– যার সামনেই হোক না কেন, শোকাবহ এমন পরিণামকে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না।[৬৩]

প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় নারী ধর্ষণের ভয়াবহতা পাঠকের সচেতন বিবেকবোধকে বিমূঢ় না করে পারে না। যদিও একথা মনে রাখতে হবে যে : 'পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা ন্যূনতম। নারী নির্যাতনের ঘটনা সাধারণত গোপন করা হয়; জনসমক্ষে প্রচার হতে দেওয়া হয় না। প্রকৃত ঘটনার তুলনায় তাই প্রকাশিত ঘটনার সংখ্যা নগণ্য।'[৬৪] ধর্ষিতা রমণী সমাজে পতিতা; ধর্ষণের কথা জানাজানি হলে তার স্থান হয় পতিতালয়ে যেখানে তাকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। কাজেই ধর্ষিতা নারীর আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা ঘটনা চাপা দেন। ধর্ষিতা নারী নিজেও ঘটনা গোপন করতে চায় কেননা : 'ধর্ষণ গুরুতর অপরাধ হলেও প্রমাণ করা কঠিন। ধর্ষিতাকে নিশ্চিত প্রমাণ দিতে হবে যে, ধর্ষণে তার সম্মতি ছিল না এবং সে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করেছিল। ... নির্যাতিত মহিলার জন্য আদালতে হাজিরা বাস্তব ধর্ষণের মতো সংকটপূর্ণ।'[৬৫] নারীর প্রতি পাশবিকতার জঘন্য বর্বরতার দৃশ্যপটের আলোকে আলোচ্য গল্পে সমাজবাস্তবতায় নারী নিগ্রহের চিরায়ত স্বরূপটিকেই প্রকারান্তরে উন্মোচিত করা হয়েছে অসাধারণ সমাজ-মনস্ক শৈল্পিক দক্ষতায়।

†iv‡' hv‡ev

হাসান আজিজুল হকের সপ্তম গল্পগ্রন্থ †iv‡' hv‡ev[৬৬]। লেখক বেশ কিছু গল্প লিখেছেন অনেক আগে এমনকি 'দু-একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে। হয়তো সেসব গল্প প্রকাশিতও হয়েছে-কিন্তু তাদের তিনি নানা কারণে

গ্রন্থভুক্ত করেন নি। সম্প্রতি এরকম প্রকাশিত কিন্তু ইতঃপূর্বে অগ্রন্থিত গল্পগুলিকে নিয়ে 'রোদে যাবো' নামে একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশকালের দিক থেকে এটি তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থের ঠিক আগের বই।'[৬৭] †iv‡' hv‡ev গল্পগ্রন্থে সংকলিত মোট আটটি গল্প যথাক্রমে 'রোদে যাবো' (১৯৬৮), 'বাইরে' (১৯৬৮), 'খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন' (১৯৮২), 'ঝড়', 'নবজাতক' (১৯৭৪), 'নিশীথ ঘোটকী' (১৯৮০), 'ভূতের কষ্ট' (১৯৮২), এবং 'কোথায় ছোবল' (১৯৭৯)। বিভিন্ন সময়ে লেখা ও প্রকাশিত গল্পগুলোকে সেগুলোর প্রকাশকাল ও রচনাকালের সময় ও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে এবং সেই সময় ও পরিপ্রেক্ষিতের সূত্রে সমাজজীবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির অনুষঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নৈরাজ্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নৈতিক বিচ্যুতি, বুর্জোয়া শ্রেণির দাস্য মনোবৃত্তি, সামরিক শাসকের লোকদেখানো সংস্কার প্রচেষ্টা হাসান আজিজুল হকের †iv‡' hv‡ev গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে যেমন রূপায়িত হয়েছে তেমনি এরই সমান্তরালে শিল্পিত হয়েছে নারীজীবনের নানামাত্রিক সমস্যা, সঙ্কট, সম্ভাবনা তথা যাপিত জীবনের বহুমাত্রিক খুঁটিনাটি দিক। 'খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন' গল্পটি আবর্তিত হয়েছে জনৈক জাঁদরেল লেখক-ক ও তার বড়ো বোনের কথোপকথনকে উপজীব্য করে। বড়ো বোন অনেকদিন থেকেই অসুস্থ, রীতিমত বাড়াবাড়ি অবস্থা, তাছাড়া নিজের বাড়িতে ভদ্রমহিলা একরকম একাই থাকতেন। স্বামী মারা গেছেন দীর্ঘদিন আগে। অসুস্থ সেই বড়ো বোনকে দেখতে আসার সূত্র ধরে বড়ো বোনের বাড়িতে জাঁদরেল লেখকের আগমন ঘটে। বড়ো বোন ও লেখকের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়ে পড়ে দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নানামাত্রিক প্রসঙ্গ। মধ্যবিত্তের পলাতক মানসিকতা এবং তার রক্ষণশীল মনস্তত্ত্বের কথা, অসহ সময় ও স্থিতিহীন পারিপার্শ্বিকতায় ব্যক্তিমানুষের মানস-কাঠামোর বিপর্যস্ত অবস্থা, ব্যক্তির আভ্যন্তর বিকার, ব্যাধি, অসঙ্গতি ও জটিলতার সূক্ষ্ম রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পের পটভূমিতে। গল্পটিতে : 'চরিত্র কিংবা লেখকের সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দুর কারণে গল্পের আভ্যন্তর টেকস্ট বিকাশ লাভ করেছে, উন্মোচিত হয়েছে চরিত্রের প্রচ্ছন্ন মনস্তত্ত্ব। প্রথাগত চরিত্র ও কাহিনি চিত্রণ বর্জন করে লেখক চরিত্রের মনোজাগতিক আলোড়ন, চিন্তা, প্রতিক্রিয়া ও অনুভবকে অনেকান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচন করেছেন।'[৬৮] সমাজবাস্তবতার বহুমুখী জীবন চর্যার অবয়বে বিম্বিত হয়েছে নারী-জীবনের বিশেষ মাত্রা। সমাজে, পরিবারে নারীর জগতটি কেমন করে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে ওঠে, পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত ছকে নারীর ভাবনা চিন্তাও ধীরে ধীরে কীভাবে সংকুচিত গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তারই পরিচয় আলোচ্য গল্পে লেখকের বড়ো বোনের কথোপকথন-সূত্রে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> আমি বাইরে খুব কম গেছি রে! জীবনে প্রায় বেরই হলাম না ঘর থেকে– কি আর দেখবো! বললাম না, জীবনটা কাটলো ছোট্ট ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো। তেমন ভালোও না, মন্দও না। কি রকম যেন ভাত ভাত স্বাদ– আলুনি। ... একদিন সন্ধ্যের চমৎকার পোশাক পরা, খুব, খুব দামি সেন্ট মাখা, ফুলকাটা চাদর বিছিয়ে বিছানায় হাত-পা এলিয়ে

বিশ্রাম নেওয়া আর গান শোনা– এই ধরনের ব্যাপার হচ্ছে আমার জীবন। ভালোটা কি বুঝতে পারি না– খারাপ বা কি তাও বুঝি না। ('খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন', †iv‡' hv‡ev, iPbvmsMn-2 : ১৮৮)

লেখকের বড়ো বোনের ভাবনায় প্রকারান্তরে গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিজাত পুরুষতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপটি যেখানে :

নারীর ক্ষেত্রে, পিতৃতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যা ভাল তাকে মন্দ আখ্যা দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে যা মন্দ তাকে ভাল আখ্যা দেয়। মেয়েরা চটকদার পোশাক পরিধান করবে, প্রসাধনে নিজেকে আবৃত করবে, সুগন্ধী মেখে দেহের স্বাভাবিকতা ঢেকে রাখবে। এভাবে পুরুষের পছন্দ মোতাবেক তারা নিজেদের কৃত্রিম জড় পদার্থে পরিণত করবে। অপরদিকে, বাস্তব, স্বাভাবিক নারী যারা নিজেদের স্বকীয়তায় অটল থেকে দেহ ও মনকে পিতৃতান্ত্রিক রং ও গন্ধে রঞ্জিত করতে নারাজ তারা সমাজে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত থাকবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই কৃত্রিম নারীকে ভাল বলে বাহবা দেবে– এ সবই নারীকে পিতৃতন্ত্রের খাঁচায় পুরে রাখার ফন্দী।[৬৯]

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'ঝড়' এবং 'নবজাতক' গল্প দুটির পটভূমি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ নির্যাতন, বিভীষিকাময় দিনরাত্রির অসহ মর্মন্তুদ ইতিহাস ও নারীর প্রতি বীভৎসতার নিদারুণ বাস্তবতা। গল্পগুলোতে বিধৃত নারী-নির্যাতনের লোমহর্ষক বিবরণ পাঠককে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাশবিকতার ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি করে দেয় এভাবে :

ক. কোথাও কোন শব্দ নেই। হাওয়া বন্ধ। ঘর ভর্তি ঠাণ্ডা হলুদ রোদ। আমি ঘরের ভিতর উঁকি দিলাম। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। শ্যামলা রং-এর ছিপছিপে কিন্তু পুষ্ট দেহটি। এত তাজা, মনে হয় জ্যান্ত। আমি হয়তো তাই মনে করতাম যদি না দেখতাম দেহটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ঘন নীল রং-এর মোটা কাপড়টি ঘরের এক কোণে জড়ো করা। কালো চুলের গোছা মাথার পিছন দিকে ছড়ানো। মেয়েটির তরুণ শরীরে রোদ। শুধু একটি মাত্র খুঁত। মেয়েটির যোনি নেই। যোনির জায়গায় বিরাট একটি গহ্বর। সেই জায়গাটিতে রোদ যেতে পারে নি। কালো, ঘন কালো বিরাট গর্ত। অনেক গোলাপ বা অনেক পাথর চাপা দিয়েও গহ্বরটি বোজানো যাবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু এটা কোন কথাই নয়। সেই মেয়ের পুষ্ট স্তন দুটির একটি ছোট হাতের মুঠো দিয়ে টিপে ধরে অন্যটি চুষছে বছরখানেক বয়সের হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু। ছোট ছোট হাত দিয়ে থাবড়া মারছে, মুখ ঘষছে, গরুর বাছুরের মতো ঢুঁ মারছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। তার ছটি দাঁত। চোখ কুঁচকে ছটি দাঁত বের করে সে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। ('ঝড়', †iv‡' hv‡ev, iPbvmsMn-2 : ১৯৫-১৯৬)

খ. আমি নদীর নিচের দিকে যতদূর চোখে চলে তাকিয়ে থেকে আমার তপ্ত কপাল আর ভাপে ভরা চোখ ঠাণ্ডা করে নিতে চাইলাম। তখন আমর বাঁ দিকে বড় ঝোপটা থেকে বিকট চিৎকার এলো। এই রকম চিৎকার আমি জীবনে শুনিনি। ... আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম ঝোপের নিচে খালটায় একটি স্ত্রীলোক বসে রয়েছে। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে একটি ফোঁটা রক্ত নেই, চটচটে আঠার মতো ঘামে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। সে তার গায়ের জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখতে পেয়ে আবার এমন চিৎকার করে উঠল যে আমি দু'পা পিছিয়ে

> এলাম। চিৎকারটি দেবার পরেই সে কোঁকাতে শুরু করে, তার কপালের দুপাশের নীল শিরা আর গলার সব কটি রগ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সে এক টানে তার ভীষণ ময়লা শাড়িটা খুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আমি তার সম্পূর্ণ উদোম চেহারা দেখার আগে সেই নিচু জায়গাটায় এক কলসি কাঁচা রক্ত দেখতে পেলাম। মেয়েলোকটি রক্তের মধ্যে নিতম্ব ডুবিয়ে বসেছিলো। এবার সে ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে কোন রকমে বললো, বাবা আমার সন্তান হবে– আমাকে বাঁচাও বাবা। ভয়ানকভাবে চমকে উঠেই আমি অসহায় আর বিপন্ন বোধ করতে থাকি। ... এক ঝাঁক প্লেন উড়ে এলো। রাস্তার পশ্চিম দিকে তিনবার বোমা পড়লো। মেয়েলোকটি যেন ঘুমের মধ্যে থেকে আমার দিকে নিস্প্রভ দৃষ্টি মেলে আর একবার বললো, আমাকে বাঁচাও। ('নবজাতক', †iv‡' hv‡ev, iPbvmsMn-2 : ১৯৭-১৯৮)

মুক্তিযুদ্ধকালীন এহেন বিভীষিকাপূর্ণ পরিস্থিতিকে কোনো আখ্যানভাগেই পুরোপুরি তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। কেননা এ স্তব্ধতাকে, এ অমানবিক নির্মমতাকে কোনোভাবেই বর্ণনা করা যায়না। যুদ্ধে যে কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনেই নেমে আসে এক ভয়াবহ অরাজকতা ও নৈরাশ্যপূর্ণ পরিস্থিতি। মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসলীলার তাণ্ডবে বাংলাদেশের জনজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরেই সৃষ্টি হয়েছিলো স্থিতি ও স্বস্তিহীন এক বিভীষিকাময় কালো অধ্যায়ের। তবে এহেন প্রতিকূলতার মধ্যে নারীর জীবন আরো বেশিমাত্রায় সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছিলো। নারীর জীবনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ছিলো বহুমাত্রিক। কেননা :

> একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে নিজে ধর্ষিতা হয়ে তার সামাজিক অবদান হারিয়েছে, নির্যাতনের শিকার হয়ে সে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু শহীদের সম্মান লাভ করতে পারেনি, কিংবা শহীদের তালিকায় তার স্থান হয়নি, আবার শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন কিংবা স্ত্রী হিসাবেও তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। পরিবারের প্রধানকে হারিয়ে অনেক মা-বোন-স্ত্রী নিঃস্ব হয়ে সমাজে মানবেতর জীবন যাপন করেছে।[৭০]

অতএব আলোচ্য গল্পগুলোর পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গটির অবতারণার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নারীর বহুমুখী অবদানের ক্ষেত্রটিকেই প্রতিবিম্বিত করা হয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা ও জীবনঘনিষ্ঠ চেতনার আলোকে।

gv-‡g‡qi msmvi

হাসান আজিজুল হকের অষ্টম ও iPbvmsMn-2-এর অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ gv-‡g‡qi msmvi[৭১]। গল্পগ্রন্থে সংকলিত মোট সাতটি গল্প যথাক্রমে 'সম্মেলন', 'মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে', 'মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত', 'বিলি ব্যবস্থা', 'ঘের', 'জননী', এবং 'মা-মেয়ের সংসার'। gv-‡g‡qi msmvi গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'বিলি ব্যবস্থা' বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের দুটো প্রত্যক্ষ সত্যকে ধারণ করেছে। জোতদার কর্তৃক খাস জমি ভাগ এবং ফতোয়াবাজি বা অবৈধ সন্তান ধারণে স্ত্রীজাতির শাস্তির বিধান– এই দুই ঘটনা গল্পটিকে প্রবহমান করেছে। গল্পটি আত্মকথনরীতিতে কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা ব্যারেজে যাওয়ার পথের একটি গ্রামের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি এ গল্পের কাহিনি। গল্পের নেক বখ্‌শ গ্রামের জোতদারের অধীনস্থ কামলা। গ্রামের অ-বণ্টিত খাস জমিতে একবার সে সরিষার চাষ করে; কিন্তু পরিশ্রমের এই ফসল সে নিজ ঘরে তুলতে পারে না, জোতদারের হুকুমে ফসল কেটে তার ঘরে দিয়ে আসতে নেক বখ্‌শ বাধ্য হয়। অন্যদিকে নেক বখ্‌শের একমাত্র ছোটবোন নেকী বোবা। জোতদারের খোঁড়া ও নুলো ছেলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় নেকী একসময়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। নেক বখ্‌শ জোতদারের নিকট তার ছেলের সঙ্গে নেকীর বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখাত হয়। উপরন্তু প্রমাণহীনতার সুযোগ নিয়ে জোতদার গ্রাম্য শালিসের মাধ্যমে নেকীর উপর ফতোয়া জারি করে। কোমর পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে অগণিত পাথর নিক্ষেপে রক্তাক্ত করে ফেলা বা এই প্রক্রিয়ায় তাকে হত্যা করার বিধান নিশ্চিত করে নেকীকে গর্তে রেখে পাথর ছোঁড়া শুরু হয়। নেকীর প্রবল চিৎকার ও দুর্বোধ্য আওয়াজে পাথর ছোঁড়া বন্ধ করে উপস্থিত সকলেই তার অর্থ বুঝতে তৎপর হয়ে ওঠে। ইমাম সাহেব এর অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হলেও নেক বখ্‌শ অনেক চেষ্টার পর তা বুঝতে পারে এবং কেঁদে ওঠে। তার ভাষ্যমতে, নেকী বলেছে 'পয়গম্বর নবীজী বুক ভাসিয়ে কাঁদছেন'। অর্থাৎ মানুষের অমানবিক আচরণে স্বয়ং ধর্ম প্রবর্তক কাঁদছেন, তিনি ধর্মের অপব্যবহার সহ্য করতে পারছেন না। এভাবেই গল্পের পরিসরে খাস জমি বণ্টনের নামে প্রহসন, গ্রাম্য জোতদারের তথা ক্ষমতাবানের অসহায়-দরিদ্র শ্রেণির মানুষের প্রতি শোষণ-নিপীড়ন, গ্রামীণ ফতোয়াবাজি তথা ধর্মের নামে অধর্ম সৃষ্টিকারীদের মুখোশ অত্যন্ত বাস্তবনিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শীরূপে আলোচ্য গল্পে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। এরই সমান্তরালে আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত সত্তার যথার্থ স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়েছে সমাজসত্যের আলোকে। পুরুষ, তা সে খোঁড়া কিংবা নুলো যেরকমই হয়ে থাকুক না কেন, সমাজে তার আসনটি বেশ সম্মানজনক স্থানেই থাকে। যে কোনো নারীর প্রতি কামনার লোলুপ দৃষ্টি ফেলতে পুরুষের বিন্দুমাত্রও বেগ পেতে দেখা যায় না। সমাজ পুরুষকে বহুগামিতার অবাধ সুযোগ দিয়ে রেখেছে। এ যেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এক অলিখিত নিয়তি। প্রকারান্তরে নারীর বেলায় একেবারেই বিপরীতধর্মী চিত্র লক্ষণীয়। কেননা : 'নারীর দেহসৌষ্ঠব তার নিজস্ব; কিন্তু পুরুষ তা ছিনিয়ে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নিজের ভোগের বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে। ... নিজের সন্তুষ্টি নয়, পুরুষের সন্তুষ্টি বিধান নারীর যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য। পুরুষ নারীকে উপভোগ করবে– এটাই নারীর নিয়তি।'[৭২] আলোচ্য গল্পেও সমাজে নারীর মূল্যহীনতা ও নারীর প্রতি তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষার ভাষাটি বিধৃত হয়েছে এভাবে : 'সন্ধ্যের মুখে বাজারের ভাঙা দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে যে মেয়েমানুষটি দাঁড়িয়ে আছে, একটা পুরুষ ধরে শোবার কোনো জায়গা পর্যন্ত নেই, ভাঙা বাসের তলায়, ড্রেনের গলিতে কোনোমতে দুটো মিনিট– সেই মেয়েটিরও মালিক আছে। মালিক আছে ঠিকই কিন্তু খাস জমির মতোই মালিক কে বলা সত্যিই দুষ্কর।' ('বিলি ব্যবস্থা', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMn-2 : ২৫৭) নেক বখ্‌শের বোবা বোন নেকী সেই নারী-জীবনেরই প্রতিচ্ছবি যারা প্রতিনিয়ত পুরুষের লালসার শিকার হয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্য দিয়ে জীবনের নির্মমতাকে প্রত্যক্ষ করে চলেছে। সমাজ এহেন নারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। অথচ যে পুরুষ সমাজ গর্হিত আচরণের অন্যতম ভূমিকায় অবতীর্ণ– সে রয়ে যায় সমস্ত বিচার-আচারের উর্ধে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিজের অপকর্মের দায়ভার নির্ভারচিত্তে পুরুষ নারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। গল্পটি সেই সমাজসত্যকে ধারণ করেছে এভাবে :

> নেক বখ্‌শ গিয়েছিলো একবার মালিকের বাড়ি, আপনের খোঁড়া আর নুলো ছোঁয়াটার এই কাজ। আপনের ছোঁয়াটার সঙ্গে বুনটার বিয়া দিয়া দ্যান মালিক। কাজটা তো ওঁয়া করিছে।
>
> তুই দেখেছিস ওঁয়া করিছে। আমার ছোঁয়া তোর বুনকে ছুঁইয়া দেখিবে? ছোট মুখে বড় কতা। মুই তোর জবান ছিঁড়্যা নিব। ... আমার বুন আর আপনের বেগমে ফারাক কি মালিক– অনেক তো দেখিছেন তুমরা, সময়কালে মিয়েয় মিয়েয় ফারাক কিছু নাই মালিক। আপনের ছোঁয়ার ঠ্যাংটা ল্যাঙরা, হাতটা নুলো, মুখ দিয়ে লালা গড়ায় তবে কি সে মিয়েমানুষ ছিনে না? ... একটা পুরনো, হাড়ের মতো শক্ত চামড়ার চটি ঠাঁই করে নেক বখ্‌শের মাথায় এসে পড়ে। তার কপাল কেটে দর দর করে রক্ত ঝরতে শুরু করে।' ('বিলি ব্যবস্থা', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMn-2 : ২৫৯-২৬০)

এভাবেই নিজের অপকর্মকে ঢেকে রাখার প্রয়াসে ক্ষমতাবান পুরুষ নারীকে বিচারের কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। শ্রমিক বা অধঃস্তনদের মানুষরূপে গণ্য না করা, সরকারি খাস জমি নিজের দখলে রাখা তথা সবকিছু আত্তীকরণ করা, এমনকি নারীকেও নিজের বশবর্তী করে অবদমিত করার কৌশল হিসেবে নিজের প্রয়োজন ও সুবিধামাফিক বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার চিরাচরিত সমাজচিত্রটি আলোচ্য গল্পে ফতোয়াবাজির বিষয়টির সংযোজনের মধ্য দিয়ে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> শেষ পর্যন্ত খাস জমির জায়গাটাই ঠিক হলো। মালিক একদিন নেক বখ্‌শকে ডেকে পাঠায়, কি কহে রে লোকে! বিচার তো এলা করিবা লাগে। ... নেক বখ্‌শ এইবার একবার ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে, আমার বুন কি করিছে মালিক,

কথাই তো কহিবার পারে না, আপনের ছোঁয়া–, মালিকের আর সহ্য হয় না, মোর ছোঁয়ার নাম আর একবার মুখে আনিবি তো তোর কল্লা ধড় থাকি নামি দেইম শালা!

খাস জমির মাঝখানে নেক বখ্‌শ গর্ত করা দেখছে। ... মালিকের ল্যাংরা নুলো ছেলেটা আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ঢাউস পেটের উপর নোংরা ছেঁড়া শাড়ি চাপা দিয়ে নেক বখ্‌শের বোন নেকী আনমনে মাঠের দিকে চেয়ে থাকে। ... ঘরের মেয়ে বেশ্যা হইবার ধরিছে, বেশ্যা হইতেছে ঘরের জেনানা। এইসব ভীষণ আক্ষেপ করতে করতে ইমাম সাহেব লাফ দিয়ে এসে নিজের হাতে কোদাল তুলে নিয়ে মাটি খোঁড়ায় হাত লাগায়। ... মুখ খিস্তি করে চেঁচিয়ে ওঠে ইমাম, কি বাহে, তুমরা মজা দেখিবার নাগিছ, খানকি মাগীক গর্তত ফ্যালে পুঁতি দাও। ভয়ে ভয়ে রোগা পটকা তিন চারটে লোক এগিয়ে আসে, মালিকের নুলো ছেলেটাকে একবার ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিতে দেখা যায়। ... নেকীকে কোনমতে গর্তে টেনে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে স্থির শান্ত হয়ে গেল। নেকী এইবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাঁয়ের লোকদের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। মাটি-মাখানো মুখের উপর ভেসে-ওঠা তার কটা চোখের তারা, বসন্তকালের বিকেলবেলায় কোকিলের চোখের তারার মতো, সেই চোখ দিয়ে চরাচরের দিকে তাকাতেই ছাই-ছাই ধোঁয়া-ভরা আলোয় মাঠ-ঘাট-আকাশ ঢেকে গেল। পাথর তোলো, ইট তোলো, পাথর ছোঁড়ো, ইট ছোঁড়ো বাহে, মারো হারামজাদি খানকিকে– ইমাম সাহেব জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। ... জেনাকারীর লাল রক্ত যে মুসলমান চোখে দেখল না সে আবার কিসের মুসলমান। শক্ত, তিনদিকে ধারঅলা একটা ঝামা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে এরে রে রে ও হো চিৎকার করে ইমাম নেকীর কপালে মারল। ... রক্ত এর মধ্যেই কালো হয়ে এসেছে, নেকীর ডান হাত বেয়ে কনুই থেকে গড়িয়ে নামছে নিঃশব্দ একটা ধারা। ('বিলি ব্যবস্থা', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMn-2 : ২৬০-২৬২)

ধর্মের অজুহাতে, ধর্মবোধকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে স্বীয়-স্বার্থহাসিলের জঘন্য, হীন, অপকৌশল হিসেবে এভাবেই ফতোয়াবাজি হয়ে ওঠে নারীকে অবদমনের পুরুষতান্ত্রিক হাতিয়ার। নির্যাতন চালিয়ে এবং নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে পুরুষ এভাবেই নারীকে পুরুষ-আধিপত্য মেনে নিতে এবং পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। আর এভাবেই : 'নারীর দেহ নারীর নিজস্ব সম্পদ এবং নারীর সম্মতি ছাড়া তার দেহের উপর কারও কোন অধিকার নেই– এ বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার প্রয়োজনে পিতৃতন্ত্র নারী নির্যাতন তথা নির্যাতনের ভীতি প্রদর্শনের আশ্রয় নেয়।'[৭৩] কেবল তাই নয় আলোচ্য গল্পে ফতোয়াবাজির প্রহসনের রঙ্গমঞ্চের চারপাশে জোতদারের খোঁড়া ও নুলো ছেলেটাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এবং নিশঙ্কচিত্তে তাকে বিচারিক প্রহসনের দিকে বারবার উঁকি মারতেও লক্ষ করা যায়। যে অন্যায় বা তথাকথিত অবৈধ সম্পর্কের জের ধরে আলোচ্য গল্পে নেকীর উপর অমানুষিক বর্বরতা নেমে আসে সেই একই ঘটনার মূল হোতা জোতদারের খোঁড়া, নুলো অথচ নারীলোলুপ ছেলের কিছুই হয় না। এমনকি সমাজের কেউই তার দিকে একটিবারের জন্যেও জিজ্ঞাসু বা সন্দেহের দৃষ্টি ফেরায় না। এভাবেই :

পুরুষ প্রধান সমাজ নারীর উপর পুরুষের নির্যাতন জায়েজ করার জন্য নানা অতিকথা (myth) বানিয়েছে এবং নারী নির্যাতনের জন্য পুরুষের যেন শাস্তি না হয় তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করে রেখেছে। ধর্ষক পুরুষের কিছু হয় না; সে বহাল

> তবিয়তে সমাজে ও পরিবারে বসবাস করে। সমাজের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হয় যে, নির্যাতিত নারী হয় স্বেচ্ছায় নির্যাতনে অংশগ্রহণ করেছে কিংবা বানিয়ে গল্প বলেছে।[৭৪]

গল্পটিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদের (সা:) উল্লেখ লক্ষণীয়। নেকীর প্রতি অবর্ণনীয় অমানবিক লাঞ্ছনা-নির্যাতনে তিনি কেঁদে উঠেছেন। 'পয়গম্বর নবীজী কেঁদে জারে জার' উল্লেখে ধর্মের নামে অধর্ম সৃষ্টিকারীদের মুখোশটি আলোচ্য গল্পের অবয়বে উন্মোচন করা হয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা ও জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞানের সমন্বয়ে। দারিদ্র্যের নিমর্ম কশাঘাতে জীর্ণ এক কুমারী মায়ের আখ্যান 'জননী' গল্পে বর্ণিত হয়েছে। মাতৃত্বের স্বাদ, মায়ের দায়িত্ব ও অধিকারবোধ এ গল্পে ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। মাতৃত্বের সৌন্দর্যকে প্রধান বিবেচনা করে লেখক কথকের বর্ণনায় মধ্যবিত্তের জীবনবোধে এ বিষয়কে স্থিত করেছেন। এ গল্পে দেখা যায়, কথকের ফ্লাটবাড়িতে আয়েশা নামের এক সুন্দরী যুবতী ঝি-এর কাজ নেয়। একদিন এক প্রতিবেশীর কথায় কথকের স্ত্রী জানতে পারে মেয়েটির সন্তান আছে কিন্তু সে অবিবাহিত। কিন্তু কাজের মেয়ে পাওয়া আজকাল কষ্টকর এবং আপনমনে কর্তব্যকাজ সমাধা করায় তাকে কিছু বলা হয় না। তবে দুই মাস পরে কথকের স্ত্রী আয়েশার পুনরায় গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে চায়। কিন্তু কথক তার স্ত্রীকে সমাজের ভয়ে ভীত না হয়ে আয়েশাকে কাজে বহাল রাখার পরামর্শ দেন। এরও প্রায় দুমাস পরে একরকম বাধ্য হয়েই আয়েশাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। পথের মাঝে আয়েশাকে মাঝে মাঝে দেখে কথকের মায়া হয়, একসময় ঝর ঝরে শরীর দেখে কথক তাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন তার সন্তান নেই। আয়েশার তৃতীয়বার গর্ভধারণ সম্পর্কে জানতে পেরে কথক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি লক্ষ করেন যে এবার আয়েশার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত জীবনযাপন সত্ত্বেও আপন গর্ভকে অস্বীকার না করে সন্তান প্রসবের জন্য আয়েশা অপেক্ষা করে। আরো কিছুদিন পর কথক শীর্ণকায়, বিধ্বস্ত আয়েশার কাছে তার সন্তান সম্পর্কে জানতে চেয়েও কোনো সদুত্তর পান না। কথক বুঝতে পারেন, পরবর্তী সন্তান ধারণের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করছে। প্রকৃতপক্ষে, ঘটনা যা-ই হোক না কেন, জননীর মাহাত্ম্য বর্ণনাই আলোচ্য গল্পের মূল উপজীব্য। বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন এক কুমারীর জননী পদে উন্নীত হওয়ার মহত্বকেই হাসান আজিজুল হক সহৃদয়তার সঙ্গে এ গল্পের পটভূমিতে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। আয়েশা বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় সেইসব অসহায় নারীর প্রতিবিম্ব যারা প্রতিনিয়ত পুরুষের পাশবিক লোলুপতার শিকারে বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে সমাজে অবাঞ্ছিত হিসেবে পরিগণিত হয়। অথচ নারীর এহেন দুর্দশার জন্য নারী মোটেই দায়ী হতে পারে না। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাত, পুরুষের বিকৃত লালসার কাছে নারী একরকম উপায়হীন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয় পতিতা নারীর জীবন বেছে নিতে। গল্পে সমাজবাস্তবতার সেই নির্মম সত্যের রূপায়ণ ঘটেছে এভাবে :

এ মেয়েটি আমাদের মেয়েটিরই মতো। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা বাষ্প আমি কিছুতেই ঠেলে ভিতরে পাঠাতে পারি না। কথা বন্ধ হয়ে যায় আমার কথার মাঝখানে।

কি বললে? আমাদেরই মেয়ের মতো? খেপে গেলে নাকি? একটা রাস্তার বদস্বভাব মেয়ে, জন্মের পর থেকে পুরুষসঙ্গ করছে–

সেই হারামজাদা শুয়োরের দল, পুরুষ শুয়োরদের বুঝি কোনো দোষ নেই– রাগে চিৎকার করে আমি গলা চিরে ফেলি।

সে তো তোমরাই– স্ত্রীও চেঁচিয়ে ওঠেন।

সে তো আমরাই– চকিতে একটা কঠিন সত্য লোহার শাবলের মতো কপালের ঠিক মাঝখানে আঘাত করে। ('জননী', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMn-2 : ২৭৪-২৭৫)

আয়েশার মতো আমাদের চারপাশেও হাজারো নারী সেইসব 'পুরুষ শুয়োরের দল' কর্তৃক প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও পাশবিকতার শিকার হয়ে আশ্রয়হীন, উপায়হীন ও অবলম্বনহীন ভাগ্যবিড়ম্বিত লাঞ্ছিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। অসহায় সেইসব নির্যাতিত নারীদের উদ্দেশ্যহীন জীবনের মর্মন্তুদ বিবরণ আলোচ্য গল্পে আয়েশা চরিত্রের অসহায়ত্বের অবয়বে শিল্পিত হয়েছে এভাবে:

আবার একদিন আয়েশাকে দেখতে পেলাম বিরাট ধামার মতো পেট নিয়ে পা টেনে টেনে হেঁটে চলেছে। কোনো বাড়িতে তো সে আর এখন ঢুকতে পারছে না। ও কি এখনো ওর 'মায়ের ঠেঁয়ে' যায়? সেখানে কি ওর ঠাঁই মিলবে প্রসব হওয়ার জন্যে? নাকি সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে এক কুকুরীর সঙ্গে একই যন্ত্রণায় সে কাতরাবে? ... তিনবারের বার সে গর্ভধারণ করেছে জানতে পেরে আমি বাসায় ফিরে এসে আমার ইউনিভার্সিটিতে-পড়া মেয়েটিকে কোলে নিয়ে কাঁদতে থাকি। এবার দেখি আয়েশার শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। এ সেই রকমের ভাঙা যাতে মনে হয় ভাঙার ব্যাপারটা শেষ হলে শরীরের টুকরোগুলো এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে পড়বে। চারদিক থেকে কুড়িয়ে এনে জোড়াতালি দিতে গেলে হয়তো দেখা যাবে পা বা কণ্ঠার হাঁড় নিয়ে চুষছে একটা কুকুর। কোথাও যায় না সে। গর্ভের অসম্ভব ভার নিয়ে বৃত্তাকার রাস্তা ধরে ধীর পায়ে শুধু হেঁটেই চলে। চোখে তার নিস্পৃহ অবজ্ঞা মেশানো দৃষ্টি। ('জননী', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMn-2: ২৭৭-২৭৮)

আলোচ্য গল্পে কথক দরিদ্র আয়েশার অসহায় মাতৃত্বের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সন্ধানে উৎসুক নন বরং আয়েশাকে দেখে তিনি নিজ কন্যার কথা ভাবতে থাকেন এবং বাড়ি ফিরে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়েকে আদর করতে থাকেন, কারণ বাল্যকালে এই কন্যাই পিতার বুকে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাত। কিন্তু কৈশোরোত্তীর্ণ মেয়ের সঙ্গে বাবার ক্রমাগত দূরত্ব তৈরি হয়। শ্বাপদ পৃথিবী ক্রমশ তার কাছে বিপদসংকুল হয়ে ওঠে। অভিভাবকহীন দরিদ্র আয়েশা এই শ্বাপদ পৃথিবীর লালসায় আক্রান্ত। সে কারণে কথক আয়েশার বিপদগ্রস্ত মাতৃত্বকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ নয় বরং পরম মমতায় সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। কথকের চিন্তায় কুমারী জননীর পরিশুদ্ধতা ধরা পড়েছে। বস্তুত গল্পের অবয়বে লেখক প্রকারান্তরে যেন এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন

যে, : 'বিবাহপূর্ব বা বিবাহ-পরবর্তী যে কোন অবস্থায় নারীকেই সন্তান জন্মদান করতে গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। পৃথিবীর কঠিন-কঠোর বাস্তবতার পাশে সন্তান জন্মদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নারীর অবদান অসামান্য।'[৭৫] আর সে কারণেই নারীর মর্যাদা বা সম্মান এতো ঠুনকো কোনো বিষয় হতে পারে না যে তা কতিপয় লম্পট চরিত্রের 'পুরুষ শুয়োরের দল' কর্তৃক পদদলিত হতে পারে। মাতৃত্ব নারীর মর্যাদাকে নানামাত্রায় সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করে। এ কথাও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে : 'নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ সে সন্তান ধারণ ও জন্ম দিতে পারে। তার গর্ভ আর শরীরকে ঘিরেই মানবপ্রজন্মের বেড়ে-ওঠা এবং বংশরক্ষা।'[৭৬] তাছাড়া আয়েশার তৃতীয়বারের সন্তান জন্মদানের পর বিপর্যস্ত শীর্ণ শরীরে কথক বাংলাদেশের খাঁজকাটা মানচিত্র দেখতে পান। জননী এক্ষেত্রে যেন জন্মভূমির মতোই বিপর্যস্ত। জননী এ গল্পে জন্মভূমির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। চরিত্রের প্রতীকীকরণের মধ্য দিয়ে এবং জননীকে জন্মভূমিতে রূপান্তর করায় গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ শৈল্পিক মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'মা-মেয়ের সংসার'। গল্পে মা-মেয়ের জীবনালেখ্যর অবয়বে জানা যায় যে, জলের নাগাল থেকে একটু দূরেই থাকে মা আর মেয়ে। কেবল তাই নয় বরং বলা যেতে পারে সমাজ থেকেও তারা দূরেই অবস্থান করে। দূরবর্তী এক নিজস্ব সংসার তাদের। সে সংসারের দৈনন্দিনতা মেলে না সমাজের অন্য সবার সঙ্গে। তাদের ঘরের পিছনের বেনাঝোপে শিয়াল থাকে। কিন্তু শিয়াল শুধু ঝোপে বা বনে থাকে না। মা-মেয়ের সংসারের চারপাশে মানুষের মাঝখানেই ঘোরাঘুরি করে 'মনুষ্যরূপী শিয়াল'। এক সন্ধ্যায় চারজন এসে মেয়েকে মুখে গামছা বেঁধে নিয়ে যায় গোলপাতার বনে, চারটি পুরুষের তথা মানুষরূপী শিয়ালের ক্রমাগত ধর্ষণে জ্ঞানহারা পড়ে থাকে মেয়ে। একটু পরে নিজেদের ঘরে মাকেও সেই একই পরিণতিতে পৌঁছতে হলো– এই হলো মা-মেয়ের জীবন, এই হলো তার বৃত্তান্ত। সমাজ থেকে দূরবর্তী হলেও সমাজ ঠিকই থাবা বাড়ায় মা-মেয়ের দিকে। কাজেই তাদের সমাজ থাকতেই হয়, তারা সমাজে না থাকলেও। মা আর মেয়ের একে অপর ব্যতিত আর কোনো স্বজন নেই। তাদের আল্লা নেই, দোজখ নেই, বেহেস্ত নেই। তারা কেবল দুজনের জন্য দুজনে আছে। তারা সমাজ থেকে পলাতক নয় বরং বলা চলে পরিত্যক্ত ও অপাঙ্ক্তেয় তবু ব্যবহার্য। যদিও মা-মেয়ে নিজেদের মধ্যে আপনমনেই থাকে, কোথাও যায় না কিন্তু সমাজ ঠিকই তাদের কাছে আসে। কখনো সন্ধ্যার অন্ধকারে, কখনো দিনের আলোয়। হয় তাদের ধর্ষণ করতে, নয় শাসন করতে। গল্পটিতে লেখক রিপোর্টারের নির্লিপ্ত, নির্মোহ ভঙ্গির মধ্য দিয়ে কাহিনিকে প্রবহমান করেছেন। গল্পের কোথাও কোনো আরোপিত আদর্শবাদের দায় চাপানো হয় নি, কিংবা কোনো অগল্পায়িত চরিত্র তৈরির চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় না। মনে হতে পারে লেখক এ গল্পে যেন শুধু দর্শক, যেন শুধু বলে যাওয়াই তাঁর কাজ, এর বাইরে তিনি কোথাও নেই। কিন্তু সচেতন ভাবপ্রত্যয়ে ধরা পড়ে যায় যে : 'আছেন গল্পকার হাসান আজিজুল হক, গল্পের পরতে পরতে যিনি মিশিয়ে দিতে পারেন ছকহীন সমাজ বাস্তবতাকে, অন্যদিকে গল্পের নির্মাণে তৈরি করে দেবেন এক চাপা উৎকণ্ঠা, যে উৎকণ্ঠার সঙ্গে

মিশে যাবে ক্লেদের অভিজ্ঞতা।'[৭৭] গল্পের মধ্যে রিপোর্টারের নির্মোহ ভঙ্গির মধ্যেই অনুভূত হয় নিষ্ঠুরতা– সে নিষ্ঠুরতা এক বাঁকা বিদ্রূপের। মা ও মেয়ের যৌথ জীবনযাপন প্রত্যাখ্যান করে প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সমাজের অচলায়তনকে, সমাজের মাতব্বরিকে, এমনকি আল্লাকেও। এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করা হয় চাপিয়ে-দেওয়া নানা মূল্যবোধকে। যে মূল্যবোধের পাকে পাকে জড়ানো থাকে নানা ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা এবং আত্মপ্রতারণা। বলা যায় বার বার মরতে মরতে মৃত্যুকেও শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করে মা-মেয়ে। মা-মেয়ের প্রতি সামাজিক অনাচার, নেমে আসা ফতোয়াবাজির খড়্গ, প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সামাজিকতার বিপরীত মেরুতে মা-মেয়ের অবস্থান নেয়া বা বিরুদ্ধাচরণ– প্রভৃতি বিষয়ের মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের নানামাত্রিক সঙ্কটকে প্রমূর্ত করে তোলা হয়েছে সমাজসত্যের আলোকে। আলোচ্য গল্পের কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য :

ক. গোলপাতার বনে একরকম কাদার মধ্যেই ওরা চিৎ করে শুইয়ে দিলো মেয়েকে। ... চারজনে চারবার দখল করল তাকে। চারজনের শেষ হয়ে যাবার পর প্রথমজন আর একবার। মেয়ের তাতে কিছুই যায় আসে না, তার জ্ঞান ছিলো না। লাল রক্তমাখা ঢলঢলে কালো কাদার বিছানায় সে শুয়ে রইল।

খানিক পরে মা-ও নিজেদের ঘরে মেয়ের মতোই জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে রইল। দুজনের ভাত চারজনে ভাগ করে খেয়ে শেয়াল চারটে এইবার হুক্কা-হুয়া আওয়াজ তুলে চলে গেল। ('মা-মেয়ের সংসার', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMÖn-2 : ২৮০)

খ. অনেকক্ষণ পরে মেয়ে আস্তে আস্তে বলে, মা, আয়, দুজনাই মরি। ... দুইজন কচ্ছিস কেন? চারজন ক। মেয়ে সে কথার জবাব না করে বলে, আয় মরি। আমাদের আল্লাও নেই, আজরাইল-ও নেই, জান কবচ করবে কেডা? তোর যত কথা, আজরাইল লাগতিছে কি জন্যি। চল গলায় কলসি বাঁধে ডুবে মরি। কামট্ হাঙরেই সাবাড় করে দেবেনে। নাহলি, চল, জোঙ্গলে যাই রাত্তিরে রাত্তিরে। একটা হাড়ি নেবানে, আমি বাঘ ডাকতে পারি।

কি যে কথা কস– শ্যাষে বাঘের গু হতি হবে।

আমরা তো এমনিতেই গু, তার চেয়ে ভালো কিসি! ('মা-মেয়ের সংসার', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMÖn-2 : ২৮১-২৮২)

গ. গাঁয়ের কিছু লোক মা-মেয়ের বাড়িতে আসে। এসব কি হতিছে– ওদের একজন প্রথমে মায়ের পেটের দিকে, তারপর আধন্যাংটো মেয়ের ফুলে ওঠা তলপেটের দিকে দেখায়। মা গাঁয়ের লোকেদের দিকে তাকায়। তোমার পোলার নাম মহম্মদ না? যে প্রশ্ন করেছিল তার দিকে ফিরে শুধোয় মা। তোমার পোলার নাম আশেকালি না, তোমার পোলার নাম কামাল না, আর তোমার পোলার নাম চেরাগালি না? মা আর তিনজনের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে। আমাদের পোলার নাম শুনে তুমি করবা কি? যা কই জবাব দাও। হাঁড়ি খাইয়ে চলে গেলি বেড়াল চেনবা? ... ওসব ফালায়ে দাও পেটের থে, না হলি সোমাজে থাকতি পারবা না। জেনা করলি সোমাজে থাকা যায় না। ... আল্লার আইন মানতি হবে সগ্গলের। আল্লার সঙ্গে তোমাগে কথা হয়? হ্যাঁ, হয়। সে বিটা কি হয়?

> খবরদাড় ছিনাল মাগী, মুখ সামলে কথা কবি। সে বিটা কি কয় জানা নেই না! কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতি পাথর ছুঁড়ে খতম করতি হবে তোদের। সেই বেবস্থাই কর গে তোমরা। তোমাদের পোলাগুলারেও নিয়ি আসবা। ওদের মাটিতে পোঁতবা মাথা থিকে কোমর ইস্তক। আল্লা নেই, তাই আল্লার কথা কচ্ছো। থাকলি এতক্ষণে ঠাঠায় পুড়ে কেলায়া থাকতা। ('মা-মেয়ের সংসার', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMn-2 : ২৮৩)

> ঘ. অনেক রাতে চাঁদ পুরোপুরি ঘরে ঢুকে গেলে মা আস্তে আস্তে মেয়েকে জাগায়, এইবার ওঠ্ মা, দানোটারে বাইরে শিয়েলের মুহে দিয়ে আয়। ও বাঁচে থাকলি কাল আমি জাউরা পুরুষজাতটারে দেহাতাম আমরা পারি ফুল ফোটাতি। গু-মুতের মদ্যি যারা গলা পর্যন্ত ডুবোয়ে বসে থাকে, গু-মুতের স্বপ্ন দ্যাখে, তাদের দ্যাহাতাম। ... বঙ্গোপসাগরের হাঙরেরা অপেক্ষায় থাকে। মা-মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমায়। ('মা-মেয়ের সংসার', gv-‡g‡qi msmvi, iPbvmsMn-2 : ২৮৫-২৮৯)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চালচিত্র। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারী-নিগ্রহের পাশবিক বর্বরতার নির্মম চিত্রটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে মা ও মেয়ের একই সমান্তরালে মনুষ্যরূপী শিয়ালের হিংস্র থাবায় গণধর্ষণের অমানবিক দৃশ্যপটের অবয়বে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে মাকে ধর্ষণ করার প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছে নিজের ঘরের ভেতরেই। সুতরাং আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারী যে নিজ আবাসস্থলেও নিরাপদ নয় বরং নারী সর্বদাই নির্যাতনের আতঙ্কে ভোগে– এই সমাজসত্যটিও একই সঙ্গে প্রতিভাত হয়েছে। মনুষ্যরূপী শিয়ালের মতো পুরুষের উন্মত্ত আচরণ পাঠককে এই বোধে উপনীত করে যেখানে :

> প্রতিটি পুরুষ এই ধারণার মধ্যে লালিত পালিত হয় যে, তার মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকা সমুচিত যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে বটে, কিন্তু প্রয়োজনে বাঁধন খুলে ছেড়ে দিতে হবে; এই উপাদানটি নির্যাতনের উপর পরিপুষ্টি লাভ করে। নির্যাতনের এই সামর্থ্য, এমন কি, নির্যাতনের সঙ্গে এই সাযুজ্য, প্রত্যেক পুরুষের বাহ্যিক অবয়বের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং পৌরুষের আদিম, বল্গাহীন ভিতের প্রতিভূ পরিগণিত হয়।[৭৮]

মা-মেয়ের এই অসহায় করুণ পরিণতির জন্যে সমাজ দায়ী হলেও সেই সমাজই আবার তাদেরকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে আসে। বিপর্যস্তবোধ করে মা ও মেয়ে– যা খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে যথার্থভাবে। সমাজকে প্রতিহত করার সামর্থ্য নেই মা বা মেয়ে কারোরই। নিজের অসহায়ত্বের কাছে পরাজয় মেনে নিয়েই মেয়ে তাই বার বার মরতে চায়। মা-মেয়ের জীবন এতই সস্তা, এতটাই নগণ্য যে তাদের জীবনে কোনো আলো নেই, তেল নেই, খাবার নেই এমনকি আল্লাহ পর্যন্ত নেই তাদের অসহায়-বঞ্চিত জীবনে। তারা এতটাই ভাগ্যাহত যে ঈশ্বরের আশ্রয় নেবারও উপায় নেই তাদের। মা-মেয়ের একে অপর ব্যতিত কেউ নেই, কিছুই নেই তাদের। মা-মেয়ে এক বিছানায় থাকে। তাদের আর কিছু দরকার নেই, কিন্তু বাইরের জনসমাজের দরকার আছে। দরকার আছে তাদের রূপযৌবনকে চেটে খাবার, দরকার আছে জেনা করেছে বলে তাদের

শাসানোর। এ কারণে গাঁয়ের লোক আসে তাদের বাড়িতে। তারা সমাজের মাতব্বর। তাদেরই কেউ শিয়াল, কিন্তু বাঘ সাজতে চায়। তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত মা-মেয়েকে অসহায়ত্বকেই মেনে নিতে হয়। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বিধৃত হয়েছে নারীর প্রতি সামাজিক অবদমনের সেই ভয়াবহ নির্মম চিত্র। উপায়হীন মা-মেয়ের মতোই সমাজের অগণিত মা-মেয়ের প্রতি তথা নারীর প্রতি অবহেলা-নিপীড়নের মর্মন্তুদ দৃশ্যপটের বাতাবরণে উন্মোচিত হয়ে পড়ে সেই সমাজসত্য যেখানে : 'অবহেলিত-অসহায় নারী যদিও সমাজের বাইরে থেকেই তাদের মতো করে বাঁচতে চায়, কিন্তু তাদের প্রান্তিকতা সমাজ মনে করে প্রয়োজনীয় আবর্জনা মাত্র, ব্যবহার করে যাকে ছুঁড়ে ফেলা যায়। ... পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার অধিকার প্রসারিত করতে চায় সমাজের বাইরে বেরিয়ে আসা মা-মেয়ের উপরেও।'[৭৯] যদিও গল্পটিতে মা তার প্রতিরোধের ভাষায় সমাজের অবদমনকে, নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ফতোয়াকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'জাউরা পুরুষজাতটারে দেহাতাম আমরা পারি ফুল ফোটাতি' এহেন সংলাপের দৃঢ়তায় মায়ের তথা নারীর দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়ে প্রকারান্তরে নারীর মাতৃত্বের অপার সম্ভাবনার ইতিবৃত্তকেই যেন প্রতীকায়িত করা হয়েছে। সমাজ, প্রকৃতি মা-মেয়েকে মারতে চায়, মাঝে মাঝে মারেও তবুও তারা সেই মরা থেকে ফিরে আসে। ফিরে আসে এক নিজস্ব ভুবনে। সে ভুবন, সে সংসার একান্তই তাদের। তাদের হারাবার কিছুই নেই, তাই হারাবার ভয় নেই। মা-মেয়ে তাই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমায়, কেননা তারা যেন পরাভূত করতে পেরেছে তাদের মুছে ফেলার অস্তিত্বহীন করে দেওয়ার সব চক্রান্তকে। প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সমাজবাস্তবতার অসার-ঠুন্‌কো পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে এভাবেই নিজস্ব নিয়মে প্রত্যাখ্যান করে মা-মেয়ে, যদিও : 'এই প্রত্যাখ্যানে তারা উল্টে দিতে পারে না প্রথাকে, নিয়মকে, কিন্তু তাদের সাজানো বয়ানের অসারতাকে প্রতিপন্ন করে দিতে পারে। প্রত্যাখ্যানের এই ভাষা সরব নয়, ইঙ্গিতময়।'[৮০] প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে আলোচ্য গল্পে বর্ণিত মায়ের প্রতিবিম্বে নারীর এই যে প্রত্যাখ্যান বা এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ানো, মনে হতে পারে, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর এহেন বিপ্রতীপ অবস্থান তো বাস্তব সমাজচিত্র নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই নারী সাধারণ কোনো নারী নয়, লেখকের প্রজ্ঞা আর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে এহেন প্রতিবাদী নারী সত্তা। কেননা একথা অনস্বীকার্য যে : 'নারীকেই হতে হবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা এবং পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারী পুরুষ উভয়ে মিলে হবে সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তা। জাগ্রত নারীই পারে যাবতীয় বৈষম্যের প্রতিকার চাইতে এবং পুরুষের অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে।'[৮১] নারী জাগ্রত হবে, আত্মজাগরণের অভীপ্সায় আদায় করে নেবে আপন অধিকার– এই আশাবাদই আলোচ্য গল্পের নারী-জীবনের অবয়বে রূপায়িত হয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক কুশলতায়।

Z_¨wb‡'k

১. mg‡'i ¯c kx‡Zi AiY¨ গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৬৪ সাল। হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-1-এ (দ্রষ্টব্য : হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-1, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১) mg‡'i ¯c kx‡Zi AiY¨ গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে mg‡'i ¯c kx‡Zi AiY¨ গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmsMn-1-র পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮৩

৩. আবু জাফর, nvmvb AwRRj n‡Ki M‡íi mgvRev¯ÍeZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৯

৪. চঞ্চলকুমার বোস, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা', MíK_v (সম্পাদক: চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮৮

৫. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৭. আজহার ইসলাম, evsjv‡'‡ki †QvUMí : wel‡q-fvebv ¯i¦c I wkíg~j¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫০

৮. ফজলুল হক সৈকত, 'হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের পরিবেশনশৈলী', MíK_v , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৯. বিকাশ রায়, 'দেশভাগের গল্প : হাসান আজিজুল হকের সৃজনী চৈতন্য', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

১০. মাহমুদা ইসলাম, bvixev'x wPšÍv I bvix-Rxeb, জে.কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ২৯

১১. মাসুদ রহমান, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : প্রাণিপ্রসঙ্গ', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

১২. ফজলুল হক সৈকত, 'হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের পরিবেশনশৈলী', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

১৩. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

১৪. দেবশ্রী ভট্টাচার্য, 'অবক্ষয়ের আখ্যান : হাসান আজিজুল হকের গল্প', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

১৫. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

১৬. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

১৭. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১

১৮. মাসুদুজ্জামান, 'নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন', nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, পৃ. ৪৩৪

১৯. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২

২০. AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৬৭ সাল। হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-1-এ (দ্রষ্টব্য : হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-1, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১) AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmsMn-1-র পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

২১. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫

২২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'ছোটগল্পের শিল্পরূপ : হাসানের 'আত্মজা...', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

২৩. হাসান ফেরদৌস, 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ : ফিরে দেখা', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

২৪. আবু হেনা মোস্তফা এনাম, 'মৃত্যুচিহ্নিত জীবনের বর্ণমালা', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫

২৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'ছোটগল্পের শিল্পরূপ : হাসানের 'আত্মজা ...', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

২৬. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

২৭. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেশভাগ-দেশত্যাগ', Abóc, (সম্পাদক : অনিল আচার্য), কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০

২৮. আবু হেনা মোস্তফা এনাম, 'মৃত্যুচিহ্নিত জীবনের বর্ণমালা', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

২৯. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৩০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, e×‡'e emi Dcb¨v‡m ˆbtm½¨‡PZbvi i/cvqY, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৩২

৩১. Rxeb N‡l Av¸b গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭৩ সাল। হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-1-এ (দ্রষ্টব্য: হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-1, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১) Rxeb N‡l Av¸b MvQ গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে Rxeb N‡l Av¸b গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmsMn-1-র পাঠ থেকে নেয়া হয়েছে।

৩২. চঞ্চলকুমার বোস, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৩৪. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

৩৫. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৩৬. ফজলুল হক সৈকত, 'হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের পরিবেশনশৈলী', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

৩৭. বিকাশ রায়, 'দেশভাগের গল্প : হাসান আজিজুল হকের সৃজনী চৈতন্য', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

৩৮. চঞ্চলকুমার বোস, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা', MíK_v ,পূর্বোক্ত, পৃ.৯০

৩৯. মাসুদুজ্জামান, 'নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন', nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

৪০. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৪১. bvgnxb †MvÎnxb গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭৫ সাল। হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-1-এ (দ্রষ্টব্য: হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-1, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১) bvgnxb †MvÎnxb গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে bvgnxb †MvÎnxb গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmsMn-1-র পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

৪২. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৯১

৪৪. মালেকা বেগম, evsjvi bvix Av‡›`vjb, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৮৮

৪৫. উদ্ধৃত, শাহনাজ পারভিন, evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv h‡× bvixi Ae`vb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৭, পৃ. ১৬৩

৪৬. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮

৪৭. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

৪৮. cvZv‡j nvmcvZv‡j গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৮১ সাল। হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-2-এ (দ্রষ্টব্যঃ হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-2, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১) cvZv‡j nvmcvZv‡j গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে cvZv‡j nvmcvZv‡j গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmsMn-2-র পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৪৯. চঞ্চলকুমার বোস, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ.৯১

৫০. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

৫১. সরিফা সালোয়া ডিনা, 'হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে 'উত্তরবঙ্গ' ', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

৫২. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

৫৩. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৫৪. Avgiv A‡cÿv KiwQ গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৮৮ সাল। হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-2-এ (দ্রষ্টব্যঃ হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-2, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১) Avgiv A‡cÿv KiwQ গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে Avgiv A‡cÿv KiwQ গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmsMn-2-র পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

৫৫. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৫৬. শাহনাজ পারভিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৫৭. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৬০. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬

৬১. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৬২. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৬৩. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯

৬৪. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

৬৬. †iv‡` hv‡ev গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৯৫ সাল। হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-2-এ (দ্রষ্টব্যঃ হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-2, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১) †iv‡` hv‡ev গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে †iv‡` hv‡ev গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmsMn-2-র পাঠ থেকে নেয়া হয়েছে।

৬৭. হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-2, (প্রকাশক : কমলকান্তি দাস), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, দ্রষ্টব্য : প্রকাশকের কথা

৬৮. চঞ্চলকুমার বোস, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ.৯০

৬৯. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৭০. শাহনাজ পারভিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮

৭১. gv-‡g‡qi msmvi গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৯৭ সাল। হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-2-এ (দ্রষ্টব্যঃ হাসান আজিজুল হক, iPbvmsMn-2, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১) gv-‡g‡qi msmvi গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে gv-‡g‡qi msmvi গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmsMn-2-র পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

৭২. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৭৫. সরিফা সালোয়া ডিনা, 'হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে 'উত্তরবঙ্গ' ', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

৭৬. মাসুদুজ্জামান, 'নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন', nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

৭৭. ইরাবান বসুরায়, 'মা-মেয়ের সংসার : প্রত্যাখ্যানের গল্প', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৭৮. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৭৯. ইরাবান বসুরায়, 'মা-মেয়ের সংসার : প্রত্যাখ্যানের গল্প', MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৮১. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡”Q‘

AvLZvi“¾vgvb Bwjqvm : Rxebcevn I wkí‡eva

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) বাংলা সাহিত্যে বিরলপ্রজ প্রতিভাবান শিল্পী। লেখক সমাজ বিচ্ছিন্ন কেউ নন। সমকালীন যুগপরিবেশ-রাজনীতি-সমাজ অনিবার্যভাবে লেখকের ওপর প্রভাব ফেলে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও এর ব্যতিক্রম নন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যুগমানস ও যুগসচেতনতা, সময় ও সংগ্রাম ইত্যাদিকে ধারণ করে ফর্ম, থিম ও কন্টেন্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জীবন ও তৎসন্নিষ্ঠ বিষয়কে দেশজ উপাদানের সংমিশ্রণে আমাদের মতো করে কথাসাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অন্যতম। তাঁর মানসগঠন, জীবনবীক্ষা, সমাজ-সচেতনতা ও শিল্পাদর্শ গড়ে উঠেছে সময়ের তরঙ্গাঘাতে আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও সমকালের অভিজ্ঞানে।

বৃহত্তর রংপুর তথা বর্তমান গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামে নানা বাড়িতে ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস। ডাক নাম মঞ্জু। তাঁর পিতার নাম বি.এম. ইলিয়াস ও মাতার নাম মরিয়ম ইলিয়াস। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যখন জন্ম তখন তাঁর পিতা বি.এম. ইলিয়াস বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি হাই স্কুলের হেডমাস্টার এবং বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। বাংলায় তখন ১৯৪৩-এর মন্বন্তর চলছে। পূর্ব-পুরুষের গ্রাম বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার যমুনা নদী-তীরবর্তী চন্দনবাইসা থেকে এসে ১৯৪৩-১৯৪৬ সালের দিকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পুলিশ অফিসার দাদা বগুড়া শহরের উপকণ্ঠ করতোয়া নদীর তীরে নারুলি গ্রামে বাড়ি করেছিলেন। নারুলি গ্রামেই ইলিয়াসের শৈশবের প্রথম কয়েক বছর কাটে। পিতা বি. এম. ইলিয়াস ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং দেশ বিভাগের পর প্রাদেশিক আইন পরিষদের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। পিতার সক্রিয় রাজনীতির সূত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শৈশব একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে কেটেছে।

১৯৪৬-১৯৪৮ এই সময়েই ইলিয়াসের ঢাকা-কেন্দ্রিক জীবনের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৯ সালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুল ছেড়ে তিনি কে এল জুবিলি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন ১৯৫০ সালে। তৃতীয় শ্রেণিতে না-পড়েই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন ১৯৫১ সালে। আবার স্কুল ও স্থান পরিবর্তন। রাজধানী শহর ঢাকা ছেড়ে নিজ জেলা বগুড়ায় চলে আসেন এবং ১৯৫২ সালে বগুড়া জিলা স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে

পড়ার সময় থেকেই তাঁর প্রচুর বই পড়ার নেশা এবং লেখালেখিতে হাতেখড়ি হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘সত্যযুগ’ পত্রিকায় ইলিয়াসের ছোটদের কবিতা, ‘আজাদ’ পত্রিকার ছোটদের পাতা মুকুলের মহফিলে কবিতা, গল্প ছাপা হয়েছে। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় ‘সওগাত’ পত্রিকায় গল্প ছাপা হয়েছে। বগুড়া জিলা স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে মেট্রিক পাশ করার পর ঢাকা কলেজে আই এ ক্লাসে ভর্তি হন। কলেজ জীবনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস থেকেছেন ঢাকা কলেজের নর্থ হোস্টেলে। অবিরাম গল্প লিখছেন আর পত্রিকায় পাঠাচ্ছেন এ-সময়ে। অধিকাংশই ফেরত আসে। দু’একটা ছাপা হয় তবু তাঁর চেষ্টার কমতি ছিলনা। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে আই এ পাশ করেন। ১৯৬১-১৯৬৪ সাল ছিল তাঁর শিক্ষা-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আই এ পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার আগ্রহ থাকলেও সে-বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে প্রথম বর্ষে কোন ছাত্র ভর্তি করা হয়নি বলে সমাজবিজ্ঞান পড়া হল না তাঁর। ভর্তি হলেন বাংলা সাহিত্যে। ১৯৬৪ সালে বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অবিরাম গল্পলেখা, গল্পবলা আর সাহিত্য-আড্ডার মধ্যে ডুবে যেতে থাকেন ষাটের দশকে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ছাত্রাবস্থায় লিখিত গল্পগুলোর মধ্যে mgK\j -এ প্রকাশিত ‘অতন্দ্র’ এবং ‘স্বগত মৃত্যুর পটভূমি’ উল্লেখযোগ্য। এ-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা, সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য-বিষয়ক পড়াশোনা চলেছে সমান্তরালভাবে। । আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের জীবনে আড্ডা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রিকতা লাভ করে– তা তাঁর সাহিত্যচর্চা থেকে জানা যায়। তাঁদের আড্ডায় সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, পুরাতত্ব, সিনেমা, প্রেম, সঙ্গীতসহ এহেন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা হয় না। বিভিন্ন সময়ে আড্ডার সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন খালেদ চৌধুরী, বুড়ো ভাই (মুশাররফ রসুল), আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, শহীদ কাদরী, নির্মলেন্দু গুণ, বিপ্লব দাশ, রণজিৎ পাল চৌধুরী, জামাল খান, মোহাম্মদ খসরু, ইয়াসিন আমিন, রফিক আজাদ, প্রশান্ত ঘোষাল, আসাদ চৌধুরী, মাজহারুল ইসলাম ও মাহবুবুল আলমসহ আরও অনেকেই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আড্ডার পাশাপাশি গল্প, কবিতা লিখেছেন আর পড়েছেন প্রচুর।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে। এর পূর্বে করটিয়া সা’দত কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দু-একদিন পরেই সে চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লেখক শিবিরে যোগদান করেন। ঐ বছর মে মাসে তাঁর সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হয়। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক নিযুক্ত হন। এ-সময়েই ডিসেম্বর মাসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৯৪ সালের মে মাসে তাঁর অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৭৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক 'হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৬ সালে এপ্রিল মাসে 'খোয়াবনামা'র জন্য প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বছরই 'সাদত আলী আকন্দ' পুরস্কার ও কাজী মাহবুব উল্লাহ স্বর্ণপদক-এ তিনি ভূষিত হন। ১৯৮৮ সালে পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়াবেটিস রোগ ধরা পড়ে। ১৯৯১ সালে তিনি জণ্ডিসে আক্রান্ত হন। ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাস থেকেই তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পায়ে তাঁর প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথা উপেক্ষা করে 'খোয়াবনামা' লিখছেন, প্রুফ দেখছেন। ব্যথার জন্য ডাক্তার বাতের চিকিৎসা দিচ্ছেন।

'খোয়াবনামা' লেখা শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর। ১৯৯৬ সালের ১৩ জানুয়ারি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পায়ের হাড়ে ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার্থে কলকাতা গমন করেন ২৬ জানুয়ারি। ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করে সম্পূর্ণ পা কেটে বাদ দেওয়া হয় ২০ মার্চ। ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ভোর ৬-৩০ মিনিটে ঢাকার কমিউনিটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। ফিরে গেলেন মাটির টানে– গ্রামের বাড়ি বগুড়ায়। বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া গোরস্থানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে সমাহিত করা হয় ৫ জানুয়ারি। দৈহিক জীবনাবসান ঘটলেও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অগণিত পাঠকের হৃদয়ে বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে।

ছোটগল্পলেখক হিসেবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উত্থান ষাটের দশকে। পুরো ষাটের দশক একটি অনিশ্চয়তার দশক, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দশক, নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের দশক। উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বৃহত্তর ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে যে স্বাধীনতা-আন্দোলন হয়েছে সে আন্দোলনে রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) ও মুসলিম লীগ (১৯০৬) বা সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দু ও মুসলমান এক হতে পারেনি। লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) তাই রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির প্রস্তাব করা হয়, পরিণামে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা (১৯৪৭) দেয়। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি ভ্রান্ত প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান স্বাধীন হলেও সে সময় এ স্বাধীনতা পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানদের স্বপ্নের অন্তর্গত ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তি তাদের আনন্দিত করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের কাজ শুরু হয়, শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা-ষড়যন্ত্র, সর্বত্র গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। রাষ্ট্রভাষা ষড়যন্ত্রের কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের পূর্বাংশে ধর্মের চেয়ে ভাষা ও ঐতিহ্যের সংকট বড় হয়ে দেখা দেয়। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য পূর্ববাংলার মানুষ রাজপথে রক্ত দেয়– এই রক্তপাতের ঘটনা পূর্ব-

বাংলার বাঙালিকে মানসিকভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির মৌল ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-আচারে তাঁরা হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত থাকবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে থাকেন। মুসলিম লীগের ওপর পূর্ব-বাংলার মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের আরেক অধ্যায়। সামরিক শাসনের কারণে এ সময়ে গণতন্ত্রের চর্চা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বহিষ্কারের পর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বন্দি করা হয়, কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ সংক্ষুব্ধ সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, সংবাদপত্র হারায় বাকস্বাধীনতা ও অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মী স্বীয়-রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আইয়ুব খানের শাসনামলে পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রবল হয়ে ওঠে। বাঙালিরা সরকারের উচ্চ পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামী ও বুর্জোয়া প্রভাবিত শাসকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় ছাত্রদের আন্দোলন নতুন উদ্যোমে শুরু হয়। আইয়ুব খান সরকারের কার্যকলাপের বিরোধিতা ক্রমশ আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ, অসংখ্যা নেতা-কর্মী কারাগারে, যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের অনেককে দেয়া হয়েছে বাধ্যতামূলক অবসর– এহেন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ছাত্ররা নিজেদের দূরে রাখতে পারেন নি। তাঁরা আন্দোলনে নামেন, তাঁদের হাতেই মূলত এ সময়ের আন্দোলন গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবতীয় অপশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা তাঁদের আন্দোলনের গতিকে বেগবান করে তোলেন। '৬৪ সালের ছাত্রদের ২২ দফা আন্দোলন, '৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, '৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং তার প্রতিবাদে গড়ে ওঠা তুমুল আন্দোলন অবশেষে '৬৯ এ গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। '৬৯ এর আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে কৃষক ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মধ্যে। সরকারি নিপীড়ন-ষড়যন্ত্র, ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলন-সংগ্রামের উন্মাদনায় পুরো ষাটের দশকে বাংলাদেশ ছিল মুখরিত। '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পরেও এই অস্থিতিশীল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেনি, শেষ হয়নি ষড়যন্ত্রের। বরং এই ষড়যেন্ত্রের অংশ হিসেবেই নির্বাচিত আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব-বাংলার মানুষের ওপর সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। শুরু হয় আরেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামমুখর ইতিহাসের– যে বর্বর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন, রাহাজানি, সম্ভ্রমহানি ও ঘৃণ্যতম নৃশংসতার দীর্ঘ ইতিহাসের পথ অতিক্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়। পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে তাই পুরো ষাটের দশক এক

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়কাল হিসেবে বিবেচিত। অস্থিতিশীল, সংগ্রামমুখর এ পটভূমি মানুষের মধ্যে বিশেষত মধ্যবিত্তের মধ্যে যে অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই তার গভীর প্রভাব পড়েছে এ দশকের বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর। ষাটের দশকে বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে একটি নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল, বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে রচিত এ কালের ছোটগল্পে ষাটের দশকের বাংলাদেশের উন্মাতাল, সংক্ষুব্ধ স্বরূপটি প্রকৃত অর্থেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ সময়কালে :

> একদিকে সামরিক শাসনের পেষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অবাঙ্গালী পুঁজির বিকাশ; অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই সময়কে অস্থির করে তোলে। এই সময়ে অগ্রজ গল্পকারেরা যখন গল্পের জগৎ থেকে এক প্রকার প্রস্থান করেছেন, তখন উঠে এসেছেন নতুন প্রজন্মের গল্পকারেরা। [1]

ষাটের দশকের বাংলাদেশের ছোটগল্প প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> আলোচ্য পর্বে ছোটগাল্পিকচৈতন্যে আমরা লক্ষ করি দুটি প্রবণতা। একদিকে রয়েছেন সেইসব শিল্পী, যাঁরা সামরিক শাসনের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে আশ্রয় নিলেন বেতার-টেলিভিশন-বি এন আর-প্রেসট্রাস্টের নিরাপদ সৌধে। এঁদের রচনায় এলো পলায়নী মনোবৃত্তি, ফ্রয়েড-এলিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঁরা নির্মাণ করলেন মৈথুন-সাধনার শব্দমালা। অপরদিকে আছেন সেই সব শিল্পী যাঁরা বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বাস করেও সমকালচঞ্চল জীবনাবেগ, যুগসংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, দ্রোহ-বিদ্রোহ অঙ্গীকার করে গল্পের শরীরে জ্বেলে দিয়েছেন সমাজ-প্রগতির আলোকবর্তিকা। স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বাস করেও এঁরা ছিলেন সত্যসন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল সমাজ ভাবনায় উচ্চকিত। [২]

ষাটের দশক থেকেই আধুনিক নগরায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গণজীবনের একটা অংশ ক্রমশ শহরমুখী হতে শুরু করে। কিন্তু শহরের জীবন মানুষের সমস্যাকে আরো প্রকট ও জটিলতর করে তোলে। শহরের জীবনযাত্রার অসম প্রতিযোগিতার বাহুল্যে, কদাকার ভ্রষ্টাচারে নাগরিক জীবন পদে পদে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হতে থাকে। ব্যক্তিক ও সামাজিক সমস্যার, ক্লেদাক্ত, অন্তঃসারশূন্য রূপটিকে এ সময়ের গল্পকারগণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন। জীবনের রূঢ় বাস্তবতার যথার্থ স্বরূপটি কঠোর বস্তুবাদী বিশ্লেষণে এ সময়ের ছোটগল্পকারগণ প্রতিবিম্বিত করেন তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে। পরিমার্জিত রূপকল্পের আধারে জীবনবাস্তবতার জটিল সত্যরূপের প্রকাশ ঘটাবার তাগিদেই এ সময়ের গল্পকারগণ নতুন শিল্প-কৌশল অবলম্বন করেন সুনিপুণভাবে। লক্ষণীয় :

> এ সময়ের ছোটগল্পে বাংলাদেশের নগরজীবন যেমন তার বহুমুখী জীবন জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তেমনি পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ জীবনও তার যুগোপযোগী সমস্যা নিয়ে অবলীলায় সেখানে স্থান করে নিয়েছে। তবে যুগ যে পাল্টাচ্ছে তা বোঝা যায়, যখন দেখি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা থেকে উৎসারিত জীবনের যন্ত্রণা, উদ্বেগ, অবসাদ, মর্মান্তিক আত্মনিপীড়ন এবং বাধাবন্ধনহীন উচ্ছৃংখলতাকে এ যুগের গল্পকারগণ অগ্রজদের অনুবৃত্তি করেও স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বরচিত গল্পের ধারায় বিধৃত করেছেন। [3]

স্থিতি ও স্বস্তিহীন ষাটের দশকে গল্পলেখক হিসেবে যাঁরা সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন, তাঁরা হচ্ছেন–নাজমুল আলম (১৯২৭-), সুচরিত চৌধুরী (১৯৩০-১৯৯৪), মুর্তজা বশীর (১৯৩২-), সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ (১৯৩৩-১৯৯৮), মাফরুহা চৌধুরী (১৯৩৪-), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫-), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), শওকত আলী (১৯৩৬–), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৩৯-), হাসনাত আবদুল হাই (১৯৩৯-), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-), রাহাত খান (১৯৪০-), বুলবন ওসমান (১৯৪০-), মাহমুদুল হক, দিলারা হাশেম (১৯৪১-), রশীদ হায়দার (১৯৪১-), আবদুস শাকুর (১৯৪১-), মাহবুব তালুকদার(১৯৪১-), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), আহমদ ছফা (১৯৪৩-১৯৯৯), আবদুল মান্নান সৈয়দ, সুব্রত বড়ুয়া (১৯৪৫-), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-), কায়েস আহমদ (১৯৪৮-১৯৯২-) প্রমুখ।

পাকিস্তান সৃষ্টির (১৯৪৭) পর থেকে পূর্ববাংলায় অস্তিত্বের প্রশ্ন যে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হয় তা প্রকট হয়ে ওঠে ষাটের দশকে। এই আন্দোলন-সংগ্রামের কালে সচেতন যুবসম্প্রদায় আক্রান্ত হয় নিঃসঙ্গতার বোধে, লেখক-চৈতন্যকে এই নৈঃসঙ্গ্য বিক্ষুব্ধ করে তোলে; তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীলতা- বিরোধী মনোভাব, অন্ধ-আভিজাত্য ও গতানুগতিকতার প্রতি ক্ষোভ দানা বাঁধে। অস্থিতিশীল এই ক্রান্তিলগ্নে : 'তাঁদের পরিবর্তিত লেখক-চৈতন্য বাতিল করে পুরনো সাহিত্যাদর্শের প্রচলিত রীতিনীতি। রাষ্ট্রশাসকের ভেদনীতির যথেচ্ছ ব্যবহার ও চাপে ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাংলা সাহিত্যের উওরাধিকারের পুনরুদ্ধার ঘটে এবং ষাটের লেখকেরা পাকিস্তানের সরকারি সংস্কৃতি খারিজ করে দেন।'[4] সামাজিক-রাজনীতিক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অস্থিতিশীলতা, বিদেশি সাহিত্য পাঠের প্রভাব, মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের নৈঃসঙ্গ্য ও অবক্ষয়, সংশয় ও দুরাশা, সংকল্প ও অন্তঃসারশূন্যতা– এরকম একটি অসহনীয় পটভূমিতে ষাটের দশকের গল্পকারগণ যে সব গল্প লিখেছেন তার মূল স্রোত চেতনার দিক থেকে না হলেও বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে পূর্ববতী দশকের গল্প থেকে নানাভাবে স্বতন্ত্র। উল্লেখ্য যে, পঞ্চাশের দশকের গল্পলেখকেরা আধুনিক নগরসভ্যতার পরিবর্তে গ্রামীণ গনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-যন্ত্রণাকেই তাদের গল্পের পটভূমি করেছেন। পঞ্চাশের দশকের গল্পকারগণ প্রবলভাবে জীবনবাদী ও সমাজসংলগ্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের গ্রামজীবনের নানা অনুষঙ্গের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাদের গল্পে। লক্ষণীয় :

> আমাদের ছোটগল্প এ পর্বেই প্রথম হয়ে ওঠে মৃত্তিকামূলস্পর্শী ও জাতিসত্তার শিকড়-অন্বেষী। গল্পকাররা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকরণ-পরিচর্যার প্রতিও ক্রমশ মনেযোগী হয়ে ওঠেন এ কালখণ্ডে। বিষয়াংশ উপস্থাপনার অভিনবত্ব এবং নিরীক্ষাশীল ভাষারীতি দিয়ে এ পর্বের শিল্পীরা সূচিত করে দেন ষাটের দশকে বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের প্রকরণ-প্রসাধনের ঋদ্ধ পথযাত্রা।[5]

ষাটের দশকেই আধুনিক নগরের যাবতীয় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নিয়ে ঢাকা গড়ে উঠেছিল, বিকশিত হচ্ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। লক্ষণীয় : 'এই শ্রেণী কৃষি ও শ্রমজীবী বৃহৎ মানবগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল,

অন্যদিকে অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা, অর্থাৎ জীবনের নানা বৈভব ছিলো তাদের অনায়ত্ত।'[6] একদিকে না-পাওয়ার হাহাকার, অন্যদিকে পাওয়ার জন্য নানারকম স্বার্থপরতায় বিভ্রান্ত ছিল এই মধ্যবিত্ত মানসিকতা। এই শ্রেণির মূল অবস্থান যেহেতু নগর, তাই তাদের জীবনকে গল্পের বিষয় করতে গিয়ে ষাটের দশকের গল্প প্রধানত নগর-পটভূমির গল্প হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে আধুনিক নগরের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছোটগল্পের উদ্ভব ঘটেছে এই ষাটের দশকে। নগর-পটভূমির বাইরে অর্থাৎ গ্রামকে উপজীব্য করে লেখা এ দশকের গল্পেও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নবতর মাত্রা লক্ষণীয়। পঞ্চাশের দশকের গল্পের প্রেম-ভালোবাসা, একান্নবর্তী পরিবারের বিষয়-আশয়ের পরিবর্তে ষাটের দশকের গল্পকারদের গল্পে রাজনৈতিক অবক্ষয়, হঠকারিতা, মধ্যবিত্তের আত্মদ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদ, অন্তঃসারশূন্যতা, মনোজটিলতা আর ব্যক্তির অথৈ নৈঃসঙ্গ্য জীবনসংলগ্ন ও সমাজ বাস্তবতার নিরিখে উদ্ভাসিত হয়েছে। ষাটের দশকে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে যে-সব প্রতিভাবান শিল্পী আবির্ভূত হয়েছেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁদের অন্যতম। ষাটের দশকের উন্মাতাল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছে। সমাজ ও রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের যে মনোবিকৃতি, তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তুলনা বিরল। তিনি জীবনকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাকে সেভাবে প্রকাশ করবার জন্য নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র ভাষা প্রকরণ-সৌকর্য। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৭– এই বিশ বছরে তাঁর মোট আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলো হলো : Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i (১৯৭৬) , †Lvqvwi (১৯৮২), 'afv‡Z DrcvZ (১৯৮৫), wP‡j‡KvVvi †mcvB (১৯৮৬), †'vR‡Li Ig (১৯৮৯), †Lvqvebvgv (১৯৯৬), Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj (১৯৯৭) এবং ms¯wZi fvOv †mZ (১৯৯৭) । ১৯৪৩ থেকে ১৯৯৭ প্রায় ৫৪ বছরের জীবনে তিনি মোট পাঁচটি গল্পগ্রন্থ, দু'টি উপন্যাস এবং একটি প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে AMwšZ AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm (২০০৩) নামে প্রকাশিত গ্রন্থখানি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনাসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে সাতচল্লিশের দেশভাগ, বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসন, বাষট্টির শিক্ষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ, পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সামরিক শাসন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ঘটে গেছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনায় সময় ও সমাজের প্রতিটি স্পন্দন, তার তীব্র আলোড়ন, বিকার, হতাশা ও নৈরাশ্য সবই মনস্ক পাঠক অনুভব করেন। লক্ষণীয় যে : 'সেই অনুভূতি মুগ্ধতা আনে না, ভাবাবিষ্টও করে না, তা পাঠককে বাংলাদেশের জলবায়ু-মাটি-মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়; এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-সূত্রে তার আত্মপরিচয়ের সন্ধানও করে।'[7] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বহুপ্রজ লেখক নন, প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্যসাধানায় তিনি লিখেছেন মোট তেইশটি গল্প– এমনই স্বল্পপ্রজ এই শিল্পী। কিন্তু :

'তাঁর রচনার স্বল্পায়তন তীরভূমি এক ঝাঁক সবুজের প্রাণময় স্পর্শে শিল্পসুন্দর, উজ্জ্বল ও সজীব। বাংলাদেশের আদি ও অকৃত্রিম বিষয়গুলোই গদ্যের নতুন ধারায় ও নতুন রচনাকৌশলে উজ্জীবিত হয়ে তাঁর লেখায় প্রাণ পায়।'[৪] প্রসারতা দিয়ে যেমন গভীরতা মাপা সম্ভব নয়, তেমনি লেখনীর পরিমাণগত তথ্যের ভিত্তিতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রতিভার মূল্যায়ন অসম্ভব। সংখ্যাগত হিসেবে নয় বরং গুণগত মানের প্রশ্নে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে তাঁর অবদান তুলনা রহিত।

পুরোনো ঢাকার ক্ষয়িষ্ণুতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা এবং জীবনসংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পভুবন। তাঁর গল্পের মানুষজন রাজধানী ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত অট্টালিকাবাসী থেকে শুরু করে রিক্সাচালক, ট্রাক ড্রাইভার, কবরখোদক, পাগল, নেশাখোর এবং গ্রামের সাধারণ মানুষজন, চাষি, কলু, নাপিত, মাঝি, রাজনীতিবিদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নগরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনের বঞ্চনা-অসহায়ত্ব, মধ্যবিত্তের কৃত্রিমতা অন্তঃসারশূন্যতা, অতৃপ্তি, আত্মদ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক নেতাদের হঠকারিতা, মনোবিকার ও স্বার্থপরতার চিত্রটি সমূলে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পের বিচিত্র ক্যানভাসে। পুরোনো ঢাকাকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো এমন অনুপুঙ্খভাবে আর কেউ দেখেন নি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের ভেতর একাধিক উপগল্প শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আছে। তবে এসব উপগল্পের শাখা-প্রশাখাকে বাদ দেয়ার যেমন কোনো সুযোগ নেই তাঁর গল্প থেকে তেমনি যে কোনো একটি উপগল্প সরিয়ে তার বদলে সম্পূরক কোনো অংশ সেখানে সংযোজনের উপায় থাকে না। ষাটের দশকের গল্পে কাহিনি-নির্ভরতা কমিয়ে চরিত্র-নির্ভরতার যে প্রবণতা যুক্ত হলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পেও তার প্রচ্ছাপ সুস্পষ্ট। পাঠকের বিভিন্ন প্রত্যাশা ও প্রস্তুতি, সমাজ-মানুষ-সময়ের দাবী মেটাতে সচেতনভাবেই তাঁর গল্পভুবন ধারণ করেছে নতুন বাকভঙ্গি ও উপস্থাপনার নিজস্ব প্রকরণ-সৌকর্য। নেতিবাচক দৃষ্টিতে চরিত্রের উপস্থাপনায় শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে নিয়ে আসেন ইতি বা পজেটিভে। কেবলমাত্র সজ্ঞান পাঠক ব্যতীত তাঁর গল্পপাঠ আনন্দদায়ক নয়, কেননা :

> আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প পাঠককে তীব্র অস্বস্তির মধ্যে ঠেলে দেয়। পাঠকের ভেতরে লাগাতার ধস্ নামে। বাস্তব নিয়ে গাল-গল্প, কি শাঁস খাওয়ার নামে বাস্তবের গা থেকে খোসা ছাড়ানোর বুলি কপচানো ভালো লাগলেও বাস্তবের খানা-খন্দ, কি পুঁজ-ঘা-এর মধ্যে একবার নিজেকে আবিষ্কার করে ফেললে বাস্তবকে তখন এড়িয়ে যেতে চায় মানুষ। বাস্তব হয়ে ওঠে অসহ্য। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে ওই বাস্তবের রূঢ়, রুক্ষ, দমচাপা অংশ, যেখানে জীবন নিয়ে ফূর্তি নেই, বিষাদ ও বিষণ্নতা দিয়ে ভরপুর। কোন গল্পে জীবন নিয়ে মজাকি বা ইয়ারকির সুযোগ এলো তো সেখানে তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করে পাঠকের করোটি ধরে চোয়াল ধরে চাপ দিয়ে লেখক বুঝিয়ে দেন– তাঁর গল্প মজার জন্য নয়।[৫]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রকরণ-পরিচর্যায় নিরীক্ষাপ্রিয় লেখক। ছোটগল্পের পটভূমিতে : 'অ্যান্টি-রোমান্টিক দৃষ্টিকোণে প্রাত্যহিক ভাষায় তিনি নির্মাণ করেন যাপিত জীবনের চালচিত্র। পুরোনো ঢাকার ভাষা, কুট্টিদের

খিস্তি খেউড়, আর বাখরখানি-সংস্কৃতি ইলিয়াসের গল্পে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত যেন। ... ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিতে কাহিনী-বয়ন ইলিয়াসের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'[১০] সমাজবাস্তবতার একজন অন্যতম রূপকার হিসেবে দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় পূর্বের এবং তাঁর সমকালের কোনো কোনো লেখকের সঙ্গে ঐক্য থাকলেও গল্পভুবনে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষণীয়। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অনুন্নত গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তনশীলতা এবং নগরায়ণের প্রভাব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এই গল্পকার। আঞ্চলিক জীবনের অভিঘাতগুলিকে নিপুণভাবে বিন্যস্ত করেছেন তিনি তাঁর গল্পের জগতে– নিপীড়িত শ্রেণির বিশ্বাস ও আচরণ, প্রথা ও সংস্কার, বাগার্থ ও প্রবচন, সমস্ত নিয়েই। এ প্রত্যয়ে তিনি সেই লেখক-প্রজন্মের প্রতিনিধি, যাঁরা সমাজ-ইতিহাসের ভাষ্যকার। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত প্রেক্ষণভূমি থেকে গল্প-উপন্যাসের পটভূমি তৈরি হয়েছে। অতীতের অদেখা অস্পষ্ট অতীত এখানে বাণীরূপ লাভ করেনি। সম-সাময়িক সময়, দ্রোহ-বিক্ষোভ, সমাজের বিচিত্র দ্বান্দ্বিক পরিসরই তাঁর গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্পের আধারে বাংলাদেশের নিচুতলার মানুষের জীবনের সামগ্রিক রূপের প্রতিফলন ঘটেছে। তাদের খিদে আর যৌনতা,তাদের জীবনযাত্রা, পুরুষ-নারীর যাপিত জীবন, তাদের কর্ম ও কর্তৃত্ব আর জৈবিক তাড়নার ইতিউতিকে পাঠকের সামনে নিপুণ অনুপুঙ্খে মেলে ধরেছেন আাখতারুজ্জামান ইলিয়াস। খুঁটিনাটির ভেতর থেকে গল্পে তিনি নিতান্ত ক্ষুদ্র কোনো বিষয়কেও হঠাৎ প্রতীকিত করে তোলেন অনেক বড়ো সত্যের সংকেত মূল্যে। মানুষের পেটের খিদের সংবাদ যেমন তিনি দিতে জানেন, তেমনি পুরুষ আর নারীর শরীরের খিদের গল্পকে রূপায়িত করতে গিয়ে কোথাও লাজলজ্জা বা রাখঢাকের পরোয়া করেন না তিনি। বানানো ভাষার প্রতিও তাঁর মোহ নেই কোনো। জৈব প্রবৃত্তির মনো-দৈহিক টানপোড়েনের বর্ণনায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গল্পে কখনো কখনো নির্বিকার টীকাকারের ভূমিকা অবলম্বন করেন। একভাবে তিনি শুধুই শহরমুখী কিংবা শুধু গ্রামমুখী নন বরং গ্রাম ও শহরের মধ্যে মেলবন্ধনের বা সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও তাঁর ছোটগল্পে বীত-স্বপ্ন ও অসহ-সময়ের অনুষঙ্গে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। গল্পের মধ্যে একক ব্যক্তির মাধ্যমেই গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্বের যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। অতএব আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পবিশ্ব মূলত ব্যক্তিবাদের গল্পবিশ্ব ও লেখক সেখানে সম্পূর্ণতই নৈর্ব্যক্তিক। যার অন্তরীক্ষে লুকিয়ে আছে সমাজ বা সময়ের পট ও পটভূমি। সময়, সমাজের বিচিত্র ক্যানভাসকে চরিত্রের অনুষঙ্গে প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন দীর্ঘ বাক্যগঠনে। তবে লক্ষণীয় : 'এই দীর্ঘ বাক্যপাঠে অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে তার গদ্য বিরক্তিকর হলেও সজ্ঞান হৃদয়সংবাদী পাঠক গল্পের ভেতরে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হন না।'[১১] সময়-সমাজের দহনের কালবেলাকেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমূর্ত করেছেন তাঁর ছোটগল্পের বিচিত্র ভুবনে। মূলত নিম্নবর্গীয় জীবন রূপ পেয়েছে তাঁর গল্পে, যাঁদের নিঃশ্বাসের শব্দ লেখক ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন অক্লেশে।

আন্তরিক ও নৈর্ব্যক্তিক– এ দুয়ের দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ে বহির্বাস্তবতার সঙ্গে অন্তর্বাস্তবতাকে মিলিয়ে দেয়ার এক অনন্য প্রয়াসে তাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প চেতনার বিচিত্র সব স্তরকে স্পর্শ করে অবলীলায়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের আলোচনায় সময়-সমকাল-সমাজ তাই অনিবার্যভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমরা লেখকের গল্পগ্রন্থের আলোচনার ধারাবাহিকতায় এই সময়জ্ঞান ও সমকালের প্রভাব প্রতিবেশকে বিবেচনায় রেখেছি। এই নিরিখে আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিটি গল্পের কাহিনি, চরিত্র, প্রাসঙ্গিক পটভূমি এবং সর্বোপরি লেখকরে অভীষ্টকে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছি। গল্পের আলোচনায় একদিকে যেমন জীবনের নানামাত্রিক বিচিত্র অনুষঙ্গের অন্তর্ভুক্তি আছে, তেমনি দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে নারীর অবস্থানটিকেও নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে লেখকের চেতনার আলোকে ও গল্পের বিচিত্র পটভূমির আধারে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিসরের সবদিক থেকেই যুগ যুগ ধরে নারী-সমাজ চরমভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। সময়ের বিবর্তনে সমাজে নারীর প্রতি অবমাননা ও উপেক্ষার ভাষা বা প্রক্রিয়ার হয়তো পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার আসনটি আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আজো ঘরে-বাইরে নারী দারুণভাবে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের প্রকৃত মুক্তি কখনোই নারীর অবদানকে অস্বীকার বা অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে নারী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সময়, সমাজ ও সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে সে-কারণেই নারীর প্রকৃত অবস্থানের স্বরূপ-সন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। সাহিত্য যেহেতু সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে, সে-কারণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের পটভূমিতে আমরা সমাজ-সত্যের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থান, তার হৃদয়ের গুহায়িত রহস্যের প্রতিও আলোকপাতের চেষ্ট করেছি। এর মধ্য দিয়েই অতীত থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিতে সমাজে নারীর অবস্থানটি মূর্ত হয়ে উঠবে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে ব্যাপক-পরিসরে ও বিস্তারিতভাবে কেবল নারীকেই রূপায়িত করার প্রয়াসটি হয়তো-বা নেই, তবে কখনো কাহিনির আবরণে, কখনো-বা চরিত্রের আত্মপ্রকাশের চকিত আভাসে কিংবা সংলাপের ভেতর দিয়েও নারী-চরিত্র তার প্রকৃত সত্তার সাবলীল উন্মোচন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, পুরো গল্পের কোথাও কোনো নারী-চরিত্রের সক্রিয় উপস্থিতি বা অংশগ্রহণ নেই, হয়তো-বা অন্য কোনো চরিত্রের কল্পনায় বা কোনো ম্যাগাজিন-এর ‘কভার পেজ’-এ নারী-চরিত্রের চকিত আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সেই চকিত-উদ্ভাসিত নারীচরিত্রই গল্পের মূল ভাবপ্রবাহটিকে নিয়ন্ত্রণ করে যেন আলোকসম্পাত করেছে কোনো বিশেষ সমাজ-সত্যের মর্মমূলে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাই গল্পের বিষয়বস্তু ও লেখক-প্রবণতার সঙ্গে নারী-চরিত্রের সরব বা নিরব অংশগ্রহণের প্রতিও আমাদের মনোযোগ সজাগ রাখার প্রয়াস পেয়েছি। নারী-জীবনের গুহায়িত রহস্য

উন্মোচনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটি যেমন চিহ্নিতকরণের চেষ্টা আছে, তেমনি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সময়-সমকালের প্রাসঙ্গিকতায় আমাদের যাপিত-জীবনের মধ্যেও যে আরও নানান দেখবার ও বুঝবার দিক আছে– সামগ্রিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সেই বিষয়টিকেও প্রতীয়মান করার চেষ্টা করা হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর iPbvmgM/1[12]-এ অন্তর্ভুক্ত মোট পাঁচটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। পাঁচটি গল্পগ্রন্থ যথাক্রমে Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i (১৯৭৬), †Lvqvwi (১৯৮২), ‘afv‡Z DrcvZ (১৯৮৫), †‘vR‡Li Ig (১৯৮৯), এবং Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj (১৯৯৭)। পাঁচটি গল্পগ্রন্থে সব মিলিয়ে তেইশটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, প্রখর মেধা ও সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সার্থক চিত্রায়ণ। বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ-সন্ধান করা হয়েছে। অতএব, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে নারী-জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর যে-সব ছোটগল্পে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবন অভিধার প্রতিফলন ও উন্মোচন ঘটেছে, কেবল সে-সব ছোটগল্পই এখানে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Z_¨wb‡‘k

১. আহমদ কবির, ‘স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ : প্রসঙ্গ–ছোটগল্প’, GK‡ki ceÜ 88, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৯

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡‘‡ki mwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.১৮১

৩. আজহার ইসলাম, evsjv‡‘‡ki †QvUMí : welq-fvebv, ¯i|c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩১৭

৪. সুশান্ত মজুমদার, ‘বাংলাদেশের ছোটগল্প : সাফল্য ও সম্ভাবনা’, gwU, গল্পসংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৫৮

৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡‘‡ki mwnZ¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৬. সারোয়ার জাহান, evsjv Dcb¨vm : †mKvj GKvj, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৯৬

৭. আলাউদ্দিন মণ্ডল, AvLZvi æ¾vgvb Bwjqvm : wbgv‡Y-wewbgv‡Y, মাওলা ব্রাদার্স ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ.১৪৮

৮. আজহার ইসলাম, evsjv‡`‡ki †QvUMí : welq-fvebv, ¯'i[c I wkígj¨, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭৯

৯. সুশান্ত মজুমদার, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দ্বৈরথ সমর', wjwiK (সম্পাদক : এজাজ ইউসুফী), আখতারুজ্জামান ইলয়াস সংখ্যা, ১ বৈশাখ, ১৩৯৯, পৃ. ৭৭

১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡`‡ki mwwnZ¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

১১. সুশান্ত মজুমদার, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দ্বৈরথ সমর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, iPbvmgM 1, (সম্পাদক : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস), মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

wØZxq cwi‡”Q‘

AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi †QvUM‡í bvix-Rxeb

Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i [1] প্রকাশিত হয় মে ১৯৭৬-এ। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পসমূহ– 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'উৎসব', 'প্রতিশোধ', 'যোগাযোগ', 'ফেরারী' ও 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'। ১৯৬৫-১৯৭৫ এই কাল পরিসীমায় গল্পগুলি রচিত হয়েছে। এই গল্পগ্রন্থের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে মাহবুবুল আলম যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা উল্লেখযোগ্য :

> Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i-এর গল্পগুলোর প্রধান চরিত্রসমূহ প্রবাসীর মতো দূরে দাঁড়িয়ে জীবন, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনাবলি অবলোকন করে। এগুলোর প্রতি তাদের আবেগ বা প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। গল্পগুলো পড়তে পড়তে প্রায়শ আলবেয়ার ক্যামুর Exile and the kingdom গল্পগ্রন্থের কথা মনে পড়ে। ...(যেখানে) D' Arrast চরিত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, ব্যক্তির মুক্তি বিচ্ছিন্নতা হতে উত্তরণে অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণে, সংশ্লিষ্টতায়। ইলিয়াসের গল্পের চরিত্রসমূহে এ ধরনের উত্তরণের কোনো প্রয়াস নেই এবং এ জন্যই চরিত্রগুলো সাধারণ অর্থে ইনডিভিজুয়ালই থেকে যায়, কখনই পারসোনালিটি অর্জনে সক্ষম হয় না। এরা এলেজির উপজীব্য হতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে বেমানান।[২]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন :

> ট্রাজেডি লিখবো কাকে নিয়ে? কোনো ভাঙাচোরা ব্যক্তি কি ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে? নায়ক হতে হলে মানুষ হতে হয়, এখন ব্যক্তি ছাড়া আছে কী ? ব্যক্তি আবার ব্যক্তি সর্বস্বতা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী? নায়ক হওয়ার যোগ্যতা এখন কেবল থাকতে পারে কোনো জনগোষ্ঠীর। জনগোষ্ঠীকে আমূল স্পর্শ করার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আঙুল ব্যথা হয়ে গেলো, এখন পর্যন্ত ধরতে পারিনি।[৩]

ÔAb¨ N‡i Ab¨ ¯^iÕ গল্পগ্রন্থ নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য:

> আমি যে ভাবে মানুষকে দেখি ... সমাজের ভেতরে থেকে এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলি বজায় রেখেও মানুষ কেবলই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার এলাকা ঢুকে পড়ে একটি বাড়ির ভেতর, বাড়ি গুটিশুটি মেরে ঠাঁই নেয় ঘরে, ঘর পরিণত হয় কামরাতে এবং কামরাও শেষ পর্যন্ত সংকুচিত হতে হতে রূপ নেয় কোঁচকানো শরীরে। সবাই এবং আর সবাই তার কাছে অপরিচিত এবং অস্বস্তিকর। তার দিকে কেউ হাত বাড়ায় না। তার চেয়েও বড়ো কথা, কারো হাতে তার আস্থা নেই। সব গল্পেই কোনো না কোনোভাবে এই ব্যাপারটি দেখা হয়েছে। যে কোনো স্বরের এবং যে কোনো শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার সংকট দেখা যায়।[৪]

এই যে পর্যবেক্ষণ– সমাজ ও সমাজস্থ মানুষকে দেখা তা কোনোভাবেই প্রবাসীর মতো পরোক্ষ দৃষ্টিপাতে দেখা নয়, একেবারে ভেতরে ঢুকে জনগোষ্ঠীর জীবনকে খানাতল্লাসি করে দেখা। বাস্তবত, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, বিধিবিন্যাসের পিঞ্জরে আটকে থাকা সাহিত্যের বিপরীতে দাঁড়ানোর শিল্পাদর্শ পর্যায়ক্রমে ইলিয়াসের মননে

সংশ্লেষিত হয়ে ক্ষোভ ও দ্রোহে সংঘর্ষপ্রবণ ‘লেখা’য় রূপ নিয়েছিল–– প্রচলিত সাহিত্যচর্চা ও শিল্পভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ব্যক্তির পরিবর্তে জনগোষ্ঠীকে নায়কের আসনে বসিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টাও তাঁর লেখনিতে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের প্রকৃত জীবনই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আরাধ্য। তাঁর গল্পে জীবন আপন স্বরূপে উন্মোচিত; গল্পের চরিত্রসমূহ সমবেত জনগোষ্ঠীর প্রতীক। কেউ নায়ক নয় তাঁর গল্পে। কোনো চরিত্র আলাদা গুরুত্ব পেলেও সমষ্টির একজন হয়েই পায়, তার ওপর প্রথাগত কোনো ‘নায়কোচিত’ মহত্ত্ব বা গুরুত্ব আরোপিত হয়না। একজন পাঠক জীবনে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন বটে, তা সত্ত্বেও , অনেক কিছুই তাঁর অজ্ঞাত থেকে যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই এমন অনেক ঘটনাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের বিষয়; সে সব আমাদের নির্মম বাস্তবতার সন্ধান দেয়। আমরা আহত হই, কিন্তু সেগুলোকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারি না, ধীরে ধীরে সে সব আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে।

Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প ‘উৎসব’। গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় ‘গণবাংলার’ সাহিত্য পাতায়, ১৯৭৩ সালে। বাস্তবত, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট রূপ পায় ‘উৎসব’ গল্প থেকে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই গল্পে ভিন্ন ধরনের দুটি উৎসবের বর্ণনার মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের শেষ দিকে বিকাশমান ঢাকা নগরীর মানুষের জীবনযাপনকে তাদের পরিপার্শ্বসহ তুলে ধরেছেন। এই গল্পে একই সঙ্গে ধানমণ্ডির বর্ণাঢ্য এবং পুরোনো ঢাকার পূতিগন্ধময় জীবনচিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষণীয়। বিত্তবৈভব যদিও সামাজিক মর্যাদার প্রকৃত মানদণ্ড হতে পারে না, তবুও আমাদের প্রচলিত সমাজ-প্রথায় এর স্বীকৃতি প্রচলিত। এ কারণে বিত্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় শ্রেণিপ্রথা। কিন্তু মানুষ হিসেবে সবার আসন একই জায়গায়, এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করানোর প্রয়াসেই ‘উৎসব’ গল্পের ফাঁদ পেতেছেন লেখক। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিজে বেড়ে উঠেছেন পুরোনো ঢাকায়, এ অঞ্চলের জীবনচিত্র তাঁর গল্পে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু বিকাশমান তথাকথিত অভিজাতদের ওপরও রয়েছে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। গল্পের মূল চরিত্র আনোয়ার আলি, আর্থিকভাবে তাকে নিম্নমধ্যবিত্ত বলা যায়। জীবনের কোনো স্বপ্নই বাস্তবায়িত না হওয়ায় পুরোনো ঢাকার দুর্বষহ প্রতিবেশে বসবাসকারী আনোয়ার আলির মধ্যে ঢুকে পড়ে বিকৃতি। ধানমণ্ডিতে পুরোনো বন্ধুর বৌভাতের অনুষ্ঠানে গিয়ে অতৃপ্ত আনোয়ার আলির বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ‘ভালো ভালো মেয়ে’, তাদের সঙ্গে আলাপ এবং সমস্ত বিয়ে বাড়ির আনন্দ কলরব অন্তত সপ্তাহ খানেক শরীরে সুখ উদ্রেক করবে বলে ভেবে থাকলেও নিজের সরু গলিতে ফিরে এসে মানুষ ও কুকুরের অপকর্মকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাতে দেখে সে একই সঙ্গে বিরক্ত ও দুঃখিত হয়ে পড়ে। ঘরে ফিরে স্ত্রীর শরীরে সে কোনো শিহরণ পায় না, উৎসবের সুসজ্জিত নারীদের শরীর তাকে ঘিরে রাখে। নাইটশো দেখে ফেরা কুলি মজুর, রেস্টুরেন্টে হিন্দি ছবির গান এবং একজোড়া কুকুরের রতিকর্ম শুরু হলে মধ্যরাতে এই সরুগলিতে যেন আরেক রকমের উৎসব শুরু হয়। দুই উৎসবের তুলনা করতে করতে এবং কুকুরের রতিকর্ম দেখতে দেখতে আনোয়ার আলি কামবোধ

ফিরে পায়। আনোয়ার আলি, কাউয়ুম, হাফিজ-- এরা একই সঙ্গে কলেজে পড়তো। সময়ের বিবর্তনে একেক জন একেক পেশায় ব্যস্ত হয়। কয়েক বছর পর কাউয়ুমের বিয়ের উৎসবে নিজেকে অনেক বঞ্চিত, হীন, দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করে আনোয়ার আলি। ধানমণ্ডির সুসজ্জিত উৎসবের বাড়ি থেকে ফিরে পুরোনো ঢাকায় এসে তার নিজের বাড়িতে সবকিছু যেন পানসে হয়ে যায়। স্ত্রী সালেহার সঙ্গে সে তুলনা করে-- উৎসবে অংশগ্রহণকারী নারীদের। একই সমান্তরালে ধানমণ্ডি ও পুরোনো ঢাকার বর্ণনায় লেখক দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের জীবনচিত্র এঁকেছেন। আনোয়ার, কাইয়ুম, হাফিজ প্রমুখ পুরোনো বন্ধুদের পারস্পরিক আলোচনায় সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত চিন্তাধারার ক্রমপরিবর্তনকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক। এই ক্রমপরিবর্তন, চিন্তা-চেতনার সাংঘর্ষিক বিক্ষুব্ধ অসহায় পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিকতায় এই গল্পের নারী-চরিত্রগুলোর আত্মপ্রকাশের পথটি পরিস্ফুটনের প্রয়াস পেয়েছে। গল্পের বিবরণে সালেহা, মিসেস পারভেজ, মিসেস ইশরাত হোসেন চৌধুরী, ইকবালের পাঞ্জাবি স্ত্রী, প্রমুখ নারী-চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। নারী-চরিত্রগুলো প্রায় কোনটিই পৃথক স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি গল্পে কোথাও। সমাজ-সংসার, জীবনবোধ, মানব-চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপটিকে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়েই এসব নারী-চরিত্রের উদ্ভাসন। 'উৎসব' গল্প থেকেই লক্ষণীয় হয়ে উঠে, বিধিবিন্যাসের পিঞ্জরে-ধর্মীয় অনুশাসন, রাষ্ট্রীয় আইন, প্রচলিত রীতিপ্রথা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মোড়কে সত্যকে ঢেকে রাখার বিরুদ্ধে কীভাবে সংঘর্ষে-অন্তর্ঘাতে অবতীর্ণ হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নির্মাণ। একেবারে বৈঠকি মেজাজে শুরু হয়েছে ' উৎসব' গল্পটি :

> এখন আনোয়ার আলির বেশ মুড়ে থাকার কথা। এই তো কিছুক্ষণ আগে সে বড়োলোক বন্ধুর বৌভাতের নিমন্ত্রনে ধানমণ্ডির মস্ত এক বাড়িতে গিয়েছিলো। ভিতর ধানমণ্ডির খুব সুসজ্জিত, অভিজাত ও আধুনিক বাড়ি। প্রচুর পরিমাণে ভালো ভালো মেয়ে দ্যাখা গেছে, কয়েকজনের সঙ্গে এমনকি আলাপও হলো। সমস্ত বিয়ে বাড়ির কুলীন কলরব অন্তত সপ্তাহখানেক সমস্ত শরীরে সুখ উদ্রেক করবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ওদের সরু গলির মুখে ঢুকেই আনোয়ার আলি বিরক্ত ও দুঃখিত হয়ে পড়লো। ('উৎসব', Ab¨ N‡i Ab¨¯i, iPbvmgM-1 : ২২)

'মুড়ে থাকা', 'প্রচুর পরিমাণে ভালো ভালো মেয়ে দ্যাখা', 'শরীরে সুখ উদ্রেক' ইত্যাদি শব্দবন্ধের ব্যঙ্গার্থে সংঘাতের ইঙ্গিত রেখেই এই গল্পে প্রবল ও প্রকাশ্য হয় একটি বিরোধ; তাদের ও ওদের ; ধানমণ্ডির ও পুরোনো ঢাকার; উচ্চবিত্ত অভিজাতের ও নিম্নবিত্ত নিম্নশ্রেণির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিরোধ। ধানমণ্ডির অভিজাত অধিবাসী নারীদের বর্ণনায় লেখক সকৌতুকে উপস্থাপন করেন :

> এই সেতারে মালকোষ ধরল কি হাই তুলতে তুলতে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে মন্থর আঙ্গুলে। মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আহরার এলে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল.পি চালিয়ে দিয়ে স্যোসালিজম সম্বন্ধে গল্প করছে কি নরম গলায়। আবার এরই ফাঁকে ফাঁকে সময় করে লোনলিনেসে কি মিষ্টি কষ্ট পায়। তখন আর উপায় থাকেনা, পুরো দুটো ঘন্টা এয়ার কন্ডিশনের ওপর ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে ডিউক এলিংটোন শোনে। ('উৎসব', Ab¨ N‡i Ab¨¯i, iPbvmgM-1 : ২৩)

একই সমান্তরালে গল্পে পুরোনো ঢাকার নারীদের বর্ণনাও বিধৃত হয়েছে আনোয়ার আলির ভাবনার আবর্তে :

> সালেহা বেগমের পুরু ঠোটের ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ ও একটা শাদা দাঁত নির্লজ্জ উঁকি দেয়। সালেহা বেগম তার স্ত্রী, তার স্ত্রীর ঠোঁটের কোণে লালার আভাস, সমগ্র মুখমণ্ডলে গ্রাম্যতা, কেবল গ্রাম্যতা তোতলায়। ... তার ক্ষোভ হয়, এই মেয়েটা বছর খানেক হলেও তো কলেজে পড়েছে। বিয়ের আগে এমনকি একটু প্রেম মতোনও করলো। অথচ এমন জবুথবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির ভেতর বুক নেই, পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেঢপ কোলবালিশ। ('উৎসব', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯'i, iPbvmgM-1 : ২৩)

দেশের মানুষের ওপর শোষণ চলে, জাতীয় আয়ের টাকায় বাড়ে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার চাকচিক্য; ঢাকা সম্প্রসারিত হয়। পুরোনো ঢাকায় মানুষ আর কুকুর একাকার হয়ে পড়ে থাকে। নগরীর দুই অংশের জীবনপ্রণালী যা মেরুদূরত্বে অবস্থান করে– এ গল্পে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে বিএ পাস একজন অতৃপ্ত কেরানি আনোয়ার আলি নামক চরিত্রের চোখ দিয়ে। গল্পে দেখা যায় যে, মাসের শুরুতে পকেটে টাকা থাকা সত্ত্বেও উৎসবের উজ্জ্বলতার বিভ্রান্তির ফলে স্ত্রীকে মনে হয় নিথর, অসহ্য। স্ত্রী সম্পর্কে আনোয়ার আলির ক্ষোভ :

> যতই সেক্সি হোকনা, কায়দাটা এরা ঠিক রপ্ত করতে পারেনা– এই সালেহা টাইপের মেয়েরা। অথচ পারভেজের বৌটাকে দ্যাখো। পারভেজের বৌ তো বড়ো জোর আই এ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। বিয়ের সময় কলেজে কেবল ভর্তি হয়েছিল, পরে আই এ কি আর পাস করেছে? অথচ দ্যাখো তার কথা বলবার ঢং কি, কি তার তাকাবার কায়দা। ('উৎসব', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯'i, iPbvmgM-1 : ২৭)

উৎসবে দেখা সম্ভ্রান্ত অনেক বন্ধুপত্নীকে প্রত্যক্ষ করার পরে স্ত্রীর সঙ্গে আনোয়ার আলির তুলনা করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় এই গল্পে , তাতে মূলত সমাজে শ্রেণি-বিন্যাস ও শ্রেণি-ব্যবধানই প্রকারান্তরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উৎসব থেকে ফিরে স্ত্রী সালেহাকে দেখে তাই আনোয়ার আলির কেবল বিরক্তি বাড়ে। স্ত্রীকে স্পর্শ করে মনে হয় হাতে গ্লাভস পরে আছে। সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পাড়ার কুকুরের সঙ্গে নিজের এলাকার সরু গলির কুকুরের প্রসঙ্গে তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে শ্রেণি বিভাজনের স্বরূপটি আর একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> কুকুর কি আর ওদিকে নেই? ওদিকেও আছে। বিয়ে বাড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন। কি গম্ভীর তাঁর মুখ, কি তারঁ চেহারা। কি ডাঁটে দাড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছিলেন মৃদু মৃদু। মনে হয় বাঙলা ফিল্মের জমিদার বাবু দোতলার ব্যালকনিতে ডেক চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছেন। এইসব কুকুর দেখলেও মনের মধ্যে ভক্তিভাব জেগে ওঠে। আর দ্যাখো, পাড়ার কুত্তার বাচ্চাদের এক বার দ্যাখো! সবগুলো শালা নেড়ি, গায়ে লোম নেই এক ফোঁটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কঁই কুঁই গোঙ্গায়। একেকটা আবার কোন কোন ছোটো লোকের বাচ্চার মতো যা তা খেয়ে ধ্যাবড়া মোটা হয়েছে, তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে। ('উৎসব', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯'i, iPbvmgM-1 : ২৩)

পাড়ার এই নেড়ি কুকুরের বিবরণের সমান্তরালে স্ত্রী সালেহা উপস্থাপিত হয় নির্মম বিবরণে : 'কলতলায় দুটো ইটের ওপর ধ্যাবড়া দুটো পা রেখে সে এখন গ্যালন খানেক পেচ্ছাব করবে। মেয়েমানুষের এরকম বারবার

পেচ্ছাব পায়খানা করা, দলা দলা থুতু ফেলা এসব আনোয়ার আলির মনঃপুত নয়। তো কি আর করা যাবে? এসব মেয়েমানুষ শোধরায় না কোনো দিন।' ('উৎসব', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i, iPbvmgM-1 : ২৩) পাড়ার অধিবাসীদের রুচি সংস্কৃতিতে আনোয়ার আলি বিরক্ত,অথচ স্ত্রী সালেহার সঙ্গে আচরণে তার নিজের রুচি হীনতা প্রকাশ পেয়েছে। আনোয়ার আলি ভাবে ' প্রাকনিদ্রা রতিক্রিয়া'র জন্য তাকে এখন 'অন্তত মিনিট বিশেক' সালেহাকে ভালোবাসার অভিনয় করতে হবে। তার ভয় হয়, সালেহা তার মূল্যবান কল্পনাময় রঙিন সন্ধ্যেবেলাটা হয়তো বা তছনছ করে ফেলবে। 'ভালো ভালো' মেয়ের সুখস্বপ্নে বিভোর উৎসব ফেরত আনোয়ার আলির কাছে সালেহা সুখভোগের একটা উপলক্ষ মাত্র, সুখ কেবল আজ তার ঐসব সুসজ্জিত, শিক্ষিতা নারীদের কল্প-ভাবনায়। আনোয়ার আলির ভাবনার আবর্তে সালেহা চরিত্রের এহেন উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে লেখক যেন সমাজে বিদ্যমান দাম্পত্য-সম্পর্কের টানাপড়েনকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। তাই বলা যায় : 'দাম্পত্য সম্পর্ক, সম্পর্কের ভণ্ডামি ও অসতর্কতাকে এতটা উদোম করে দেখানোয় কেউ কেউ অস্বস্তি ও বিচলিত বোধ করেছেন।'[৫] কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ব্যক্তিকে, ব্যক্তির ব্যাধিকে, তার সম্পর্কের বিন্যাসকে রূপায়িত করেছেন শ্রেণির প্রেক্ষাপটে ও শর্তে– সেই স্বরূপ উন্মোচনে কোনও মিথ্যে আবরণ বা দূরগামিতা কিংবা রোমান্টিকতা নেই– এ যেন একেবারে নিষ্ঠুর শল্যব্যবচ্ছেদ। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত আনোয়ার আলি যেখানে থাকে, সেই সরুগলির মধ্যরাতের জীবন চিত্রের বর্ণনায় দেখা যায় :

> জনতা কুকুরটি দ্যাখার উৎসবে মুখর, তারা নানা ভাবে কুকুরদের উৎসাহিত করে। বড়ো রাস্তার উচু রোয়াকে জুয়াড়িদের আড্ডা থেকে কে ১টি গানের কলি ভাঁজছে, ১টি জনপ্রিয় গানের প্যারোডি, 'এই কার্তিক মাসে, দুই কুকুর এসে'– কিন্তু এই আড্ডা থেকেই আরেকটি উচ্চকণ্ঠ ধ্বণি ওঠে, 'আব্বে হালায়, এক খামচা নিমক লইয়া আয় না বে। নিমক দিলেই তো ছুইটা যায় গিয়া; যা না পিচ্চি, লইয়া আয়না হালায়, কইতাছি নিমক দিয়া ফালা!' ফলে গানের বাকি অংশ আর শোনা যায়না। কিন্তু কে যাবে লবণ আনতে? কেউই তার অবস্থান পরিবর্তন করতে চায়না। ('উৎসব', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i, iPbvmgM-1 : ৩০)

এর ফলে, এই পরিবেশে, উচ্চবিত্ত উৎসবের স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসা, ছা-পোষা কেরানি আনোয়ার আলিকে এদেরই স্তরে নেমে আসতে হয় । বি এ পাস লেবেল কোন কাজেই আসেনা, এক অন্তর্দহন বাড়ানো ছাড়া। কলেজ জীবনের তারুণ্যের স্বপ্নের ভাঙন, রাজনৈতিক অবক্ষয়, একদিনকার সমাজতন্ত্রীদের ধানমণ্ডিতে সুদৃশ্য প্রাসাদের মালিক হওয়া, নিজের অভাবগ্রস্ত মলিন সংসার, দুর্বিষহ প্রতিবেশ, স্ত্রী সালেহার আনস্মার্টনেস– সব মিলিয়ে যে বিবমিষা-ক্ষোভ-অস্বাভাবিকতা আনোয়ার আলির মধ্যে জেগে ওঠে, সে অপ্রীতিকর , অস্বাভাবিক অবস্থায় মধ্যরাতে কুকুরের রতি-উৎসব দেখে নিজের মধ্যে কামোত্তেজনা ফিরে পায়, বা ফিরিয়ে আনা ছাড়া তার হয়তো আর কোনো উপায় থাকেনা। এভাবেই কুকুর, বস্তিবাসী, বি এ পাশ স্বপ্নাহত আনোয়ার আলিরা একাকার হয়ে ওঠে 'উৎসব' গল্পে । জীবনের ঐ বিপ্রতীপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষকে শুধু অসুখী ও অভাবগ্রস্তই

করেনা, একই সঙ্গে অসুস্থ ও মনোবিকারগ্রস্তও করে তোলে। এই গল্পে লেখক কেবলমাত্র আনোয়ার আলির রাবার গ্লাভস খুলে নিয়েই ক্ষান্ত হন নি, আনোয়ার আলির চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভদ্রলোকদের স্বভাবসুলভ শরীর থেকে চামড়া তুলে নিয়েছেন :

> মানুষ সম্পর্কে মোহহীন দৃষ্টির জন্যেই হোক আর মানুষের প্রতি দমিত ভালোবাসার জন্যেই হোক, এটা বলতে হয় যে, উল্টোপথ ধরেছেন বলেই ইলিয়াসকে যেতেও হয়েছে শেষ পর্যন্ত। যেন দাতঁভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন মানবিকতাবিলাসীদের। চোখ বন্ধ করে ইটপাটকেল ছুড়েছেন দয়া, মায়া, বাৎসল্য, পরোপকারিতা , মহত্ব, আত্মত্যাগ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ন্যাকা সাহিত্য আর ভণ্ড সমাজের দিকে। বাংলা সিনেমার প্রেমঘন মুহূর্তে নায়কের পাছার কাপড় খুলে জল বিছুটি দেবার মতো ব্যাপার। বলাই বাহুল্য, বাড়াবাড়ি হয়েছে। বাড়াবাড়ির জবাবে বাড়াবাড়ি। উল্টো রোমান্স কতদুর যেতে পারে দেখুন, বড়োলোক বন্ধুর বাড়িতে নেমতন্ন খেয়ে এসে সেখানকার আলো, খাদ্য , মেয়েমানুষ ইত্যাদি আর ভুলতে পারছেনা আনোয়ার আলি। নিজের স্ত্রীকেও স্থুল অশ্লীল লাগছে। এ পর্যন্ত স্বাভাবিকই। কিন্তু এটা ভাবা কি চরম নয় আনোয়ার আলির পক্ষে যে তার স্ত্রী দুটো ইটের উপর ধ্যাবড়া পা রেখে গ্যালন খানেক পেচ্ছাব করবে। মেয়েমানুষ বারবার বাথরুমে যাওয়াও তার পছন্দ নয়। এর পরেই কিন্তু ইলিয়াসের ক্রোধ আর ক্ষোভ ফেটে পড়ে যখন দেখি কুকুরের মৈথুন দেখে এসে তবে আনোয়ার আলি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে রমনে প্রবৃত্ত হতে পারে। ভয়ানক প্রতিশোধ কি শোচনীয় আত্মহনন, কি প্রচণ্ড ঠাঠা উচ্চ হাসি চোখে জল এসে যায়। এ তো শুধু নারীদেহ ছিন্নভিন্ন করা নয়, আমাদের সমাজকে, দাম্পত্য বন্ধনকে, পারিবারিক পবিত্রতাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য, স্নেহ এক কথায় তেল গড়িয়ে পড়া মানবিকতার ধারণাকে মুগুর দিয়ে চুর্ণ করেছেন ইলিয়াস। মানুষ আর কৃমিকীটের অস্তিত্বের মধ্যে কোন তফাৎ করতে চাননি। মধ্যবিত্ত সঙ্কীর্ণ জীবনকে তিনি জুতোপেটা করেছেন। মনে হয়, এই অমানবিকতা অনড় ও অপ্রতিকার্য।[৬]

'উৎসব' গল্পটি আধা বুর্জোয়া ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা ঢাকা নগরীর এক প্রান্তের সমৃদ্ধি, অন্যপ্রান্তের পচন এবং এ দুইয়ের দর্শক ও শেষোক্তটির ভোক্তার মনোবিকারের বিশ্লেষণ দিতে দিতে নগরীর মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও মিথ্যে অহঙ্কারের ঠুনকো আস্ফালনকেও তীব্র ব্যঙ্গ করেছে। ফলে গল্পে উল্লিখিত সালেহা, মিসেস পারভেজ, মিসেস ইশরাত হোসেন চৌধুরী, ইকবাল সাহেবের পাঞ্জাবি স্ত্রী প্রমুখ নারী চরিত্রের সমাবেশ যেন সামগ্রিক ঘটনার সাযুজ্যে রূপায়িত হয়েছে। নারীচরিত্রগুলো গল্পে প্রেক্ষাপট, বিষয় আর লেখকের চেতনার গভীরতম সত্তাটিকেই প্রমূর্ত করেছে। নবোদিত স্বপ্নাহত মধ্যবিত্ত-শ্রেণি এবং একই সঙ্গে শ্রেণি-ব্যবধান জনিত বিবমিষাকে যথার্থভাবে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করাতে এসব নারী-চরিত্র পটভূমি বা প্লট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

Ab¨ N‡i Ab¨ ¯'i গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'প্রতিশোধ' । প্রতিশোধের স্পৃহা মানুষের মনের ভেতর বাসা বেঁধে থাকে। সময় ও সুযোগমত এর প্রতিফলন ঘটে। আব্দুল গনি সাহেবের দুইপুত্র, এক কন্যা, ওসমান, আনিস এবং রোকেয়া। অসুস্থ গনি সাহেবকে দেখতে আসে ওসমান। এসে দেখে বোনের হত্যাকারী ঘাতক স্বামী আবুল হাশেমের শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি বাগিয়ে নেবার চেষ্টা। এদিকে আবার আবুল হাশেম বিয়ে করেছে নার্গিসকে, যার সঙ্গে ওসমানের বিয়ের কথা হয়েছিল এবং নিজে পছন্দ করতো নার্গিসকে। ঘটনাচক্রে আনিস ও আবুল হাসেমের ছিল গভীর হৃদ্যতা অথচ আনিসের একটি কথাতেই প্রতিশোধস্পৃহা জেগেছিল ওসমানের

Dhaka University Institutional Repository

মনে। এরকম এক দ্বন্দ্বমুখর কাহিনিই 'প্রতিশোধ' গল্পের মূল বিষয়। নারীর সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও বৈষয়িক সম্পত্তি নিয়ে সংঘাত সৃষ্টির কারণ এবং পরাজিত মানুষের জয়ী হবার যে স্পৃহা যুগে যুগে বয়ে চলে এই পৃথিবীতে, সে কাহিনীরই সফল চিত্রায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। ১৯৭১-৭৫ সময় কালের পরিসীমায় সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গল্পের পটভূমি নির্মিত হয়েছে; এই সময়ে সদ্যস্বাধীন দেশের মানুষের মনে আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। দেশের মধ্যে নানা অরাজকতা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দল মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেনি এ উপলব্ধি অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল হতে থাকে। ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক শক্তির অপব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন মতাবলম্বী এবং সাধারণ মানুষ লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হতে থাকে। 'প্রতিশোধ' গল্পে এই রাজনীতি লালিত সুবিধাবাদীদের আনাগোনা আনিস চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ গল্পে মূলত মধ্যবিত্ত যুবক ওসমানের মানসিকতা, আস্ফালন, তাঁর নানা পরিকল্পনা ও ব্যর্থতাকে তুলে ধরাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্ত তাতেও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সমকাল-বর্তমান-প্রতিবেশ থেকে বিচ্যুত হননি; ওসমানের প্রতিশোধস্পৃহা ও ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রতিবেশ-রাজনীতিও জায়গা করে নিয়েছে। গল্পে বর্ণিত নারী চরিত্র রোকেয়া, নার্গিস– এরাও কাহিনীর বিভিন্ন বাঁকের সঙ্গে জড়িত থেকে ওসমানের মানসিক বৈকল্য এবং সমকালের সমাজ-রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত। গল্পে এইসব নারী চরিত্র পৃথক কোন সত্তায় বা প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি; বরং ওসমান, আনিস, আবুল হাসেম প্রমুখ চরিত্রের মানসিক-মানবিক সঙ্কটকে প্রকটিত করেছে মাত্র। ওসমানের সঙ্গে নার্গিসের বিয়ে হবে, সবাই এটা জানতো, অথচ হাশেম নিজের বউকে মেরে নার্গিসকে বিয়ে করার পরেও ওসমান কিছুই করতে পারেনি। গল্পে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এভাবে : 'তুমি একটা এ-ক্লাস কাওয়ার্ড। তোমার সঙ্গে নার্গিসের বিয়ে হবে। এভরিবডি নিউ ইট। তাইনা? তোমার বৌকে আরেকজন লোক ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করবে, কিলিং ইওর সিস্টার, আর তুমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে? এটা কি তোমার ম্যাগনানিমেটি? না কাওয়ার্ডলিনেস? এসব কি?' ('প্রতিশোধ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i , iPbvmgM-1 : ৩৯) গল্পে দেখা যায়, আবুল হাশেমকে বলবার জন্য ওসমান ঝাঁঝালো একটা জবাব তৈরি করে, তবে মনে মনে : 'তুমি আমার বোনের মার্ডারার। ঐ নার্গিসকে বিয়ে করার লোভে গাড়ি এ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে আমার বোনকে খুন করেছো।' ('প্রতিশোধ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i , iPbvmgM-1 : ৩৭) আসলে ওসমান কিছুই করতে পারেনা। সে একটি স্বপ্ন দেখে, এবং আবুল হাশেমকে খুন করবার পরিকল্পনা করে–– কোনটিই তার বীরত্বের প্রমান দেয়না; বরং তার ভীরুতা,সংশয়, কাপুরুষত্ব ও অসহায়ত্বকেই মূর্ত করে তোলে–– কেননা, প্রতিশোধ স্পৃহার কথা ভাবতেই :

> ওসমানের পাচঁটা আঙ্গুল শূন্যে কী সব লিখলো। তার চোখের সামনে গাঁথা রয়েছে ১টা রড। বেশ বড়ো ফ্যামিলি সাইজের লোহার রড। বাঃ ! এইতো আবুল হাশেমের মাথা ফুঁড়ে দিব্যি ভেতরে ঢুকে গেলো। রক্ত বেরুচ্ছে ফিনকি দিয়ে ; সমস্ত ছাদ,

> পাখার ব্লেড, ছাদের সিলিং সব লাল। ওসমান আস্তে আস্তে তার নিজের মাথার তালুতে হাত চাপা দিলো; ১ সেকেন্ড পর শুকনো হাতটা মাথার ওপর থেকে টেনে নিয়ে ঝুলিয়ে দিলো তার পাশে। না, হাত কেবল উঠবো উঠবো করে। ('প্রতিশোধ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i , iPbvmgM-1 : ৪১)

ট্রাফিক জ্যাম-এ পড়ে পুরোনো ঢাকার অলিগলি ও ভিড়ে ঠাসা রাস্তা ধরে আসতে আসতে ওসমান ভাবে, এখন সঙ্গে যদি আবুল হাসেম থাকতো তবে কলার দাম দেখার ফুরসতে এক ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেয়া যেত ধাবমান ট্রাকের তলায়। আবার এই ভাবনাও তাকে পেয়ে বসে যে, সিগ্রেট কেনার ফাঁকেও তো ট্রাকের নীচে ধাক্কা মেরে আবুল হাশেমকে ফেলে দেয়া যেত। তার ভাবনায় : 'শালার একটু ইন্টেলেকচুয়াল, একটু পলিটিক্যাল, একটু কালচার্ড ও একটু কমার্শিয়াল মুণ্ড ট্রাকের চাকায় চমৎকার ডিসেকটেড হয়ে যাবে।' ('প্রতিশোধ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i , iPbvmgM-1 : ৪৪) কৌতুকে-দ্রোহে আবুল হাশেমের বিরুদ্ধে ঘৃণা উগরে দিলেও ওসমান প্রতিশোধ নিতে পারেনা । জিঘাংসার বশে ওসমান আস্ফালন করলেও খুনের অলীক কল্পনা ছাড়া বাস্তবে কিছুই করতে পারেনা, করা সম্ভবই নয় তার পক্ষে-- মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই মিথ্যে-আস্ফালন ও প্রতিশোধস্পৃহা এভাবেই নানা দৃশ্যকল্পে রূপায়িত হয়েছে 'প্রতিশোধ' গল্পে। ওসমানকে এক রকম সংশয়ের মধ্যে রেখেই গল্পটি যেন বিন্যস্ত হয়েছে। ফলে ছাদ থেকে আবুল হাশেমকে নিচে ফেলে দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। ওসমান চরিত্রে লোভ আছে, জ্বালা আছে; সাহস , শান্তি, স্বস্তি ও সুখ নেই। তাই তার মতো মানুষদের কেবল ঘরের আঙিনায় ঘোরাফেরা করতে হয়, বাঁচতে হয় স্বপ্ন-স্মৃতি আর ব্যর্থ 'প্রতিশোধ পরিকল্পনার' সমাহার নিয়ে। প্রবল অব্যবস্থার শিকার হয়ে ওঠে এই শ্রেণির মানুষ, কিন্তু তাকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে তাদের চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অস্বাভাবিকতা। সমকাল- প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এসব মনোকল্পনা বিলাসী চরিত্রের অভ্যন্তর দিয়ে ব্যক্তির শ্রেণির অসহায়ত্বের রুক্ষ বিবর্ণ রূপায়ণ 'প্রতিশোধ' গল্পটি। রোকেয়া, নার্গিস– এসব নারী চরিত্র প্রাসঙ্গিকভাবেই তাই পৃথক সত্তায় নয়; বরং পরিপাশ্বর্কে প্রোজ্জ্বল করতেই সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ বলা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার, বাঙালি জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী ধারার মিশেলে যে সমাজবাস্তবতা, যেখানে মানবতা প্রতিমুহূর্তে বিপন্ন অসহায়, রুগ্ন– তারই সমান্তরাল ভাবপ্রবাহে এই গল্পে নারী-চরিত্রের যথার্থ উন্মোচন বা সমাবেশ প্রশংসনীয়।

Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'যোগাযোগ'। ছোট বড় ঘটনা ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্জগতে কীভাবে, কতটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, বহির্জগতের ঘটনাপ্রবাহ মনোজগতে যে ভিন্ন ধরনের এক বাস্তবতার জন্ম দেয়, তারই এক নবতর শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটেছে 'যোগাযোগ' ছোটগল্পে। ব্যতিক্রমী এই গল্পটির নির্মাণ-সৌকুমার্য ছাপিয়ে তার শিল্প-প্রণোদনাই মনস্ক পাঠককে আকৃষ্ট করে বেশি। সমাজের নানা টানাপড়েন ও রাজনীতি-কবলিত মানুষের দুঃসহ জীবনযাপনের বাইরে একেবারে ভিন্নমাত্রার এক আমেজ এই গল্প-পাঠে

অনুভূত হয়। সন্তানের প্রতি প্রত্যেক মায়েরই থাকে গভীর মমত্ববোধ। সন্তানের কোন দুর্ঘটনা বা বিপদ যে কোন মায়ের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মা ও সন্তানের মধ্যকার শাশ্বত মাতৃত্বের সম্পর্কের গভীর উপলব্ধিই 'যোগাযোগ' গল্পের প্রেক্ষাপট। রোকেয়া তার আদরের ছেলে খোকনকে রেখে তার বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে যায় অসুস্থ মামাকে দেখার জন্য। তার মায়ের স্মৃতি বিজড়িত মামার বাড়িতে মৃত মাকে সে খুঁজে পায় আত্মীয়স্বজনদের কথায়, মায়ের হাতে লাগানো গাছে। এমনকি বাড়ির প্রতিটি কোণে সে আবিষ্কার করে তার মাকে। রোকেয়ার স্কুল পড়ুয়া ছেলে খোকনের দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে আহত হবার টেলিগ্রাম পেয়ে ঢাকায় ফেরার জন্য উতলা হয় রোকেয়া। ঢাকায় এসে হাসপাতালের বেডে সাদা চাদরে শুয়ে থাকা খোকনকে না-দেখা পর্যন্ত মন শান্ত হয় না তার। ফেরার পথে ট্রেনে স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ঢাকায় ফিরে আসে রোকেয়া। সন্তানের প্রতি মায়ের (খোকন ও রোকেয়া) এবং মায়ের প্রতি সন্তানের (রোকেয়া ও তার মা) সম্পর্কের যে গভীরতম চিত্র এঁকেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই গল্পে তা একান্ত বাস্তব ও স্বাভাবিক। তবে এই স্বাভাবিক বাস্তব কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন যাত্রাপথের চিত্র, শহর ও গ্রামীণ সমাজের সরস ও নীরস বাস্তব-কঠিন জীবনালেখ্য। এই গল্পের নারী-চরিত্রের মধ্যে রোকেয়া, রোকেয়ার মা নুরুন্নেসা, রোকেয়ার ননদ সিতারা, রোকেয়ার মামী প্রমুখের উপস্থিতি লক্ষণীয়। সম্পূর্ণ গল্প যদিও রোকেয়া ও তার পুত্র খোকনকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয়েছে, তবুও ঘটনা প্রবাহে, ঘটনার বিস্তৃতি ও পরিপূর্ণতা দানে অপরাপর নারী-চরিত্রের ভূমিকা একেবারে কম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এ-গল্পে চিরন্তরণ মাতৃহৃদয়ের আকুলতা ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষনীয়। সন্তানের কাছ থেকে দূরে এসে সন্তানের জন্য মায়ের যে ভাবনা-বেদনা, তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা আছে এ গল্পে। সুশান্ত মজুমদার যথার্থই বলেছেন : ' 'যোগাযোগ' গল্পের রোকেয়ার সন্তান বাৎসল্য পাঠককে অনায়াসে শুষে নেয়।'[৭] একই মন্তব্য পাওয়া যায় ড. সায়েদা বানু ও আলেয়া বেগম-এর কণ্ঠে। ড. সায়েদা বানু বলেন : 'যোগাযোগ' গল্পটি অসহায় মাতৃত্বের বাস্তব চিত্র।'[৮] আলেয়া বেগমের মতে : 'যোগাযোগ' গল্পে দেখা যায় মমতা আর বাৎসল্যের এক অনুপম প্রকাশ।'[৯] মাতৃ-হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় অন্তঃস্থল, যেখানে সন্তানকে ঘিরে বাৎসল্যের প্রবল আলোড়ন চলে, তার স্বরূপ উন্মোচনে গল্পের শুরুতেই এক কুহকী পরিমণ্ডল নির্মিত হয় :

> রোকেয়া, অ- রোকেয়া, আর কতো ঘুমাইবি? কাইন্দা কাইন্দা পোলার তর শ্বাস বন্ধ হয়। উঠলি? অ রোকেয়া !
>
> খোকনের একটানা কান্নার সঙ্গে মায়ের ডাক শুনে রোকেয়ার স্বপ্ন ও ঘুম ছিঁড়ে বড়ো এলোমেলো হয়ে গেলো।
>
> হায়রে কি কালঘুমেই না পাইছিলো আমারে! পোলায় না জানি কখন থাইকা কান্দে! দুই চোখ খুব টান টান
>
> করে খুলে সোজা হয়ে বসলে তন্দ্রার সঙ্গে তিন বছর আগে মৃত মা-ও জানলা দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ে। ('যোগাযোগ', Ab¨
>
> N‡i Ab¨¯i, iPbvmgM-1 : ৪৭)

আবার এরকমই এক কুহকী পরিবেশের সৃষ্টি হয় যখন রোকেয়া মামাবাড়িতে গিয়ে সজনে তলায় তার মৃত মাকে অবলোকন করে :

> হঠাৎ দ্যাখে, অন্যদিক থেকে শাদা শাড়ি পরা অল্প বয়সী একটি মেয়ে বেগুন খেত পার হয়ে বাঁশ ঝাড়ের পথ ধরলো। রোকেয়ার বুকের মধ্যে শির শির করে ওঠে। ঠায় দাঁড়িয়েই রইল সে। বাঁশ ঝাড়ে চাঁদের ময়লা রঙ আলো। বাঁশঝাড় পার হয়েও মেয়েটা একটুও থামে না। এ কে? খুব কাছাকাছি চলে এলে রোকেয়া শুনলো মেয়েটা বলছে, 'রোকেয়া, তর পোলায় কেমুন আছে ?' মায়ের কণ্ঠস্বরে খুব চমকে উঠে ও তখন চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখে না, কোথাও কেউ নেই। ('যোগাযোগ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i, iPbvmgM-1 : ৫১)

চোখের সামনে না থাকার ফলে মামার বাড়িতে এসে ছেলের অমঙ্গল চিন্তায় সে কাতর হয়ে পড়লে এক ধরনের অপ্রকৃতিস্থতায় থেকে রোকেয়ার পক্ষে অবাস্তব দৃশ্য দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে। ছেলের দুর্ঘটনার খবর শোনার পর মামার বাড়িতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রোকেয়ার মনে হয়, সে ট্রেনে চেপেছে। রেললাইনের পাশের টেলিগ্রাফের গা ঘেঁষে সে মৃত মা-কে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং জীবিত স্বামীকে উবু হয়ে মাটি খুঁড়তে দেখে। শুনতে পায় মায়ের কণ্ঠস্বর : 'রোকেয়ারে, মারে মা, আইছস তুই ? এতো দেরি করলি মা? চাইরটা ঘণ্টা আগে আইলেও তো পোলাডার মুখে পানি দিবার পারতি !' ('যোগাযোগ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i, iPbvmgM-1 : ৫২) সন্তানের জন্য ব্যাকুল রোকেয়াকে সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে তার মৃত মা যখন নিজের সন্তানের কথাই জিজ্ঞেস করে, তখন সহজেই বোঝা যায়, এ জিজ্ঞাসা সন্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ রোকেয়ার নিজের ভেতর থেকেই উত্থিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে পুত্রের আহত হওয়ার সংবাদ শোনার পর তার মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং অবাস্তব দৃশ্য দেখার পালা বেড়ে চলে। তার মনের অবস্থা সে কাউকে না জানালেও আচরণ ও মনোবিশ্লেষণে তার অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। সাধারণ বিবেচনায় এ গল্পে অনেক অবাস্তব দৃশ্য বা ভাবনার অবতারণা হলেও প্রকৃতপক্ষে, চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের শাশ্বত অনুভূতির নিরিখে সে সব অতিপ্রাকৃত বা অবাস্তব ঘটনাবলি আর অর্থহীন মনে হয় না, বরং মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে সংঘটিত এসব ঘটনাকে রোকেয়ার অন্তর্গত বাস্তবতা বলা যেতে পারে। চিরন্তন মাতৃ-হৃদয় তার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, আনন্দ দুঃখ সবকিছুই তার সন্তানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চায়। যে গৃহকর্মী কোনো বাড়িতে কাজ করে ভালো-মন্দ কোনো খাবার বা উপহার পায়, সেটাও সে একাকী ভোগ করে না, করতে পারে না, সেই খাবারের সামান্য একটু অংশ গোপনে সযত্নে সে তার সন্তানের মুখে তুলে দিবে বলে রেখে দেয়। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়াবার মধ্যেই অপত্য মাতৃ-হৃদয় স্বস্তি, শান্তি খুঁজে পায়। এই গল্পে রোকেয়ার মধ্যেও সেই চিরন্তন মাতৃহৃদয় বার বার জেগে ওঠার প্রয়াস পেয়েছে। মামাবাড়িতে যাওয়ার পথের দৃশ্য অবতারণায় এরকম একটি পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয় :

> স্বরূপখালি স্টেশনে নেমে যখন নৌকায় ওঠে তারো আগে থেকে শৈশবের অল্প অল্প চেনা গোরুবাছুর, সবুজ ও ধূসর গাছপালা, ন্যাংটাকালো রাখাল বালক, পুকুর পাড়ে পচা ঘাসের ঘন সুবাস, খড়ের গাদা, গেরস্থ বাড়ির ঈশাণ কোণে গোয়ালঘরের গন্ধ, হাল্কা-মিষ্টি গন্ধের খোলা শাদা রোদ-- কতোকাল পর এদের দ্যাখা পেয়ে রোকেয়ার সমস্ত বুক, পিঠ, মুখ, চোখ কানায় কানায় ভরে গিয়েছিলো। কেবল একটি মাছরাঙা চোখে পড়ার পর থেকে যা দ্যাখে শুধু মনে হয়, আহ খোকনটারে দ্যাখাইতে পারতাম! ('যোগাযোগ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i, iPbvmgM-1 : ৫০)

যে কোনো বিপদে মানুষের পরম আশ্রয়স্থল মাতৃক্রোড়। মায়ের সুধাস্নেহ যে কোনো দুঃখ ক্ষতকে যেন কয়েকগুণ প্রশমিত করে দিতে পারে। হাসপাতালে নার্স এর একটিমাত্র বাক্য সে চিরন্তন নিরাপদ মাতৃত্বকে যেন অবলীলায় স্বীকার করেছে : 'রোকেয়াকে দেখে নার্স সিতারার দিকে প্রশ্নবোধক ভ্রু নাচায়, ' মা তো, না? সিতারা ঘাড় নাড়লে নার্থ একটু হাসে; দাঁত দুটো উঁচু , তবু নার্সের হাসিটা মিষ্টি, 'এখন আর কি? মা এসে পড়লো, এখন আর কি? কষ্ট কি আর থাকে?' ('যোগাযোগ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i, iPbvmgM-1 : ৫৫) রোকেয়া ভেবেছে ঢাকায় গিয়ে খোকনের সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তার খোকন ভালো হয়ে যাবে। সে ছিল না বলেই খোকনের এত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস অটল রেখেই সে ভাবে : 'আমি থাকলে কি আর খোকনের এ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে? আমি তাড়াতাড়ি পোলার কাছে গিয়ে খাড়াইতে পারলেই হ্যার ব্যাবাকটি বিষ মুইচ্ছা ফালাইতে পারতাম।' ('যোগাযোগ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i, iPbvmgM-1 : ৫৩) কার্যত, হাসপতালে পৌছানোর পর দৃশ্যপট ঠিক রোকেয়ার ভবানা-চিন্তার সঙ্গে মেলানো গেলোনা। খোকন তার মাকে যেমন চিনতে পারেনি, মাকে দেখে তার কষ্টও লাঘব হয়নি। দুদিনব্যাপী মায়ের যে অন্তর্জালা ও ভাবনা, বাস্তবে তার কিছুই স্বীকৃত হয়নি। মায়ের এ বেদনার মধ্য দিয়েই গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে। গল্পে চমৎকার একটি দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে মা ও সন্তানের অকৃত্রিম বন্ধন, শাশ্বত সম্পর্কের মাঝেও যে বিচ্ছিন্নতার সুর ধ্বনিত হতে পারে, এই বিচ্ছিন্নতাকে কোনোভাবেই এড়ানোর উপায় থাকে না মানুষের, সে বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এভাবে :

> রোকেয়ার হাতের তালুর নিচে খোকনের জ্বরের তাপ শুধু বাড়ে। হায়রে, এ্যামনে তো পোলার তামাম শরীরটা ফালা ফালা করছে, অহন জ্বর বাড়বো তো লগে লগে মাথা বিষাইবো, পোলায় আমার ক্যামনে বাঁচে? জলদে পৌঁছানো সেতারীর হাতের আঙুলের মতো রোকেয়ার দীর্ঘ ও ফর্সা আঙুলগুলো খোকনের কপালে খুব দ্রুত কাঁপে। কিন্তু ১০৪° জ্বর খোকনের শরীরে কম্বলের মতো বিছানো, রোকেয়ার আঙুল এই কম্বল ভেদ করে কি করে খোকনকে ঠিক ঠিক স্পর্শ করে? ('যোগাযোগ', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i, iPbvmgM-1 : ৫৮)

'যোগোযোগ', গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক যেন এক ভাবসত্য তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন পাঠকের কাছে। সমাজ, সংসারের সামাজিক-রাজনৈতিকত বিক্ষুব্ধতা ব্যক্তি মানুষকে সংক্ষুব্ধ করে তাকে ক্রমাগত আত্মকেন্দ্রিক ও সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ধাবিত করে চলেছে। এটাই সমকালীন সমাজবাস্তবতার প্রকৃত চিত্র। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে চিরন্তন মাতৃত্বও বাদ পড়েনা । বিষয়টিকে লেখক নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> রোকেয়া তার ছেলের অসুস্থতার কথা শুনে ফিরেছে। তার একটা অহংকার যে সে থাকলে এমন হতো না, কিন্তু সে যখন ছেলের কাছে পৌঁছাচ্ছে তখন তার গায়ে ১০৪° জ্বর কম্বলের মতো জড়িয়ে। রোকেয়া হাত দিচ্ছে কিন্তু সে হাত ঐ কম্বল ভেদ করে ছেলের কষ্টের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। কষ্টটার সাথে যোগাযোগ ঘটছে না। এ ব্যাপারটাই যদি বড় করে দেখি তো বলতে পারি, ছেলে যখন বড়ো হতে থাকে তখন মায়ের সাথে এক পর্যায়ে আর যোগাযোগ ঘটে না। যে মায়ের ওপর তুমি দারুণ Dependent ছিলে একসময়, এক পর্যায় তার সাথে তোমার সব কষ্টের আর যোগাযোগ ঘটছে না। তুমি তোমার Problem আর Share করতে পাছো না। হয়তো তোমার প্রেমের সমস্যা বা কোনো Philosophical Crisis দুজনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা হয় না, এটা দুজনের জন্যেই খুব বেদনাদায়ক। তবু এটাই সত্য।[১০]

গল্পে এই ভাবসত্যটি প্রায় অধরাই থেকেছে, বরং বাৎসল্যের এক নিটোল শাশ্বত গল্প হিসেবে 'যোগাযোগ' গল্পটি সাধারণভাবে পঠিত ও আলোচিত হয়েছে। রোকেয়া হয়ে উঠেছে শাশ্বত মাতৃহৃদয়ের তথা চিরন্তন বাঙালি নারী-চরিত্রের প্রতিনিধি। রোকেয়ার সন্তানবাৎসল্যের মাধ্যমে মানবজীবনের মহৎ গুণাবলি লেখক যেভাবে বয়ান করেছেন তাতে 'যোগাযোগ' গল্পটিকে নিখুঁত গল্প হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি স্বীকার করলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প সম্পর্কে এই ধারণাকে সংহতি দেয়া যায় :

> ইলিয়াসের সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সম্পূর্ণ গল্প 'যোগাযোগ'। তাঁর লেখায় যতোরকম খুঁত আমি উল্লেখ করেছি তার প্রায় একটাও আমি এই গল্পটি সম্পর্কে উচ্চারণ করবো না। এই গল্পে কোন ছবিই অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় নয়, লক্ষ্য সম্পর্কে কোথাও দ্বিধা নেই, ভিতরের সূত্রগুলি ন্যায়বদ্ধ। স্রেফ গল্প হিসেবে দেখলেও একথাগুলি বলা যায়। তবে এ গল্পের প্রতি আমার পক্ষপাতের হয়তো অন্য কারণ আছে। ইলিয়াসের সারা বই পড়ে এইখানে এসে আমি নিঃশ্বাস ফেলেছি। কুকুর-বিড়াল, গরু-ছাগলের মতোই সন্তানবাৎসল্য মানুষ নামক পশুর একটি সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র এইটাই যদি ইলিয়াসের তত্ত্ব না হয় (আশা করি তা নয়), তাহলে এই গল্পে ইলিয়াস ঘাড় ঝুঁকিয়ে মিষ্টি হেসে জানিয়েছেন, কোথাও কিছু অমৃত এখনো আছে। ইলিয়াস যদি উল্টো সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে চান যে বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে মা সন্তানকে বুকে টেনে নিয়েও অনুভব করতে পারেন না কোনো যোগাযোগ, তবু যে প্রচণ্ড টান নিয়ে ছুটে আসেন মা, যে প্রবল নির্ভরতা নিয়ে সন্তান চেয়ে থাকে মায়ের পথের দিকে, বাঁচার জন্য এখনো তো তাই মানুষর মূল অবলম্বন ।[১১]

কলকাতাবাসী প্রদীপের বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে বসবাসকারী পিসির বাড়িতে বেড়াতে আসার অভিজ্ঞতা, পিসিমার আদরে সময় কাটানো, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী একটি হিন্দু পরিবারের ব্যবসায়িক জীবনের ইতিবৃত্ত, পিসিমার পড়ন্ত-যৌবনের নেভানো সলতের অতীত স্মৃতি রোমন্থন এবং প্রদীপ নামের উদীয়মান যুবকের বয়সের বিচ্ছিন্ন চিন্তার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গ্রন্থের নাম-গল্প 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' । স্বাধীনতা-পরবর্তী এক হিন্দু পরিবারের জীবনালেখ্যই 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পের মূল সুর। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কন এবং মানুষের জীবনাচরণে তার প্রভাব-পরিসর এ গল্পের প্রধান অবলম্বন। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরিণতিতে পুর্ববঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশ পূর্ব-পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অনির্দেশ্য, অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে ভারতে চলে গিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক হিন্দু-পরিবার শেকড় ছিঁড়তে পারে নি, তাদের কেউ কেউ পেশা বা জীবিকার কারণে এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের অসম্মান ও নিগ্রহ

সহ্য করেও থেকে যায়। সেরকম একটি পরিবারের প্রতিবিম্বে সেই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিভক্ত-মানস, স্মৃতি কাতরতা, ও রাজনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা উদঘাটনে আলোচ্য গল্পটি গড়ে উঠলেও, একটি পর্যায়ে পৌঁছে পিসিমা চরিত্রের স্মৃতিকাতরতা, অতলান্ত শূন্যতা ও বাৎসল্যের অভিপ্রকাশে তা এক বিপন্নতার করুণ আবহ নির্মাণ করেছে। নারায়ণগঞ্জের এক ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান ননী। স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তার আত্মীয়-স্বজন চলে যায় কলকাতা। কলকাতায় প্রবাসী পরিবারের সন্তান প্রদীপ। ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে বাংলাদেশে আসে। কাজের ফাঁকে দেখতে যায় পৈতৃক বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনদের। বাংলাদেশে এসে নানা সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা ও টানাপড়েন প্রত্যক্ষ করে প্রদীপ। তার চেতনায় খেলা করে নানারকমের অনুভূতি। এর মধ্য দিয়েই সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার এক নিরেট-কঠোর জীবনালেখ্য রূপায়ণ করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে। এ গল্পের উল্লেখযোগ্য নারী-চরিত্র হলো বৌদি, ইন্দিরা, মন্দিরা, মীনাক্ষী এবং পিসিমা। এর মধ্যে বৌদি, ইন্দিরা, মন্দিরা ও মীনাক্ষী প্রমুখ চরিত্র ঘটনার আবর্তে সমকালীন পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে রূপায়িত। পিসিমা চরিত্রটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে এই গল্পের কাহিনির বলয় নির্মাণের ক্ষেত্রে। মনে রাখা প্রয়োজন, '৪৭-এর ভারত বিভক্তির পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ভারতে চলে গেলেও অনেকেই আবার থেকে গেছেন এখানে ভিটে মাটি কামড়ে। উপায়হীনতার পাশাপাশি অনেকের মধ্যে যে নিরেট স্বদেশপ্রেমও কাজ করেছে এই না-যাওয়ার পেছনে– তা এই পিসিমা কিংবা প্রদীপের বাবার মধ্য দিয়ে এ সত্যটিকে লেখক ধারণ করেছেন এ গল্পে। এ গল্পে উজ্জ্বলতর করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে ক্রমশ পরিবর্তমান জীবনের ভেতর বেঁচে থাকা পূর্বপ্রজন্মের একজন পিসিমাকে, যিনি সমকালের জীবন-প্রতিবেশে হয়তো অনেকাংশেই বাহুল্য, কিন্তু বেঁচে আছেন পূর্ববর্তী নানা ঘটনা-অনুভূতির সাক্ষ্য হয়ে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু হিসেবে হিন্দুদের ওপর সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক চাপ কমে যাবে, এবং এর অবসান ঘটবে, এমনটা ভাবা হলেও প্রকৃতপক্ষে সত্যকার বাস্তবতা এর বিপরীত। গল্পে লক্ষণীয় প্রদীপের নিকট বৌদি তার মেয়েদের লেখা পড়ার সমস্যা নিয়ে আক্ষেপ করে। সে-আক্ষেপে সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্রের খোলস উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

> গোলমালের আগে ম্যাট্রিক পাস করলো। তহন তোমার দাদায় কয়, 'না, পাকিস্তানে ভর্তি করুম না। কলকাতা পাঠাইয়া দেই। দিদির বাড়ি থাইকা কলেজে পড়েবো।' নয়টা মাস আগরতলা থাকলাম, দিদি না, জামাইবাবু না, কেউরো ছায়াও দ্যাখলাম না। পাকিস্তান তো গেলো গিয়া। দ্যাশে আইয়া কলেজে ভর্তিও তো হইলো! কি হইলো? টাকাগুলিন হুদা-হুদি জলে ভাসাইলা। পোলার বয়সের ছ্যামরাগুলিরে তোয়াজ করো, আবার হেইগুলির ডরে মাইয়ায় বারাইতে পারে না। আর কলেজ যাইতে পারবো? ('অন্য ঘরে অন্য স্বর', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i, iPbvmgM-1 : ৮১)

ছেলের বয়সী মাস্তানদের চাঁদা দেওয়া ও তোয়াজ করা সত্ত্বেও তাদেরই ভয়ে কলেজ পড়া মেয়ে যখন রাস্তায় বেরুতে ভয় পায়; তখন নিরাপত্তাবোধের অভাবে, আশঙ্কায় অসহায় ননীদার বৌ, প্রদীপের বৌদি আরো

অনেক হিন্দুর মতো ভারতে চলে যাওয়া ছাড়া পথ দেখেন না। ননীদার ছেলে যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী, সেই অমিতকে গল্পে পর্নোগ্রাফির মধ্যে স্বস্তি খুঁজতে দেখা যায়। অন্যদিকে প্রদীপের বিধবা পিসিমা মৃত বড়ো ভাইয়ের মতোই দেশপ্রীতি, স্নেহ, পুরনো স্মৃতি আর পূজা-কৃষ্ণকীর্তন নিয়ে বাড়ির পুরনো দালানে পড়ে থাকেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে। অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপর্যস্ত ননীদার সংসারে পিসিমা হয়ে ওঠেন এক 'সেকেলে স্বর' । অন্য ঘরে অন্য স্বর হয়েই যেন পিসিমা বেঁচে আছেন। পিসিমার থাকার ঘরের বর্ণনার মধ্যেও এই একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার পরিচয় মেলে এভাবে : 'এই নতুন দালান তৈরি হওয়ায় পুরনোটা আড়ালে পড়ে গেছে। তা' বয়সে বয়সে পিসিমাও একটু আড়াল, পিসিমা এখানেই থাকে।' ('অন্য ঘরে অন্য স্বর', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i, iPbvmgM-1 : ৮১) পিসিমার জীবনের ব্যর্থতা ও হাহাকার ধ্বনিত হয় 'জীবন আমার বিফলে গেলো' গানে। আবার পিসিমার স্মৃতিচারণে বিবৃত হয় প্রদীপের প্রয়াত পিতার কথা :

> তর বাবায় তগো বয়সে কি খাইতে পারতো! তিন সের দুধ না জ্বাল দিয়া মাইরা এক সের বানাইয়া, রামপাল থাইকা কলা আসতো, এই বড়ো বড়ো সাগর কলা, বৌদি আমসত্ত্ব রাখছে সর্বদা, বুঝলি, বৌদির আছিলো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সেই আমসত্ত্ব দিয়া দুধে কলায় মাইখা এতোটি ভাত খাইছে। ... দাদায় খাইতো, খাটতেও পারতো খুব। বাবায় দ্যাহ রাখছে, আমার বয়স তহন সাত আট বছর; দাদাই তো আমাগো বাপ হইছে। কতো খাইটা খাইটা ব্যবসা করছে, বাবার ঋণ শোধ করছে, কমলাঘাটে আড়ত দিলো। রামপালের জমি ছাড়াইয়া লইলো; দিদিরে, আমারে বিয়া দিছে। ... কয়েক ঢোক কেঁদে মুখ চোখ একটু গুছিয়ে নিয়ে বলে, দাদায় যে আমার কি আছিলো ক্যামনে কই? আমারে দ্যাখতো, ভাইগ্না ভাগ্নীরে দ্যাখতো আর চক্ষের জল ফালাইতো। দাদার কাছে রইছি, মনে লইছে কি মায়ের কোলে আইছি। ('অন্য ঘরে অন্য স্বর', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i, iPbvmgM-1 : ৮৫)

এইরকম স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে গল্পটিতে একদিকে পিসিমা, প্রদীপের পিতার মতো দেশের টানে, ভালোবাসার বন্ধনে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের কথা যেমন উঠে এসেছে , তেমনি পদদলিত মানবতা আর ঘুণপোকায় আক্রান্ত সমাজে ক্রমাগত যে বিচ্ছিন্নতার সুর রচিত হয়ে চলেছে, তারও একটি আভাস লক্ষণীয় । পিসিমার স্মৃতিচারণের ফলে প্রদীপের অতীতচারিতা যেন আরও তীব্র হয়ে পড়ে এবং গড়ে তোলে বিচ্ছিন্নতা ও বিপন্নতার এক সামূহিক পরিমণ্ডল। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে বিকাশমান জনজীবনে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও শিথিল সম্পর্কের মধ্যে প্রদীপ আর পিসিমার কথোপকথন, স্মৃতিচারণ, তাদের সেই নিবিড় নির্ভরতা-আন্তরিকতা-ভালোবাসার সম্পর্কের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া সে প্রজন্মের পিসিমাদের যেন আর কোনো অবলম্বন নেই-- গল্পে এ সত্যটিকেই ধারণ করেছেন লেখক। সময় এগিয়েছে, পুরনো অনেক কিছু বাতিল হয়ে গেছে আগ্রাসী অগ্রগামী সময়ের অতল গহ্বরে। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত জীবনকে, স্বপ্নকে খুঁজে পায়নি, বরং সামাজিক অস্থিরতা ও অস্তিত্বের সঙ্কট যেন আরো বেশি মাত্রায় থাবা বিস্তার করেছে মানবতার মর্মমূলে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদীপের কলকাতা-বাংলাদেশ-আগরতলা ঘুরে বেড়ানো যেন সেই অস্থির সময়ের সামূহিক সঙ্কটকেই মূর্তমান করে তুলেছে গভীরভাবে। ফলে পিসিমা যেমন প্রদীপের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত

কোনো অতীতকে, আকাঙ্ক্ষাকে খুঁজে বেড়ান; তেমনি প্রদীপও স্বস্তি, নির্ভরতা, বিশ্বাস-অবলম্বন খুঁজে ফেরে পিসিমার মধ্যে। কিন্তু কোনোভাবেই প্রদীপ আর পিসিমার পারস্পরিক স্বপ্নের বিনিময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই দেখা যায় :

> এমন সময় পিসিমার গুঞ্জন বারান্দা দিয়ে গুটি গুটি পায়ে এসে এ ঘরেও উকিঁ দিয়ে যায়, 'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ।' এখন বোধহয় ভোর হচ্ছে, এই গান যদি ঘরে ভালো করে একবার ঢুকে পড়তে পারে তো তোলপাড় শুরু হবে– এই ভাবনায় কাতর হয়ে নেভবার আগেকার প্রদীপের মতো এই প্রদীপও লাফ দিয়ে উঠে-বসলো। খাটে বসেই জানালা বন্ধ করা যায়। এই নিয়মটা ভালো। আবার নামতে হলো না বলে খুশি হয়ে জানালাগুলো সটাসট বন্ধ করে দিলো। জানালার কপাটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পিসিমার গান ল্যাজ গুটিয়ে বাইরে চলে যায়। ('অন্য ঘরে অন্য স্বর', Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i, iPbvmgM-1 : ৯০)

প্রকৃতপক্ষে, শেষ পর্যন্ত প্রদীপরা আর পিসিমাদের, অর্থাৎ ওই পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষের সঙ্গে ঐক্য রাখতে পারে না স্বাভাবিক নিয়মেই। পিসিমাদের মধ্য দিয়ে প্রদীপ যেন প্রকারান্তরে এই ভালোবাসা-প্রেমময় বাঙালি জীবনের, বাবা-মা, পিসিমাদের প্রজন্মটাকেই নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখে, গুরুত্বহীন ও অস্তিত্বের সঙ্কটে দোদুল্যমান হতে দেখে। পিসিমা হয়ে ওঠেন দুই প্রজন্মের যোগসূত্রের ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিমানসের ক্রমবিচ্ছিন্নতার প্রতিভূ ।

Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর পর্যালোচনা করলে অনায়াসে এ কথা বলা যায় যে, শ্রেণি-বর্ণ-ধর্ম বিভাজিত বাংলাদেশের মানুষের সাধারণ এক ব্যাধি, বিচ্ছিন্নতার কথাই যেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নানা আখ্যানিক বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। আত্মজৈবনিক ও মঙ্গলাচরণমূলক প্রথম গল্প ' নিরুদ্দেশ যাত্রা' ছাড়া প্রায় প্রতিটি গল্পেই রূপায়ণ ঘটেছে একই বিচ্ছিন্নতার সুর। 'উৎসব' গল্পে আনোয়ার আলির ধাণমণ্ডির অভিজাত বিয়ে-বাড়ির উৎসবে এবং পুরোনো ঢাকার রাস্তায় মধ্যরাতের কুকুররতি উৎসবে যোগদানের সূত্রে শ্রেণিমানসে সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনার ভিন্নতা ও আত্মবিচ্ছিন্নতা; 'প্রতিশোধ' গল্পে ওসমান এবং অংশত আনিসের মিথ্যে, অকার্যকর প্রতিশোধ গ্রহণের ফাঁপা আস্ফালনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেনির দ্বিচারিতা-শঠতা-ভণ্ডামি এবং জীবন বিচ্ছিন্নতার ঘুণ; 'যোগাযোগ' গল্পে রোকেয়ার প্রবল পুত্রস্নেহ ও বাৎসল্যের গভীর মমতার পাদদেশে বিচ্ছিন্নতার সুর; সবশেষে, 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে প্রদীপ ও পিসিমার বর্তমান থেকে অতীতে, বাস্তব থেকে স্মৃতির দোলাচলে ও স্বেচ্ছাবন্দিত্বে একই বিচ্ছিন্নতার অনুরণন ধ্বনিত হতে থাকে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন : 'মানুষ কেবল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে– কেউ তার দিকে হাত বাড়ায় না।'[12] এই বিচ্ছিন্নতার সংকটকে লেখক দেখেছেন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ-ব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ঘরে-বর্ণে শ্রেণিতে আপাত অনুচ্চারিত সেই 'স্বর' কে, সেই সত্যকে। যা প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন; অথচ এক অমোঘ দ্বিধা-সঙ্কটের বেড়াজালে সে 'স্বর' বা 'সত্য' উচ্চারণের বা প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না, ফলে স্বাভাবিকভাবেই আলোচ্য গল্পগ্রন্থে যে সকল নারী-চরিত্রের উপস্থাপন ঘটেছে তারাও এই সুর, স্বর থেকে পৃথক

সত্তায় রূপায়িত হতে পারেনি। সামগ্রিক বৈরী-পরিমণ্ডলকে তারা নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি; বরং আত্ম-বিধ্বস্থ, সমাজ-ব্যবস্থায় তারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সমাজ-সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট, নিয়ন্ত্রিত নারী-জীবনের স্বরূপ-দর্পণ হিসেবেই উল্লিখিত নারী-চরিত্রের উপস্থিতি ও বিকাশ পরিস্ফুট হয়েছে Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i গল্পগ্রন্থের মধ্য দিয়ে।

†Lvqvwi

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ †Lvqvwi [13] প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। ‡Lvqvwi গল্পগ্রন্থে রয়েছে মোট চারটি গল্প : 'খোঁয়ারি', 'অসুখ-বিসুখ', 'তারাবিবির মরদ পোলা', এবং 'পিতৃবিয়োগ'। এই গল্পগ্রন্থের প্রথম দুটি গল্প 'খোঁয়ারি' ও 'অসুখ-বিসুখ' লেখা হয়েছে Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i (১৯৭৬) গল্পগ্রন্থ প্রকাশের একবছর পূর্বে ১৯৭৫ সালে। অন্যদিকে, 'তারাবিবির মরদ পোলা' ও 'পিতৃবিয়োগ' গল্প দুটি যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং ১৯৭৯ সালে লেখা। 'খোঁয়ারি' গল্পটি গ্রন্থের শুরুতেই বসিয়ে লেখক প্রথম গ্রন্থের শেষ গল্প 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-এর ভাবানুষঙ্গের অনুবর্তন রক্ষা করেছেন বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : ' 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' যেখানে শেষ সেখান থেকেই 'খোঁয়ারি' গল্পের শুরু।'[১৪] তাৎপর্যপূর্ণ এই আনুক্রমিক বিন্যাসে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়ত্ব যেমন রূপ পেয়েছে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ফলে অর্জিত বাংলাদেশের কথা, মাটি ও মানুষের কথা, সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যকার অসঙ্গতি এবং তৎকালীন সময় ও সমাজের বাস্তবতার নিরেট উপস্থাপনাই †Lvqvwi গল্পগ্রন্থের পটভূমি।

†Lvqvwi গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'অসুখ-বিসুখ'। ন্যূনতম মনোযোগ, ন্যায্য অধিকার থেকে, স্নেহ-মমতা-শুশ্রূষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় যে চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভ জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে– মানবিক বোধকে করে ফেলে অসার, বিকৃত সেই ভাবসত্যকেই আখ্যানিক রূপ দেয়া হয়েছে 'অসুখ-বিসুখ' ছোটগল্পে। বাংলাদেশের অগণিত বঞ্চিতা নারীর জীবনের ক্ষোভ-প্রবঞ্চনা, শঠতা, তাদের অন্তর্গূঢ় সংঘাতসমূহ এ গল্পে উন্মোচিত হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর চেষ্টা থাকে মানুষের। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার একটাই ইচ্ছা– একটু ভালো করে বাঁচা। কিন্তু অজ্ঞানতা, অশিক্ষা যে সব সময়ই ভালো থাকার অন্তরায় এ সত্যই 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে সমাজ বাস্তবতার প্রাসঙ্গিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আতমন্নেসা একজন বৃদ্ধা। জরাগ্রস্ত এ নারী প্রতিমুহূর্তে ঈর্ষান্বিত হয় অন্যের স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করে। এই ঈর্ষা

থেকেই ক্রমে জন্ম নেয় ক্ষোভ, হতাশা। আতমন্নেসার কথায়-কাজে প্রকাশ পেয়েছে নিম্নবিত্ত পরিবারের না-পাওয়ার হাজারো ফর্দ। এ গল্পে আতমন্নেসার ছেলে সোবহান, খোরশেদ, মেয়ে মতিবানু, নূরুন্নাহার, ননদ ফুলজান, নাতি আলম প্রমুখ চরিত্র পাওয়া যায়। আরও আছে ছেলের বউ সিতারা, মেয়ের জামাই সুরুজ মিয়াসহ কিছু প্রাসঙ্গিক চরিত্র। মতিবানুর স্বামী তার জন্য সবসময়ই কিছু-না-কিছু ওষুধ ফলমূল নিয়ে আসে। কিন্তু কেউই আতমন্নেসার অসুস্থতাকে আমলে নেয় না। তারও যে শরীরে রোগ থাকতে পারে, তা যেনো কারোরই বিবেচনার বিষয় নয়। তাই নাতি আলমকে পান ও পয়সার লোভ দেখিয়ে মতিবানুর সব ঔষধ নিজের কাছে এনে সুস্থ হবার লোভে খেয়ে ফেলে সে। কিন্তু এতে তার অসুস্থতা চরমে পৌঁছলে হাসপাতালে নিয়ে চেকআপ করালে আতমন্নেসার শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ে। মৃত্যুই তখন তার সামনে একমাত্র খোলাপথ হিসেবে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে আতমন্নেসার কোনো আক্ষেপ, কষ্ট, ভয় নেই। বরং এতেই যেন সে স্বস্তি পায় এই ভেবে যে, ডাক্তার তাকে অনেক ঔষধ দিয়েছে। এখন বাড়ির সকলের মনোযোগ তার দিকে। মৃত্যু-শঙ্কার বদলে এই মনোযোগ, যত্ন তার শরীরে আত্মতৃপ্তির আবেশ বুলিয়ে দেয়। আতমন্নেসা চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন; দেখাতে চেয়েছেন মানুষের দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, ক্রোধ আর অবহেলার মর্মান্তিক চিত্র। সামগ্রিক অর্থে নিম্নবিত্ত সমাজের অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা-কুশিক্ষা মানুষকে কীভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পেছনের দিকে ধাবিত করে এ সত্যকে যেমন এ গল্পে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি ব্যক্তিমনের গহীনে আলো ফেলে তার পরতে পরতে জমে থাকা ক্লেদ, ঘৃণা, হতাশা, ক্ষোভ, যন্ত্রণার বিবমিষাকেও উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষণীয়। বাংলাদেশের সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আতমন্নেসা, মতিবানু, নূরুন্নেসা, সিতারা, ফুলজান, আর সাবিত্রী দাই প্রমুখ নারী চরিত্র যেন জীবনের বিচিত্র অলি-গলি, নারীর প্রতি সমাজের উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, বঞ্চনা-হতাশা, প্রতি পদে মানবিকতা দলিত-মথিত হওয়ার চিরন্তন দৃশ্যপটকেই ধারণ করেছে। 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে মানুষের জীবনে ন্যায্য অধিকার ব্যাহত হওয়ায় যে-চাপা অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভ স্বাভাবিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তার নিপুণ প্রকাশ ঘটেছে। আতমন্নেসা, ফুলজান, মতিবানু, নূরুন্নাহার, সিতারা, সোবহান প্রমুখ চরিত্রের বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিহিত চিরন্তন সমাজ-সত্যকে রূপায়িত করাই 'অসুখ-বিসুখ' গল্পের মূল বিষয়। একটি নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের একাধিক সন্তানের জননী আতমন্নেসার আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-ব্যর্থতা সবকিছু মিলেই গল্পের আখ্যান তৈরি হয়েছে। মানুষের জীবনে সহস্র দুঃখের মধ্যেও একটুখানি ভালোবাসা ও রোগ-শোকের চিকিৎসা পাওয়ার স্বাভাবিক আবেদনের প্রকাশ ঘটেছে আতমন্নেসা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কাম-ক্রোধ, ঈর্ষা-বিষাদ সবকিছু মিলিয়ে গল্পটি ভিন্ন আমেজে ভরপুর, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষকে, এবং টানাপড়েনের দেশচিত্রটিকেই যেন খুঁজে পাই আমরা। বিয়ের পর থেকে আতমন্নেসার শরীর-স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো, বড় ধরনের অসুখ-বিসুখ তার হতো না তেমন একটা। তাছাড়া মানুষ হিসেবে আতমন্নেসারও যে অসুখ-বিসুখ হতে পারে, এ সত্যকে

স্বামীসহ পরিবারের কেউ-ই আর বিশ্বাসের মধ্যে আনেনি কখনো। স্বামীর ছিলো হাঁপানি। সারা জীবন নিজের হাতে তাকে খাওয়াতে হয়েছে নানা রকমের ঔষধ। কিন্তু আতমন্নেসার ক্ষেত্রে চিত্র পুরোপুরি উল্টো। সন্তান প্রসবের সময়েও একটুখানি ঔষধ বা বাড়তি যত্ন-আত্তি সে পায়নি কখনোই। ঘন ঘন সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সন্তানের প্রকৃতসংখ্যাই আতমন্নেসা অনেক সমর সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে না। গল্পের বর্ণনায় দেখা যায়:

> শরীর লোহার হোক কাঠের হোক– রোগ ব্যারাম ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? অবেলায় গোসল করে আতমন্নেসার যদি কখনো গা গরম করেছে, সে আর বলা হয়নি। এই না-বলাটাই হয়েছে তার কাল। হায়রে কপাল, ছ'টা সাতটা ছেলে মেয়ে হলো– সন্তানের সংখ্যা তার ভালো করে মনেও পড়ে না। ... একবার মনে হয় আটটা, সবচেয়ে বড়োটার কথা মনে পড়ে, সেটা ছিলো ছেলে, সাত আটমাস বোধহয় বেঁচে ছিলো, ... তারপর বোধ হয় নুরুন্নেসা– তার জীবিত সন্তানদের মধ্যে বড়ো। তারপর কে? সোবহান। না, সেই মরা ছেলেটা কি জানি? এখন আর মনে করে লাভ কি? তখনই কেউ খেয়াল করলো না! না, পোয়াতির শরীরের দিকে কেউ দ্যাখেনি। প্রত্যেকবার গর্ভ যখন পূর্ণ হয় হয়, 'না, অহন ফুলজানেরে লইয়া আহি'– এই কথা বলে সোবহানের বাপ চলে যেতো নাজিরা বাজার। নাজিরা বাজার থেকে আসতো তার ননদ ফুলজান। ... আতমন্নেসার প্রসবের ব্যাপারটি কারো কাছে কিছুই না। না ডাক্তার, না কোনো ওষুধ, না বিশেষ কোনো পথ্যি। সাবিত্রী দাই তো কাছেই থাকতো, মহল্লার মেয়েদের প্রসবের আগে তাদের পেট মালিস করে দিতো, না, সোবহানের বাপ তাকেও যদি একবার ডাকতো! ('অসুখ-বিসুখ',) †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১২০-১২১)

প্রসূতি নারীর প্রতি এই অবহেলা শুধু গল্পের বিষয় হয়েই আর থাকলো না, এ যেন পুরো গ্রামবাংলার পশ্চাদপদ সমাজ-বাস্তবতার এক জীবন্ত সত্যের রূপায়ণ। আজো অগণিত নারী আতমন্নেসার মতোই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে চরম অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়। সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার যেন কোনো মূল্যই নেই সমাজে। তাই আতমন্নেসা ঠিক কতটি সন্তান জন্ম দিয়েছে তার সঠিক সংখ্যা মনে করতে পারে না। এই রকম চিত্র আমাদের সমাজ-বাস্তবতায় একেবারে বিরল কোনো ঘটনা নয়, বরং এটিই প্রকৃত বাস্তবতা। নারীর ইচ্ছা, অনিচ্ছার কোনো মূল্যই এ সমাজ দেয় না। আজো এ সমাজে একজন নারীর কোনো সামাজিক ভূমিকা সেই অর্থে স্বীকৃত হয়নি। রাজনৈতিক বুলির আবর্তেই এখনও নারী ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। তাছাড়া প্রসব-পরবর্তী মাতৃসেবার করুণ চিত্রও উদঘাটিত হয়েছে এ গল্পে :

> প্রসবের পর আতমন্নেসার খুব খিদে পেতো, প্রচণ্ড ক্ষুধা। ফুল খসাতো তার ননদ, এই কাজে তার জুড়ি দিলো না। পর পরই তার জন্য গামলা ভরে ভাত এনে দিতো। মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত। আতমন্নেসার ইচ্ছা করতো, মাখামাখা করে রাঁধা গলদা চিংড়ির ঘন সুরুয়া দিয়ে ভাতটা মেখে নেয়। সোবহানের বাপের চিংড়ি নিষেধ, ঐ জিনিস তাই ঘরে কখনো আসেনি। ওষুধ না দিক, চিকিৎসা না হোক, --- কেবল তারই জন্যে কোনো একটা পথ্য যদি কোনদিন আসতো! ('অসুখ-বিসুখ', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১২১)

এই আক্ষেপ বাংলাদেশের হাজারো নারী-কণ্ঠ থেকে যেন আতমন্নেসার স্বরে বিলাপ ও ক্ষোভ হয়ে ফেটে পড়েছে আলোচ্য গল্পে। বৃদ্ধ বয়সে যখন একসময় আতমন্নেসার শরীরের অভ্যন্তরে নানারকম ভাঙচুর শুরু হয়,

তখনো সে কাউকে তার শরীরের অবস্থা বিশ্বাসযোগ্য করে বোঝাতে পারে না। তার নিজের মেয়ে এ প্রসঙ্গে বলে :

> আম্মার শরীল মাশাল্লা খুব ভালো। আমরা কুনোদিন আম্মার জ্বর ভি হইতে দেখি নাই। ... না আম্মা, বিমার তোমার মনের মইদ্যে। বয়স হইছে, সংসারের মইদ্যে সুখ শান্তি পাইবা না তয়? মতিবানু আড়চোখে রান্নাঘরের দিকে একবার দ্যাখে, শরীল আর ক্যামনে ঠিক থাকে? আম্মার বিমারি তার মনে, তার শরীল মাশাআল্লা বহুত ভালো। ('অসুখ-বিসুখ', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১২৪)

আতমন্নেসার ছোটখাটো অসুস্থতা কখনো গুরুত্ব পায়নি বলে তার অভিমান প্রগাঢ়। হাঁপানি, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, পায়ে পানি-ধরা, কলেরা, আমাশয় তাকে 'অচ্ছুত' মনে করেছে বলে তার দুঃখ কম নয়। ফলে তার চরিত্রে এক রকমের মনোবিকার দেখা দিয়েছে। আজীবন বঞ্চিত হয়েছে বলে জীবনের প্রতি কোনো শুভদৃষ্টি অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে বঞ্চনা, অবহেলা থেকে উদ্ভূত ঈর্ষা-দ্বেষে নিজের মেয়ে মতিবানু আতমন্নেসার প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। আর সেই ঈর্ষা থেকে অকল্যাণও কামনা করে ফেলে সে মেয়ের। গল্পে বিষয়টি উঠে এসেছে এভাবে :

> মতিবানুর কি এমন অসুখ করলো যে দুদিন পর ডাক্তার, একদিন পর পর ওষুধ পত্র নিয়ে আসতে হবে? পেটের মেয়ে হলে কি হয়, এই যে রোগ বিমারের নাম করে মতিবানুর কথায় কথায় বাপের বাড়ি আসা, সব সময় গা এলিয়ে থাকা এসব তার একটুও ভালো লাগে না। ... এই সব ভড়ং করেই তো স্বামীটাকে সে তুর্কি নাচন নাচাচ্ছে। জামাইটাই বা কি রকম পুরুষ মানুষ যে বিয়ের পর চার বছর বাচ্চা হয় না, এখনো অন্য বিয়ে করার নাম পর্যন্ত করে না। আবার ডাক্তার দ্যাখায়! ('অসুখ-বিসুখ', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১২১-১২২)

আরেক মেয়ে নুরুন্নেসা সম্পর্কে তার ভাষ্য :

> নুরুন্নেসা থাকে লালবাগে, সেতো কাছেই, কৈ বছরেও তো একবার আসা হয় না তার। ঐ জামাইটার বয়স একটু বেশি, সোবহানের বাপের কাছাকাছিই হবে। নুরুন্নেসা তার তৃতীয় পরিবার। তার অবশ্য খানদান অনেক ভালো। ... বড়ো মেয়েরই বা এ কিরকম আচরণ? মানী মানুষের বিবি হলে কি নিজের মাকে ভুলে যেতে হবে ? ('অসুখ-বিসুখ', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১২২)

মনে মনে আতমন্নেসা মেয়ে নুরুন্নেসার স্বামীর স্বভাব ও তাদের খানদানের প্রশংসা করে; তার ভাবনার মধ্য দিয়ে, স্বামীটি যে মেয়ের বাপের বয়সী এবং মেয়ে যে তার তৃতীয় পক্ষ এ তথ্যটিও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে আতমন্নেসার আত্মজা এই নারীও যে সমাজে ভাগ্যাহত– এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। সময় বদলায়, সমাজ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যায়, আশেপাশের অনেক কিছুই আধুনিকতার ছোঁয়ায় বা প্রভাবে আলোকিত হয়, কিন্তু পরিবর্তন ঘটে না কেবল নারীর। আধুনিকতার মোড়কে সেই চিরায়ত ব্যথিত-বঞ্চিত-অসহায়-নিপীড়িত নারী আত্মা গুমরে গুমরে কাঁদে। এ যেন নিয়তির এক অমোঘ চক্রাবর্ত; এ থেকে নারীর যেন মুক্তি নেই

কোনোভাবেই। ফলে, গল্পের আতমন্নেসা, মতিবানু, সিতারা, ফুলজান আর নুরুন্নেসারা কেবল গল্পের চরিত্র হয়েই থাকে না; তারা হয়ে পড়ে সমাজে বিভিন্ন মাত্রিকতায় পদদলিত বঞ্চিত, অবহেলিত ও অসহায় নারীজীবনের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিনিধি। গল্পের শেষাংশে দেখা যায়, সুলতান ডাক্তার এসে আতমন্নেসাকে দেখে এবং তাকে হাসপাতলে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়। হাসপাতালে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রোগ ধরা পড়ে, আতমন্নেসার ক্যান্সার হয়েছে– রেডিও-থেরাপি দিয়ে মৃত্যুকে আপাত ঠেকিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই। রোগের ভয়াবহতার ছায়া বাড়ির প্রাণচাঞ্চল্য নষ্ট করে দিলেও আতমন্নেসা এতে খুবই তিপ্ত বোধ করে। তার ভাষায় :

> বাড়ি ফিরে সে হাঁপাতে হাঁপাতে গোঙায়, 'মতি, অ-মতি, কি করস? অ বৌ কি করো? আউজকা না আমারে একটা ঘরের মইদ্যে লইছে, বুঝলি ঘুরঘুইট্টা আন্ধার, বুঝলি ? – একটা বেটায় না কয়, আপনের রক্ত লমু। আমি না ডরাইয়া গেছি! আমার খালি গতর কাঁপে ! ' মেলা-দেখে আসা ছোটো মেয়ের মতো কোনটা আগে বলবে সে বুঝতে পারে না, 'অ মতি, আউজকা না ... আমারে একটা ঘরের মইদ্যে লইয়া গেছে, বুঝলি? হি হি কিসব ফিতাফুতা দিয়া আমার বুক বান্দে, পিঠ বান্দে, হাত পাওয়ের উংলি ভি বান্দে, কি করবো? না, আমার কলিজার মাপ লইবো ! হি! হি! খুশিতে আতমন্নেসার নিঃশ্বাস নিতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। ('অসুখ-বিসুখ', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১৩০)

রোগের স্বীকৃতি মিলেছে, সে সে অসুস্থ এই সত্যটা বাড়ির সকলের কাছে ধরা পড়েছে, আর সবাই তার প্রতি নজর দিচ্ছে, তার চিকিৎসা হচ্ছে, তার জন্য ঔষধ আসছে, মনে হচ্ছে আতমন্নেসা যেন শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। বাড়ির সকলের শঙ্কা-উদ্বেগে আতমন্নেসা যেন জীবনের সফলতা খুঁজে পেয়েছে; বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে পেরে আজ সে তৃপ্ত, আজ সে জয়ী। সতৃপ্ত ভঙ্গিতে সে উচ্চারণ করে; 'আমি কই নাই ? গোঙাতে গোঙাতে জবাব দেওয়ার সময় আতমন্নেসার পান-খেতে-না-পারা ফ্যাকাশে ঠোঁটের কোণ ছোটো একটু গোলাপি মিষ্টি হাসি চিক চিক করে, যেন বাজি রেখে সে জিতে গেছে, 'আমি তগো আগেই কইছিলাম!' ('অসুখ-বিসুখ', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১৩০) বাংলাদেশের অগণিত বঞ্চিতা নারীর ক্ষোভ ও বেদনা, তাদের অন্তর্গূঢ় সংঘাত-দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে এই গল্পে আতমন্নেসা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তবে কেবল পুরোনো ঢাকার একটা বাড়িতে পুরো একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া বৃদ্ধা আতমন্নেসার সমগ্র জীবন, তার ওপর বঞ্চনা-অনাদর-অবহেলার চিত্র অঙ্কন 'অসুখ-বিসুখ' গল্পের একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠেনি; বরং গল্পটিকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, তার স্বাভাবিক প্রবণতায়, এমন এক ভঙ্গি ও পরিকল্পনায় উপস্থাপন করেছেন যে, গতানুগতিকতার গণ্ডি পেরিয়ে তা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন :

> ব্যক্তিকে যুগপৎ তার সামাজিক ও মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে দেখা ইলিয়াসের স্বভাব। ফলত সে কখনো বিশেষ কোনো ভালো বা বিশেষ কোনো মন্দের প্রতিভূ হয়ে উপস্থিত হয় না, উপস্থিত হয় সমগ্রতা নিয়ে। নানাধরনের বঞ্চনা ও অমনোযোগের ফলে বৃদ্ধা আতমন্নেসার যে মনোবিকৃতি ঘটেছে, ওই বঞ্চনার ইতিহাসসহ তা আমাদের সামনে উপস্থাপন ইলিয়াসের উদ্দেশ্য

বটে, কিন্তু সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি আতমন্নেসার প্রতি পাঠকের বিশেষ কোনো সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেন না; ফলে বঞ্চিত বিকারগ্রস্ত আতমন্নেসার রিক্ত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার মানবিক স্বার্থপরতা ও হীনম্মন্যতাও কাদা-জলের মতো একাকার হয়ে তাঁর গল্পে ধরা পড়ে ।[১৫]

আবার অন্যভাবে আতমন্নেসা চরিত্রের প্রতিকল্পে তার ব্যাধি ও বিকারগ্রস্ততাকে বাংলাদেশের অনুষঙ্গেও বিবেচনা করা যেতে পারে। সমালোচকের মতে :

অনেক সময় ছাদটা এমন বোঁ বোঁ করে ঘোরে যে মনে হয় চুন-শুরকি ছেঁড়া খোড়া কাঁথার কম্বল ভেদ করে ছাদের এই বিশাল বপু বুঝি তার ঝরঝরে গতরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কিন্তু অনড় সমাজ তার আপন কাঠামোতে টিকে আছে। টিকে থাকার প্রয়োজনে দাওয়াই এর সন্ধানেও ব্যস্ত সর্বক্ষণ আতমন্নেসা এই গল্পে জড়ভরত এই সমাজেরই প্রতিকল্পে ।[১৬]

এ ক্ষেত্রে, আতমন্নোসার ক্যান্সার ব্যাধিটি যেন বাংলাদেশের নৈরাজ্যময় বাস্তবতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি। †Lvqwi গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'তারাবিবির মরদ পোলা'। শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাও একজন ব্যক্তির খুব প্রয়োজন। মানসিক সুস্থতার জন্য চাই সুস্থ বিনোদন, সুস্থ যৌনজীবন এবং সুস্থির পারিবারিক সম্পর্ক। এগুলোর যে কোনো একটির অভাব হলেই আচরণগত একটা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এ বিষয়গুলো শিল্পিত হয়েছে 'তারাবিবির মরদ পোলা' গল্পে । সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-জীবনের অতলান্ত ব্যর্থতা, হতাশা, ক্ষোভ, অবমাননার শৈল্পিক প্রতিবেদন গল্পটিকে মহিমান্বিত করেছে। সমাজবাস্তবতার এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে 'তারাবিবির মরদ পোলা' গল্পটি। এ গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র তারাবিবি, তার বার্ধক্যগ্রস্ত স্বামী রমজান আলী, তার বহুগামী পুত্র গোলজার আলী, পুত্রবধূ সখিনা, কাজের মেয়ে সুরুজের মা প্রমুখ। তারাবিবি রমজান আলীর দ্বিতীয় স্ত্রী। বয়সের ভারে নুয়েপড়া রমজান আলী যৌবনবতী তারাবিবিকে যৌনতৃপ্তি দিতে অক্ষম। এ নিয়ে তারাবিবির মনে গভীর হতাশা, জ্বালা, মর্মযাতনা। অপরদিকে পূর্ণযুবক গোলজার আলীর বিবাহিতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নজর যায় গৃহকর্মী সুরুজের মায়ের উপর। বিয়ের পরেও গোলজারের সঙ্গে তার বন্ধুর বোন দীপালি এবং বিয়ের কথা হওয়া খাদেম পাগলার ভাইয়ের মেয়ে রাবেয়ার সঙ্গে যৌনসম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। তারাবিবিকে প্রতিমুহূর্তে পুত্রবধূ সখিনার কাছে গোলজার সম্পর্কে নানা ধরনের কথা বলতে দেখা যায়, যা গোলজার-সখিনার মাঝে মান-অভিমান সৃষ্টি করে। এভাবেই পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই আবর্তিত 'তারাবিবির মরদ পোলা' গল্পের কাহিনি। জৈবিক চাহিদা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু অসুস্থ ও বিপথগামী যৌনতা, অবশ্যই নানামাত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে। তারাবিবির অতৃপ্ত যৌনজীবন এবং গোলজার আলির বহুগামী যৌনজীবন সংসারের শান্তি-সমৃদ্ধি বিঘ্নিত করেছে। গল্পের মধ্য দিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যগ্রস্ত জীবনের কাহিনি বয়ানের আলোকে আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরস্থ ফাটলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ফলে এ গল্পের দর্পণে আমরা সমাজের রুগ্ন, অসুস্থ,

বিকারগ্রস্ত স্বরূপটিকেই যেন প্রতিবিম্বিত হতে দেখি। 'তারাবিবির মরদ পোলা' গল্পে তারাবিবি, সখিনা, সুরুজের মা, রাবেয়া, দীপালি প্রমুখ নারী-চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। প্রত্যেকটি চরিত্র তার নিজস্বতা নিয়ে গল্পে প্রচলিত সমাজের মিথ্যে অহমিকার মুখোসটিকে উন্মোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। 'অসুখ-বিসুখ' গল্পের আতমন্নেসার মতো এই গল্পেরও কেন্দ্রে রয়েছে মনোবিকারগ্রস্ত এক নারী-- অতিবৃদ্ধ আশি কি বিরাশি বছরের রমজান আলির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তারাবিবি। তবে আতমন্নেসা ছিল বৃদ্ধা ও মুমূর্ষু, আর তারাবিবি প্রৌঢ়া ও শক্ত সমর্থ। লক্ষণীয়, দুই নারীরই মনোবিকার ঘটেছে বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণে। আতমন্নেসা যেখানে সংসারের কারো কাছ থেকেই পায়নি প্রাপ্য মমতা, শুশ্রূষা বা মনোযোগ; সেখানে তারাবিবি অচরিতার্থ যৌন-বাসনার শিকার, আর এই অচরিতার্থতাজনিত বঞ্চনার প্রসঙ্গটি গল্পে রূপায়িত হয়েছে অতিকুশলতায়-- কখনো সংলাপের মধ্য দিয়ে, কখনো-বা ইঙ্গিতে-ইশারায়। গল্পটি শুরু হয়েছে রমজান আলি ও তারাবিবির যুবক পুত্র গোলজার আলির বিবরণের মধ্য দিয়ে। পুরনো ঢাকার এক নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবন-প্রতিবেশে গল্পের আবহ রচিত। আসাদুল্লার সঙ্গে মুন সিনেমা হলে একটা ইংরেজি ফাইটিং ছবি দেখে বেরিয়ে গোলজার অভিভূত-- ফেরার পথে সে আকাশ জুড়ে টাঙানো সিনেমাস্কোপের পর্দায় পর্যন্ত সেই অসাধারণ ঘুষো-ঘুষির দৃশ্যরূপ দেখে। আসাদুল্লাহ তাকে পতিতালয়ে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি না হয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। দরজায় কান পাততেই সে শোনে তার মায়ের ক্ষোভধ্বনি :

> তুমি তো একখান মরা মানুষ! তামামটা জিন্দেগী ভইরা খালি বিছানার মইদ্যেই পইড়া রইছো, একটা দিন বুঝবার পারলা না আমি ক্যামনে কি পেরেশানির মইদ্যে ঘরবাড়ি চালাই। কি একখান পোলারে প্যাটে ধরছিলাম, হায়রে আল্লা, হাসরের দিন আমি আল্লারে কি জবাব দিমু ? রাইত হইছে বারোটা না একটা, ঘরের মইদ্যে অরে পাইবা না। কৈ কৈ কার লগে রঙ কইরা বেড়ায়, আমি জানি না, না ? ('তারাবিবির মরদ পোলা', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১৩৪)

তারাবিবি অবিরাম বকে যায় এবং সেই সঙ্গে আলী হোসেনের বৌ রাবেয়া, 'কামের মাতারি' সুরুজের মা, বিনয়ের বোন দীপালির মতো পরনারীরা আসে-- তাদের সঙ্গে গোলজার আলির অবৈধ সম্পর্কও বিবৃত হয়। যদিও সেই সন্দেহের সপক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ গল্পে বিধৃত হয়নি, কিন্তু এই সন্দেহ প্রবণতার কারণেই সে পুত্রবধূ সখিনাকে সাবধান করে : 'বৌ, খাল কাইটা কুমির ডাইকা আইনো না, বুঝলা? ... খাল চিনো না? তারাবিবি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে 'গেরাইম্যা মাইয়া তুমি খাল চিনো না? খালের ধারে হাগামোতা কইরা মানুষ হইছো, আউজকা খাল চিনবার পারো না?' ('তারাবিবির মরদ পোলা', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১৩৭) আর এই সন্দেহপ্রবণতার কারণেই সে দিনরাত গোলজার ও তার স্ত্রীকে গালিগালাজ করে। আর এই গালিগালাজে অভিমান করে স্বামী গোলজার আলিকে স্ত্রী সখিনা বলে, 'আমরা গেরাইম্যা মাইয়্যা, ছোটো লোকগো ঘর থন আইছি, তোমাগো খান্দানী ঘরের জামাইরে বাইন্দা রাখি ক্যামনে?' ('তারাবিবির মরদ পোলা', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১৩৬) এই উক্তিতে কেবল সখিনার অভিমানী অনুযোগই রূপ পায় না, বরং প্রকাশিত হয়ে

পড়ে সমাজ-বাস্তবতার এক নগ্ন দিক। সমাজে পুরুষের চরিত্রের সততা রক্ষার দায়ভার যেন কেবল নারীর উপরই বর্তায়। ঘরের পুরুষমানুষ পতিতালয়ে যাবে কি যাবে না, পরনারীতে আসক্ত হবে কি হবে না, এসব যেন ঘরের স্ত্রীদের স্বামীদের মোহিত করবার শক্তির উপর, সতর্ক দৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। এরকম হাস্যকর যুক্তিহীন অথচ নির্মম-কঠোর সমাজ অভ্যন্তরস্থ একটি গূঢ় বিষয় সখিনার এই অভিমানী স্বরের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে যেন পুরুষশাসিত সমাজকেই বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। তারাবিবির বঞ্চিত নারীজীবন, অতৃপ্ত যৌন বাসনা উন্মোচনে লেখক গোলজার চরিত্রের স্মৃতিচারণে জানান : 'গোলজারের একঘেয়ে জীবনের শৈশবের শেষভাগ, কৈশোরের পুরোটা, এমন কি যৌবনকালের প্রথম অংশ তো তারাবিবির কান্না দিয়েই বিরতিময় ছিলো।' ('তারাবিবির মরদ পোলা', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১৩৮) মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে গোলজার বুঝতে পারতো :

> তারাবিবি রমজান আলিকে জাগাবার চেষ্টা করছে, 'অ গোলজারের বাপ! এক্কেরে লাশটা হইয়া রইছো, না? আরে বুইড়া মরদ, খাটিয়ার লাশটাভি লড়েচড়ে, তোমার লড়ন নাই? বিছানা জুইড়া ভ্যাটকাইয়া রইছো, অ গোলজারের বাপ! এরপর রমজান আলি হয় চুপ করে থাকবে, নইলে উঠে তার বালিশের কাছ থেকে হাতপাখাটা নিয়ে বৌকে পেটাতে শুরু করবে। 'খানকি মাগী, তর মরদানি দ্যাখনের খাউজানি উঠছে, না? র। তরে মরদ দ্যাখাই। তর হাউস মিটাইয়া দেই, আয়।' রমজানের দাঁত-পড়া , ঘুম-ভাঙা মুখের বাক্য ভালো করে তেতে উঠবার আগেই মিইয়ে পড়ে, তার হাড়ডিসার হাত দেখতে দেখতে ক্লান্তিতে নুয়ে আসে। ('তারাবিবির মরদ পোলা', †Lvqwi, iPbvmgM-1:১৩৯)

একই সঙ্গে গোলজারের মনে পড়ে তার ভাগ্নেদের ঠাট্টা, তার অতিবৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে তাদের সরস সব উক্তি : 'মামুজান, নানায় হালায় এই বিয়া যহন করছে তহনই তো ষাইট বছইরা বুইড়া। পঁচিশ বছরের ছেমরিটারে লইয়া বুইড়ার বহুত মুসিবত, না মামু? বহুত মেহনত হয়, না?' ('তারাবিবির মরদ পোলা', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১৩৯) তারাবিবির যৌনঅতৃপ্তির কোনো প্রসঙ্গ গল্পে খোলাখুলিভাবে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু বিবাহোত্তরকাল থেকে তারাবিবির কান্না, মরা মানুষের মতো নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে থাকা, স্বামীর প্রতি ক্ষোভ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তারাবিবির অতৃপ্ত-জীবনের বঞ্চনা ধরা পড়ে। এ জন্যই নিজের যুবক সন্তানের মধ্যে যথার্থ মরদ পোলার সাহস ও আচরণ সে প্রত্যাশা করে। এসব সন্তানের মধ্যে দেখে সে যেন নিজের বঞ্চিত ও অতৃপ্ত-জীবনের মধ্যে একটুখানি স্বস্তি পেতে চেয়েছে। ছেলের মধ্যে যে স্বভাব সে প্রত্যাশা করে, তা জাগাবার জন্যই সে ছেলের বন্ধু আবুল হোসেনের স্ত্রী রাবেয়া ও স্কুল জীবনের সহপাঠী বিনয়ের বোন দীপালির সঙ্গে ছেলে গোলজারের শারীরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে নিরন্তর খিস্তি করে গেছে। বিনয়ের বোনের সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করেছে বলে তারাবিবি একদিন প্রশ্ন তুলেছিলো, 'এই যে বেলা তিনটা পর্যন্ত বেজাত মাগীটার লগে বইয়া রইছস, তর বৌ আছে না? দুইদিন বাদে তর পোলা হইবো না? তর শরম নাই? তর শয়তানীর চোট এমুন-- আমার ঘরে ফেরেস্তা আইবো কুনোদিন?' ('তারাবিবির মরদ পোলা', †Lvqwi, iPbvmgM-1 : ১৪৩) মা-বৌয়ের অনুপস্থিতিতে ঘরে কাজের মেয়েকে নিয়ে গোলজার দরোজায় খিল দেয়– রমজান আলির মুখে এ

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ শুনে, সেই তারাবিবিই আবার বলে উঠে : ‘এমুন চিল্লাচিল্লি করো ক্যালায়? গোলজারে কি করছে? পোলায় আমার জুয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মড়াটা হান্দাইয়া গেছো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে?’ (‘তারাবিবির মরদ পোলা’, †Lvqvwi, iPbvmgM-1 : ১৪৭) তখন আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, এখানে এসে সন্তানের কাছে তারাবিবির প্রত্যাশা যেন পূর্ণতা পায়। পরনারীর সঙ্গে নিজের সন্তানের অবৈধ সম্পর্কের মধ্যেই যেন তারাবিবি তার নিজ জীবনের অতৃপ্ত, অচরিতার্থ যৌন-বাসনার ব্যর্থতার তৃপ্তি খুঁজে পায়। আজীবন বঞ্চনা ও অতৃপ্তির কারণে যারা পরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য করতে পারে না-- তাদের মনোবিকৃতির স্বরূপ ও কারণকে পারিবারিক জীবনের আবহে রূপায়িত করে এই গল্পে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে নারীর চিরন্তন বঞ্চনা, বেদনা ও হতাশাকেই মূর্ত করে তুলেছেন তারাবিবি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। সমালোচকের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা যথার্থ হয়ে উঠে :

> তারাবিবির একটানা সংলাপ কানের ফুটো দিয়ে মাথায় ঢুকে এলোমেলোভাবে আঁচড়াতে শুরু করলে পাঠকের সাজানো গোছানো নৈতিকতা একেবারে তছনছ হয়ে যায়। কিন্তু লেখক টিনের দরজার ফুটো দিয়ে চোখ গলিয়ে দিয়ে তারাবিবির সংসারকে অনুসন্ধানী গোয়েন্দার চোখে পর্যবেক্ষণ করেন নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। একসময় অসম যৌনতার শিকার তারাবিবির চরিত্রের খানিক ভোগ অতৃপ্তিজাত ক্ষোভ ও বিকৃতি পাখা মেলে উড়তে থাকলেও আধা-পুঁজিবাদি সমাজ অভ্যন্তরে নারীর যৌনবৈষম্যের চিত্রটি হাড় মজ্জা কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।[১৭]

‘afv‡Z DrcvZ

সমাজ-রাজনীতির অবক্ষয়, মানুষের অস্থিরতা, বিভ্রান্তি, অসুস্থতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে ঘুরে-ফিরে এসেছে। তৃতীয় গল্পগ্রন্থ ‘afv‡Z DrcvZ [18]-এ লেখক যেন সমাজ ও রাজনীতির অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি চলে আসেন। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের অভ্যন্তরে লেখকের দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়। ধীরে ধীরে যেন তাঁর খোঁয়ারি কাটে, তিনি বুঝতে পারেন– প্রতিটি মানুষই কোনো একটা আশা নিয়ে বাঁচে। সেই বাঁচাকে, বাঁচার সেই লড়াইরত মানুষকে জনগোষ্ঠীকে অন্য দৃষ্টিতে অবলোকনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যক্তিমানুষের পরিবর্তে তার গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের অস্তিত্বের অনুসন্ধান জরুরি। মঙ্গলকাব্যের মর্মবাণী ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’ নানা বিন্যাসে আখ্যানিক অবয়ব পেয়েছে ‘afv‡Z DrcvZ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে। ‘মিলির হাতে স্টেনগান’, ‘দুধভাতে উৎপাত’, ‘পায়ের নীচে জল’, ও ‘দখল’– এই চারটি গল্প ‘afv‡Z DrcvZ গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এ গল্পগ্রন্থের মধ্য দিয়ে লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যেন চলে আসেন গ্রামে, বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে– যেখানে আবহমানকাল থেকে নিরন্ন মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত রয়েছে ওপর তলার শোষণ। প্রথম গল্প 'মিলির হাতে স্টেনগান' বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সমাজ, সময়, সংকট ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে। এ গল্পের মিলি, লিলি, রানা, মনোয়ারা বেগম, আশরাফ আলি, আব্বাস পাগলা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চরিত্র। এই আশরাফ আলি, মিলি, লিলি ও রানার বাবা, মনোয়ারা বেগমের স্বামী আর তাদের প্রতিবেশী আব্বাস পাগলা (আব্বাস মাস্টার)–– এদের জীবনচিত্রের খণ্ডিত অথচ জীবন্ত দিনলিপি গল্পটি। পুরনো ঢাকার একটি পরিবার এবং পরিবারটি যে পাড়ায় অবস্থিত সে পাড়াকে আবর্তিত করে 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পটির পটভূমি রচিত হলেও মূলত ইঙ্গিতে প্রতীকে গল্পটি হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। এই প্রতিচ্ছবি লেখকের 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i) ও 'খোঁয়ারি' (‡Lvqwi) গল্পেও বিবৃত হয়েছে, তবুও এ গল্পে যুক্ত হয়েছে প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে পুনরায় যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মানুষের নৈতিকতায় স্খলন দেখা দিয়েছিল। যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল শত্রুসেনা তাড়ানোর কাজে, তা-ই যেন পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত হতে থাকে স্বার্থান্বেষী মহলের ইশারায় নিজের দেশের মানুষের বুকে। এবং একশ্রেণির মানুষ হঠাৎ করেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠতে থাকে। 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে এ সমাজ-সত্যটি রূপায়িত হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতায়। মুক্তিযোদ্ধা আব্বাস আলি মাস্টার স্বাধীন দেশের চরম অবনতি দেখে মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়। তার নাম হয় আব্বাস পাগলা। এ আব্বাস পাগলা সারাক্ষণই মিলিদের বাসার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতো। ব্যাপারটি মিলিকে খুব ভাবাতো, বিষয়টি সে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতো। মিলির বড় ভাই রানার কাছে আব্বাস পাগলা সবসময় একটা স্টেনগান চাইতো। আব্বাস পাগলা মিলির সঙ্গে চাঁদের গল্প, শত্রুসেনাদের অবস্থান নিয়ে গল্প জুড়ে দিতো। রানার সঙ্গে সমাজে উপর মহলের বেশ ভালোই যোগাযোগ ছিল। দেশ পুনর্গঠনের সুযোগে নিজেকে সুযোগ-সন্ধানীর মতো ভালোই গোছাতে থাকে সে। এক পর্যায়ে আব্বাস পাগলার পাগলামী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে তাকে পি.জি. হাসপাতালে মানসিক বিভাগে ভর্তি করা হয়। মিলি বাসায় কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে হাসপাতালে যায়। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে আব্বাস আলি মিলির সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু মিলির মনে পড়ে তার পাগলাস্বরূপ, মিলির কাছে সুস্থ এই আব্বাস আলির চেয়ে আগের অসুস্থ আব্বাস পাগলাই বেশি আকর্ষণীয় মনে হতে থাকে। মিলি একজন মানসিক ভারসাম্যহীন পাগলাকে ভালোবেসেছিল অকপটে। ভালোবেসেছিল তার অবচেতনে স্বদেশের মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা তাকে। ফলে, সুস্থ আব্বাস আলি তাকে আকর্ষণ করে না। বরং মিলি স্টেনগান হাতে নিয়ে ভাবতে থাকে আব্বাস পাগলার শূন্যে উড়ে যাবার কথা, আর চেষ্টা করতে থাকে উড়াল দেওয়ার জন্য। মিলি নিজেই যেন আব্বাস পাগলা হয়ে ওঠে। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে এই গল্পে লেখক স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক অবক্ষয়, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও

সম্ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন। গল্পের শুরু থেকেই লক্ষণীয়, আব্বাস পাগলা একনাগাড়ে চিৎকার করে বলছে :

> রানা, স্টেনগান দিলি না?... কইলাম আমারে একটা স্টেনগান দে। একটা স্টেনগান পাইলে ব্যাকটিরে আমি পানির লাহান ফালাইয়া দিবার পারি! ... কাল রাইতে একটা চানস্ পাইছিলাম। রাইত ভইরা চাঁদনি আছিলো না? আসমান এক্কেরে ধবধবা, ইট ওয়াজ ক্লিয়ার লাইক, এ, লাইক এ। জুতসই উপমা খুঁজে না পাওয়ায় ভাঙা রেকর্ডের মতো সে একই কথা কয়েকবার বলে। ... লাইক এ হোয়াইট শিট অফ পেপার। একটা পিচ্চি মেঘ ভি আছিলো না। এক মিনিট বাদে কল আসতাছে, এ্যালার্ট থাকো। গেট প্রিপেয়ার্ড ফর দি ফাইনাল এ্যাকশন। ('মিলির হাতে স্টেনগান', 'af_\#‡Z DrcvZ. iPbvmgM-1 : ১৬৫-১৬৭)

একটু বিরতি দিয়ে আব্বাস পাগলা পুনরায় বলতে থাকে :

> খুব ভোরের দিকে হালাগো আর্টিলারি-এ্যাট লিস্ট এ হান্ড্রেড টু এ থাউজ্যান্ড, এক লাখও হইতে পারে, আর্টিলারি পাস করলো, আমি সিগন্যালের লাইগা বইসা রইছি। একটু থেমে ফিসফিস করে, মেট্রেগুলি কম্যুনিকেশন ডিসরাপ্ট কইরা দিলো। ... রাইত তহন কিছু বাকি রইছে। চান্দে হালায় তহন ভি পুরা ফোকাস মারতাছে। একবার উপরে চাইয়া দেখি, ঐগুলি কী? আসমানের মইদ্যে উঁচানিচা এগুলি কী? গাত মালুম হয়না?– হ, তাই তো! এন্টায়ার স্কাইস্কেপ হ্যাজ বিন রেপড মিজারেবলি! খালি বাঙ্কার, ট্রেঞ্চ এইখানে গর্ত, ঐখানে খন্দ! ... একটি মাত্র অস্ত্র হাতে থাকলে আব্বাস পাগলা কি হেড কোয়ার্টারের অর্ডারের জন্য প্রতীক্ষা করে? একটা স্টেনগান থাকলে হু বদারস ফর দি ফাইনাল মেসেজ? ('মিলির হাতে স্টেনগান', 'af_‡Z DrcvZ. iPbvmgM-1 : ১৬৮)

মুক্তিযুদ্ধের সময় এই আব্বাস মাস্টার ইন্ডিয়ায় যায়, নানা ফ্রন্টে লড়াই করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্বে দেশের সামূহিক অরাজকতা, ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির লেজুরবৃত্তি, যুব-সমাজের মধ্যে ভয়াবহ ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি, লাম্পট্য ও ভোগবাদ– এসব দেখে আব্বাস মাস্টারের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে স্বাভাবিক থাকা কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে হয়ে উঠে আব্বাস পাগলা। সমালোচকের ভাষায় : 'আব্বাস পাগলা এই গল্পে ধারণ করে আছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ভারসাম্যহীনতার নির্ণায়ক অভিধা।'[১৭] মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাঙালির সম্মান ও গর্ব বাস্তবায়িত হয়নি। সুস্থ রাজনৈতিক পন্থা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়নি। যুবসমাজ হয়েছে অবক্ষয়ের শিকার। মিলির বড় ভাই রানা যুদ্ধ করেছে '৭১ এ, কিন্তু অস্ত্র জমা দেয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে এখন সে ঘরে দামি জিনিসের স্তূপ ঘটায়। রানা ও তার বন্ধুরা যুদ্ধোত্তর যুবসমাজের প্রতিভূ প্রতীক। দল ক্ষমতায় রয়েছে বলে তারা সমবেতভাবে নানা সুবিধা আদায় করলেও কেউ কাউকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। গল্পে বিষয়টি উঠে এসেছে এভাবে:

> রানার সমস্যার আর অন্ত নাই। কার দিকে টেনে সে কথা বলে? একজন শালা গাড়ির মালিক। ওর বাপও টপ লেবেলের এম.পি। আবার সেক্রেটারিয়েট আত্মীয়-স্বজনে ভরা। ওদিকে বিজনেস বলো এ্যাকশন বলো– সব ধরণের ব্যাপারে ফর্সা-রোগার মাথা একেবারে পরিষ্কার। ('মিলির হাতে স্টেনগান', 'af_‡Z DrcvZ. iPbvmgM-1 : ১৬৬)

অবিশ্বাসে ভরা, অস্থির সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ঢুকে পড়ে সন্দেহ, জীবন কাটে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার মধ্যে। মিলির বাবার কাছে মনে হয় আব্বাস গোয়েন্দা সংস্থার লোক। রানার দিকে নজর রাখছে হয়তো-বা। তাই তো আশরাফ আলির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা :

> না না এদের এ্যাভয়েড করতে হয়। সব জায়গায় আজকাল আই.বি.র লোক। কে যে কী ডিসগাইজ নিয়ে আসে।
>
> আই.বি হবে কেন? মনোয়ারা বিরক্ত হয়, তুমি কি এমন মস্তবড় মানুষ যে তোমার ঘরে আই.বি ঢুকবে?
>
> আহা, আমি কেন? আমি কেন? দু'একবার তোতলালেও আশরাফ আলী শেষ পর্যন্ত বুকে বল নিয়ে বলে তোমার ছেলে বড়লোক হচ্ছে না? ... মানে রানাকে তো আজকাল সবাই চেনে টেনে, মানে পপুলার তো, তাই ধরো–। ('মিলির হাতে স্টেনগান', 'af\‡Z DrcvZ. iPbvmgM-1 : ১৭৩)

এ প্রসঙ্গে মিলির একটি বিবরণ বিষয়টিকে যেন আরো একটু খোলাসা করে তোলে এভাবে : 'বাপের জন্য মিলির একটু মায়াই হয়, আব্বা যে কখন কী ভাবে। তার ইচ্ছা করে বাপকে বলে যে আই.বি' র যারা বাপ, তাদের বাপের সঙ্গে রানার কড়া লাইন। দামি দামি সব জনিসপত্রে ঘরবাড়ি ভরে তুললো, গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে না, আর আই.বি আসবে তাকে ধরতে?' ('মিলির হাতে স্টেনগান', 'af\‡Z DrcvZ. iPbvmgM-1 : ১৭৩) কিন্তু রানার মতো পাওয়ারফুল ছেলেও এই পরিবারের অনিশ্চয়তা দূর করতে পারে না। এভাবেই দেখা যায়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে নগরীর মানুষ যেন অবরুদ্ধ, রুদ্ধশ্বাসে সময় কাটায় তারা। রাত জেগে মা সন্তানের জন্য প্রতীক্ষা ও দুশ্চিন্তা করেন, ব্যাংকে ডাকাতি হয়, সমস্ত রাত বাসার অদূরে রাস্তায় গোলাগুলি চলে। ঘরে ঘরে তৈরি হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন ভয়াল রাত্রির মতো অসহ্য উৎকণ্ঠা ও স্তব্ধতা। গোলাগুলির সময়ে রানাদের ঘরে সবাই শুয়ে পড়ে মেঝেতে। রাত শেষ হলে স্টেনগান হাতে রানাকে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে মিনির মনে হয় : 'যুদ্ধের পর এই জিনিসটি নিয়ে রানা বাড়ি ফিরেছিলো। এটা নিয়ে ভাইয়া তখন কতো কথা বলতো। আর এটা এখন কোথায় রাখে, কখন লুকিয়ে নিয়ে বেরোয় কিছু জানা যায় না। ভাইয়াটা কী হয়ে যাচ্ছে কতোদিন চুল কাটে না।' ('মিলির হাতে স্টেনগান', 'af\‡Z DrcvZ. iPbvmgM-1 : ১৮১) এভাবেই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যুবসমাজের অবক্ষয়, হতাশা, বিভ্রান্তি ও অসহায়ত্বকে লেখক গল্পে চমৎকারভাবে রূপ দিয়েছেন। এই অসহায় সমাজ-বাস্তবতায় মিলির মায়ের চরিত্রে কন্যাদায়গ্রস্ত মায়ের স্বরূপটিও একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। রানার বন্ধুরা বাসায় এলে মিলির মা ইচ্ছাকৃতভাবে চা-নাস্তার ট্রেসহ মিলিকে ভেতরে যেতে বলেছে। তার গোপন ইচ্ছা, এদের মধ্যে কারো সঙ্গে মিলির একটা ব্যবস্থা যদি করা যায় তো মন্দ হয় না। বিষয়টি এভাবে বিবৃত হয়েছে :

> মিলির সঙ্গে মুখোমুখি হতে ফর্সারোগার মাখোমাখো মার্কা চোখে মুখে লাল রঙ ক্যাট ক্যাট করে ওঠে, এই জিনিস মিলি আগেও লক্ষ করেছে। কালো-লম্বা এক্সট্রা স্মার্ট হয়, ... অতো ছটফট করার দরকার কী বাপু? প্রেম ট্রেম করতে চাইলে সরাসরি বললেই

> পারে। এরা তো সব এক টাইপের। মিলি কী বাছাবাছি করতে বসবে, না তাই করা তার পোষায়? তবে গাড়িওয়ালা কিন্তু যেমন ছিলো, তেমনি রইলো। হায়রে, আম্মার টার্গেট তো এই গাড়িওয়ালাই। ('মিলির হাতে স্টেনগান', 'afv‡Z DrcvZ. iPbvmgM-1 : ১৬৭-১৬৮)

কন্যাদায়গ্রস্ত মাতার গোপন উদ্দেশ্যকে গল্পে রূপ দিয়ে লেখক যেন মিলির মায়ের চরিত্রের মাধ্যমে চিরন্তন অসহায় মাতৃহৃদয়ের স্বরূপকেই প্রতিবিম্বিত করেছেন। রানা এবং তার বন্ধুদের সহযোগিতার মাধ্যমে আব্বাস পাগলাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এক পর্যায়ে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। মূলত, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস ও বিরাজমান স্বার্থপরতার ভেতরে আব্বাস পাগলাকে মিলির ব্যতিক্রম মনে হয়েছিলো, সে সামগ্রিকভাবে এই অবস্থার অবসান চেয়েছে বলেই আব্বাস পাগলার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ততোদিনে আব্বাস পাগলা সুস্থ হয়ে গেছে। সুস্থ হয়ে সে বরং রানাদের মাধ্যমে ইন্ডেন্টিং ফার্মে ঢুকে পড়তে ব্যস্ত। তখন মিলি নিজেই যেন আব্বাস পাগলার স্বপ্নকে ধারণ করতে শুরু করলো। মিলি যেন আব্বাস পাগলায় রূপান্তরিত হলো :

> চাঁদ তাহলে এতক্ষণে শত্রুর কব্জায় চলে গেছে! দখলকারী সেনাবাহিনীর একনাগাড়ে বোমাবাজিতে চাঁদের হাল্কা মাটির ধূলা এবং বারুদের কণা নিচে ঝরে পড়ছে। রোদ ও বাতাস তাই ধোঁয়াটে ও ভারি, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বৈ কি! হাতের স্টেনগানের ইস্পাতে আঙুল বুলাতে বুলাতে পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে মিলি আরো ওপরে দেখার চেষ্টা করে। ... চাঁদের রেঞ্জ এখনো মেলা দূর, ওকে তাই দাঁড়াতে হয় পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। এতে হচ্ছে না। এবার একটা উড়াল দেওয়ার জন্য মিলি পা ঝাপ্টায়। ('মিলির হাতে স্টেনগান', 'afv‡Z DrcvZ. iPbvmgM-1 : ১৮৩)

এই গল্পে আব্বাস পাগলা ও মিলি বাংলাদেশের মুক্তি আকাঙ্ক্ষী মানুষের প্রতিনিধি। চাঁদ তাদের স্বপ্ন। চাঁদ এখানে বাংলাদেশের প্রতীক। আব্বাস পাগলা চাঁদের চতুর্দিকে শত্রু দেখেছে, কিন্তু তার ভাবনায় চাঁদে আঘাত লাগেনি। কিন্তু মিলির স্বপ্নে বোমার আঘাতে চাঁদের মাটি ঝড়ে পড়েছে। চাঁদরূপ স্বপ্নকে আহত হতে দেখে মিলি যখন উড়াল দেয়ার জন্য পা ঝাপটায়, তখন যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশ যেন তার স্বাধীনতার স্বপ্নভঙের বেদনায় নীল আর্তনাদ করে ওঠে, সামূহিক অরাজকতা থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় যেন পা ঝাপটাতে থাকে। কিন্তু কী উপায়ে মুক্তির পথটি তৈরি করা যাবে, এ বিষয়ে আব্বাস পাগলা বা মিলি দুজনের কেউই স্পষ্ট হতে পারে না। তবু তারা তাদের অবস্থান থেকে চেষ্টা করে যেতে থাকে। সমালোচকের ভাষায় :

> মিলির একটি স্বপ্নের সঙ্গে 'প্রতিশোধ' (Ab¨ N‡i Ab¨¯̄i) গল্পের ওসমান গনির দেখা একটি স্বপ্নের সাদৃশ্য রয়েছে। স্বপ্নে দুজনেই একটি ক্রেন বেয়ে উঠতে থাকে। ওসমান একা, মিলির স্বপ্নে থাকে (সঙ্গে) আব্বাস। তবে দুজনের কেউই শেষ পর্যন্ত ক্রেনের (অর্থাৎ অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষার) চূড়ায় উঠতে পারে না, পা ফসকে পড়ে যায় গভীর খাদে।[২০]

আবার কারো মতে :

> স্বাধীনতা লাভের পর মিলির হাতে স্টেনগান তুলে দিয়ে আব্বাস পাগলার স্থলাভিসিক্ত করেন নতুন চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে। এই গল্পে বাতুলগ্রস্ত আব্বাস পাগলা অবলীলায় দিয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী আমাদের অপ্রাপ্তিজাত ক্ষোভের দীর্ঘ ফিরিস্তি। স্বাধীনতার মহান চেতনা ভূলুণ্ঠিত হয় নয়া শাসক ও শোষকদের আবির্ভাবে, এ রকম দমবন্ধ করা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা আব্বাসের সঙ্গে পাঠকও স্বাভাবিকতা হারায়। বাতুলগ্রস্ত মনে হয় নিজেকে।[২১]

এভাবেই মিলি এ গল্পে যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের ক্ষত-বিক্ষত মানচিত্রের মুক্তিকামী চেতনার প্রতীক হয়ে পাঠকের বিবেচনা বোধকে নাড়া দেয়ার চেষ্টা করেছে। মিলি চরিত্রের আবরণে যাবতীয় অনাচার অরাজকতায় নিমজ্জিত বাংলাদেশের মুক্তির প্রচেষ্টা ধ্বনিত হয়েছে 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে। বাংলাদেশের এই মুক্তি বর্তমান প্রজন্মের হাত ধরেই আসবে– এই রকম আভাসই মিলি চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'দুধভাতে উৎপাত' আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একটি দিকনির্ণয়ক গল্প। গল্পলেখার এ পর্যায়ে এসে যেন ধীরে ধীরে লেখকের নাগরিক জীবনের খোঁয়ারি কাটতে থাকে। পুরোনো ঢাকার অলিগলি, নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনগাথা ইলিয়াসের গল্পের প্রধান বিষয় হলেও এ গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক যেন ফিরে তাকালেন বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন, কৃষক ও প্রান্তিক মানুষের বিষণ্ন-বিবর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত জীবনদৃষ্টির গভীরে। সেই জীবনের হাসিকান্না, ব্যর্থতা-বঞ্চনা, ক্ষোভ-হতাশা প্রভৃতিকে কার্যকারণ ও দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে আবদ্ধ করে জীবনঘনিষ্ট করে রূপায়িত করেছেন 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যবস্থায় ক্ষুধাপীড়িত বঞ্চিত অসহায় মানুষের আর্তনাদ 'দুধভাতে উৎপাত' গল্প। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামের সুবিধাবাদী ও ক্ষুধাপীড়িত মানুষের নীচতা, ধর্মীয় সংস্কার ও অহঙ্কার। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই গ্রামে বসবাস করে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবনযাত্রার মান খুব নিম্নস্তরের। এ কারণেই তারা অনেক অল্পতেই খুশি হয়। তাদের চাহিদাও যেন তাদের সামর্থ্যের মতোই ক্ষুদ্র, সীমার মধ্যেই থাকে, একজন মৃত্যুপথযাত্রীর অসীম যাত্রার পূর্বে শেষ চাওয়াটুকুও যে সামান্য দুধভাত। কিন্তু তাও তার ভাগ্যে জোটানো সম্ভব হয়না। যেখানে দুমুঠো ভাতেরই যোগান দেয়ার নিশ্চয়তা নেই, সেখানে দুধভাত তো অনেকটা বিলাসিতারই শামিল। এরকম চাওয়া-পাওয়ার দোলাচলেই 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। অজপাড়া গাঁ বলতে যা বোঝায়, সেরকমই একটি গ্রাম ও গ্রামের মানুষের দারিদ্র্যপীড়িত অসহায়-বঞ্চিত জীবনের কাহিনি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এই গল্পে যেন বাংলাদেশের একটা বৃহত্তর অংশের জীবন-চর্যাটিকে উন্মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে উঠে। অসুস্থ জয়নাবের পাঁচ সন্তান। স্বামী কসিমুদ্দিন উত্তরে এক গ্রামের মক্তবে পড়ায়। বছরে দু-একবার আসে। বড় ছেলে ওহিদুলা স্কুলে যায় আবার কখনো কখনো স্কুলে যাবার নাম করে লঞ্চে গিয়ে ভিক্ষা করে, যা জয়নাব জানে না। নিতান্ত ক্ষুধার জ্বালাতেই সে এ কাজ করে। এমনি একদিন বৃষ্টিস্নাত সকালে ওহিদুল্লাকে স্কুলে যেতে বারণ করে জয়নাব। সময়টা তার কাছে ভালো ঠেকে না। কথা বলতে গিয়ে তার শ্বাসকষ্টটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। মনে মনে সে স্বামী সন্তানদের নিয়ে সুখের

স্মৃতি রোমন্থন করে। আজ তার খুব ইচ্ছে হয় দুধভাত খেতে। তাদের একটি গরু ছিলো, কিন্তু অভাবের তাড়নায় গরুও বেহাত হয় একবছর আগে। সারা গ্রামে দুধ খুঁজেও কারো কাছ থেকেই পাওয়া যায় না। এমনকি নিজের গরুটা যাদের বাড়িতে সেখান থেকেও শূন্যপাত্রে ফিরে আসতে হয়। শেষপর্যন্ত চালের গুড়িসহ ভাত মাখানোকেই দুধভাত মনে করে পিত্তিজুড়িয়ে জয়নাব সন্তানসহ খায় আগ্রহভরে। এ সময়ই তার মৃত্যুবমি আরম্ভ হয়। বমি করে নেতিয়ে পড়া জয়নাব যখন জানতে পারে যে, সে দুধভাত মনে করে যা খেয়েছে তা আসলে দুধভাত ছিল না। তখন প্রচণ্ড অভিমানে, কষ্টে, হতাশায় আক্রোশে ফেটে পড়ে সে। শেষ পর্যন্ত চাওয়া-পাওয়ার অপূর্ণতা নিয়েই জয়নাবের জীবনের ইতিহাস সমাপ্ত হয়। জয়নাবের জীবনের ইতিহাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামীণ-জীবন ব্যবস্থার নিভৃতে দরিদ্রতার নগ্নরূপটি প্রকাশিত হয়ে পাঠককে বিমূঢ় করে তোলে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য কতটা নির্মম হতে পারে, তারই এক জীবন্ত আখ্যান হয়ে ওঠে 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পটি। ধলেশ্বরী নদীর তীরের এক গ্রামের কসিমুদ্দিনের কিশোর ছেলে ওহিদুল্লার চোখ দিয়ে গল্পের ঘটনাবলি চিত্রিত হয়েছে। ওহিদুল্লা স্কুলে যেতে চায় আর দশটা তার বয়সী বালকদের মতোই। কিন্তু দরিদ্রতা তার সে স্বপ্নকে যেন ভেঙচি কাটে কর্কশভাবে। মা জয়নাবের অসুস্থতার কারণে তার স্কুলে যাওয়া হয় না। তার মনে হতে থাকে, স্কুলে যেতে পারলে হয়তো কিছু দানাপানি তার পেটে পড়তো। কেননাঃ

> সাড়ে ১০টায় লঞ্চে উঠে কাপড়ের গাঁটের ওপর বসে থাকা প্যাসেঞ্জারদের সামনে সুর করে 'মা ফাতেমা কাইন্দা বলে বাপ কোথায় আমার/হায়রে নবীজীর এন্তেকালে দুনিয়া জারজার' গাইতে গাইতে বাঁ পা'টা খুঁড়িয়ে হাঁটলে ২ টাকা আড়াই টাকা যোগাড় করা এমন কিছু নয়, তারপর রামেশ্বরদি ঘাটে নেমে কদম আলীর দোকানে বসে চায়ে ভিজিয়ে বনরুটি খাও, পেয়ারা খাও, গাব খাও, পয়সা থাকলে চাই কি মেঘনা সিগ্রেটও একটা জুটে যায়। ('দুধভাতে উৎপাত', 'afv‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৮৪)

অভাবের তাড়নায় কীভাবে কিশোর বয়সের একটি বালকের মনে পড়ালেখা করে বড় হওয়ার স্বপ্নকে চুরমার করে ভিক্ষাবৃত্তির মতো জঘন্য কাজ জায়গা করে নিতে পারে গল্পে সে বিষয়টি রূপায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার ভগ্ন চিত্রকেও যেন নির্দেশ করেছে। গল্পের একদম শুরুতেই আছে : 'একটু বেলা হলে বৃষ্টি ধরে এলো। তবে আবুল মাস্টারের উত্তর পাড়ার জমিতে পাটকাটা শুরু হয়েছে, শালার মাস্টার আজ আসবে না।' ('দুধভাতে উৎপাত', 'afv‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৮৪) পাট কাটার জন্য যেখানে স্কুল বন্ধ থাকে, সেখানে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যহত হতে বাধ্য। এই দৃশ্যে গ্রামীণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌল চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছে। শিক্ষায় যদি এভাবে ঘুণপোকা ধরে তাহলে জাতির মেরুদণ্ড যে কতটা সোজা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ওহিদুল্লার পিতা কসিমুদ্দিন চরিত্রটি গল্পে দরিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বহীনতার যোগসূত্রকে বিবৃত করেঃ 'এখানে এই বিল এলাকায় কসিমুদ্দিনের দাম বোঝার মতো লোক কোথায়? ... যেখানে তিনদিন বৃষ্টি হলো তো ডাঙা ও নদীর কোন ভেদচিহ্ন রইলো না, সেখানে মানুষ বাস করে?' ('দুধভাতে উৎপাত', 'afv‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৮৫) এই আক্ষেপ ওহিদুল্লার বাবা মৌলভি

কসিমুদ্দিনের। এখানে মৌলভীর দাম বোঝার মতো লোক নেই বলে এবং প্রাকৃতিক অব্যবস্থার কারণেও সে চলে যায় তিস্তাতীরের খোলামহাটি গ্রামে নিজের দাম বাড়াতে। প্রধানের বাড়িতে সে স্বচ্ছল জীবনযাপন করে অথচ পরিবারের জন্য, পরিবারের সবার মুখে অন্নসংসস্থানের কোনও উদ্যোগ নিতে তাকে দেখা যায় না। পাঁচটি সন্তান উৎপাদন ছাড়া পরিবারকে দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে কোনও ভূমিকা নিতে তাকে দেখা যায় না। কোরবানির ঈদের পর মাংস কলিজা নিয়ে একবার এবং বছরে আর দু'একবার ছাড়া তাকে পরিবারের সঙ্গে দেখা যায় না। একা জয়নাব বিবি এতগুলো সন্তান নিয়ে আগ্রাসী ক্ষুধার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তীব্রতা ও বিস্তার কীভাবে মানুষকে অমানবিক ও স্বার্থপর করে তোলে এ গল্পে তার সুনিপুন প্রকাশ ঘটেছে। মৃত্যুপথযাত্রী জয়নাব বিবির হঠাৎ ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুধভাত খেতে ইচ্ছে করলে সন্তান ওহিদুল্লাহ ভাবে : 'এই তো মেয়ে মানুষের বুদ্ধি। কাল থেকে শুরু হয়েছে দুধের বায়না। গোরু বিক্রি করে দিয়েছে আজ এক বছরের ওপর, সেই গোরুর শোক কাল থেকে নতুন করে উথলে উঠেছে। এতো হাহাকারের আছে কী? গরু যখন ছিলো তখনি কি এই মা মাগী ওদের দুধভাত দিতো?' ('দুধভাতে উৎপাত', 'afv‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৮৬) না, ছেলেমেয়েদের মুখে দুধভাত দেবার মতো সামর্থ কোনোকালেই জয়নাব বিবির ছিলো না। কেননা প্রতিদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হাশমত মুহরির বড়ো ছেলে ঢ্যাঙা আশরাফ বা তার ঘরজামাই হারুন মৃধা এসে দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতো। বিনিময়ে সাতদিন পর পর বাজারে হারুন মৃধার দোকান থেকে ওহিদুল্লা চালডাল নিয়ে আসতো। ফলে জীবনের ন্যূনতম খাওয়া পরার যোগান দিতেই যেখানে ব্যাকুল হয়ে থাকতো জয়নাব বিবি, সেখানে দুধভাত দেয়া স্বপ্নেরই মতো। মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য হাশমত মুহরির বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে ওহিদুল্লা টিপটিপ বৃষ্টিতে তার জ্যাঠাকে ভিজতে দেখে, খরার সময় হাসমতের জামাই হারুন মৃধার দোকান থেকে যে পাঁচসের চাল বাকি নিয়েছিল, সেই ধার শোধ না হওয়ায় সে নিজে যেতে সংকোচ বোধ করছে, ভাইপোকে শেখায় কিভাবে দুধ চাইতে হবে : 'ওইদুল্লা, কোষাখান লইয়া মালখাপাড়া যা, হাশমত মউরির তিনটা গাই, দুধ লইয়া বাজারে অহনো যায় নাই। মউরিরে হাতে পায়ে ধইরা কইস, আমার মায়ের অহন-তহন অবস্থা, একখান হাউস করছে, আপনের না কওন চলবো না' ('দুধভাতে উৎপাত', 'afv‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৮৭) মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য হাশমত মুহুরির বাড়ি দুধ আনতে গেলে সেখানে ওহিদুল্লা এক নির্মম বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয় :

> ওহিদুল্লার আবদার শুনে মুহুরির বৌ অবাক হলো, হায়রে আল্লা তর মায়ের না প্যাটের ব্যারাম? চিরকালের সুতিকার রুগী? হ্যারে তুই দুধ খাওয়াইবি? পাগল হইছস? ... মুহুরির জামাই হারুন মৃধা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, বলে, তর মায়ের প্যাট খারাপ, তগো হইছে মাথা খারাপ।
>
> ওহিদুল্লা মিনমিন করে, না, হ্যার হাউস হইছে দুধভাত খাইবো, মায়ে বলে বাঁচবো না ... দুধভাত খাইলে তর মায়ে ফাল পাইড়া উঠবো, না? ('দুধভাতে উৎপাত', 'afv‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৮৮)

এই নির্দয় উদাসীনতা ও নির্মম উপহাস আরো সুতীব্র হয়ে ওঠে যখন : 'শহরবাসীর স্কুলে-পড়া ফ্রক-পরা কন্যা কামড়ে কামড়ে পেয়ারা খাচ্ছিলো, মুখে পেয়ারা নিয়েই সে বলে, দুধ আমার ভাল্লাগে না। দুধ আবার মানুষ সখ করে খেতে চায়? মাগো।' ('দুধভাতে উৎপাত', 'afv‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৮৮) এভাবে অবহেলা-উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিস্তার লাভ করে শ্রেণি-বৈষম্যকেই প্রকটিত করে। জয়নাব বিবি মরে যাচ্ছে, এ ঘটনা হাশমত মুহুরির বউ, মেয়েই জামাই হারুন মৃধা কিংবা শহুরে ছেলেকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না স্বাভাবিকভাবেই, কেননা এরা শ্রেণিগত ব্যবধানে দুই মেরুর বাসিন্দা। কিন্তু ক্ষুধা, দরিদ্রতা কেমন করে সন্তানকেও মাতৃপ্রেমের অনুভূতির বাইরে টেনে নিয়ে যায় তার বর্ণনা এ গল্পেই পাওয়া যায়। ঘরের ভেতরে মাকে নিয়ে আহাজারি চলে, অন্যদিকে মেয়ে খাদিজা কচুর ঝোপে পালিয়ে শশা খেয়ে ক্ষুধা তাড়ায়। জয়নাব বিবির ইচ্ছে পূরণের জন্য তার বড়ো জা হামিদা বিবি চালের গুঁড়া জ্বাল দিয়ে দুধভাতের মতো করে দিয়ে মেখে নিয়ে এলে এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। বর্ণনাটি তাৎপর্যপূর্ণ :

> মায়ের পদসেবা ছেড়ে হাজেরা এসে দাঁড়িয়েছে হামিদা বিবির হাতের সানকির ধার ঘেঁষে। খাদিজা তার শশা সম্পূর্ণ খেয়ে বা অভুক্ত অংশটি কোনো ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে রেখে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আহমদউল্লার মুখ থেকে অর্থহীন ধ্বনি ও লালা গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু খাদিজার হাঁটুর পেছনে ছেঁড়া পায়জামার ঝুলে-পড়া কাপড় ধরে সেও মুখ তুলে গোল ও কালো সানকিটা দেখছে। স্যাঁতসেঁতে কাঁথার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হামিদা বিবি জয়নাবের ডান হাত টেনে আনে। ... এক মুঠি দুধমাখা ভাত সেই হাতে পুরে দিলে হাতটা নিজে নিজেই ছেলে মেয়েদের দিকে এগিয়ে আসে। সবচেয়ে বেশি এগিয়ে সাড়া দিয়েছিলো খাদিজার মুখ। ... তবে হাঁ সবচেয়ে বড়ো হয়েছিলো হাজেরার যদিও একটু পিছিয়ে পড়ায় জয়নাবের হাত ঘেঁষে সে দাঁড়াতে পারে নি। এক চোখ কানা হলেও এবং মায়ের উল্টোদিকে থাকা সত্ত্বেও কানা রহমতউল্লা তার ভালো চোখটা দিয়ে সব দেখে ফেলেছে, সেও মায়ের কাছাকাছি বিছানার ওপর উঠে বসতে চেষ্টা করেছিলো। কনিষ্ঠটির আবোল তাবোল বকা শেষ, তখন তার জিভে কোনো ধ্বনি নাই, কেবল লালা গড়িয়ে পড়ছে। ('দুধভাতে উৎপাত', 'afv‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৯২)

অতঃপর হামিদা বিবি জয়নাবের দুধভাত ভরা হাতটি পাঁচটি ক্ষুধার্ত মুখ, আকুল চাহনি সন্তানের মাঝে ধরলে 'ভাতের গন্ধে, গুড়ের গন্ধে'ওহিদুল্লার ক্ষুধা তীব্রতর হয়ে ওঠে। জয়নাবের হাত যখন ধপাস করে বিছানায় পড়ে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে খাদিজা সেই হাত নিয়ে স্তনের মতো চুষতে থাকে। এরই সঙ্গে জয়নাবের বমি শুরু হয়। জয়নাব বিবির বমি করার দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে লেখক এ গল্পে ক্ষুধার তীব্রতাকে ধারণ করেছেন এভাবে :

> কে শোনে কার কথা? বিছানার উপর থেকে মাটির সানকিটা কখন যে পাচার হয়ে গেছে ঘরের পূর্ব কোণে এমন কি ওহিদুল্লাও টের পায়নি। কাদাকাদা মেঝেতে একমাত্র সে ছাড়া আর সবাই লেপ্টে বসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটির সানকির ওপর। হাজেরা তার ডান হাত দিয়ে খাচ্ছে বটে, কিন্তু সানকির সঙ্গে তার মুখের তফাৎ ২/৩ ইঞ্চির বেশি নয়। ইচ্ছে করলে সরাসরি মুখ দিয়েই সে ভাত তুলে নিতে পারে। ... কানা রহমতউল্লা এক চোখে যা দেখে সমস্ত সানকিটা দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাই যথেষ্ট। এখান থেকে তার কানা চোখটা দেখা যায়। মনে হয় খাওয়ার সুখে তার চোখটা বুঁজে এসেছে। আর কনিষ্ট আহমদউল্লা দুই হাতে ভাত খাচ্ছে, তার নাকের প্রবাহিত সিকনি মিশে যাওয়ায় তার লোকমাগুলোর তরলতা বাড়ে। ... ওহিদুল্লার সর্বশরীর এখন কেবল

> পেটেরই সম্প্রসারণ। এই সব জানোয়ারের ওপর রাগে তার সর্বশরীর অর্থাৎ সমস্ত পেট জ্বলে ওঠে, ইচ্ছা করে সানকিটা কেড়ে নিয়ে দুধভাতসমেত চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। ('দুধভাতে উৎপাত', 'af¨‡Z DrcvZ, iPbvmgM-1 : ১৯৩-১৯৪)

ক্ষুধার এমনতরো বর্ণনায় পাঠকের চিত্ত আলোড়িত হয়, আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি জীবন-বাস্তবতার করুণ নির্মমতায়। প্রসঙ্গটিকে সমালোচক এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : 'রুগ্ন জয়নাবের ভাত খাওয়া এবং বমন দৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণণায় যে হৃদয়হীন, প্রতীকশূন্য, স্নায়ুপীড়নকারী দৃশ্য নির্মিত হয়েছে তা আমাদের সচকিত না করে পারে না। এই একটি দৃশ্যে আমরা মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ একটি জৈবিক প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করি।'[২২] আবার এই গল্পে জয়নাব বিবি ও তার সন্তানদের ক্ষুধার তীব্রতায় দুধভাত খাওয়ার যে দৃশ্য গল্পে অঙ্কিত হয়েছে তার নির্মমতাকে কোন কোন সমালোচক এভাবে বিবৃত করেছেন :

> জয়নাব বিবির বমির কাছে পড়ে থাকা সানকির ওপর একঝাক পশুর মতো পাঁচটি ছেলে-মেয়ে হুমড়ি খেয়ে যে দৃশ্যের সৃষ্টি করে তা আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর-অসহ্য-অস্বাভাবিক ঠেকে। এতটা যেন হয় না, এ যেন অভিজ্ঞতার বাইরে বা অবাস্তব। ... মানুষের ক্ষুধা এবং ক্ষুধার্ত মানুষের চরিত্রের গতিপ্রকৃতির নগ্নরূপ আরো নগ্ন ও বীভৎসরূপে উপস্থাপন করবার জন্যই যেন ইলিয়াস সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে ব্যাপারটিকে এমন ভয়ঙ্কর ও অস্বস্তিকর করে তুলেছেন। ... আসলে ক্ষুধা ও ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে ধারণা থাকলেও আমাদের গ্রামসমাজে বঞ্চিত মানুষের প্রকৃত অবস্থা যেমন আমরা জানি না, তেমনি এ অবস্থায় মানুষ কতটা বিচিত্র ও মানবেতর আচরণ করতে পারে– তাও আমাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতার বাইরে। ফলত, এ ধরণের ভয়ানক দৃশ্যের মুখোমুখি হলে দিশেহারা না হয়ে, একটু অস্বস্তিবোধ না করে পারা যায় না। এরকম নির্মোহ পর্যবেক্ষণ ও নির্মম উপস্থাপন ইলিয়াসের স্বেচ্ছাকৃত।[২৩]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই গল্পে কেবল বিশেষ একটি জনপদের গ্রামীণ মানুষের অসহায়ত্ব, দরিদ্রতার নির্মমতা ও ক্ষুধার ভয়াবহতাকেই ধারণ করেননি, বরং : 'অহিদুল্লার চার ভাইবোন, অসুস্থ মা জয়নাব বিবিসহ ৬ জনের একটি পরিবারের প্রত্যেককে নানা ভঙ্গিতে দেখান লেখক; পরিবারের মর্মন্তুদ অবস্থার ভেতর দিয়ে উন্মোচন করেন বাংলাদেশের গ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অবস্থা'[২৪] বৃহত্তর গ্রামীণ-দরিদ্র জীবনের করুণ মর্মন্তুদ বঞ্চনার স্বরূপটিকে কেউ কেউ বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে :

> এ-দেশে, শুধু এ-দেশে কেন, প্রায় প্রতিটি দেশেই দুধভাতে উপদ্রব দীর্ঘকালের। সমাজের বিশেষ একটি গোষ্ঠী, বলবান গোষ্ঠী, চিরকালই ঘন দুধ, দুধের সর, শবরী কলা আর কড়াপাকের গুড় দিয়ে তৈরি অমৃত উদরস্থ করছে। মাঝে মধ্যে জয়নাবেরা ভুল করে দুধভাত খেতে চাইলে ধূর্ত মুহুরীরা দুধেল কালো গাইখান তুলে নিয়ে যাচ্ছে সুকৌশলে।[২৫]

বমির ভেতর দিয়ে জয়নাব বিবি যেন সমস্ত জীবনের বঞ্চনা, ব্যর্থতা, নিপীড়নের ইতিহাসকেই উগরে ফেলতে চায়। ক্ষুধার তাড়নায় জয়নাব বিবির মৃত্যু ঘটলেও সে তার বিপক্ষ শত্রুদল হিসেবে শনাক্ত করে যায় হাসমত মুহুরি, তার মেয়ে-জামাই হারুন মৃধা ও তার ছেলে ঢ্যাঙা আশরাফকে। গ্রামের এসব বিত্তবান মানুষ সামান্য অর্থের বিনিময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থাবর অস্থাবর সম্পদ ছিনিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। তাদের নিঃস্ব করেই এসব তথাকথিত বিত্তবানেরা টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। এদের স্বরূপটিকে উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা-দারিদ্র্য কেমন করে মানুষকে মানবেতর জীবে পরিণত করে এই গল্পে তারই রূপায়ণ ঘটেছে জয়নাব

বিবি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। জয়নাব বিবি কেবল মা বা স্ত্রী নয়; হয়ে উঠেছে মানবাত্মার অবমাননার এক সচিত্র প্রতিবেদন। জয়নাব বিবি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের অবহেলিত, নিষ্পেষিত অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সার্থক প্রতিনিধি।

†'vR‡Li Ig

‘কীটনাশকের কীর্তি’, ‘যুগলবন্দি’, ‘অপঘাত’ এবং ‘দোজখের ওম’ এই চারটি গল্প নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের †'vR‡Li Ig [26] শীর্ষক চতুর্থ গল্পগ্রন্থ বিন্যস্ত। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ ‘afv‡Z DrcvZ-এ গ্রামীণ-জীবনের যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার করুণ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে †'vR‡Li Ig গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প ‘কীটনাশকের কীর্তি ’ গল্পেও গ্রামের সেই নির্মম-বাস্তবতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে একই রকম করুণ ও মর্মান্তিকভাবে, এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজধানীতে পুঁজির বিকাশের ফলে বেড়ে ওঠা ধনবান মানুষের বিলাসী জীবন। সমাজ সেবার নামে আত্মপ্রচারণা। এই গল্পে লেখকের দৃষ্টি পুনরায় নগরের দিকে ধাবিত হয়েছে। জীবনের তাগিদে, জীবিকার অন্বেষY গ্রাম থেকে শহরে ছুটে আসা মানুষের জীবনযন্ত্রণার করুণ মর্মস্পর্শী বাস্তবতার নগ্নরূপ ‘কীটনাশকের কীর্তি’ গল্পে রূপায়িত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গ্রামের নিম্নবিত্ত শ্রেণির রমিজ আলিদের জীবনযাত্রার সঙ্গে শহরের উচ্চবিত্ত শ্রেনির সাহেবদের জীবনযাত্রার দ্বন্দ্ব, জীবন যাত্রার অন্তঃসারশূন্যতার চিত্র এবং তথাকথিত ‘নারী অধিকার আদায় সংগ্রাম’-এর স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে একশ্রেণির মানুষের দাম্ভিকতা, মিথ্যা অহংবোধ এবং আত্মপ্রচারণার প্রবণতাকেও এই গল্পে বাস্তবতার নিরিখে রূপদান করা হয়েছে। ‘কীটনাশকের কীর্তি’ গল্পে লক্ষণীয়, ধলেশ্বরীর তীর থেকে একটুখানি সুখের হাতছানিতে নিরক্ষর যুবক রমিজ আলি রাজধানীতে এসে বিত্তবান এক মানুষের বাড়িতে কাজ নিয়েছে। একদিন, বাবার চিঠিতে, তার ছেলেবেলাকার বহুমাত্রিক স্মৃতি জড়িত বুবুর আত্মহত্যার খবর জেনে দ্রুত বাড়ি যাবার জন্য সাহেবের কাছে টাকা চাইতে যায় সে। কিন্তু কোনোভাবেই টাকা চাইবার মতো পরিবেশ সে তৈরি করতে পারে না। এদিকে বোনের মৃত্যুর জন্য বোনের স্বামী হাফিজুদ্দিন ও জোতদারের ম্যাট্রিক পাশ ছেলে, যার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে তার বোন বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়েছিল, তাকে বোনের মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে সে। এদের প্রতি রাগ এবং সাহেবের কাছে বাড়ির অবস্থা বর্ণনা করে টাকা চাইতে না পারা– সব মিলিয়ে রমিজ আলির মধ্যে মনোবিকার উপস্থিত হলে সে সাহেবের মেয়েকেই বিষ খাইয়ে মারতে যায়। সাহেবের মেয়ের সম্ভ্রমহানির অপচেষ্টার অপরাধে বেধড়ক মার খেয়ে সে সারা রাত গ্যারেজে বন্দি থাকে এবং ভোরের দিকে মারা যায়। এরকম একটি পটভূমিতে গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। তবে গল্পের বিস্তার ঘটেছে সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শ্রেণিগত দোলাচল ও স্বপ্নভঙ্গের স্বরূপ-

সন্ধানের মধ্য দিয়ে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই গল্পে রমিজ আলির ভেতর দিয়ে একাধারে গ্রাম ও শহরের জীবনকে, তার অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন। রমিজ আলি, তার মা, বুবু অসিমুন্নেসা, হাফিজুদ্দি, গ্রামের ম্যাট্রিক পাশ, সাহেবের বউ, সাহেবের মেয়ে, সাহেবের ট্রাক-ড্রাইভার– প্রত্যেকটি চরিত্রকে স্পষ্টভাবে রূপায়িত করেছেন স্বীয় শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের তাৎপর্যে। এসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবন-ব্যবস্থার দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্য-অসহায়ত্ব, বঞ্চনা-শঠতা প্রভৃতি যেমন উঠে এসেছে তেমনি শহুরে জীবনের বাহ্যিক চাকচিক্যের আবরণে লালিত মিথ্যে অহংবোধ, দাম্ভিকতা, শোষণ-প্রক্রিয়া এবং সর্বব্যাপী অন্তঃসারশূন্য মেকি জীবনের অবক্ষয়কে অত্যন্ত বাস্তব ও জীবনঘনিষ্ঠ করে রূপায়িত করা হয়েছে। অসিমুন্নেসা চরিত্রটি এ গল্পে প্রতারিত নারী চরিত্রের পরিচয় বহন করে। প্রেম-ভালোবাসার মতো পবিত্র সম্পর্ক এদের জীবনে ভয়াল অন্ধকারের থাবা নিয়ে ঘনিয়ে আসে। লম্পট-ভালোবাসার কাছে তারা ভোগের সামগ্রীমাত্র, বিকৃত-কামনা দমনের মাধ্যম। ফলে যে জোতদারদের বাড়িতে রমিজ আলিরা কামলা খাটে, সেই জোতদারদের কাছে কেবল সর্বশেষ ভূমিটুকুই যে তাদের হারাতে হয় তাই নয় বরং দিতে হয় নারীর সম্ভ্রমও। যে বাড়িতে রমিজের মা ও বোন কাজ করতো তাদেরই ম্যাট্রিক পাশ, গল্পে যার নাম নেই, তার লোভের শিকার হতে হয় রমিজের বোন অসিমুন্নেসাকে। সে অসিমুন্নেসাকে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখায়, তাকে ভোগ করে এবং গর্ভে সন্তান দিয়ে অন্তর্হিত হয়। আবার নিজের পাপকর্ম ঢাকতে সেই ম্যাট্রিক পাশ তাদেরই দোকানের কর্মচারী হাফিজুদ্দির সঙ্গে অসিমুন্নেসার বিয়ে দেয়। এখানেই শেষ নয়। বিয়ের পর কৌশলে হাফিজুদ্দিকে ঢাকায় পাঠিয়ে সে অসিমুন্নেসার দরোজায় টোকা দেয়। তার হাত থেকে বাচঁবার জন্য অসিমুন্নেসা বাপের বাড়ি চলে এলে সে ফতোয়া দিয়ে বেড়ায় :

> চাকর বলে হাফিজুদ্দি কি মানুষ নয় ? তার কি আখেরাত নাই? বিয়ের আগে যে মেয়ে পেট বাধিয়ে বসে তার সঙ্গে সে হাফিজউদ্দিকে ঘর করতে বলে কোন বিবেচনায় ? – তা বুবু অতো সতীপনা দ্যাখালে তো মৃধার পোলা তার ওপর একটু ঝাল ঝাড়বেই। বুবুর পেটে তারই বীজ , তার দোকানের পয়সায় বুবুর খাওয়া পরা, আর তাকে এড়াতে সে কি-না চলে আসে বাপের বাড়ি! সে ছাড়া বুবুর গতি আছে? ('কীটনাশকের কীর্তি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1:২৪৩)

এভাবেই গরিব অসহায় মানুষের প্রেম-ভালোবাসার শখ-আহ্লাদ যেন এক নিমেষেই কর্পুরের মতো হাওয়া হয়ে যায়। এর উপর তাদের কোন অধিকারই থাকে না। তারা হয়ে পড়ে ভাগ্যের হাতে বন্দি। ফলে তথাকথিত ম্যাট্রিক পাশ জোতদারেরা কেবল অসিমুন্নেসার সম্ভ্রমই নষ্ট করে না, তার ঘর ভাঙ্গার ব্যবস্থা করে তাকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে। এভাবেই অসিমুন্নেসা হয়ে পড়ে গ্রাম বাংলার অসহায়, বঞ্চিত, নিগৃহীত-নিপীড়িত নারীর প্রতীক। হাজারো অসিমুন্নেসার হাহাকার বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যেন আজো অসহায় বিলাপ করে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে তারা মৃত্যুযন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, কেই-বা তাদের খবর রাখে। অসিমুন্নেসা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজে বিরাজমান যৌতুক প্রথার ভয়াবহতার দিকেও লেখকের দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে। হাফিজউদ্দি চরিত্রহীন

অসিমুন্নেসাকে নিয়ে ঘর করতে নারাজ। তবে একটা সাইকেল পেলে হয়তো সে বিষয়টিকে বিবেচনা করে দেখতে পারে। গল্পে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে: 'বাজানের অনেক ঘোরাঘুরির পর হাফিজুদ্দি বলে পাঠায় যে শ্বশুর যদি একটা সাইকেল কিনে দেয় তো সে বিবেচনা করে দেখবে।' ('কীটনাশকের কীর্তি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৪৩) এভাবেই সমাজের একটি কদর্য দিকের প্রতি লেখক অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেবল অসিমুন্নেসাই নয় ; যৌতুকের জন্য আজো বাংলাদেশের শত সহস্র নারী গুমরে গুমরে কাঁদে। প্রকাশভঙ্গি হয়তো বদলে গেছে, জীবনধারণের পদ্ধতিতে হয়তো বা পরিবর্তন এসেছে কোথাও কোথাও; তবে যৌতুকের ভয়াবহ অভিশাপ এখনও নারী জীবনে এক মহাশনি হয়ে বিরাজমান। এ যেন সমাজবাস্তবতার এক অনতিক্রম্য দুরারোগ্য ব্যাধি। সমালোচক যথার্থই বলেছেন : 'রমিজ, অসিমুন্নেসার জীবন প্রত্যক্ষণের সূত্র ধরে গল্পকার বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার অন্তর্মূলকেই স্পর্শ করলেন। স্বপ্ন ও বাস্তবের শৈল্পিক মিশ্রণে এ গল্পের ভাষা বৈশিষ্ট্য অসামান্য হয়ে উঠেছে।'[২৭] বিবিসাহেব, বিবিসাহেবের মেয়ে শাম্মী, রমিজের মা, রমিজের বোন অসিমুন্নেসা সমাজ-বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য গল্পে। সেইসঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিকেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। এ গল্পে রমিজের ভাবনার মধ্য দিয়ে তার মায়ের অস্তিত্ব যেন হাজারো বাঙালি নারীর শাশ্বত মাতৃত্বকেই প্রকাশ করেছে। তাছাড়া রমিজের স্মৃতিতে তার মা ও বোনের চরিত্রের যে আভাস এ গল্পে বিবৃত হয়েছে তার একটি নমূনা উল্লেখযোগ্য :

> তা বড়োলোকের বাড়ি থেকে সরানো তেল-নুনপেঁয়াজরসুন দিয়ে রাধা সুঁটকি দিয়ে মায়ের হাতে মাখানো কড়কড়া ভাত খেতে গিয়ে প্রতি গ্রাসের পর রমিজ বলবেই, 'কী মজা হইছে রে বুবু নারে?'– বেশি কথা বললে বিপদ, এক সানকিতে খাচ্ছে, একজন কথা বললেই আরেকজন কয়েক গ্রাস বেশি খেয়ে ফেলে। এই নিয়ে বুবুর সঙ্গে কতো ঝগড়া কতো মারামারি। মা কিন্তু সবসময় টানে রমিজের দিকে, 'মাইয়ামানষের অতো লালচ ক্যান রে? সবুর না থাকলে কিয়ের মাইয়ামানুষ? ('কীটনাশকের কীর্তি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৪৯)

বিবরণে মনে হয়, সমাজে নারীর যেন কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা বলতে কিছু থাকতে নেই। সমাজে সকল প্রকার শখ আহ্লাদ, ইচ্ছা পূরণের অধিকার যেন কেবল পুরুষের হাতেই ন্যস্ত। নারী কেবল সবকিছু সহ্য করে যাবে। যে যতো বেশি সহ্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারবে সে নারী ততো বেশি কৃতিত্বের পরিচয় বহন করবে। ন্যায়-অন্যায় বোধের ক্ষেত্রে যুক্তি নয় বরং সয়ে যাওয়া বা মেনে নেয়াতেই যেন নারীর প্রকৃত নারীত্বের পরিচয় নিহিত আছে। সহ্যক্ষমতা পুরুষের না থাকলেও চলে। অতীত থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে নারীর প্রতি পুরুষ শাসিত সমাজের এহেন দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা ব্যত্যয় ঘটেনি। ফলে নারীরা কেবল মেয়েমানুষ হয়েই থাকে, মানুষ হওয়ার গৌরব যেন সমাজ কেবল পুরুষের জন্যই নির্ধারিত। রমিজের মায়ের উক্তিটি এই বাস্তব সত্যকে যথাযথভাবে ধারণ করেছে। এই গল্পে সাহেবের মেয়ে (শাম্মী),

সাহেবের বৌ– প্রমুখ চরিত্রের মধ্য দিয়ে শহুরে মানুষের বিশেষ করে উচ্চবিত্তদের বিলাসী জীবনযাপন, মানুষের চেয়ে এ্যালসেশিয়ানের অধিক মূল্যায়ন, সাহেব-বৌদের নারী-নির্যাতন প্রতিরোধের নামে আত্মপ্রচারণা, মেকি দেশপ্রেম ও সংস্কৃতি-চর্চার বিষয়টিও অত্যান্ত জীবন্তরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পে বিবি সাহেব চরিত্রটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে এভাবে :

> বিবি সায়েবকে তো ওরা চেনে না। বিবিসায়েবদের একটা দলই আছে শুধু পুরুষমানুষের জুলুম বন্ধ করার জন্য। ... রমিজদের মতো গরিব গরবা ছোটলোকেরদের মেয়েদের নিয়েই বিবিসায়েবদের সমিতির মাথাব্যথা বেশি। সমিতির সব ভালো ভালো বড়ো বড়ো ঘরের বিবিসায়েবরা, ফর্সা ফর্সা মেয়েরা বড়ো রাস্তার মোড়ে গাড়ি রেখে পায়ে হেটে বস্তিতে যাচ্ছে; ঘরে ঘরে খোঁজ খবর নিচ্ছে, কোন রিকশাওয়ালা বৌকে রেখে হাওয়া হয়ে গেছে, বন্যায় গ্রাম থেকে ভেসে আসা কোন মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে, তাঁকে খুঁজে বের করে শাসাচ্ছে, হয় বৌকে নাও, না হলে খোরপোষের ব্যবস্থা করো। শয়তান রিকশাওয়ালা তালাক দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচে। ('কীটনাশকের কীর্তি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৩৯)

সমাজসেবার নামে বিদেশ-ভ্রমণ আর আত্মপ্রচারের নগ্নচিত্র তথাকথিত এইসব বিবিসায়েবদের চরিত্র ব্যবচ্ছেদ করে গল্পে বিবৃত হয়েছে এভাবে :

> রমিজ সেদিন টেলিভিশনে দেখলো, প্রেসিডেন্ট আর কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে বিবি সায়েব তার সমিতির মহিলাদের নিয়ে কীসব কথা বললো, কেউই কিন্তু সেভাবে হাসছিলো না, মনে হয় মেয়ে মানুষদের ওপর জুলুমের কথা মনে থাকায় সবারই মন খারাপ ছিলো। ... বিবিসায়েব কিন্তু মিটিং টিটিংয়ে খুব সুন্দর বলতে পারে। পুরুষমানুষের শয়তানি বন্ধ করার ফন্দি শেখার জন্য বিবিসায়েব একেকবার বিলাত লন্ডন এ্যামেরিকা বোম্বাই কোথায় কোথায় যায় , তো একবার ফিরে এসে এই বাড়িতেই মিটিং করলো; খবরের কাগজের লোক , টেলিভিশনের লোক, রেডিওর লোক এসেছিলো, বিবিসায়েব যে কী সুন্দর কথা বললো সে না শুনলে বিশ্বাস হবেনা। এমনিতে কড়া লোক, তার দিকে তাকানো কঠিন, কিন্তু এটুকু কড়া না হলে জুলুম বন্ধ করবে কী করে ? ('কীটনাশকের কীর্তি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৪০)

কিন্তু এ রকম সমাজমনস্ক, বিবিসাহেবের কাছেও রমিজ আলি তার নিজের বোনের আত্মহত্যার ঘটনাটি বলতে পারলো না, এক অলিখিত দ্বিধা জড়তার কারণে। ফলে সমাজের অগণিত মেয়েদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় রত বিবিসাহেবেরা আর রমিজের মতো অসহায় মানুষের বোনের আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান বা সমস্যার গভীরে অনুপ্রবেশ করতে পারলো না সঙ্গত কারনেই। আত্মপ্রচারণার প্রতিযোগিতায় এত-বেশি পরিমাণে সেইসব বিবিসাহেবেরা নিয়োজিত যে, ক্রমশই রমিজ আলি, অসিমুন্নেসাদের সঙ্গে তাদের মেরু-দূরত্ব তৈরি হয়। কাজেই রমিজ আলির মনে এক রকমের জ্বালা সৃষ্টি হয়ে তাকে মনোবিকারগ্রস্ত করে তোলে। প্রতিশোধস্পৃহায় সে সাহেবের মেয়েকে কীটনাশক খাইয়ে দিতে চায়। নিজের অক্ষমতাকে প্রতিশোধের স্পৃহায় আবর্তিত করে সে ভাবতে থাকে :

> তখন দ্যাখা যাবে ... কী করে বছরের একদিন লালপাড় হলুদ শাড়ি পরে লাল টয়োটা হাঁকিয়ে পান্তাভাত খাওয়ার রঙ ফলাতে যায় রমনা পার্কে, তখন দ্যাখা যাবে সখের খালি পা কী করে অর্ধেক হেঁটে আর অর্ধেক গাড়ি করে চলে যায় মেডিক্যাল কলেজের

ওখানে শহীদ-মিনারে, তখন দ্যাখা যাবে শবে-বরাতের দিনে ঘোমটা মাথায় কী করে আল্লা-রসুলের গান করে টেলিভিশনে, ফের পর দিনই পাছা দুলিয়ে তিড়িং বিড়িং নাচে, তখন দ্যাখা যাবে কী করে বাপের গলা জড়িয়ে হাসে, এই কাঁদে, এই সোহাগ করে– সব দ্যাখা যাবে, সব। ('কীটনাশকের কীর্তি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৪৫)

এই বিবরণের মধ্য দিয়ে সাহেবের মেয়ে চরিত্রের যে নমুনা উপস্থাপিত হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে যেন লেখক শহুরে উচ্চবিত্তের মেকি দেশপ্রেম ও সংস্কৃতি-চর্চার অসারতার চিত্রকেই মূর্ত করেছেন জীবনঘনিষ্টভাবে। সাহেব-কন্যা শাম্মী এখানে নিছক একটি নারী-চরিত্রই নয় বরং আগ্রাসী সংস্কৃতি-চেতনার পরিচয়বাহী। এ বিষয়টিই সমালোচকের বক্তব্যে উঠে এসেছে সুনিপুণভাবে :

আপাত কিম্ভূতকিমাকার গল্পটি পড়তে পড়তে জ্যান্ত, রূপান্তরের মরু হাওয়ার ঝাপটায় আমাদের লালিত বিশ্বাস এবং পুষে রাখা মহত্ত্ববোধ ধূলায় গড়াগড়ি খায়। 'কীটনাশকের কীর্তি ' শিরোনামটি এ দেশের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অজপাড়াগায়ে পর্যন্ত ঢুকে পড়া বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কীটনাশক, সার, ইলেকট্রিক বাল্‌ব কি টিভি ভিসিয়ারের ক্রম প্রসারমাণ বাজার সৃষ্টির চেষ্টাটি খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমাবেশে একটি অখণ্ড চিত্র হয়ে ওঠে এই গল্পটিতে সঙ্গে শহুরে উচ্চবিত্তের জীবনের ছবিটি চলচ্চিত্রের মতো প্রতিফলিত হয়। একদিকে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তেজারতি কারবার অন্যদিকে শহুরে উচ্চবিত্তের পাশ্চাত্য কি আমেরিকান ইয়াংকি সাংস্কৃতিক মেশেলে গড়ে ওঠা লিপস্টিক সংস্কৃতির খাসলত রপ্ত করণের অর্থহীন চেষ্টা।[২৮]

‡'vR‡Li Ig গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'যুগলবন্দি'। বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বেড়ে ওঠা উচ্চ মধ্যবিত্তের অদ্ভুত জীবনযাপন, ধ্যান-ধারণা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্তের নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আপসকামী ও চাটুকারী মনোভাব এ গল্পের বিষয়। শহুরে বড়লোক হলেই যেন তাদের এবং তাদের স্ত্রীদের দিনরাত মদ্যপান করতে হবে, ক্লাবে যেতে হবে, জুয়ার আড্ডা দিতে হবে। এই হীন-মূল্যবোধ এবং পোষাকী সভ্যতা ব্যক্তিক আত্ম উন্নয়নে কোন কোন সময় সহায়ক হলেও সার্বিক সমাজ-উন্নয়নে কতটুকু ফলদায়ক–– এসব প্রশ্ন নিয়েই 'যুগলবন্দি' গল্পটি পাঠককে আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত করে তোলে। স্বাধীনতা-পরবতী বাংলাদেশের শহুরে শিক্ষিত সমাজের একটি শ্রেণির হঠাৎ ভদ্রলোক হয়ে ওঠার মানসিকতাই গল্পের মূল সুর। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সরোয়ার কবির, জেসমিন কবির এবং আসগর। 'কীটনাশকের কীতি' গল্পের সাহেব চরিত্রের নতুন সংস্করণ এ গল্পের সরোয়ার কবির। সে এবং তার স্ত্রী আধুনিক জীবনযাপনের নামে পোষণ করে অদ্ভুত ধ্যান-ধারণা, অন্যদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত আসগর চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় চুড়ান্ত হঠকারিতা, স্ববিরোধিতা ও দোদুল্যমানতা। এই সরোয়ার কবির, জেসমিন কবির ও আসগররা আজো সমাজের নানা স্তরে, নানা উপায়ে দর্পিতভাবে অস্তিত্ববান। এদের হাত থেকে আজো মুক্ত হয় নি সমাজ, সামাজিক মানুষজন এবং রাষ্ট্র। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সরোয়ার কবিরের বোনের 'চাচাতে না মামাতো' দেবরের বন্ধু আসগর একটা বড়ো চাকরির আশায় তার বাসায় থেকে ফাইফরমাশ খাটে। কবির সাহেবকে খুশি করার জন্য, রাত একটায় তার স্ত্রী জেসমিন কবিরের প্রয়োজনে লেবু কিনতে সে শহর চষে বেড়ায় আর তাদের প্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

এ্যালসেশিয়ানকে পায়খানা করায়। আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর আসগর করতে পারেনা এমন কিছুই যেন নেই। যদিও বড়োলোক হওয়ার স্বপ্ন আসগরকে ক্রমশ তার পারিবারিক জীবনের পরিমণ্ডল থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ক্রমশই নিজ পরিবারে সে অপরিচিত একজন হয়ে পড়ছে। কিন্তু তাতে আসগরের কোনো মাথাব্যথা নেই, তার একটাই চাওয়া পাওয়া ; যে কোন উপায়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। জীবনকে নির্মোহ ভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণের অসাধারণ ক্ষমতা লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

> পরিচিত অভিজ্ঞতার প্রায় সর্বস্তরে জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে একেবারে এর গভীরতম শাঁস পর্যন্ত অশেষ কৌতূহল নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে শিল্পকর্মে তা বেপরোয়াভাবে প্রকাশ করার বিরল ক্ষমতা দেখতে পাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখায়। ... এই দেখা একাধারে নির্মম এবং কৌতুকবহ। নির্মম, কেননা সত্যনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ সব সময়ই নির্মম, এবং কৌতুকপ্রদ কেননা মানুষের অসতর্ক ও দুর্বল মুহূর্ত কি ভঙ্গি কি বেঁফাস বাক্য বা কাজকে তিনি যেমন অবলীলায় প্রকাশ করেন তাতে পাঠক একই সঙ্গে অস্বস্তি, বিব্রত এবং কৌতুক বোধ না করে পারে না।[29]

জীবন পর্যবেক্ষণের অসাধারণ দক্ষতায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই গল্পে উচ্চমধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তাদের জীবনের উদ্ভট চিন্তা ও হাস্যকর প্রচেষ্টাকে নগ্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনের পাশাপাশি উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লেখকের গভীর অভিজ্ঞতা গল্পের চরিত্র সরোয়ার কবির এবং জেসমিন কবিরের চরিত্র অঙ্কনের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। গল্পে জেসমিন কবির সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> স্লিম হওয়া হলো জেসমিন কবিরের জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তার চিন্তাভাবনা, তার সুখ-দুঃখ, বলা যায় তার দর্শন– সবই একটি অভিন্ন কেন্দ্রের দিকে ধাবমান– ক্লাবে পার্টিতে সোসাইটিতে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা। এজন্য তাকে কিছু খেসারত তো দিতেই হবে। খাওয়া কন্ট্রোল করা তো আছেই, যখন তখন ঘুম পেলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলে চলবে না, ঘুম পেলেও নয়, সেক্স ফিল করলেও নয়। ('যুগলবন্দি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৫৮-২৫৯)

'দর্শন' শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে চরিত্রটি যেন হাস্যকর হয়ে উঠেছে। আবার কুকুর 'আরগস' কে নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মতোবিরোধ, তা মূলত তাদের নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে এভাবে : 'আরগসের খাবার বাড়িয়ে দেওয়া দরকার সরোয়ার কবির এই কথা বলতেই জেসমিন প্রতিবাদ করে ; বডি স্লিম না হলে এ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে দেশি কুকুরের আর পার্থক্য কী ? বেশি খেলেই খালি বসে বসে হাই তুলবে।' ('যুগলবন্দি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৬১) এরকম বিবৃতিতে কুকুর 'আরগস' যেন জেসমিন কবিরের শ্রেণিচেতনার প্রতীকে পরিণত হয়ে উঠে। এ ধারণার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নিজেকে জেসমিন কবীর দেশিয় রমণীদের চেয়ে ভিন্নতর ভাবতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে– এ বিষয়টিই মূর্ত হয়েছে। কিন্ত সরোয়ার কবির এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে। তার মতে বাউয়েলস ক্লিয়ার হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। এ

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই সমস্যা। এ জন্য প্রয়োজনে সকালে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ইন্টারকোর্সে যান। গল্পে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে এভাবে :

> ঘুম ভাঙলে বিছানায় শুয়ে শর্ট একটা ইন্টারকোর্স সলভস ইওর প্রবলেম। কয়েকটা স্ট্রোক দিলেই তলপেটে চাপ পড়বে, এরপর রেগুলার ডোজ অফ থ্রি সিগারেটস এ্যান্ড ইউ গেট ইওর বাউয়েলস ক্লিয়ার। 'তা সাত সকালে তোমার ওয়াইফ এ্যালাউ করবে কেন?' বন্ধু হেসেই অস্থির। ... একটু ট্রিক খাটাতে হয়। ভোরবেলা ঘুম থেকে না উঠেও যে এক্সারসাইজ করতে পাচ্ছো, এতেও তোমার ফিগার স্লিম থাকবে। এক নাম্বার সাতার আর দুই নাম্বার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইন দি আর্লি মর্নিং–– আইদার অফ দিজ টু কিপস্ ইওর ফিগার স্লিম। ব্যস; এই থিওরিতে কাজ হয়। ('যুগলবন্দি', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৬২)

এভাবেই সরোয়ার কবির ও জেসমিন কবিরের জীবনযাপন পদ্ধতিকে লেখক হাস্যকর করে তোলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তথাকথিত উচ্চবিত্তশ্রেণির চিন্তা চেতনার অসাড়তা, হঠকারিতাকেই যেন প্রতিভাত করেন। জেসমিন কবির হয়ে পড়েন তথাকথিত নারী-সমাজের প্রতিনিধি, যারা নারী-উন্নয়নের নামে সভা-সমিতি করে বেড়ায় অথচ এর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রচারণা আর স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের অপতৎপরতায় ব্যাপৃত থাকেন সর্বদা। আমাদের সমাজে এরকম নারী-চরিত্রের অভাব নেই। সমাজসেবা, নারী-উন্নয়ন যাদের স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থতার উপায় মাত্র। মানুষ আসগর যেন কুকুর 'আরগস' এর সমার্থক হয়ে গল্পে মানবতার অবমাননার বিষয়টিকে মূর্ত করে তুলেছে। একটা ভালো চাকরির প্রত্যাশায়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিম্নমধ্যবিত্ত যুবক আসগরের মোসাহেবি আখ্যানজুড়ে এমনই এক শ্লেষের তাপ ছড়ায় যে পাঠককেও লজ্জা পেতে হয়, বিদীর্ণ হয় তার অন্তরাত্মা। এক অলীক মায়ার জালে আসগর তার নিজ জীবনের পরিচিত গণ্ডি অতিক্রম করে ছুটে চলে অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে। তবে আসগর যতই শ্রেণি ব্যবধান ডিঙিয়ে উপরে ওঠার স্বপ্ন দেখুক না কেন, সরোয়ার কবিরের মত মানুষেরা কখনও তাকে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিবেনা। কেননা, তাদেরও আসগরদের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অস্তিত্বের সংকটে আবর্তিত যুবকদের প্রয়োজন আছে। ফলে আসগর আর 'আরগস' যেন নামকরণেই কেবল যুগলবন্দি হয়ে পড়ে না, বরং আসগর ও সরোয়ার কবিরের আচরণেও নীতিহীনতা ও অসততার এক যুগলবন্দি এই গল্পের লক্ষণীয় বিষয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষ আর কুকুর এক কাতারে মিশে যেতে থাকে। এ সমাজে অসংখ্য আসগর কুকুরের পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় শুধু একটি আশায় যে তার খেদমত প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে। সেই সন্তুষ্টির উপরই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নির্ভর করেছে। এই বোধ ও চেতনাশূন্য পদলেহন এবং তার অন্তঃস্থ শর্তগুলি নিখুঁত ব্যবচ্ছেদে আর তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপে 'যুগলবন্দি' গল্পের তিনটি চরিত্রের প্রতিবিম্বে তুলে ধরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। প্রাসঙ্গিকভাবেই এক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> শেষ পর্যন্ত মানুষের 'আসগর' সারমেয় 'আরগস'–– এ রূপান্তিরিত হয়। নিজ প্রজাতির এই ছবি দেখতে দেখতে বিবমিষার স্রোত বয়ে যায়। হৃদয় তড়পাতে থাকে। সারমেয় আরগসের বাউয়েলস ক্লিয়ার হওয়ার সময় শেকলের পরত বেয়ে শিরশির কম্পন আসগরের হাত থেকে আমাদের শরীরেও সংক্রামিত হলে বুঝতে পারি বাজারায়িত দেশের মানুষ কতো গ্লানিকর কাজে তার হাত মকশ করে অর্থ আর মোক্ষ লাভের প্রত্যাশায়। বিশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণ পচে যাওয়া মধ্যবিত্ত মানুষটিকে মাটিতে আছড়ে

> ফেললেই যেন দুর্ভোগের কিছুটা লাঘব হয়। এরকম এক বৃত্তাকার শিকলের ভেতরেই দেশের মানুষ নিজ নিজ গ্লানিকর জীবনের ভার বহন করে পরবর্তী জেনারেশনের জন্য।[৩০]

এভাবেই 'যুগলবন্দি' গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক যেন আমাদের বোধের জগতটিকে চাবুকের ঘা দিয়ে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, মানুষের ভেতরের কুকুর স্বভাবটাকে টেনে বের করে যেন সমাজ থেকে শ্রেণি ব্যবধানের ফলে অবরুদ্ধ মানবজীবনের অবমাননা, গ্লানিকেই মূর্ত করে তুলেছেন এই গল্পের অবয়বে। আগরের মা এখানে চিরন্তন স্নেহময়ী, মাতৃত্বের প্রতীক। ছেলে যত রাত করেই ঘরে আসুক, মা সন্তানের জন্য নিজের ঘুম, আরাম সব বাদ দিয়ে ভাত নিয়ে বসে থাকবে, সন্তানকে খাওয়ানোর ভেতর দিয়েই যেন সে তৃপ্ত হবে– এরকম চিরন্তন মাতৃত্বের প্রকাশ তার চরিত্রের অনুষঙ্গে গল্পে রূপায়িত হয়েছে। ফলে জীবনে উপরে উঠার জন্য ছেলের উদ্বেগ তাকে স্পর্শ করে না, কেবল সন্তানের মঙ্গল কামনাতেই এই চরিত্রের বিস্তৃতি। ‡'√R‡Li Ig গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'অপঘাত' আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এক অনবদ্য নির্মাণ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশকে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে , হত্যা-নির্যাতন পাশবিকতা ও অপশাসনের চিত্রটিকে ভালোভাবে অবলোকন করা যায় 'অপঘাত' গল্পে সার্বিক বিপর্যয় ও সামূহিক নিপীড়নের চেহারার পাশাপাশি তরুণ মুক্তিদ্ধোদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অন্যতম নিদর্শন 'আপঘাত' গল্পটি। বগুড়া জেলার আওতাধীন একটি ইউনিয়ন পরিষদের কেরানি মোবারক আলির পুত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'অপঘাত' গল্পের পটভূমি গল্পের নায়ক মোবারক আলির ছেলে বুলুর মৃত্যু আসলে অপঘাত বা অপমৃত্যু নয়, বরং এ মৃত্যু শহীদের মর্যাদায় ভূষিত। বুলু তরুণ বয়সে মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে বগুড়া জেলার ধুনট থানার ধুনট দেবডাঙা রাস্তায় বৌডোবা খালের সেতুর নীচে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মাইন পুততে গিয়ে মিলিটারির চোখে পড়ে যায়। জিপ গাড়ী লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়লে পাকিস্তানি মিলিটারি অফিসারের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু প্রাণে বেঁচে যাওয়া একজন সেপাইয়ের চালানো গুলিতে বুলুর মৃত্যু ঘটে, বুলু শহীদ হয়, তবে মুখ খুলে বুলুর বাবা এই কথা কাউকে বলতে পারেনা। কারণ তার বাড়ির পাশে দেড়'শ গজের মধ্যে ঘাঁটি গেড়েছে মিলিটারি। বুলুর মায়ের বিলাপ শুনে মনে হতে পারে যে বুলুর মত্যু অপঘাতে হয়েছে। কিন্তু জাতির জন্য এ মৃত্যু গর্বের, বীরের এবং শহীদের মর্যাদাপ্রাপ্ত। মোবারক আলি, বুলুর পিতা, যার চাকরির বেতন আসে পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ বগুড়া জেলা ট্রেজারী থেকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেজর তাকে সন্দেহ করে মিসক্রিয়ান্টদের আশ্রয়দাতা হিসাবে। মিলিটারির ভয়ে ম্রিয়মাণ একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পিতা হিসেবে এই মোবারক আলি সন্তানের কৃতিত্বে নিজেদের বিপদকে অগ্রাহ্য করে কীভাবে হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠে 'আপঘাত' গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তা-ই দেখাতে চেয়েছেন নিস্পৃহ-নির্মোহ ভঙ্গিতে। মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময়ের চেতনাগত রূপান্তরের মর্মান্তিক আলেখ্য বিবৃত হয়েছে 'অপঘাত' গল্পে। মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করেছে, আমূল বদলে দিয়েছে মানুষের এতদিনকার বিশ্বাস ও প্রবণতাকে। কীভাবে নিস্পৃহ, ভীত একজন

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ সব ভয়কে অতিক্রম করে নির্ভীক ও জাগ্রত হয়ে ওঠে– 'অপঘাত' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় কালকে, ইতিহাসকে ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটিকেই উদ্ভাসিত করেছেন লেখক যুদ্ধে শহীদ বুলুর পিতা মোবারক আলি চরিত্রটির ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের বিভীষিকার খণ্ড খণ্ড বর্ণনা একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে যেন ইতিহাসের সত্যকে লেখক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন। গল্পে বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যানের ছেলে বুলুর বন্ধু শাহজাহান জ্বর ভুগে মারা যায় প্রায় বিনাচিকিৎসায়। কেননা :

> এখানে চিকিৎসা একেবারেই হচ্ছে না, ... ছেলেকে নিয়ে চেয়ারম্যান এখন যায় কোথায়? গোরুর গাড়ি করে সেরপুর পর্যন্ত না হয় গেলো, সেরপুরে জনমনিষ্যি কেউ নাই, বড়ো রাস্তায় খালি মিলিটারি, খালি মিলিটারি। তা এখানে হাইস্কুল ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে চেয়ারম্যানের একটু আলাপ হয়েছে, তবে ওদের সাহায্য চাইতে ভয় হয়। ঘরে সোমত্ত বয়সের মেয়েরা আছে, কিসের বিনিময়ে আবার কী চেয়ে বসে! ('অপঘাত', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৬৯-২৭০)

মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ কেউ-ই নিরাপদ ছিলো না। পাকবাহিনীর নারকীয় অত্যাচার, নির্মমতা আর বিপন্ন মানুষের আতঙ্কিত বিবর্ণ দিনযাপনের খণ্ড খণ্ড বর্ণনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধকালীন সময়ে নারীর প্রতি পাশবিকতার নগ্নচিত্রটির পরিচয়ও এ গল্পে উঠে এসেছে অসাধারণ দক্ষতায় :

> মিলিটারি কলেরার মতো আসে, ম্যালিরিয়ার মতো আসে। যে গ্রামে একবার হাত দেয় তার আর কোনো চিহ্ন রাখে না। ... সরকার বাড়ির ল্যাংড়া জমির আলির মেয়ে আর ভাইঝিকে নিয়ে গেলো। কী ব্যাপার? ... তারা সব ইনফর্মার, মুক্তিবাহিনীকে খোঁজখবর পাঠায়। ... মোবারক মিয়া, ডাঙর বেটিছেলেকে বাড়িতে না রাখাই ভালো গো! ... চেয়ারম্যানের পরামর্শে মোবারক আলি তার ছোটো মেয়েকে পাঠিয়ে দিনো সম্বন্ধীর সঙ্গে। চেয়ারম্যানও তার মেজো মেয়েটিকে সঙ্গে দিলো। মেয়েটি বেশ ফর্সা, নাকমুখ চোখে পড়ার মতো, তাই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ... পোয়াতি মেয়ে, জমির আল দিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে যাবে ... এ সময়টা মেয়েরা তো মায়ের কাছেই ভালো থাকে। মায়ের কাছে আর রাখা গেলো কোথায়? ('অপঘাত', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1:২৭০-২৭৩)

মুক্তিযুদ্ধে হাজারো মা, বুলুর মায়ের মতো, তাদের প্রাণপ্রিয় সন্তান হারিয়েছে। পুত্রশোক বুকে চেপে প্রাণভরে একটু কাঁদতে পর্যন্ত পারেনি। অগণিত নারী হারিয়েছে তাদের সম্ভ্রম। প্রাণভয়ে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পশুর মতো ছুটে বেড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ শহীদের তাজা রক্ত আর অসংখ্য মা-বোনের আত্মত্যাগের ফসল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধে নিহত বুলুর কাঁদতে না-পারা মায়ের বেদনা এ গল্পে হাজারো সন্তানহারা মায়ের হাহাকারকেই প্রতিধ্বনিত করেছে এভাবে :

> দ্যাখো তো, চেয়ারম্যানের ব্যাটা, এ্যাঁ, তাঁই মরলো মায়ের সামনে, বাপের সামনে! মাও তো তার ব্যাটাক জান ভর্‌য়া দেখ্যা লিবার পারলো। আর হামার বুলু কোটে কার গুলি খায়া মুখ থুবড়্যা পড়্যা মলো গো, ব্যাটার মুখকোনা হামি একবার দেখবারও পারলাম না গো ! হামার বুলুর উপরে গজব পড়ে কিসক গো? বুলু অপঘাতত মরে কিসক গো? ('অপঘাত', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৭৩)

নির্দোষ সন্তানের মৃত্যুর বেদনা, মৃত ছেলের মুখ দেখতে না পারায় জ্বালা এবং মৃত ছেলের জন্য কাঁদতে না-পারার অবর্ণনীয় কষ্ট বুকে নিয়ে জেগে ওঠা বুলুর মায়ের এই জিজ্ঞাসা বাংলাদেশের এমনি হাজারো মায়ের উত্তরহীন জিজ্ঞাসা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এভাবেই অনেক নারী তার সন্তানকে ত্যাগ করে নিজেই হয়ে উঠেছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। এরকম মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের কথা বিস্মৃত হবার কোনো সুযোগই নেই আমাদের। মোবারক আলির চেতনার প্রতিক্রিয়া ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এ গল্পে দীর্ঘ-ক্ষুদ্র-কথন-অনুচ্ছেদ রচনার স্থাপত্যে মুক্তি যুদ্ধকালীন গ্রামীণ পূর্ব-বাংলার ভয়-আতঙ্ক-উদ্বেগের বাস্তবতা, সন্তান-হারা দুই মায়ের পরিপূরক বিলাপ, দুঃসহ বর্তমান আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ– এসব নিয়ে 'অপঘাত' গল্পে যেন প্রকৃতপক্ষে একাত্তুরের বাংলাদেশকেই মূর্ত করে তুলেছেন । কেবল ঘটনার বিবরণ নয় বরং ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গল্পটি যেন গতানুগতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে অসাধারণ শিল্প কুশলতায় বাংলাদেশের মানুষের শান্তিবোধ ও অমিত সংকল্পের দৃঢ়তাকেই ধারণ করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই এই গল্পে বিবৃত নারীচরিত্রসমূহ এই দৃঢ়তা ও সংকল্পের সংশ্লিষ্টতায় নিজেদের ভূমিকাকে চিহ্নিত ও প্রকাশ করেছে সগৌরবে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের †'vR‡Li Ig গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'দোজখের ওম' গল্পে অতিদীর্ঘ স্বগত ভাষণমূলক বিবরণের মধ্য দিয়ে পুরনো ঢাকার গলি, উপগলি, শাখাগলির পটভূমিকায় মৃত্যুপথযাত্রী অতিবৃদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক চরিত্রের চেতনার বিবর্তন এবং জীবন-বাস্তবতার বহুমাত্রিক দিকের উন্মোচন ঘটেছে। প্রবল যন্ত্রণা ও দুর্বিষহ জীবনের হাজারো দুর্বিপাকের ভেতরেও মানুষের বেঁচে থাকার স্পৃহা শেষ হয় না। 'দোজখের ওম' গল্পে লেখক মানুষের এই বেঁচে থাকার স্পৃহাকে উপলব্দি করেছেন এবং একই সঙ্গে সমাজ-বাস্তবতার বিভিন্ন দিকের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। পুরো গল্পটি শরীরের অর্ধেক অচল অতিবৃদ্ধ কামালউদ্দিনের অতীত স্মৃতিচারণায় এবং বর্তমানের প্রাত্যহিকতায়– বাস্তব ও বাস্তবাতীতের জারণে মৃত্যুযন্ত্রণাকে অতিক্রম করে যেন পাঠককে জীবনের ইতিবাচক দিকের প্রতি আহবান জানায়। কয়েকটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে বিবৃত কামালউদ্দিনের স্বগত ভাষণমূলক কথনের মধ্য দিয়ে এই গল্পে রূপায়িত হয়েছে পুরনো ঢাকার নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের প্রায় পৌনে একশ বছরের ইতিহাস ও পরিবর্তিত পরিবেশ– তাদের নোংরা জীবনযাপন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহতা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কৃত্রিম সম্পর্ক , সামাজিক-পারিবারিক জীবনে মানুষের পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা ও স্বার্থপরতার জটিল বিন্যাস, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা, মুক্তিযুদ্ধ, অতিজাগতিক বিশ্বাস, অবৈধ অর্থ-উপার্জনকারীদের শঠতা আবার তাদের সঙ্গেই পীরদের মাখো মাখো সম্পর্ক, সমকামের মধ্য দিয়ে প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা, মানবিক বোধের অবক্ষয়, বিষয়গত ক্ষুদ্রতা ও নীচতা, সাম্পদায়িক দাঙ্গা– এসবের ভাষাচিত্র।

বার্ধক্যপীড়িত পক্ষাঘাতগ্রস্ত দর্জি কামালউদ্দিন প্রতিনিয়ত মৃত্যুর প্রহর গোনে আর ঝিমায়। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে তার কাছে পৃথিবীটাকে মনে হয় হাবিয়া দোজখ। অসুস্থ কামালউদ্দিনের পুত্র কন্যারা সে যার মতো

সংসার করে। পুরো গল্পই কামালউদ্দিনের স্মৃতি রোমন্থনের গল্প– সেই ছোটোবেলা, কাজ শেখা, বিবাহ, সন্তানদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, পারিবারিক নানা ঘটনার অবতারণা ও সেই সুত্রে সমাজ-সংসারের নিরেট বাস্তবতার প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়েই আবর্তিত হয় গল্পের কাহিনি। বিধবা কন্যা খোদেজা স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে উঠেছে বাবার বাড়িতে। সেই মেয়ে খোদেজা আর তার কিশোর পুত্র আবু বকর বৃদ্ধ কামালউদ্দিনের সেবা করে। সে মারা গেলে খোদেজার 'ভাইয়েরা তাকে এ বাড়ি থেকে হটাবেই। আর এ কারণেই খোদেজা চায় যতদিন পারে তার অতিবৃদ্ধ পিতাকে সেবাযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে। খোদেজার পিতৃসেবার নমুনা অনেকটা এরকম : 'বাপকে তার এতো আদর, 'এটা খাও ওটা খাও,' কিংবা 'না আব্বা এইটা তোমার খাওয়া হারাম' ডাক্তারের মানা আছে,' কিংবা 'বালিশ ঠেকা দেই, তুমি উইঠা বসো'। ('দোজখের ওম', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৯৬) প্রায় সাত বছর হলো খোদেজার স্বামী নেই। ভাসুর-দেবর-জায়ের মুখ ঝামটা সহ্য করতে না পেরে সে প্রায়ই তার কষ্টের কথা বলতো, যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে কামালউদ্দিন নিজেই গিয়ে পাকাপাকি ভাবে খোদেজাকে নিয়ে এসেছেন। এখন তার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে খোদেজার জীবন আবারো অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। কেননা : 'বাপ মরলে ভাইরা তাকে জায়গা দেবে? আমজাদ যদি বোনকে দ্যাখেও তো তার ম্যাট্রিকফেল বৌটা? অতো সোজা। এই সব লেখাপড়া জানা মেয়েদের কামালউদ্দিন কি কম চেনে? খোদেজাই কি হাড়ে হাড়ে চিনতে পাচ্ছে না? তাই তো বাপকে দীর্ঘায়ু করার জন্য তার এতো যত্ন, এতো তদবির।' ('দোজখের ওম', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৯৬) খোদেজার এই স্বার্থের মধ্যকার প্রচ্ছন্ন অসহায়তা ও বেদনা বাঙ্ময় হয়ে গল্পের মধ্য দিয়ে যেন সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানকেই চিহ্নিত করেছে। নারীদের যেনো নিজের বাড়ি বলতে কিছু থাকতে নেই। বিয়ের আগে বাবার বাড়ি এবং বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি বা স্বামীর বাড়িই তার আশ্রয়স্থল। ফলে শেকড়বিহীন গাছের মতোই নারী নড়বড়ে অস্তিত্ব সমাজে বিরাজমান। প্রচলিত-আইন বা ধর্মীয়-নীতিতে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকলেও আমাদের পরিবারগুলোতে এখনও নারী তার পূর্ণমর্যাদা ও পূর্ণঅধিকারের প্রশ্নে বিব্রতকর, অসম্মানজনক অবস্থায় রয়ে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের পরে পিতার সম্পত্তিতে নারীর প্রাপ্য অধিকার চাইতে গেলে– সেক্ষেত্রে নারী হারায় তার কাঙ্ক্ষিত সম্মান। পরিবারে সেই নারীকে আর আগের মতো স্নেহ ভালোবাসার পরিমণ্ডলে বিচার করা হয় না। আদরের ভাই হয়ে পড়ে নারীর অচেনা। এই রকম একটি সামাজিক সত্যকে খোদেজা চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপ দিয়ে লেখক সমাজে বিরাজমান নারীর চিরন্তন বৈষম্যকেই প্রকট করে তুলেছেন শৈল্পিক দক্ষতায়। বাংলাদেশে এমন হাজারো খোদেজা প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যেই তাদের জীবনের গ্লানিকে বহন করে চলেছে। কামালউদ্দিনের স্মৃতিচারণায় তার আরেক মেয়ে নুরুন্নাহারের প্রসঙ্গ টেনে এনে লেখক সমাজে নারী নিগ্রহের আরেকটি দিকের উন্মোচন করেছেন। আমাদের সমাজে অনেক মেয়ে বিয়ের পরে স্বামীর ঘরে এসে যদি জানতে পাবে যে, তার স্বামী স্বভাব চরিত্রে ভালো না, ঘরে স্ত্রী থাকার

পরেও পতিতাপল্লিতে না গেলে তার চলে না। কিন্তু কেবলমাত্র বিয়ে হয়েছে, এই কথা বিবেচনায় রেখেই স্বামীর শত অত্যাচার-অকর্ম ঢেকে রেখেও চায় সংসারটি টিকে থাকুক। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো যে শক্তি 'বিশ্বাস' তার ছিটেফোঁটা না থাকলেও কোনোরকমে ঘর সংসার চালিয়ে যায় অনেক অসহায় নারী । এমনকি অত্যাচারে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে জেনেও বাবা মাকে জানাতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করে। অসহনীয়, দোজখের যন্ত্রণার মতো বেদনাদায়ক এক পরিবেশে জীবনকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টায় রত থাকে নারীরা। এমনি এক সমাজচিত্র নুরুন্নাহার চরিত্রবিম্বে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> সেই মেয়ে– কামালউদ্দিন পঙ্গু গলায় ঢোঁক গেলে, ঐ ঢোঁক বেঁধে সুইয়ের মতো– সেই মেয়ে কি-না দম বন্ধ হয়ে মরে রক্তের মধ্যে। সবই কপাল। চেহারা সুরত দেখে নবাব-পুরের এক হার্ডওয়ারের দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলো, তার স্বভাব যে এরকম কে জানতো? ... বিয়ের পর আস্তে আস্তে শোনা গেলো যে লায়ন সিনেমাই শেষ নয়, সিনেমার চেয়েও বড়ো আকর্ষণ তার কুমারটুলির খানকিপট্টি। নুরুন্নাহার বাপ মাকে কোনোদিন কিছু বলে নাই। মেয়ে তার নিজের কষ্টে নিজেই পুড়লো ... ৭ কি ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা, তখন তার গর্ভপাত ঘটে, টাকের হাট লেনের অন্ধকার ঘরে মেয়ে তার একা একা মরে গেলো, দামাদ হালা তখন কোথায় কোন খানকি মাগীর সঙ্গে রঙ করছে কে জানে? কার মুখে খবর পেয়ে আকবরের মাকে নিয়ে কামালউদ্দিন যখন সেখানে পৌঁছল তখন সব শেষ। ('দোজখের ওম', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ৩০৬)

কামালউদ্দিনের স্ত্রী, আকবরের মা, গল্পে চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের প্রতীক হয়ে আছে, বড় ছেলে আকবরকে কামাল উদ্দিনই ঢুকিয়ে ছিলো হাসান মিয়ার দোকানে, ছেলের হাতের কাজ ছিল বেশ ভাল। কিন্তু সেই ছেলে কিনা ওস্তাদের বৌয়ের পাল্লায় পড়ে, তাকেই বিয়ে করে বসলো। সেই বৌকে নিয়ে আকবর বাড়ি আসতে চেয়ে ছিলো, কিন্তু আকবরের মা কোনাভাবেই বৌকে মেনে নিতে পারেনি, সে বলে দেয়ঃ 'আইলে একলা আইবো! খানকি উনকি লইয়া ঘর নাপাক করবার দিমুনা।' ('দোজখের ওম', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৯৭) কিন্তু এই আকবরের মাকেই দেখা গেলো মরবার সময় তার ছেলের নামটাই বারবার উচ্চারণ করলো :

> ৭/৮ দিন জ্বরের ঘোরে তার মুখে আকবর ছাড়া আর কথা শোনা যায় নাই। 'আকবর, বাবা, ও আব্বা, দুধ খাইবি না?' 'ও আকবরের বাপ, দেইখা যাও, তোমার পোলায় তোমার টুপি পইরা কেমুন হাসতাছে।' 'আকবর, আব্বা, আমার সোনাটা, আয়, নাহাইয়া দেই ভাত খাইয়া খেলবি, অহন আয় বাবা!' 'হায় হায়। আকবরে আউজকা নারিন্দার মোচড়ে গেছিলো গিয়া, পোলায় কেমুন বিচ্ছু হইছে কুনদিন গাড়ির নিচে পড়বো!' ('দোজখের ওম', †'vR‡Li Ig, iPbvmgM-1 : ২৯৭)

কামালউদ্দিনের স্ত্রী আকবরের মায়ের এরকম বিলাপের মধ্যে শাশ্বত মাতৃত্বের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যতো কষ্টই সন্তানের কাছ থেকে পেয়ে থাকুক না কেন, শেষপর্যন্ত সন্তানের মঙ্গল কামনাতেই মায়ের সুখ নিহিত। তাই, বর্তমান সময়েও দেখা যায় যে, বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে বোঝা মনে করে অনেক সন্তান যখন তাদের দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করে, এমনকি সন্তানের অবহেলার চূড়ান্ত প্রকাশের সাক্ষ্য হিসেবে তাদের শেষ আশ্রয় বা ঠিকানা হয়ে পড়ে বৃদ্ধাশ্রম। কিন্তু সন্তান কর্তৃক নির্মম অবহেলার শিকার এসব বাবা-মাও শেষ পর্যন্ত

সন্তানের মঙ্গল-কামনাতেই প্রার্থনারত থাকেন। মাতৃত্বের শাশ্বত সেই অনুভূতিকেই এই গল্পে ভিন্নতর প্রসঙ্গের মধ্যমে রূপদান করা হয়েছে আকবরের মায়ের এই বিলাপের মধ্য দিয়ে।

Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj [31]। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা থেকেও ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় ঐ একই গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির রচনাকালের ব্যবধান লক্ষ করবার মতো ; 'প্রেমের গপ্পো'(১৯৭৯), 'ফোঁড়া'(১৯৮০), 'জাল স্বপ্ন,স্বপ্নের জাল'(১৯৯২), 'কান্না' (১৯৯৪), ও 'রেইনকোট'(১৯৯৫)। আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস †Lvqvebvgv (১৯৯৬) রচনায় এতই ব্যাপৃত ছিলেন যে, গল্পের দিকে যথেষ্ট মনেযোগ দেয়া সঙ্গত কারণেই তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। গল্পের ওপর বারবার কলম চালিয়ে তাকে পরিণতি দান করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা লেখকের সহজাত, সেই প্রবণতা রক্ষা করা এই Rvj ¯c,¯‡ci Rvj (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে লক্ষণীয় হয়না । উপন্যাসে গভীরভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার কারণে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, মূলত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তার চতুর্থ গল্পগ্রন্থ †'vR‡Li Ig (১৯৮৯) প্রকাশের পর সহসা আর কোনো গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করতে চাননি। নিজে সন্তষ্ট হতে পারার মতো একটি গ্রন্থের গল্প লেখকের কাছে ছিলো না কিংবা তাঁর কাছে তা যযার্থ মনে হয়নি। তবুও মৃত্যুর পূর্বে তিনি Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj গ্রন্থের পরিকল্পনা করে যান প্রকাশকের তাগাদায় অথবা প্রিয়জনদের প্রেরণায়। কাজেই লেখকের অন্যান্য গল্পগ্রন্থের থেকে একেবারেই সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার বা নতুনত্বের সন্ধান Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj গল্পগ্রন্থের মধ্যে হয়তো পাওয়া যাবে না; কিন্তু লেখকের গল্পভাবনা, বয়ান ধাঁচ ও আঙ্গিককুশলতা মনস্ক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে সহজেই।

Rvj ¯c ¯‡ci Rvj গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'প্রেমের গপ্পো'। গল্পের নামকরণে চটুলতা ও কৌতুক লক্ষণীয়, গল্পের ভঙ্গিটিও স্বচ্ছন্দগতি ও আখ্যানমূলক এবং গদ্যভাষাও নিরাভরণ। পাঠকের প্রত্যাশাকে এ গল্প হয়তো যথার্থভাবে নিবৃত্ত করতে পারেনি কিন্তু এ গল্পেও লেখক গতানুগতিকতার পথ অতিক্রম করে গিয়েছেন। মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের কাহিনি নির্ভর গল্প হলেও 'প্রেমের গপ্পো' গল্পে গতানুগতিক মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণী, স্বামী-স্ত্রীর নানাবিক মনোজটিলতা ও দ্বন্দ্বকেই প্রধান বিষয় করে দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য নয়। নিজস্ব পথ অনুসন্ধানের সূত্রে এ গল্পেও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জীবনের অর্থকে ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করার উপায় খুঁজেছেন; কেননা :

Dhaka University Institutional Repository

> এ জাতীয় গল্প তিরিশের দশক থেকে শুরু করে আজতক প্রচুর লেখা হয়েছে এবং এরকম গল্প লিখতে গেলে কেমন স্যাঁতসেতে একটা ভাব চলে আসে বলে ইলিয়াস মনে করতেন। তা সত্ত্বেও ইলিয়াস আশির দশকের উপান্তে 'প্রেমের গপ্পো' লেখেন, কিন্তু নামকরণেই বোঝা যায় স্যাঁতসেতে ভাবটি এ গল্পে থাকবে না। বস্তুত এটা কোনো প্রেমের গল্প নয়, অন্য কোনো লেখকের হাতে পড়লে হয়তো এটি প্রেমের গল্প হয়ে উঠতো।[32]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই গল্পের মধ্য দিয়ে প্রবল উইট-হিউমারের ভিতর দিয়ে প্রকারান্তরে জীবনের গল্পই বলতে চেয়েছেন। 'প্রেমের গপ্পো' জাহাঙ্গীর ও বুলার সাংসারিক জীবনের আবহে নির্মিত। ঢাকার ছেলে জাহাঙ্গীর, কুমিল্লার মেয়ে বুলাকে, বিয়ের অনতিকার পরেই, প্রায় প্রতিদিন, সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে বিয়ের আগেকার নিজের গল্প বলে। গল্পগুলো অনেকটা নিজেকে জাহির করবার প্রবণতা থেকে তৈরি। গল্পগুলোর অধিকাংশ স্থান জুড়েই জাহাঙ্গীরের বিয়ে পূর্ববর্তী জীবনে বিভিন্ন মেয়ের প্রেমের আহ্বান থেকে নিজেকে সুকৌশলে দূরে সরিয়ে রাখবার প্রবণতায় বিবৃত। গল্পগুলোতে থাকে কোনো মেয়ের কাছে তার নিজের বাহাদুরিরর সাজানো বয়ান। প্রকৃতপক্ষে অক্ষম মানুষদের এক ধরনের হীনম্মন্যতা থাকে, এ হীনম্মন্যতা থেকে অন্তত ঘরের মানুষের কাছে নিজের নানা যোগ্যতাকে জাহির করার একটা প্রবণতা এ ধরনের মানুষের মাঝে প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টিকে এভাবেও দেখা যেতে পারে, যেখানে : 'মূলত জাহাঙ্গীর তার ছাত্রজীবনের ফাঁক ও ব্যর্থতা গপ্পো দিয়ে পূরণ করে। মানুষ তো তাই করছে। নিজের অপ্রাপ্তি, তৃষ্ণা, অপূর্ণ সাধ মেটাতে বিভিন্ন কল্পনা, কখনো স্বরচিত আখ্যানের আশ্রয় নেয়।'[৩৩] জাহাঙ্গীরের স্ত্রী বুলা সম্পূর্ণ তার বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। সঙ্গীত বিষয়ে তার ফ্যাসিনেশন পুরোপুরি। সুনীলদা, কুমিল্লা শহরের বাসিন্দা বুলার সঙ্গীত শিক্ষক। মুশতাক, বুলার বড়ভাইয়ের বন্ধু এবং বুলার সঙ্গীত-সহযোগী, উপরন্তু সুনীলদার ছাত্র। কুমিল্লায় এই সুনীলদার কাছেই বুলা ও মুশতাক গান শিখতো একত্রে। সুনীলদার অসুস্থতা ও করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। আর গল্পের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মানব চরিত্রের বিচিত্র দিকের উন্মোচন ঘটেছে সময় ও সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে। গল্পটি জাহাঙ্গীরের বানোয়াট প্রাক-বিবাহ প্রেমের গল্পের আবহ দিয়ে শুরু হলেও এর মধ্য দিয়েই জাহাঙ্গীরের কপট আত্মরম্ভিতার মুখোশটি উন্মোচিত হয় আর প্রকট হয়ে উঠে তার শূন্যতা বা অনস্তিত্ব। প্রতিষ্ঠাকামী কেজো জাহাঙ্গীরের নিজস্ব কোনো সত্তাই আসলে লক্ষ করা যায় না। তার স্থূল জীবনে সাধ-আহ্লাদ আছে, কিন্তু স্বপ্ন নেই, স্বপ্নের কোনো নারীর মুখও সে পরিষ্কারভাবে কল্পনা করতে পারে না, অথচ বিয়ের পরে সে নিজেই নববধূ বুলাকে তার কলেজ-জীবনের শাহীন-পারভিন-হিপ হিপ হুররে প্রমুখ নারীদের তার প্রতি প্রবল আগ্রহের কথা বিস্তৃত করে। মিথ্যে-পৌরুষের খোলসে যেন জাহাঙ্গীর আড়াল করতে চাইছিলো তার নিজেরই শূন্যতাকে। গল্পের প্রারম্ভিক রঙ্গ-রসিকতা, হাসি-তামশার চটুল আবহটি বুলার বড়ভাই হাফিজ ও তার বন্ধু এবং বুলার এক সময়ের সঙ্গীত-সহযোগী মুশতাক ভাইয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিন্নরূপ ধারণ করে। জাহাঙ্গীর বিস্ময়ে লক্ষ করে তারই স্ত্রী বুলা সাবলীল ভঙ্গিতে মুশতাক ভাইয়ের আপসহীন নীরব

সঙ্গীত সাধনার প্রশংসায় রত, কুমিল্লায় সুনীল সেনগুপ্তের কাছে একসঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষার স্মৃতিকথা শোনাচ্ছে এবং সঙ্গীতগুরু সুনীলদা ক্যান্সারে আক্রান্ত– এই খবরে দুজনেই সমানভাবে উদ্বিগ্ন হচ্ছে। এই বোধ ও মানবিক চেতনার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কোনো পূর্ব পরিচয় নেই। উচ্চশিক্ষা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সাধনা, ত্যাগ-সংগ্রামের উচ্চমার্গীয় সাংস্কৃতিক চেতনার পরিমণ্ডলে জাহাঙ্গীর যেন ক্রমশ নিজেকে আপাঙ্‌ক্তেয়, বেমানান ও নিরবলম্ব বোধ করে। বুলার সামনে বাহাদুর সেজে থাকা জাহাঙ্গীরকে তাই মেহমানদারির নাম করে ওঠে পড়তে হয়। তার ভাবনায় এলোমেলো সব চিন্তা ঘুরপাক খায়। সে ভাবে : 'বুলা গানবাজনার চর্চা করে– এ খবর সে জানে, কিন্তু এই ব্যাপারে তার আবার সঙ্গীও আছে একজন, সে আবার তার ভাইয়ের বন্ধু– বুলা তো কোনোদিন বলেনি! কেন বলেনি? ... এই মেয়েটাকে একটু আগে মনে হচ্ছিল নিজেরই হাত পা-নাক-কানের মতো। এখন এরকম অপরিচিত মনে হচ্ছে কেন?' ('প্রেমের গপ্পো', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩২৭) নিজেকে কোনোভাবেই স্ত্রী বুলার সাংস্কৃতিক চেতনা-বোধের সঙ্গে মেলাতে না পেরে ক্রমশই জাহাঙ্গীরের হীনম্মন্যতা চূড়ান্ত হতে থাকে, হীনম্মন্যতা থেকেই সে বুলাকে বলে, 'তোমার আসলে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল ঐসব হাই–থটের গান বাজনা করা লোকের সঙ্গে। আমি ঐগুলি বুঝি না।' ('প্রেমের গপ্পো', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩৩০) জাহাঙ্গীরের ভেতরে অনস্তিত্বের যন্ত্রণা ও হীনম্মন্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলে সে বলতে থাকে : 'মেয়েদের বাসায় বাসায় ঘোরা, কার্পেটের উপরে বইসা হারমোনিয়াম একখান লইয়া প্যাঁ-প্যাঁ করা আমার পোষায় না ! ... মেয়ে ক্লাসমেটের বাড়ি গিয়া ডাক দিমু ও মিনু , ও ডলি, একটা গান ধরো তো! তারপর শিঙাড়া, চানাচুর চা খাইয়া ঘরে ফেরা এইগুলি পুরুষমানুষের কাম না, বুঝলা? এইগুলি করে হিজড়ারা, বুঝলা ?' ('প্রেমের গপ্পো', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩৩১) অন্যদিকে এই গল্পে সদা হাস্যময়ী বুলা অসম বা বিরুদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিখুঁতভাবে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টায় রত। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা একটি মেয়ে কেমন করে একেবারে বিপরীত মেরুর একজন বাসিন্দার সঙ্গে সংসার নামক সম্পর্কটিকে মানিয়ে চলছে এ গল্পে তারই প্রতীক হয়ে উঠেছে বুলা চরিত্রটি। জাহাঙ্গীর শ্লেষের খোঁচায় যতোই বুলাকে আঘাত করতে চেষ্টা করুক না কেন বুলার কণ্ঠে বারবারই ধ্বনিত হতে দেখা যায় মানিয়ে নেওয়ার তীব্র প্রচেষ্টা : 'আমি ঠিক এইরকম লোকই চেয়েছি। এইরকম হাসিখুশি, এইরকম কাজের লোক, এইরকম ফিগার, হেঁটে গেলে মাটি কাঁপে– এই আমার ভালো।' ('প্রেমের গপ্পো', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩৩০) আবার যখন মুশতাক ভাইয়ের মতো গান বাজনা জানা সংস্কৃতিমনা মানুষের প্রসঙ্গ আসে, তখনও দেখা যায় জাহাঙ্গীরের আত্মরম্ভিতার অভিমানকে বুলা সামাল দেয় এভাবে : 'ঐসব লোক গুণীলোক, ওদের খুব শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ওদের ভালোবাসা মুশকিল। বুঝলে না, রাত দিন বিছানার ওপর বসে খালি রেওয়াজ করে, বাইরে যায় না– এসব পুরুষমানুষের সঙ্গে ঘর করা যায়?' ('প্রেমের গপ্পো', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩৩০) বুলার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যেন বিরুদ্ধ পরিবেশে, অসম-

মানসিকতার মধ্যেও পলে পলে কেমন করে সমাজের অসংখ্য নারীকে প্রতিনিয়ত মানিয়ে নেয়া জীবনের বোঝা বহন করতে হয়– তারই একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও বুলা বিয়ের আগে কাউকে বালোবাসতো বা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিয়েতে তার সম্মতি ছিলো না– এমন কোনো ইঙ্গিত গল্পে পাওয়া যায় না, তবুও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বুলার জীবনের মুল সুরটি যে কোনোভাবেই মেলানো যাচ্ছে না– এ বিষয়টি গল্পে প্রচ্ছন্নতার আবরণে স্পষ্ট হয়েছে। ফলে দেখা যায় যে, গল্পের শুরুতে জাহাঙ্গীর মিথ্যে বললেও তার মধ্যে একরকমের সারল্য ছিলো। কিন্তু মুশতাক ভাইয়ের আগমনের পরে সে সারল্যের জায়গায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে তৈরি হয় বুলাকে আঘাত করার স্পৃহা। ফলে দেখা যায় একই গল্পে পূর্বে যেখানে একটা মেয়ে তাকে 'জাহাঙ্গীর ভাই' ও 'আপনি' সম্বোধন করেছিলো, সেই গল্পই পুনর্বার বলতে গেলে দেখা যাচ্ছে, সে মেয়েই তাকে 'জাহাঙ্গীর' ও 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে। আগেরবার গল্প বলার সময় বর্ণিত মেয়েটিকে সে মোটরবাইকে নেয়নি, অথচ পরেরবার একই গল্পে সেই মেয়েটি তার বাইকের পেছনে শুধু উঠেই বসেনি, তাকে ঝাপটেও ধরেছে। অন্যদিকে লক্ষণীয় যে, আগে জাহাঙ্গীর বুলাকে বার বার কোনো গল্পের কোনো নাম বা ঘটনায় ভুল তথ্য দিলে, বুলা পরম মমতায়, সে সব ভুল শুধরে দিতো। কিন্তু মুশতাক ভাইয়ের আগমন এবং সুনীলদা ও গান প্রসঙ্গে আলোচনার পরে দেখা গেলো, জাহাঙ্গীর উদ্দেশ্যমূলকভাবে সূক্ষ্ম চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে এমনভাবে তার প্রাক-বিবাহ প্রেমের গল্প বলতে লাগলো যে বুলার কাছেও এই উদ্দেশ্যমুলক চাতুর্য আর অপ্রকাশ্য থাকলো না। বিষয়টি উপলব্ধি করে বুলাও জাহাঙ্গীরের এই প্রেমের গল্পে কোনো আনন্দ বা আগ্রহ খুঁজে পেলো না, জাহাঙ্গীরের হীনম্মন্যতার কোনো প্রতিবাদ করতে সরাসরি গল্পে কোনো বিবৃতি বা ব্যাখ্যা না থাকলেও দেখা যায়, জাহাঙ্গীরের এই বানোয়াট গল্প শোনার একপর্যায়ে :

> আবার কি আলো জ্বালাবে? বুলার মুখটা দেখা যেত। কিন্তু সুইচে হাত দেয়ার আগেই বুলার মিহি স্বরের নিঃশ্বাস শোনা যায়। আরে, এ তো ঘুমিয়ে পড়েছে! ... এই মেয়েটা স্বামীর প্রেমের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীরের ব্যাপারে কি তার কোনো মনোযোগ নেই? জাহাঙ্গীর উঠে বাথরুমে যায়। ফের এসে খাটের ধারে বসে থাকে। মনে হয় একা শুয়ে থাকাটা অনেক আরামের। এইটুকু সেমি-ডবল খাট, সেখানে দুজনে ঘুমানো? বিশ্রি! ('প্রেমের গপ্পো', R¨j ¯c, ¯‡ci R¨j, iPbvmgM-1 : ৩৩২)

বুলার এই ঘুম জাহাঙ্গীরের সরব আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় নিরব প্রতিশোধ যেন। বুলা যেন বাংলাদেশের সেই সব নারীদের প্রতিনিধি, যারা বিরুদ্ধ জীবনস্রোতে ক্রমাগত মানিয়ে চলার বা মানিয়ে নেয়ার নীতিতে পথ চলতে গিয়ে একসময় নিস্পৃহ, নিস্তেজ হয়ে পড়ে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে জীবনের প্রতি, কিন্তু দম আটকানো সেই জীবনকেই কোনো রকমে আঁকড়ে ধরে ঠেলে ঠেলে পার করে দিতে হয় জীবনতরী। সমাজ-সংসারে এরকম নারী-চরিত্রের সংখ্যা একেবারে কম নয়। ঘরে ঘরে এক ঘরহীন অবরুদ্ধ অসহনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করেই এইসব নারীদের জীবন কাটাতে হয়। বুলা চরিত্রটিকে এইসব নারীদের প্রতিবিম্বে কল্পনা করলে

বাংলাদেশের অগণিত নারীর-জীবনের অন্তর্গত ইতিকথা উন্মোচিত হয়ে উঠবে। আসলে এই গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক জাহাঙ্গীর চরিত্রটিকে নেতিবাচকভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে চাননি, বরং : 'সাংস্কৃতিক বৈষম্য যে অনেকাংশেই পরিবার ও সমাজজীবনকে বিষিয়ে তুলতে পারে গল্পটিতে সে ধারাই লক্ষ করা যায়।'[34] কিংবা এভাবেও বিষয়টিকে বিবেচনা করা যায় যে : 'ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা বুলা ও জাহাঙ্গীরের রুচিবোধ ও মানসিকতা সঙ্গত কারণেই ভিন্ন হয়েছে। কেউ চায়নি, তবু এই ভিন্নতা দুজন মানুষের মাঝখানে গড়ে তুলছে অনতিক্রম্য দেয়াল– এই বিষয়টি ইলিয়াস মূর্ত করেছেন বলে দুজনেই পাঠকের সমবেদনা লাভ করে।'[৩৫] প্রকৃতপক্ষে, বুলা ও মুশতাক ভাইয়ের সাংস্কৃতিক বোধের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের মতো, কপট অস্মিতার ঘেরাটোপে বদ্ধ, মানুষের মধ্যকার বিভেদটি জাহাঙ্গীর চরিত্রের অস্বস্তির মধ্যে প্রতিভাত। সুনীলদাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার পরে বুলা ও মুশতাক ভাইয়ের শোকের সমতার মধ্যে সে নিজেকে বড়ো বেমানান মনে করতে থাকে। ফলে : 'জাহাঙ্গীরের চোখ থেকে জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, চোখ বড়ো-বড়ো করে সে এদের একই বেদনা ও একই স্মৃতির ছোঁয়াছুঁয়িটা দেখে, তার চোখ খটখটে হয়ে আসে।' ('প্রেমের গপ্পো', R√j ¯c, ¯‡ci R√j, iPbvmgM-1 : ৩৩৫) দুটি একেবারে ভিন্ন জীবনবোধ ও সংস্কৃতির ওপর প্রেমের প্রলেপ লাগোনো সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে কতটা স্বস্তিদায়ক হবে, কিংবা প্রতিকূল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বুলাই-বা কতোটা মেনে নিয়ে আর মানিয়ে নিতে পারবে– এসব প্রশ্নের ইঙ্গিত রেখেই গল্পটি সমাপ্ত হয়। শেষ পর্যায়ে অস্তিত্বের সংকটে আবর্তিত জাহাঙ্গীর তাই কোনো রকমে ভেসপা চালিয়ে হাসপাতাল থেকে, ক্রন্দনরত বুলা-মুশতাকের সান্নিধ্য থেকে যেন বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। পলায়নপর অবস্থাতেও তার রুচি ও সংস্কৃতি অপরিবর্তিতই থাকতে দেখা যায় :

> ভেস্‌পায় স্টার্ট দিতে দিতে জাহাঙ্গীর শিস দেয়, হাম-তোম এক কামরেমে বন্দ হ্যায় আওর চাবি খো যায় ... একটু দূর থেকে ফার্মগেটের ওভারব্রীজের গায়ে লেখা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। কিন্তু একটি বর্ণও তার মাথায় ঢোকে না। হঠাৎ করে স্পীড বাড়িয়ে মগবাজার দিয়ে মালিবাগ এসে পড়ে। না, পুলিশবক্সের সামনে দাঁড়িয়ে লাভ কি? মেয়েটার নামটাও যদি মনে রাখতো! তবে? সুতরাং ভেস্‌পার চাকাজোড়া তার কেবল গড়িয়েই চলে । ('প্রেমের গপ্পো', R√j ¯c, ¯‡ci R√j, iPbvmgM-1 : ৩৩৫-৩৩৬)

জাহাঙ্গীর চরিত্রের এই অস্তিত্বহীনতার সংকট, আত্মপ্রতারণামূলক কপট পৌরুষত্ব , কপট আত্মম্ভরিতা, স্থূল ও সাংস্কৃতিক বোধের অসাড়তার মধ্য দিয়ে কেবল ব্যক্তি মানুষটিকেই লেখক উন্মোচিত করেন নি বরং বাংলাদেশের উদীয়মান মধ্যবিত্তের শ্রেণি-মানসিকতার স্বরূপটিকেও প্রতিবিম্বিত করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবেই সমালোচকের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

> আপাত প্রাকবিবাহ জাহাঙ্গীরের চটুল প্রেমের গপ্পোটিকে আমরা বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রতীকেও স্থাপন ও সার্বিকতা দিতে পারি। বাংলাদেশে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বিপুল অংশের মধ্যে কোনও গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি– জীবনযাপন, রুচিবোধ,

> মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবচয় এবং সত্তাগত অনস্তিত্বজনিত কারণে দিয়েছে সমাজ ও জীবন-বিচ্ছিন্নতা– জাহাঙ্গীর চরিত্রবিম্বে অবক্ষত যুবমানসের সেই বিকৃত রূপেরও আভাস মেলে।[৩৬]

স্বাভাবিকভাবেই তাই নিটোল প্রেমের গতানুগতিক বৃত্তের বাইরে গিয়ে এই গল্প পাঠককে এক নবতর বোধের আস্বাদ দেয়। দাম্পত্যের সাধারণ কাহিনি নয় বরং মানবচরিত্রের গভীর অস্তিত্বেরই প্রত্নখননকার্য হিসেবে গল্পটি বাংলাদেশের শ্রেণি-বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। Rvj ¯c ¯‡ci Rvj গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'ফোঁড়া'। এ গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক বাংলাদেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের দৈনন্দিন গ্লানি, হতাশা-কষ্ট, ক্ষোভ— প্রভৃতি বিষয়কে এক রিক্সাচালকের প্রতীকে যেমন তুলে ধরতে চেয়েছেন তেমনি এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাজ-উন্নয়নের আবরণে স্বার্থপরতা, আত্মপ্রচারণা এবং মেকি-দেশপ্রেমের মুখোশটিকেও সযত্নে উন্মোচিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিকথা পর্যালোচনা করলে সাধারণ, একেবারে খেটে-খাওয়া মানুষের অংশগ্রহণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা অবলীলায় স্বীকার করতেই হবে। বাংলাদেশের অস্তিত্বের সূত্রে এই সব সাধারণ মানুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত থাকলেও দেশের সার্বিক সাফল্যে এইসব হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি; তারা যে তিমিরে ছিলো, ঘুরেফিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে : 'ইলিয়াস উপলব্ধি করেছেন যে, এদেশের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে রয়েছে সীমাহীন স্বার্থপরতা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, আর আন্তরিকতার অভাব।'[৩৭] ফোঁড়া' গল্পে এক রিক্সাচালককে কেন্দ্র করে সমাজ-বাস্তবতার রূপক আখ্যানে একটি বামপন্থী সংগঠন ও তাদের কর্মকাণ্ড ও কর্মীদের চিন্তা-ভাবনাকে, তাদের জীবনবোধের স্বরূপকে স্বভাবগত তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নির্মোহ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। যে সমাজ-ব্যাধির এবং বাম-সংগঠনের কর্মীদের দিশাহীনতা ও অনভিজ্ঞতার ইঙ্গিত এই গল্পে বিবৃত হয়েছে, তা কেবল প্রাসঙ্গিকই নয় বরং বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতার নিরিখে বর্তমানেও প্রণিধানযোগ্য। কেননা :

> আপাত শ্রমিকদরদি অথবা জনপ্রিয় রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যে শুধু স্বার্থপরতাই নয় রয়েছে দেশ ও দেশের মানুষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বা সচেতনতার অভাব। তাছাড়া শ্রেণি-চেতনার কঠিন বাধাও কেউ ডিঙোতে পারে না– শ্রমজীবী মানুষকে, দরিদ্র বঞ্চিত শ্রমিকদের জীবনকে তারা দেখে যান্ত্রিক অথবা তত্ত্বগতভাবে, এবং অনেকটা উপর থেকে।[৩৮]

স্বাভাবকিভাবেই তাই দেশের আপামর হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনলিপিতে তেমন হেরফের হয় না। স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই নয় বরং বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তায় প্রতিনিয়ত এইসব নিরন্ন মানুষ দিনাতিপাত করে চলে। মামুন একটি বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের কর্মী, সে শ্রমিকদরদি ও নিষ্ঠাবান সৎকর্মীও। ঈদের দিন সে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে যায় হাসপাতালে, যেখানে তাদের সংগঠনের শ্রমিক নইমুদ্দিন আহত হয়ে

শয্যাশায়ী। কিন্তু হাসপাতালে গিয়েই মামুন দেখে নইমুদ্দিন নেই, মামুনের কাছ থেকে আগের দিন একশ টাকা পেয়েই সে হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে গিয়েছে— বাড়ির সবার সঙ্গে ঈদ পালন করবে। প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ নিয়ে মামুন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরে যে রিক্সায় করে, সেই রিক্সাচালক কথা প্রসঙ্গে জানায় যে সে নইমুদ্দিনের মামাতো ভাই। রিক্সাওয়ালা নইমুদ্দিনের আত্মীয় একথা জানার পর নইমুদ্দিনের ওপর মামুনের যে ক্ষোভ তা রিক্সাওয়ালার ওপর ঝাড়া যাবে, এ কথা ভাবতে ভাবতে দেখা যায় রিক্সাওয়ালা নিজেই তার নিজস্ব সমস্যার কথা বলতে শুরু করে। রিক্সওয়ালা তার ডান পায়ের উরুর নিচে একটা ফোঁড়ার কথা বলতে বলতে সেখানে কথাপ্রসঙ্গে এসে পড়ে তার বউ, ছেলে-মেয়ে, টাকা ধার করার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গ এবং ঈদের সাধ আহ্লাদের বৃত্তান্ত। এভাবে ধীরে ধীরে হাসপাতাল ত্যাগী নইমুদ্দিন, পার্টি, মামুনের দায়িত্ব, তার ক্ষোভ, ক্রোধ– প্রভৃতি প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়, মামুনের কৌতূহলের কেন্দ্রে চলে আসে রিক্সাওয়ালা-বৃত্তান্ত। এর মধ্য দিয়েই আবর্তিত হয় 'ফোঁড়া' গল্পের কাহিনি। শ্রমজীবী গরিব রিক্সাচালকের স্বগত বাক্য-স্রোতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অসহায়-বঞ্চিত, হতদরিদ্র সাধারণ মানুষের সাধ-আহ্লাদ, জীবনযাপনের গ্লানিময় কদর্য রূপ, তাদের কিছু কিছু সাধারণ প্রবণতা ও মানসিক গড়নের বিশেষত্ব নিখুঁতভাবে এ গল্পে ওঠে এসেছে। সমাজে যারা হতদরিদ্র, তাদের সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই এমন অভিমত যে, তারা নিতান্তই ছোটলোক, আর যারা ছোটলোক তাদের ঈমানের কোনো বালাই নেই, তারা সব গরীব এবং একই সঙ্গে বেঈমানও বটে। কিন্তু এই গল্পে রিক্সাওয়ালার কেবলমাত্র একখানি ভালো লুঙ্গি যখন ফোঁড়ার পুঁজ লেগে নোংরা হয়ে পড়ে এবং ঐ রিক্সাওয়ালার যখন নামাজ পড়বার পবিত্রতা রক্ষার জন্য ন্যূনতম ভালো একটি লুঙ্গির আয়োজনেরও ক্ষমতা থাকে না; তখন কেবলমাত্র পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, এই অজুহাতে তাকে কতটুকু বেঈমান ভাবা যায়— সে বিষয়টিও বিবেচনার দাবি রাখে। রান্না করতে গিয়ে কষ্টের ধার করা টাকায় কেনা সেমাইকে আটার দলায় পরিণত করেছে বলে রিক্সাওয়ালা বউকে সেই আটার দলা খাইয়েছে রাতে, মাথায় একটা ঠোনাও মেরেছে। অথচ ছেলেমেয়ে নিয়ে রিক্সাওয়ালা দিব্যি কইমাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছে। গল্পে বিষয়টি এভাবে উঠে এসেছে :

> 'সোগলি মিল্যা কৈ মাছ দিয়া আত্রে ভাত খাওয়া হলো।'
>
> কৈ মাছ দিয়ে ভাত খাওয়ার কথা বারবার বলে সে জিভে কৈ মাছের স্বাদ অনুভব করে। 'ভাত রান্দিছিল দেড়সের চাউলের, বৌ তো খালো না, কড়কড়া ভাত এ্যানা আছিল, মাছের সুরুয়া দিয়া খায়া হামি গাড়ি লিয়া বারালাম।' 'বৌকে ভাত খেতে দিলে না?' 'একসের সেমাইয়ের দলা খালো, আবার ভাত খাবে কি?' ('ফোঁড়া', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩৪৮)

আবার রিক্সাওয়ালা স্ত্রীকে শাসন করার ব্যাপারে অনেক কড়া। বাইরে সে দরিদ্র শ্রমজীবী একজন হাভাতে মানুষ হলেও ঘরে সে নিজেকে জাহির করে বেশ ভালোভাবেই। স্ত্রী সম্বন্ধে রিক্সাওয়ালার মন্তব্য : 'বুঝলেন

ভাইজান, শাস্ত্রে কয়, গোরু আর জরু,— জগতের এই দুইটা জীব লাঠির ডাং না খালে ঠিক থাকেন না।' ('ফোঁড়া', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩৪৮) সমাজের নারীর আবস্থান কোথায় আছে এবং পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজে একজন নারী তার মর্যাদা বা অস্তিত্বের প্রশ্নে কতটা অবমাননাকর স্থানে বিরাজমান তা রিক্সাওয়ালার এই দাম্ভিক উচ্চারণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে নারীর অবস্থান যে আরো নিম্নে— সে সমাজচিত্রই রিক্সাওয়ালার এহেন দাম্ভিক উচ্চারণে সুস্পষ্ট। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী এ নারী সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই নীচতা, তুচ্ছতাবোধ প্রকারান্তরে সমাজের হীনম্মন্যতারই পরিচয়বাহী। আলোচ্য গ্রন্থের নাম-গল্প 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী দু'দশকব্যাপী সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা লাভ। বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও স্বপ্নের অস্তিত্বের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বছর পরেও এদেশের মানুষের যথার্থ মুক্তি মিলেছে কী না এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আজো জাতি সঠিক পথটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে কী না কিংবা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত সত্তার মর্মকথা আজো ধারণ করার মানসিক শক্তি আমরা অর্জন করতে পেরেছি কী না— এ সমস্ত সত্যকথা নিয়েই 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্প রচিত। গল্পের পটভূমি ঢাকা। বর্তমান থেকে অতীতে, নব্বই থেকে একাত্তরে ফিরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, ত্যাগ ও স্বপ্নকে অবলম্বন করে গল্পে যুদ্ধ-পরবর্তী অরাজকতা, হানাহানি, দলীয় রাজনীতির কদর্যতা, ধর্মীয় মৌলবাদ, ও স্বৈরশাসনের উত্থান ও আগ্রাসী ক্ষমতার কপটতা-হিংস্রতা— এককথায় স্বপ্নভঙ্গের বেদনা সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে আভাসিত হয়েছে। আবার সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, শহীদদের আদর্শ ও আত্মত্যাগের মহিমা এবং দেশবাসীর স্বপ্নদেখাকেও যথাযোগ্য মর্যাদায় তুলে ধরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। লেখকের আরো কয়েকটি মুক্তিযদ্ধের গল্প যেমন 'অপঘাত' († 'vR‡Li Ig) , 'রেইনকোট' (Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj) ও 'খোঁয়ারি' (†Lvqwi) প্রভৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটি এসেছে যেগুলোর সূচনা ও সমাপ্তি মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে শুরু হয়ে নব্বই দশকের সূচনাকাল স্পর্শ করেছে বলে 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পটি ভিন্নতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে। যুদ্ধের ভেতরে ব্যক্তি-চেতনার স্বরূপ সন্ধান নয় বরং বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও মহৎ ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন হওয়া একটি দেশে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরেই কীভাবে কত দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুনর্বাসিত ও শক্তিশালী হয়, কীভাবে অশুভ শক্তির ডালপালা বিস্তার করে তারা বাংলাদেশের মাটিতে শেকড় প্রোথিত করে, কীভাবে স্বাধীন একটি দেশে সর্বস্তরে অবক্ষয় নেমে আসে— বস্তুত সে বিষয়টিই এ গল্পের মূল উপজীব্য। মহান মুক্তিযুদ্ধের মহত্ত্ব ও মুক্তিযোদ্ধাদের অমূল্য ত্যাগকে কোনভাবেই খাটো না করে লেখক যুদ্ধপরবর্তী অরাজকতাকে, সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে স্বপ্নে-কল্পনায় রুখে দাঁড়ানোর সাহসিকতাকে শিল্পসম্মতভাবে এ গল্পে বস্তুনিষ্ঠতার আলোকে রূপায়িত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আত্মত্যাগকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এ গল্পে যেমন

উপলব্ধি করেছেন এবং করিয়েছেন তেমনি দেখেছেন মানুষের শঠতা, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা ও পশ্চাৎপদতা। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিনের অনাথ কিশোর ছেলে বুলেট নানা জায়গা ঘুরে পিতৃবন্ধু লাল মিয়ার হোটেলে কাজ নেয়। হোটেলের প্রকৃত মালিক একাত্তরের রাজাকার নাজির আলি— মহল্লার অনেক দোকান বাড়ি নাজির আলি দখল করেছে, বেনামে সেগুলি এখন চালাচ্ছে সে। মুক্তিযুদ্ধের পর বহুদিন নাজির আলির দেখা পাওয়া যায়নি, যুদ্ধ শেষে নাজির আলি দেশের বাইরে চলে যায় বা দেশেই আত্মগোপন করে। সম্প্রতি হঠাৎ তার উদয় হয় দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে। ইতোমধ্যে নাজির আলি এক মুক্তিযোদ্ধার ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে অনেক অর্থ উপার্জন করেছে— এখন সে প্রকাশ্যে আসবো আসবো করছে। শহীদ ইমামুদ্দিনের একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু লালমিয়া বন্ধুর অনাথ পুত্রের প্রতি বাৎসল্য বোধ করে, বুলেটকে দেখাশুনার কাজটা নিজের মানবিক দায়িত্ব থেকেই করে সে। ইমামুদ্দিনের মা, দিনরাত বুলেটকে শোনায় তার শহীদ পিতার স্বপ্ন, আদর্শ ও সাহসের কথা। সত্য মিথ্যায় পল্লবিত এই কাহিনি শুনে শুনে বুলেট তার মানসপটে এক কল্পিত আদর্শ পিতার ভাবচ্ছবি আঁকে আর স্বপ্ন দেখে। বুলেটের স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে সমস্ত অরাজকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের যথার্থ মুক্তিকামী মানুষের আহত স্বপ্নকেই জাগ্রত করার, উদ্দীপিত করার বিষয়টিকে লেখক মূর্ত করতে চেয়েছেন। এভাবেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঘটে যাওয়া খণ্ড খণ্ড ঘটনার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পটি। স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্মমতা, হত্যাযজ্ঞ, লুঠতরাজ, নারকীয় বীভৎসতা সব মিলিয়ে যুদ্ধকালীন টানটান উত্তেজনার বিবরণ গল্পে অসাধারণ দক্ষতায় লেখক জীবন্ত করে তুলেছেন এভাবে :

> ইমামুদ্দিনের ১২/১৩ বছরের ভাই ও ইমামুদ্দিনের বাপকে আচ্ছাসে জখম করা হয়েছিল, তাদের তোলা হলো মিলিটারির লরিতে। মারধর ও ধরাধরির কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে মিলিটারি এবার বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করল। তাদের যাবতীয় তৎপরতার মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহ এই আগুন লাগা ঘরের দিকে টার্গেট করে ব্রাশ ফায়ারের কাজে। হাজার হলেও দুনিয়ার সেরা ফৌজ, হাতিয়ারের ট্রিগার টেপার চেয়ে তাদের বড়ো সুখ আর কীসে থাকবে? ব্রাশ ফায়ারের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে সংগত করে বেজে ওঠে ইমামুদ্দিনের খুনখুনে বুড়ি দাদীর খনখনে গলা, 'আল্লায় সইজ্য করব না, সইজ্য করব না। তগো উপরে গজব পড়বো, গজব পড়বো!' মিলিটারির সঙ্গে নাজির আলিও বুড়ির অভিশাপের অন্যতম লক্ষ্য, 'এই কুত্তার বাচ্চা, খানকির বাচ্চা নাজিরা আউজফা মিলিটারির ভাউরা হইয়া আজরাইলগো লইয়া মহল্লার মইদ্দে ঢুকচে। আমাগো ব্যাকটিরে ধরাইয়া দিতে আইচে, আরে ভাউরার ভাউরা, মিলিটারি দিয়া তর মায়েরে চোদা, তর বুইনেরে চোদা।' নাজির আলির উপর একটি তাৎক্ষণিক গজব বর্ষণের জন্যে ইমামুদ্দিনের বুড়ি দাদী আল্লার দরবারে অস্থির মিনতি জানায়, কিন্তু এই আবেদনে আল্লা সাড়া দেওয়ার আগেই বীরপুরুষ এক মিলিটারির কয়েকটি গুলিতে বুড়ির অভিশাপ-বর্ষণ চিরকালের জন্যে মিটে যায়। ('জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩৬২)

কেবল এখানেই শেষ নয় মিলিটারির এই নারকীয় তাণ্ডব। যুদ্ধে কেবল অসংখ্য নারী-পুরুষ প্রাণ হারায়নি বরং লুণ্ঠিত হয়েছে অগণিত নারীর সম্ভ্রম। তেমনি একটি ঘটনার বিবরণ গল্পে পাওয়া যায় :

> বস্তির মেয়েরা এদিক ওদিক ছুটতে শুরু করে এবং এই অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত ছোটাছুটির ফলে কেউ কেউ ছিটকে পড়ে মিলিটারির জিপের সামনে। এদের মধ্যে একজন হলো ইমামুদ্দিনের বৌ, কোলে শিশুকে নিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। মিলিটারির সায়েব গোছের একজন লোক তাকে জিগ্যেস করে, 'নাম কেয়া?' দাদীশাশুড়ির টাটকা লাশের দিকে এবং মাটির দিকে তাকিয়ে সে ঢোঁক গেলে, ... শেষ পর্যন্ত সব ঢোঁক গেলা শেষ হলে মরিয়া হয়ে নিশ্বাস ছাড়ার মতো মেয়েটি বলে ফেলে, 'বুলেট!' ... এই নাম শুনে সায়েব গোছের মিলিটারি হাসে, 'ইয়ে বাচ্চা ভি এক বুলেট হ্যায়? বহুত আচ্ছা।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে সে বলে, 'তুমহারা বাচ্চা? তুমহারি কোক সে নিকলা হ্যায়, তব তো তুম রাইফেল হোগি!' বুলেট যেখান থেকে বেরিয়েছে তাকে অবশ্যই রাইফেল হতে হবে– এই শাণিত যুক্তি প্রয়োগ করে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট মিলিটারি কর্তা তার অসাধারণ মেধার পুরস্কার দাবি করে, 'ইয়ে রাইফেল সিজ করো।' ইমামুদ্দিনের বৌ সুতরাং মিলিটারির হাতে বাজেয়াপ্ত হলে তাকে গাড়িতে ওঠানো হয় ... নাজির আলি লালমিয়াকে মিলিটারির হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে দুই সপ্তাহের মধ্যেই। কিন্তু ইমামুদ্দিনের ভাই ও বৌকে ছাড়িয়ে আনা তার সাধ্যের বাইরে। ('জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল', Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj, iPbvmgM-1 : ৩৬২-৩৬৩)

এভাবেই গল্পে যুদ্ধকালের নারকীয় নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা টানটান উত্তেজনায় যেন পাঠককে মুহূর্তকালও অমনোযোগী হওয়ার অবকাশ দেয়না। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অগণিত নারীর আত্মত্যাগের বিষয়টিও করুণভাবে বিধৃত হয়ে পড়ে আপসহীন দক্ষতায়। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায় নারীর অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক সত্য। নারীকে অবমাননা মানে তাই দেশকে, দেশের অস্তিত্বকে অবমাননা স্বরূপ— যা অতীত থেকে সাম্প্রতিকাল পর্যন্ত সমাজে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণে সততই পরিলক্ষিত হয়।

Z_¨wb‡'k

১. Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭৬ সাল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbvmgM-1-এ (দ্রষ্টব্য : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পাদিত), AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm iPbvmgM-1, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে Ab¨ N‡i Ab¨ ¯i গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmgM-1-র পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

২. মাহবুবুল আলম, 'ইলিয়াসের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত পর্যালোচনা', ZYgj (সম্পাদক : আনু মুহাম্মদ), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ১৮০

৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'আমার প্রথম বই', ZYgj, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-২৮৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

৫. হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ', K_vmwn‡Z¨i K_KZv , সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১০৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫

৭. সুশান্ত মজুমদার, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দ্বৈরথ সমর', ˆkjx (সম্পাদক : কায়সুল হক), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১ জানুয়ারি ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ.১১৮

৮. ড. সায়েদা বানু, evsjv‡`‡ki †QvUM‡í ev¯ÍeZvi ¯^i|c (1972-88), হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৬৪

৯. আলেয়া বেগম, AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi †QvUMí, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪

১০. শাহাদুজ্জামান, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', wjwiK (সম্পাদক : এজাজ ইউসুফী), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৩৯৯, পৃ. ১৬৩

১১. হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

১২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'আমার প্রথম বই', ZYgj, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

১৩. †Lvqvwi গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৮২ সাল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbvmgM-1-এ (দ্রষ্টব্য : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পাদিত), AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm iPbvmgM-1, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), †Lvqvwi গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ‡Lvqvwi গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmgM-1-র পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

১৪. জাফর আহমদ রাশেদ, AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi †QvUMí : Rxe‡bvcjwäi ¯^i|c I wkí, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৪৬

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৬. এজাজ ইউসুফী, 'চন্দ্রালোকের হন্তারক : মানবিক বোধের যুগলবন্দি', wjwiK (সম্পাদক : এজাজ ইউসুফী), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৩৯৯, পৃ. ১১৮

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১৮. 'afv‡Z DrcvZ গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৮৫ সাল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbvmgM-1-এ (দ্রষ্টব্য : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পাদিত), AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm iPbvmgM-1, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), 'afv‡Z DrcvZ গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে 'afv‡Z DrcvZ গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmgM-1-র পাঠ থেকে নেয়া হয়েছে।

১৯. মোস্তফা মোহাম্মদ, AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi K_vmvwn‡Z¨ wfbgvÎv Ab¨ mi, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১

২০. জাফর আহমদ রাশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

২১. এজাজ ইউসুফী, 'চন্দ্রালোকের হন্তারক : মানবিক বোধের যুগলবন্দি', wjwiK, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

২২.ইফতেখারুল ইসলাম, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'afv‡Z DrcvZÕ , wbiš—i (সম্পাদক : নাঈম হাসান), ৩য় সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ১৮১

২৩.জাফর আহমদ রাশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২৫.শোয়েব শাহরিয়ার, Bwjqvm I LwÐZ †PZbvi bv›‘xcvV, wbmM (সম্পাদক : সরকার আশরাফ), ২০০৪, পৃ. ১১৮

২৬.†‘vR‡Li Ig গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৮৯ সাল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbvmgM-1-এ (দ্রষ্টব্য : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পাদিত), AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm iPbvmgM-1, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), ‡‘vR‡Li Ig গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ‡‘vR‡Li Ig গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmgM-1-র পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

২৭.আলেয়া বেগম, AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi †QvUMí, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

২৮.এজাজ ইউসুফী, 'চন্দ্রালোকের হন্তারক : মানবিক বোধের যুগলবন্দি', wjwiK, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

২৯.খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পাদিত), AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm iPbvmgM-1, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, দ্রষ্টব্য : ভূমিকা

৩০.এজাজ ইউসুফী, 'চন্দ্রালোকের হন্তারক : মানবিক বোধের যুগলবন্দি', wjwiK, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৩১.Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৯৭ সাল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbvmgM-1-এ (দ্রষ্টব্য : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পাদিত), AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm iPbvmgM-1, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ iPbvmgM-1-র পাঠ থেকে নেয়া হয়েছে।

৩২.জাফর আহমদ রাশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৩৩.সুশান্ত মজুমদার, 'মৃত্যু প্রসঙ্গ ও স্বপ্নের জাল', ZYgj, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৩৪.মোস্তফা মোহাম্মদ, পূর্বোক্ত,পৃ. ২৪

৩৫.জাফর আহমদ রাশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৩৬.আলাউদ্দিন মণ্ডল, AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm : wbgv‡Y-wewbgv‡Y, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৫২

৩৭.জাফর আহমদ রাশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৩৮.আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡”Q'

†mwjbv †nv‡mb : Rxebcevn I wkí‡eva

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে সেলিনা হোসেন সুপরিচিত একটি নাম। একটানা লিখে যাওয়ার নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল উদাহরণও যেন তিনি। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে লিখছেন। তিনি প্রধানত লিখেছেন গল্প-উপন্যাস; লিখেছেন কিশোর সাহিত্য, প্রবন্ধগ্রন্থ এবং সম্পৃক্ত থেকেছেন নানামুখী সম্পাদনায়। সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশতেরও বেশি। যে কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর শিল্পকর্মে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধের প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে। সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের এমন একজন সাহিত্যব্যক্তিত্ব যাঁর সৃষ্টিকর্মে স্বতন্ত্র জীবনচেতনা ও শিল্পবোধ স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। প্রখর মেধাবী এই কথাসাহিত্যিক সমাজ, দেশ ও জাতির কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতার পরিচয় শিল্পিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মসমূহে। বাংলাদেশের ক্রান্তিকাল, রাজনীতির নানা ঘাত-প্রতিঘাত, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মধ্যবিত্তের জীবন ও সংকট, অস্তিত্বের সংগ্রাম, জীবনচেতনা, ইতিহাস, ঐতিহ্যবোধ, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাবাদ তাঁর কথাসাহিত্যের মৌল বিষয়। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা, রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংকট ও অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের কবলে পড়া জর্জরিত ব্যক্তিজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের নানামাত্রিক জটিলতা ও দ্বান্দ্বিক-পরিসরের বাস্তবনিষ্ঠ রূপটি গভীরভাবে সেলিনা হোসেনের রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেলিনা হোসেনের বিশেষ লক্ষ্য ছিলো : 'বাংলাদেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছে, সেই সম্পর্কের ভেতরকার অসংগতিগুলো কী– পাঠকের দৃষ্টি, ভাবনা আর বোধের সীমায় এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আসা।'[১] কথাসাহিত্যের বিচিত্র পটভূমিতে সেলিনা হোসেন নিরন্তর এই কাজ করে চলেছেন। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এই সাহিত্যিক বাংলা কথাসাহিত্য জগতে স্থান করে নিয়েছেন প্রাতিস্বিকতায়।

সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন, রাজশাহী শহরে। পৈতৃক নিবাস বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার হাজীরপাড়া গ্রাম। পিতা এ. কে. মোশাররফ হোসেন রাজশাহী রেশমশিল্প কারখানার পরিচালক ছিলেন, মাতার নাম মরিয়মন্নেসা বকুল। তিনি পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। শৈশব ও কৈশোরে তাঁর বেড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত লেখক হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। শৈশবে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংস্পর্শে তিনি লাভ করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তাঁর বাবা, মা, ভাই, বোনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও চিন্তাচেতনা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। সেই সঙ্গে তাঁর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের চিন্তাশীল শিক্ষকগণের সাহচার্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সেলিনা হোসেনের বাবা চাকরি করতেন রেশমশিল্প কারখানায়। অবসর গ্রহণ করার সময় তিনি পরিচালক হয়েছিলেন। চাকরিসূত্রে তিনি ছিলেন বগুড়ায়, তারপর রাজশাহীতে। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে বাবার আচরণ সেলিনা হোসেনের শৈশবকে প্রভাবিত করেছিলো। বাবার বিচিত্র স্বভাব তাঁকে বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। তাঁর বাবা শিকার করতে ভালোবাসতেন; পয়সা দিয়ে তাস খেলা, দাবা খেলা, ভলিবল খেলা ছিলো তাঁর নেশার অংশ। হোমিও চর্চাও করতেন গ্রামের মানুষদের চিকিৎসা সেবাদানের উদ্দেশ্যে। লেখকের ভাষায় : 'আমি ছিলাম তাঁর কম্পাউন্ডার; তিনি বলে দিতেন অমুক শিশিটা বের কর, দুইটি বড়ি দাও, আমি পুরিয়া বানিয়ে লোকজনকে দিতাম।'[২] বাবা যখন মাছ শিকারে বা পাখি শিকারে যেতেন লেখকও সঙ্গে যেতেন। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তিনি দারুণ শিহরণ অনুভব করতেন। পিঁপড়ার চাক ভেঙ্গে মাছের জন্য টোপ বানানো, বাঘ শিকারের জন্য জঙ্গলের মধ্যে খাঁচায় ছাগল বেঁধে রাখা, বড় বড় ধনেশ পাখি শিকার– এসব ঘটনা তাঁর শৈশবের বেড়ে ওঠাকে করেছিলো অর্থপূর্ণ। তাঁর বাবা ছিলেন ভীষণ রাগী প্রকৃতির ও সংসারের প্রতি অনেকটা উদাসীন। বেতনের টাকাটা তাঁর মার হাতে দিয়ে উধাও হয়ে যেতেন; কোনো কারণে ভীষণ রেগে গেলে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যের যে বিষয়টি লেখকের বাবার দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিলো তা লেখকের শৈশব জীবনকে করেছিলো প্রভাবিত। লেখক তাঁর মায়ের জীবনাচরণ থেকে আহরণ করেছেন সৌন্দর্যবোধ। তাঁর মা প্রচুর শাড়ি কিনতেন, সবাইকে দিতেন। ফুলগাছ ও বাগান করতে ভালোবাসতেন। রেডিওতে খেয়াল শুনতেন। তিনি তাঁর মেয়েদের পড়ালেখার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। মায়ের মতো বড় বোনেরাও ছিলেন আধুনিক ও রুচিশীল। আধুনিকতা বোধ ও মননশীলতার শিক্ষা লেখক তাঁর পরিবার থেকেই পেয়েছেন। বড় বোন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও সুন্দরী; অথচ তাঁর দাদার ইচ্ছার কারণেই বিয়ে হয়ে গেলো পড়ালেখা শেষ হবার আগেই। এই বড়বোনই স্কুলে ভর্তি হবার সময় নিজের নাম উম্মে কুলসুম বদলে ফেলে রেখেছিলেন সুরাইয়া ও লেখকের নাম খায়রুন্নেসা পাল্টে দিয়ে রেখেছিলেন সেলিনা হোসেন। বস্তুত, ধর্মীয় প্রথার বিরুদ্ধে এটি ছিলো তাঁদের কৈশোরের প্রথম প্রতিবাদ; যা সম্ভব হয়েছিলো তাঁদের প্রগতিশীল চেতনা আর নান্দনিক সৌন্দর্যবোধের কারণেই। এ প্রসঙ্গে লেখিকার জবানীতে জানা যায় : 'আমার মনে হয় পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই এই উপাদানগুলি ছিল, যে উপাদানগুলোকে আমি ধরতে পেরেছিলাম। যা আমার অন্য কোন ভাই বোনেরা ধরতে পারে নি, হয়তো তারা চেষ্টাও করেনি।'[৩] কৈশোরে লেখকের স্বাধীনতা ছিলো অবাধ। একটা কিছু মাথায় ঢুকলে লেগে থাকতেন সেটা নিয়ে। দেখতে ছোটখাট হওয়াতে ধিঙ্গি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঢ্যাং ঢ্যাং করে এই ধরনের অপবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয় নি। মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে, নদীতে সাঁতার অথবা গাছ বাওয়া, উঁচু থেকে লাফ দেওয়া, ঝড়ের সময় আম কুড়োতে যাওয়া, আম এনে ঘর বোঝাই করে ফেলা, ঝড়ের মধ্যে বেড়িয়ে যাওয়া, জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরা দেখতে যাওয়া– তাঁর এই উদ্দাম ও অবাধ বিচরণে কখনো তিনি বাধাগ্রস্ত হন নি। বাবা অথবা মা কেউই

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে এসব বিষয়ে নিষেধ করেন নি। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার যে স্বাধীনতা তিনি পেয়েছিলেন তার সবটুকু তিনি ব্যবহার করেছিলেন এবং নিজের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত রেখেছিলেন যা তাঁকে আজকের সেলিনা হোসেন হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলো। শুধু প্রকৃতির ভেতর ডুবে যাওয়ার বিষয়টি নয় পারিবারিক পরিমণ্ডলের ভেতর থেকেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে বিচিত্র রূপ তিনি দেখেছিলেন তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিলো। তাঁর বাবা প্রচণ্ড রাগী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের প্রতি ছিলো অপরিসীম দরদ ও অগাধ সহানুভূতি। গ্রামের সাধারণ মানুষকে ঔষধ দিতেন, সাহায্য করতেন। গ্রামের মানুষেরাও তাঁর কাছে সুখ-দুঃখের কাহিনি বলতো অকপটে। চারপাশের মানুষের জীবন-যাপন থেকেই শিক্ষা নিয়েছেন লেখক। শৈশবেই তিনি বুঝতে পেরেছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলো সহজ নয়। মানুষের স্বভাব ও ক্রিয়াকর্ম বিচিত্র; এই ক্রিয়াকর্মই মানুষের সম্পর্কগুলোকে জটিল করে দেয়। সেলিনা হোসেনের মানস-প্রবণতা গঠনে প্রকৃতি এবং পারিবারিক পরিমণ্ডল ও পরিপার্শ্বের প্রভাব প্রসঙ্গে লেখকেই জবানীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> আমার শৈশব-কৈশোর হচ্ছে সোনালী সময়ের শৈশব কৈশোর; সেখানে আমার দুই ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল। এক, অবাধ প্রকৃতি দেখা; মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, খাল-বিল, নদী, ধানক্ষেত, আকাশ– ঘুরে বেড়ানোর অবাধ স্বাধীনতা ছিলো। বাবার সর্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার জগৎ তৈরি হয়েছিলো। প্রকৃতি দেখেছি দু'চোখ ভ'রে। আর দ্বিতীয়ত দেখেছি মানব-মানবীর সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণ যে কতো বিচিত্র হতে পারে সেটা শৈশব-কৈশোরে দেখতে পেয়ে সম্পর্কের জটিলতার ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিলাম। মানবসমাজের কথা, প্রকৃতির বিবিধ কথা– এসব প্রকশের জন্য বড় ক্যানভাসের প্রয়োজন অনুধাবন করেছিলাম। সে জন্যেই কথাসাহিত্য চর্চা।[৪]

সেলিনা হোসেনের লেখালেখির সূচনা বই পড়ে নয় এমনকি কোনো বিশেষ লেখক দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন নি; বরং অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লেখার তাগিদ অনুভব করেছেন। ভেতরকার তাগাদা ও নিজস্ব প্রেরণাই তাঁকে গল্প লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত স্মরণযোগ্য :

> আমার শৈশবে পাঠ্য বইয়ের বাইরে আমার কোনো বই পড়ার সুযোগ ছিল না। কৈশোরেও আমি বইপড়ার সুযোগ পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার সামনে অনেক দরজা খুলে যায়। আমি মার্কস এঙ্গেলস পড়ি, গিনসবার্গের হাউল পড়ি, বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, বিভূতি, মানিক, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ। আমার সামনে তখন বিশাল সমুদ্র। ক্লাসের বইয়ের বাইরে আমি তখন অন্য ভুবন খুঁজে পেয়েছি। তারপর আমার আর পেছন দিকে তাকাতে হয় নি। বই দিয়ে আমি নিজের সঞ্চয় বাড়িয়েছি। শিখেছি। অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। বই ছিল আমার জানার উৎস।[৫]

শিশুবেলা থেকে তাঁর যে জীবন ও প্রকৃতি অবলোকন শুরু তার ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে পরিণত বয়সে এসেও। মুছে যায় নি কিছুই; শৈশবে তিনি দেখেছিলেন অভাবের কাছে মানবিক মূল্যবোধগুলো কেমন করে হারিয়ে যায়। সেই দেখাটা এখনও চলছে; এখনও শেষ হয় নি; সেই শৈশবের অভিজ্ঞতা এখনও তাঁর শিল্পসত্তায় ক্রিয়াশীল। একথা অনস্বীকার্য যে : 'যার পকেটে শৈশব নেই– প্রতিভার নদীতে তার সাঁতার দিতে

নামা উচিত হবে না।'[৬] কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের জীবনে শৈশব ছিলো, সমৃদ্ধ শৈশব; সুতরাং তিনি প্রতিভার নদীতে সাঁতার কেটে চলেছেন অদ্যাবধি। এই শৈশব, এই প্রতিভা আসলে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনকেই চিহ্নিত করে; অন্তত একজন কথাসাহিত্যিকের জন্য। এই যে অবাধ প্রকৃতি দেখা, প্রকৃতি থেকে, পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে নানা কিছু আবিষ্কার করা, এটা তাঁর নিজের ধাঁচের মধ্যেই ছিলো। সুতরাং তিনি সেই কৈশোর থেকেই লাভ করেছিলেন এক ধরনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা; যাকে বলা যেতে পারে তৃতীয় নয়ন লাভ; যা একজন শিল্পীর জন্য ছিলো অপরিহার্য।

১৯৬৩-৬৪ সালে কলেজ জীবনে লেখক সাক্ষাৎ পান প্রফেসর আব্দুল হাফিজের; যিনি সেলিনা হোসেনকে কেবল পড়ালেখার দিক নির্দেশনাই দেননি; দিয়েছেন আধুনিকতার শিক্ষা। তিনি লেখিকাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে না থেকে সব পত্রিকাতেই লেখার পরামর্শ দেন এবং তিনি লেখিকার সমালোচনা করতেন; যাতে সেলিনা হোসেন প্রকৃত লেখক হয়ে ওঠার সুযোগ পান। প্রফেসর হাফিজ তাঁকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নানাভাবে গাইড করেছেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যের নানা বিষয় ও দর্শনের সঙ্গে লেখককে অন্তরঙ্গ করে তোলেন। সেলিনা হোসেনের শিল্প-সত্তা গড়ে ওঠার পেছনে লেখকের সমৃদ্ধ শৈশব যেমন ক্রিয়াশীল; তেমনি তাঁর শিক্ষা জীবনে প্রফেসর আব্দুল হাফিজের প্রভাবও অনস্বীকার্য। তাঁর প্রতিবেশ তাঁকে নারী হয়েও লেখক হিসেবে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। লেখককে তাঁর বোনদের মতো শাড়ি পেঁচিয়ে বোরখার মতো করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি ছাত্ররাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও করতেন। সাহিত্য প্রতিযোগিতায় চার বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রাকসু ও ছাত্রী হল সংসদে নির্বাচন করে জিতেছেন। কখনোই তাঁর বাবা-মা তাঁকে এসব বিষয়ে বাঁধা দেন নি। মেয়েদের স্বাধীন বিকাশের ব্যাপারে বাবা-মার উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে লেখক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ফলে তিনি ছিলেন সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা একজন প্রগতিশীল মানুষ। রাজশাহীতেই লেখকের সাহিত্য সৃজনের সূচনা। একটি দৈনিক পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রথম ছাপা হয়। তিনি লেখা পাঠাতেন। কখনো ছাপা হতো কখনো হতো না; কিন্তু এ নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপ ছিলো না। ছাপা না হলে ভাবতেন নিশ্চয়ই লেখাটি ভালো হয় নি। তাই সম্পাদক সেটা ছাপান নি। লেখকের সাক্ষাৎকার পাঠে জানা যায়, তাঁর লেখা প্রথম ছাপা হয়েছিলো AvRv' ও ce‡'k এই দুটো দৈনিকে। প্রথম গল্প ছাপা হয়েছিলো ঢাকায় প্রকাশিত, cevjx পত্রিকায়; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর সম্পাদনায়। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ড. মাযহারুল ইসলাম, ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা 'উত্তর অন্বেষণ' ও 'পূর্বমেঘ' এবং ঢাকার 'মাহে-নাও' পত্রিকাতে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। এরপর আরও অবারিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যজগৎ। আর কখনো তাঁর সাহিত্যচর্চা থেমে থাকে নি। সেলিনা হোসেন লেখালেখি শুরু করেন লেখক হবার বাসনা থেকে নয়; বরং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চাকরি পাবার জন্য অতিরিক্ত যোগ্যতার বিবেচনা

হিসেবে তাঁকে লেখালেখি করতে হয়। সেলিনা হোসেনের লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। তাঁর কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকটের সামগ্রিকতা। বাঙালির অহঙ্কার ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখার নতুন মাত্রা অর্জন করে। ভ্রমণ তাঁর নেশা। সুযোগ পেলেই ছুটে যান বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে– সর্বত্র। সমুদ্র উপকূল, পার্বত্য এলাকা, হাওড় অঞ্চল, প্রত্যন্ত গ্রাম– সেখানকার কল্লোলিত বিচিত্র জীবন যেমন তাঁর লেখায় উঠে আসে, তেমনি ওদের সঙ্গে সময় কাটাতেও তিনি ভালোবাসেন। সংকীর্ণ জাতীয়তায় আক্রান্ত নন তিনি। পৃথিবী তাঁর কাছে 'বাউন্ডলেস ইউনিভার্স'। সব কিছুর উর্ধ্বে মানুষ। তাই সেই মানুষের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যকে খুব কাছে থেকে দেখার আগ্রহে তিনি ভ্রমণ করেছেন ভারত, নেপাল, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এতে লেখক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্ব-সংস্কৃতির মিলিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনের আলোকে। ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি, কানাড়ি, মালয়ালাম, রুশ, মালে, ফরাসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' ও ১৯৮৩ সালে 'নীল ময়ূরের যৌবন', এবং ২০০০ সালে 'টানাপোড়েন' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত হয়ে কেরালা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটি উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়ে ২০০৩ সালে পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পত্রে পাঠ্য। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছে 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', 'নীল ময়ূরের যৌবন' ও 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল থিসিস হয়েছে তাঁর উপন্যাস নিয়ে। কেবল তাই নয় : 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন রাজ্যের ওকটন কমিউনিটি কলেজে ২০০৬ সালে দুই সেমিস্টারে পাঠ্য ছিলো 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ *The Shark The River and The Grenade*. তিনি বাংলা একাডেমিতে ৩৪ বছর কাজ করার পরে ২০০4 সালে পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।'[৭] পেয়েছেন দেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুরস্কার। জেন্ডার গ্রন্থমালা সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত আছেন কয়েক বছর ধরে। জীবনের বর্ণিল প্রাপ্তি ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিসর-পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সমৃদ্ধ ভুবন। ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য সৃজন উভয়কেই তিনি ভালোবেসেছেন সমান মমতায়। ফলে তাঁর কর্মজীবনও সমৃদ্ধ; কর্মক্ষেত্রে যেমন সাফল্য অর্জন করেছেন তেমনি রচনা করে যাচ্ছেন শিল্পসমৃদ্ধ সাহিত্যকর্ম। কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো ক্লান্তিবোধ করেন না এবং সময় নষ্ট করেন না। তাই তাঁর কাজের সঙ্গে লেখার কোনো বিরোধ নেই। বরং এ প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট উচ্চারণ : 'আমার এক হাতে ব্যক্তিগত জীবন, আরেক হাতে লেখালেখি।'[৮]

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। গত দু-তিন দশকে বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজ আরও দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, মেরুকরণ, সীমাহীন লুণ্ঠন আর দুর্বৃত্তায়নে জর্জরিত বাংলাদেশ যে নৈরাজ্য আর অবক্ষয়ের কবলে পড়ে, তাতে সামাজিক সংকট আরও তীব্রতর ও জটিল আকার ধারণ করে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিজীবনেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কেও দেখা দেয় নতুন মাত্রা। তবে রাষ্ট্রিক-সামাজিক ওই সংকট ও অস্থিতিশীলতার মধ্যেও ব্যক্তিক আত্মমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কখনও লোপ পায়নি। বিশেষ করে সচেতন লেখকরা সামাজিক অসংগতিকে তাদের লেখায় নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেলিনা হোসেন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের টানাপোড়েনের বিচিত্র পরিসর ও নেপথ্য-সূত্রকে সমাজসত্যের আলোকে রূপায়িত করেছেন শৈল্পিক পটভূমিতে। সেলিনা হোসেনের সৃষ্টিকর্মেও প্রতিফলিত হয়েছে সমাজসচেতনতা এবং বস্তুবাদী জীবনপ্রত্যয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সংকটের ভেতরেও তাঁর ছোটগল্পের পাত্র-পাত্রীরা ইতিবাচক জীবনদৃষ্টিতে আত্মপ্রত্যয়ী ভূমিকায় অবতীর্ণ। জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে সেলিনা হোসেন গভীরভাবে এই জীবনবোধে উপনীত যে :

> আজকের দিনে তৃতীয় বিশ্বের লেখকদের শেকড় সন্ধানী অনুপ্রেরণা বৈরী সময়কে অতিক্রম করতে চায়, অতিক্রম করতে চায় মিলিটারি এ্যারিস্টোক্রেসীর বদৌলতে বন্দুকের শাসন। কেননা এই শাসন-উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মূল্যবোধের অবক্ষয়। যে অবক্ষয় সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে ঢুকিয়ে রাখে কালো থাবা। যার নিষ্পেষণে পদদলিত হয় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রমূর্ত রাখার দায়-দায়িত্ব লেখকের।[৯]

এই বিশ্বাসে দৃঢ়মূল থেকেই সেলিনা হোসেন নির্মাণ করেন তাঁর ছোটগল্পের বিচিত্র ভুবন। তাঁর লেখাতে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক নারীজীবনের বাস্তব চিত্রায়ণ। একক কোনো গল্প নয়, একটিমাত্র কাহিনি নয়– টুকরো টুকরো নানা কাহিনির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারী-জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর লেখায়। বাংলাদেশের নারীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে– সেই যাপিত জীবনের নানামাত্রিক চালচিত্রের অন্যতম রূপকার সেলিনা হোসেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই বলা যায় যে : 'তাঁর গল্প মানেই নারীর গল্প, বাংলাদেশের নারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনের গল্প।'[১০] সাধারণ দৃষ্টিতে কোনো কাহিনিকে সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখে, সেইভাবে দেখা নয়; গল্পের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে যে জীবন, সেই জীবনের বৌদ্ধিক দিকটিকে পাঠকের বোধের সীমায় প্রতিবিম্বিত করে তোলেন সেলিনা হোসেন গল্পের বিচিত্র অনুষঙ্গে।

সেলিনা হোসেনের গল্প কেবল নির্জলা গল্পমাত্র নয়; বরং এর মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা, মানুষের জীবন-সংকটের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের অসমতা ও আত্মসংকটে ক্ষত-বিক্ষত মানবিক অবচয়ের নিদারুণ বাস্তবচিত্র। ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসরে সেলিনা হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

একজন দক্ষ জীবনশিল্পীর ন্যায় : 'ব্রাত্যনারী থেকে অভিজাত নারী, নিম্নবর্গের নারী থেকে উচ্চবর্গের নারী, সাধারণ-সরল-গ্রাম্য নারী থেকে প্রখর রাজনীতি-সচেতন নারী, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সব স্তরের নারীকেই গল্পের চরিত্র ও ন্যারেটিভের অংশ করে তুলেছেন সেলিনা হোসেন তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতা ও পরিপার্শ্বের পটভূমিকায়।'[১১] 'উপনিবেশবাদ', 'গণতন্ত্র', 'রাষ্ট্রতন্ত্র', 'প্রগতিশীল রাজনৈতি আন্দোলন', 'ভাষা-আন্দোলন', 'মুক্তিযুদ্ধ'– প্রভৃতি নানামাত্রিক ভাবনাকে সেলিনা হোসেন তাঁর গল্পের অবয়বে অভিনিবিষ্ট করে দিয়েছেন, যা লেখকের প্রাতিস্বিকতারই পরিচয়বাহী। সৃষ্টিশীল জীবনের শুরু থেকেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য। প্রথম পর্যায়ে সচেতনভাবে নয়, অনেকটা অসচেতন অথচ লেখকের সংবেদনশীল অনুভূতি দিয়ে তিনি নারীর জীবনকে রূপায়িত করেছেন। আর এখন তিনি নারীবাদ সম্পর্কে সচেতন হয়েই গল্প লিখছেন। তবে নারী-জীবনের বিচিত্র অভিধানকে গল্পে রূপায়ণের নেপথ্যে প্রকারান্তরে তাঁর গভীর জীবনভাবনা ও সমাজসচেতন মানস-প্রবণতারই পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত উল্লেখযোগ্য :

> আমি নিজেকে সে রকম বড় মাপের নারীবাদী মনে করি না। নারীবাদী ভাবনাকে প্রকাশ করার তাগাদা থেকে কখনো লিখিওনি। যদিও নারীরা পুরুষতন্ত্রের শিকার, তারপরও বলবো– জনজীবনের দিকে যখন তাকাই দেখতে পাই শ্রেণি দুটি এমনভাবে বিভক্ত যে সাধারণ মানুষের জীবন কথা তুলে ধরার জন্য নারী-পুরুষকে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।[১২]

নারীও মানুষ, পুরুষও মানুষ। কিন্তু নারীর মানবাধিকার যদি বিপর্যস্ত হয় তথাকথিত সামাজিক অনুশাসন বা সামাজিকীরণের অজুহাতে; তবে সমাজব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে বাধ্য। সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ সন্ধানে তাই সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীর প্রকৃত সামাজিক অবস্থান, নারীর মানবিক মূল্যায়ন, নারী-পুরুষের অসম সম্পর্ক, সম্পর্কের জটিলতা তথা নারীর প্রকৃত সত্তার স্বরূপ উন্মোচন অত্যন্ত সময় উপযোগী একটি অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার প্রকৃত চিত্রটি অনুধাবন করা সহসসাধ্য হয়ে ওঠে সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের নানামাত্রিক বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। ছোটগল্পের বিচিত্র ক্যানভাসে নারী-জীবনের বহুমুখী অনুষঙ্গের চিত্রায়ণ ঘটাতে গিয়ে সেলিনা হোসেন আপন অভিজ্ঞতার কাছে দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট ছিলেন এবং সুনির্দিষ্ট কোনো ফর্মের ধারণা-প্রসূত হয়ে লেখনী ধারণ করেন নি। তাঁর মতে, ফর্মের সীমাবদ্ধতায় লেখা উচিত নয়; বরং লিখতে গিয়ে যদি একটা ফর্ম পাওয়া যায় তবে সে পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রথমে বিষয়, সংস্কৃতি, তারপর ফর্মের গুরুত্ব। তিনি মনে করেন : 'মহৎ শিল্পের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে তত্ত্বের ধারণাগুলো। এবং যতগুলো তত্ত্ব হয়েছে কেউ তত্ত্ব ধরে সাহিত্য রচনা করেন নি। বরং মহৎ শিল্পের ভেতর থেকে সমালোচকেরা অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে দেখাতে পারেন।'[১৩] সমাজসচেতনতা সেলিনা হোসেনের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয়বাহী। তাঁর মতে, প্রত্যেক লেখকেরই রাজনৈতিক চেতনা থাকা উচিত। রাজনৈতিক দর্শন ছাড়া কখনো সোশ্যাল কমিটমেন্টের দিকে

যাওয়া সম্ভব নয়। সেটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সৌখিন মজদুরি হবে। রাজনীতিটাকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নভাবে আনতে হবে ও তাকে সময় উপযোগী করে তুলতে হবে। রাজনীতির এই মাত্রা অর্জন না হলে শিল্প তার বাস্তব গুণ ও শৈল্পিক মর্যাদা হারাবে। প্রচলিত প্রকরণের বাইরে গিয়ে নতুন কিছুর সন্ধান থেকেই তিনি ঐতিহ্য ব্যবহার করেন; মিথকে প্রয়োগ করেন। সেই সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তাকে পিছন ফিরে দেখার প্রেরণা তাঁকে লেখায় মিথ, ইতিহাস অথবা ঐতিহ্য ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করে। তবে ইতিহাসকে তিনি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেন নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য :

> ইতিহাসের প্রয়োগকে আমি ইতিহাস অর্থে বলতে চাই না। অনেকে ইতিহাসকে ইতিহাসের মতো করে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। আমি এটা মানতে পারি না। ইতিহাসকে আমার প্রয়োজনে আমার সময়ের উপযোগী করে মডার্ন প্যারালাল করে নব-নির্মাণ করতে চাই। ইতিহাসটা আমার কাছে সেই অর্থে একটি নতুন উপাদান। একে নির্মাণের আঙ্গিকে সাজিয়ে নেই। ইতিহাস থেকে আমি উপকরণ গ্রহণ করি, কিন্তু তার পরিসমাপ্তি ঘটে সমসাময়িক পটভূমিতে। আমার লেখা তাই ঐতিহাসিক নয়, এগুলো ঐতিহ্যের নবায়নও।[১৪]

তাঁর ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসরে রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও ঐতিহ্যপ্রীতি সময় ও সমাজবাস্তবতার প্রাসঙ্গিকতায় শিল্পিত হয়েছে। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের নানামাত্রিক চালচিত্র হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের নারী-জীবনের বাস্তবধর্মী জীবন-অভিধা। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প তাই হয়ে উঠেছে নারীর জীবনবোধ, দর্শনচিন্তা, বেঁচে থাকার পরিসর, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি। গল্পে প্রতিবিম্বিত চরিত্রগুলো হয়ে ওঠে মানুষের বন্ধু, আমাদের চারপাশের চেনাজানা একান্ত আপনজন। গল্পে বিধৃত নারী-জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নিজের ছায়া খুঁজে ফেরে হাজার রকম মানুষ। এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত স্মরণযোগ্য : 'লেখক যদি নিজের ছায়ার মধ্যে হাজার ছায়া ফেলতে পারেন তবে তার একটি মানবিক অবয়ব ফুটে ওঠে। যে কেউ ভাবতে পারেন অমন গল্পের অমুক চরিত্রটির মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পাই। তাহলে সাহিত্যের পরিসর বাড়ে।'[১৫] সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবন এভাবেই মানবিক বোধের জায়গা ছুঁয়ে যায়। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন কখনো কখনো পাঠককে এই ভাবনায় তাড়িত করে যে, এই নারী আমাদের সমাজবাস্তবতায় স্বাভাবিক কোনো নারীচরিত্র কী-না; কখনো কখনো এটাও মনে হতে পারে, তাঁর গল্পে রূপায়িত নারী যে এভাবে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের সমাজ সেইভাবে গঠিত কী-না। কোনো সন্দেহ নেই, সেলিনা হোসেন তাঁর গল্পের নারীকে প্রজ্ঞা আর সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তার গল্পের নারী তাই অধিবাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। তারা 'পুরুষতন্ত্রকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে, আত্মমুক্তির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়।'[১৬] মানুষের অন্তর্জগৎ খুঁজে ফেরে লেখক, তার সঙ্গে মূল বাস্তব চরিত্রের মিল না

থাকলেও কিছু এসে যায় না। বাস্তব এবং কল্পনা দিয়েই তৈরি হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত নারী-চরিত্রের অবয়ব। এ প্রসঙ্গে লেখকের মতামত প্রণিধানযোগ্য :

> এখনও আমি ভাবি যে এই আচরণ তো সামাজিক বাস্তবতা নয়। তবে আমি কেন করলাম? সিদ্ধান্তে এভাবে পৌঁছাই যে একদিন নারী-পুরুষের সম্পর্ক এভাবে সমান হবে। আমি তো এমন স্বপ্ন দেখতেই পারি। মানুষের জীবনের ভালোবাসার পরিমাপ থাকবে না। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সাহিত্যের বাইরে এনে এক সমান্তরালে স্থাপন করলে একদিন সাহিত্যের গল্প জীবনের গল্প হবে।[১৭]

নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়কে নিয়ে সমাজ গঠিত। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়-বিচার, সামাজিক সাম্য– এ সবের মূলে নারী-পুরুষ উভয়েই। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুষম সমাজ গঠন এবং সমাজের নারীপুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব। একথা অনস্বীকার্য যে : 'নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি।'[১৮] নরগোষ্ঠী, বর্ণ ও শ্রেণি-বৈষম্যের পাশাপাশি নারী-পুরুষ বৈষম্য সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা যা সমাজের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিবন্ধক। তাই নারী-পুরুষের সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সুষম ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্যে প্রয়োজন সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান ও নরীর প্রতি সামাজিক-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণের স্বরূপ-সন্ধান। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে নারী-জীবনের সমাজবাস্তবতা ও প্রকৃত সত্তার স্বরূপ-সন্ধানের শৈল্পিক প্রচেষ্টা তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সমাজসত্যের সামাজিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর MímgM[১৯]-এর অন্তর্ভুক্ত মোট আটটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আটটি গল্পগ্রন্থে সব মিলিয়ে ছিয়াশিটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের সাহিত্য-সাধনার অনবদ্য দলিল এই গল্পগুলো। গল্পগুলো লেখকের সমৃদ্ধ-অভিজ্ঞতা, প্রখর মেধা ও সমাজবাস্তবতার বহুমাত্রিক অনুষঙ্গের সার্থক চিত্রায়ণ। বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ-সন্ধান করা হয়েছে। অতএব, সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে নারী-জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর যে-সব ছোটগল্পে নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের প্রতিফলন ঘটেছে, কেবল সে-সব ছোটগল্পই এখানে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Z_¨wb‡'k

১. মাসুদুজ্জামান, 'নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন', nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ঢাকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, পৃ. ৪২৭

২. মাসুদুল হক ও খালেদ হোসাইন, †mwjbv †nv‡m‡bi mvÿvrKvi, শ্রাবণ, ঢাকা, ১৯৯৯

৩. প্রাগুক্ত

৪. মারুফ রায়হান, †jLv bq K_v, (১০ আলোচিত লেখকের সাক্ষাৎকার), সূচীপত্র প্রকাশনী, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৬৪

৫. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), ‡jL‡Ki K_v, রাইটার্স ইনক, ঢাকা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৮৭

৬. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, GB Rxe‡bi hZ gai fj¸wj, কাগজ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৯

৭. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৮. মারুফ রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৯. উদ্ধৃত, বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮৯

১০. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭

১১. প্রাগুক্ত

১২. মারুফ রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

১৩. মাসুদুল হক ও খালেদ হোসাইন, পূর্বোক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

১৬. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

১৭. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

১৮. মাহমুদা ইসলাম, bvixev'x wPšÍv I bvix-Rxeb, জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ.৪

১৯. সেলিনা হোসেস, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২। (MímgM-এর অন্তর্ভুক্ত আটটি গল্পগ্রন্থ যথাক্রমে Drm †_‡K wbiš÷i, RjeZx †g‡Ni evZvm, †Lvj KiZvj, ciRb¥, gvbwlU, gwZRv‡bi †g‡qiv, Abþv cwYgv এবং GKv‡ji cvšÍvwo)

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡”Q‘

†mwjbv ‡nv‡m‡bi †QvUM‡í bvix-Rxeb

Drm †_‡K wbiš¿i

সেলিনা হোসেনের প্রথম গল্পগ্রন্থ Drm †_‡K wbiš¿i[1]। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোট তেরটি গল্প। গল্পসমূহ যথাক্রমে 'গৈরিক বাসনা', 'বৈশাখী গান', 'রতিবিলাস', 'শেওলা সবুজ রক্ত', 'মাস্টার', 'ইচ্ছার বাগান কবিতা– আমার ভালোবাসা', 'কান্নার তৃতীয় দিন', 'গোলাপ ফোটা সকাল', 'খেয়াঘাট', 'দীপান্বিতা', 'বিষণ্ন অন্ধকার', 'কাক জ্যোৎস্না' ও 'উৎস থেকে নিরন্তর'। গল্পগুলো প্রথম দিকের রচনা বলে তাতে লেখকের পরিণত ভাবনার গভীরতা ও সৃজনশীলতার ঋদ্ধ শিল্পরূপের প্রকাশ দেখা যায় না। এমনকি : 'কোথাও কোথাও তাঁর আত্মপ্রক্ষেপজনিত নীতিবাদমূলক মন্তব্যের প্রকাশও ঘটেছে, যা কথাশিল্পের নৈর্ব্যক্তিক ভাবনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে।'[2] কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে সেলিনা হোসেনের সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর শিল্পচৈতন্যের কোনো বিরোধ নেই। সমাজসচেতনতা এবং বস্তুবাদী জীবন প্রত্যয়ের বাস্তবনিষ্ঠ রূপটি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। নগর আর গ্রাম– উভয় পটভূমিতেই ছোটগল্পের শিল্পিত পরিসরে চেতনার গভীরে মমতায় লালিত জীবন ও প্রকৃতিকে বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার মেলবন্ধনে রূপায়িত করেছেন সেলিনা হোসেন। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে যেমন সমাজের নিম্নবিত্ত খেটে-খাওয়া মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চনা-হতাশা, দুঃখ-দারিদ্র্য, সংগ্রাম ও ক্ষোভের চালচিত্র তথা যাপিত জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বাস্তব চিত্রায়ণ ঘটেছে তেমনি সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের জটিলতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি – সেইসূত্রে সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানের স্বরূপটিও অপ্রকাশ্য থাকেনি।

প্রথম গল্প 'গৈরিক বাসনা'। সাবানি ও তার গনুভাইয়ের হৃদয়দৌর্বল্যের বিষয়কে কেন্দ্র করে গল্পের প্লট পরিকল্পিত হয়েছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ভালোবাসার সুতীব্র বাসনাকে কেমনভাবে পর্যদুস্ত করে জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহকে রুদ্ধ করে মানবিক বোধের অপমৃত্যু ঘটায়– সে বিষয়টিও গল্পে সুস্পষ্ট। তবে গল্পের বিষয়টি জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য বহন করে না। বিষয়টি গতানুগতিক এবং পরিবেশনায় রোমান্টিক ভাবালুতা ও সাধারণ জীবনের প্রতি সেলিনা হোসেনের গভীর মমত্ববোধের পরিচয়বাহী। গনুভাইয়ের প্রতি সাবানির অপরিসীম ভালোবাসা গল্পে স্বাভাবিক পরিণতি পায় না। সমাজবাস্তবতার কঠিন-কঠোর দারিদ্র্য উভয়ের মিলনের পথে অন্তরায়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর মহামারীতে গ্রামের এক চতুর্থাংশ লোক মারা গেলো। কিন্তু গনু আর সাবানি বাঁচতে চায়– তারা পরস্পরকে আরো নিবিড় করে পাওয়ার, আরো

গভীরভাবে ভালোবাসার সুযোগ চায়। তাই সাবানি চাল কুড়াতে যায়। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে গনু পাহারাদারের মাথা ফাটিয়ে তালুকদার বাড়ি থেকে বেশ বড়ো এক বস্তা চাল চুরি করে আনে। যদিও গনু ভালো করেই জানে যে এ অপকর্মের জন্য হয়তো তার জেল হবে। কিন্তু যে চালগুলো এনেছে সেগুলো সাবানিকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখবে। যদিও গনু এমনটা চায়নি, কেননা : 'গনু বিদ্যুৎ চমকিত অন্ধকার রাত্রির আড়ালে চাড়াবাড়ির পথের উপর দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলো এমনভাবে বাঁচতে ওরা দুজনে কেউ চায়নি।' ('গৈরিক বাসনা', Drm †_‡K wbiŠÍi, MímgM : ১৮) সমাজের বিদ্যমান শ্রেণি-শোষণের নির্মমতা ও অভাবের তাড়নায় এভাবেই মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে। তবে আলোচ্য গল্পে সাবানির মা যেন সমাজের অজ্ঞতা, অসহায়ত্ব এবং নির্বিবাদে সবকিছু মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতার প্রতীক। নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিরোধের শক্তিটুকুও সমাজবাস্তবতার নির্মম ছোবলে বিলুপ্ত প্রায়। নিজের অধিকারবোধের কোনোপ্রকারের তাড়না অনুভব করে না নিষ্পেষিত অসহায় মানুষগুলো। একরকম ভারবাহী পশুর মতোই তাদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে সমাজে নারীর অবস্থান আরো করুণ। তার চারপাশের পৃথিবীর পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ। আলোচ্য গল্পে সাবানির ভাবনায় তার মায়ের জীবনচিত্রের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তাতে প্রকারান্তরে সমাজের অগণিত নিম্নবিত্ত অসহায় নারী-জীবনের বঞ্চনা ও অবহেলার বাস্তবনিষ্ঠ চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়েছে এভাবে :

> মা তো হাসি কাকে বলে জানেই না। সারাদিন চুপচাপ কাজ করে আর কিছু ব্যতিক্রম হলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। মার জন্য ভয়ানক কষ্ট হয় সাবানির। মা বছরের সাত-আট দিন আঁতুরঘর করে আর অন্য সমস্ত দিনগুলো রান্নাঘরের চার দেয়ালের মধ্যে একরাশ হাঁড়িকুড়ির মাঝে কাটিয়ে দেয়। আচ্ছা এর বাইরে কি মার কোনো শখ নেই? সাবানির মনে হয় শখ অনেক আছে। কিন্তু এর কোনো বিকাশ নেই, বিবর্তন নেই। তা নিরন্তর বুকের গহীনে অদৃশ্যভাবে জন্ম নিচ্ছে আর হতাশার এক একটা প্রবল চাপে ক্রমাগত পিষ্ট হচ্ছে। ('গৈরিক বাসনা', Drm †_‡K wbiŠÍi, MímgM : ১৪)

পরবর্তী গল্প 'বৈশাখী গান' অনেক পরিণত রচনা। 'একটা আঞ্চলিক জীবনের নিঃসঙ্গতাকে এক অন্তর্প্লাবী জ্বালা-যন্ত্রণায় সিক্ত করে লেখিকা এক সমাজবিরোধী অথচ এক বৈপ্লবিক রূপ দিয়েছেন এই গল্পে।'[৩] গ্রামের এক কুলবধূ ইকতি। তার স্বামী সীমান রাজশাহীতে চাকরি করে। ঈদের সময় দিন কয়েকের ছুটিতে সে দেশের বাড়িতে আসে। সামান্য এই কয়েকদিনের স্বামীসঙ্গ ইকতিকে তৃপ্ত করতে পারে না। সে চায় সীমানের সঙ্গে বসবাস করতে। তাকে একান্তভাবে পেতে চায় সে। কিন্তু সামান্য চাকুরে সীমানের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সীমান ইকতিকে বুঝ দেয় আগামীবার বাসা করে এসে তাকে সে নিয়ে যাবে। কিন্তু কার্যত সে তা পারে না। ইকতির পুরুষসঙ্গহীন অভূক্ত মন স্বামীর অনুপস্থিতিতে আকর্ষণ খুঁজে পায় গ্রামের তাগড়া জোয়ান ছেলে সাজনের অদ্ভুত শিষ বাজানোর ভঙ্গিতে। পুকুরের ঘাটে, পেয়ারা তলায় কিংবা নির্জন সুপারী গাছের সারির আড়ালে সাজনের সংস্পর্শে ইকতি জীবনের নতুন এক অর্থ খুঁজে পায়। সাজনের সঙ্গে সম্পর্কের

পরিণতিতে ইকতি একসময় সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। স্বভাবতই এ রকম একটা গুরুতর সংবাদ বেশিদিন চাপা থাকে না। সমাজ পুরুষের বহুগামিতাকে স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করলেও নারীর এহেন আচরণ রীতিমতো গর্হিত এবং অন্যায় বলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সমাজের দৃষ্টিতে ইকতি তাই জঘন্য অপরাধী। তার পাপের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। সমাজই নারীর এহেন পাপকর্মের বিচারপ্রক্রিয়ার যথাযথ আয়োজন করে রেখেছে। জৈবিক প্রক্রিয়া একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক মানবিক আচরণ হলেও নারীর জন্য ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ। কেননা :

> নারীর ব্যক্তিক আচরণ কার সঙ্গে কেমন হবে, সমাজই নির্ধারণ করে দেয়। পুরুষের জীবনও একইভাবে সমাজকর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, নারী ও পুরুষকে পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, অনুশাসন একদৃষ্টিতে দেখে না। নারীর জীবন পুরুষের তুলনায় তাই অধস্তন। ... বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষের যে অধিকার ও অভিগম্যতা আছে, নারীর সেসব নেই।[৪]

তাই সমাজ ইকতির বিচার করতে যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। গ্রামে ইকতির বিচার সভার দৃশ্যপটটি একদিকে সমাজ ব্যবস্থার অসাড় চিত্রটিকে উন্মোচিত করে নারীর প্রতি পুরুষশাষিত সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে যেমন প্রতিভাত করে তেমনি ইকতির চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে নারীর আত্মমুক্তির, আত্মজাগরণের অভীপ্সাটিকেও সুস্পষ্ট করে তোলে :

> ইমাম সাহেব একটা রোষদৃষ্টি হেনে শুরু করলেন, 'এই মাগীরে আজ কওন লাইগবো হিগার হোলার বাপ কে? গাঁয়ের মধ্যে এরুম শয়তান আমরা রাখতে পারিনা। সারা-গাঁ অপবিত্র হইবো।'
>
> ইমাম সাহেব ইকতির দিকে গর্জন করলেন, 'এ্যাই মাগী তোর হোলার বাপ কে? হেরপর আমরা ইগারেই মাথায় চুনকালি দি বার করি দিয়ুম।'... ইকতি ঝট করে উঠে দাঁড়ালো, 'তার আগে কন আপনের বাপ কে?
>
> আপনে যে কাজেম মিয়ার হোলা হেইডা আপনে কেমনে জাইনলেন? কাজেম মিয়ায়ে যে আপনের বাপ তার হরমান কি?' ... সাজন বিস্মিত। ইমাম সাহেব অপমানিত। এতগুলো লোকের সামনে তার বাপ নিয়ে সংশয়? ... 'এই মাগী হুন, তুই যে হাপ কইচ্ছত ... ইমাম সাহেবকে থামিয়ে দিলো ইকতি। 'না, আঁই কোনো হাপ করি ন। আঁই যদি হাপ করি থাই তাইলে ঘরে ঘরে ব্যাকেই হাপ করে। আপনেও কম করেন না'। ('বৈশাখী গান', Drm †_‡K wbiš¿i, MímgM : ২৩)

ইকতিকে সমর্থন করে তার স্বামী সীমান। কেননা সীমানের ভাবনায় সেলিনা হোসেন যেন নিজের ভাবনাকেই জারিত করে দিলেন এভাবে : 'হের হ্যাডে যার হোলাই থাক, হে মাইনষের হোলা। পশুর হোলা ন! ... সমস্ত সভা জুড়ে একটা কথাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো, ও মানুষের সন্তান– ও মানুষের সন্তান– ও মানুষের সন্তান।' ('বৈশাখী গান', Drm †_‡K wbiš¿i, MímgM : ২৪) ইকতি নিজের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে যেন প্রকারান্তরে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার মিথ্যে অহমিকার মূলে, স্বার্থপরতার হীন মানসিকতার মর্মমূলে আঘাত হানতে উদ্যত হয়ে উঠলো। কেননা : 'সে কি অন্যায় করেছে? পেটের মধ্যে একটা সজীব নিষ্কলঙ্ক প্রাণের অস্তিত্ব যদি এতোই অবাঞ্ছিত হয়, তবে মানুষের জন্মের মধ্যে

কোথাও সত্য আছে বলে মনে হয় না। প্রতিটি মানুষের জন্মই পাপে ভরা। ... দেহের দাবি মেটানোটা যদি পাপ হয় তবে তো এ পৃথিবীর একটি লোকেরও পুণ্য সঞ্চয় হয়নি।' ('বৈশাখী গান', Drm †_‡K wbiŠÍi, MímgM : ২২) ইকতির কাছে মানবিক সম্পর্কটাই প্রধান। এ অনুভবই ইকতিকে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজনীতির অসাড় অবস্থানের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় ইকতি সাধারণ নারীজীবনের যথাযথ বা স্বাভাবিক কোনো নারী নয়। কেননা :

> আমদের সমাজব্যবস্থা এখনো পশ্চিমা সভ্যতার আদলে গড়ে ওঠেনি। সুতরাং এরূপ ঘটনাকে মেনে নিতে এই সমাজ যদি প্রত্যাখ্যান করে তবে তাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করা যায়। তাছাড়া সীমান যত সহজ নিজের স্ত্রীর পরপুরুষচর্চা ও অবৈধ সন্তান ধারণকে মেনে নিয়েছে, বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনে এখানো তা প্রত্যাশা করা যায় না।[৫]

কিন্তু লক্ষণীয় যে, সেলিনা হোসেন তার গল্পের নারীকে প্রজ্ঞা আর সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। একই কাজের পরিণতি সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান হবে, কোনো কাজ পুরুষের জন্য বৈধ বা স্বাভাবিক অথচ নারীর জন্য সেই কাজই অনৈতিক বলে বিবেচিত হবে; এরকম হাস্যকর, যুক্তিহীন বিষয়ের বিপক্ষে মানবতার প্রশ্নে নারী নিজেই এগিয়ে আসবে, সৃষ্টি করে নেবে তার আপন অধিকারের নিজস্ব ভুবন– এরকম আকাঙ্ক্ষাই সেলিনা হোসেন তার সৃষ্ট নারীচরিত্রের মধ্যে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই 'সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পের নারী তাই অধিবাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। তারা পুরুষতন্ত্রকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে, আত্মমুক্তির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়।[৬] আলোচ্য গল্পের ইকতি তাই হয়ে উঠেছে সেলিনা হোসেনের আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নসোপান।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের পরবর্তী গল্প 'রতিবিলাস'। মিসেস খানের দাম্পত্য-জীবন, সমাজ, সংসার, সম্পর্ক-বিষয়ক তার নিজস্ব চিন্তাচেতনা ও সামাজিক-দ্বান্দ্বিক পরিপার্শ্ব ও নিজের বোধের সঙ্গে জটিল টানাপোড়েনের বাস্তবচিত্র রূপায়িত হয়েছে এ গল্পের আধারে। এ্যাকসিডেন্টে স্বামী হাসিব খানের অকাল মৃত্যুর পরে একমাত্র কন্যা এক বৎসরের নীলাকে নিয়ে দীর্ঘ আঠার বছর ধরে মিসেস খানের একাকী পথ চলা, তার সংকট ও ভাবনার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সচিত্র প্রতিবেদন 'রতিবিলাস' গল্প। জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে পরিণত বয়সে নিজের আত্মজাকে তার ভালোবাসার মানুষ রাতুলের সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে দেখে মিসেস খানের উপলব্ধিতে নিজ জীবনের অতলান্ত শূন্যতা ও অতৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের হাহাকার অনুভূত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরে পরিচিত অনেকে পুনরায় তাকে সংসারধর্ম পালনের কথা বললেও মিসেস খান কোনোভাবেই তা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। কেননা :

> হাসিব খানের স্মৃতিকে বুকে পুষে আরেকজনের ঘর করা তার পক্ষে অসম্ভব। ... যে হাসিব খানকে তিনি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন– তিনি দৈহিক কামনার ঊর্ধে ভালোবাসেন বলে অহরহ প্রচার করে বেড়াতেন– যে হাসিব খান তার সমস্ত মন

> জুড়ে, তাকে তিনি কখনো সরাতে পারবেন না। হাসিব খানের মৃত আত্মা বিজয়ী হলো– হেরে গেলো মিসেস খানের সমস্ত দৈহিক অনুভূতির উদগ্র প্রকাশ। সবকিছুকে তিনি চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন করলেন– জোর করে দিলেন ঘুম পাড়িয়ে। ('রতিবিলাস', Drm †_‡K wbiŠÍi, MímgM : ২৪)

মিসেস খানের এ মানসিকতা মূলত সমাজ-প্রসূত। তথাকথিত সামাজিকীকরণের অজুহাতে সমাজ তথা পুরুষতন্ত্র নারীকে তার ভাবনার নিজস্ব পরিমণ্ডলে আবদ্ধ করে ফেলে। নারীর জীবন, তার ভাবনা তখন পুরুষের ভাবনার ছকেই আবর্তিত হয়। নারীর ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বোধ গড়ে ওঠে সমাজ আরোপিত ভাবনার আদলে। এর ফলশ্রুতিতে : 'প্রতিটি নারী সহজেই উপলব্ধি করে যে, বেঁচে থাকতে হলে তাকে সমাজনির্দিষ্ট 'নারীসুলভ' আচরণ করতে হবে, নতুবা নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার শিকার হতে হবে।'[৭] সমাজব্যবস্থার এহেন প্রতিকূল অবস্থায় নারী নিজেই নিজের ভাবনার-চেতনার বিপরীত স্রোতে অবস্থান নেয়, নিজ জীবনের অতৃপ্তি ও বঞ্চনাকে বরণ করে নেয় হাসিমুখে। নিজের একান্ত প্রাপ্যটুকু বুঝে নিতেও নারী কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। নিজেকে বঞ্চিত করবার হাহাকারে জীবন হয়ে পড়ে অসহ যন্ত্রণার আধার। জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ এলোমেলো হয়ে মানবিক বোধকে করে তোলে প্রশ্নবিদ্ধ। যার বহিঃপ্রকাশ আলোচ্য গল্পে মিসেস খানের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'কিন্তু তবুও খটকা থেকে যায়। মনে হয় এভাবে বাঁচা তো বাঁচা নয়। শুধু স্মৃতি ছাড়া তার জীবনের সম্বল আজ আর কিছুই নাই। মনটা কেঁদে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মৃত হাসিব খানের স্মৃতিটাই কি তার সারা জীবনের সঞ্চয়? আর কি পেয়েছেন তিনি? আর কি– আর কি– আর কি?' ('রতিবিলাস', Drm †_‡K wbiŠÍi, MímgM : ২৬) সমাজবাস্তবতার সংকীর্ণ মানসিকতার প্রভাবে নারীর অন্তরের সৌন্দর্যের চেয়েও বাহ্যিক সৌন্দর্য কীভাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে প্রকারান্তরে মানবিক মূল্যবোধকে উপহাস করে– তারই শিল্পরূপ আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'শেওলা সবুজ রক্ত' গল্প। পিতৃ-পরিচয়হীন দরিদ্র, অসহায় অথচ রূপবতী উনিশ বছরের এক তরুণী কুলসুম। সে জানে যত রূপবতীই সে হোক না কেন জীবনে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখার কোনো অধিকার তার নেই। অন্যের স্বপ্নপূরণের মাধ্যম হিসেবেই সে ব্যবহৃত হয়। কেননা :

> এই নিয়ে ওকে দেখিয়ে পাঁচটা বিয়ে হয়ে গেলো। অথচ ওর জীবনে শরতের মিঠে রোদ লুকোচুরি খেললো না। ... গ্রামের টাকাওয়ালা লোকগুলো টাকার জোরে ওকে দেখিয়ে তাদের কুৎসিত মেয়েগুলোর বিয়ে দিচ্ছে। ... মা ওকে বিয়ে দিতে পারবে না, তা ও জানে। তাই সাজার আদিম উল্লাসে ভুলে যেতো নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথা। স্বপ্নে রাজকন্যার মতো হওয়া– এটাই ছিলো তার জীবনের বড়ো বিলাস। এর বাইরে কুলসুম কিছু পায়নি। ('শেওলা সবুজ রক্ত', Drm †_‡K wbiŠÍi, MímgM : ২৭-২৮)

গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই সত্যটি প্রতিভাত হয় যে কেবলমাত্র বাহ্যিক সৌন্দর্য সমাজে নারীর সকল গুণাগুণের ঊর্ধ্বে বিবেচিত হয়ে নারীকে মানুষের যথাযথ অবস্থান থেকে নামিয়ে আনে। গ্রামের কালো,

দেখতে ভালো নয় এমন মেয়েদের বিয়ে নামক বৈতরণী অতিক্রমের মাধ্যম হয়ে ওঠে কুলসুম তথা তার বাহ্যিক সৌন্দর্য। আবার কেবল পিতৃ-পরিচয় পাওয়া যায় না বলে রূপ-যৌবন থাকা স্বত্ত্বেও কুলসুমের জীবনের সকল স্বপ্নের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মূলত সমাজ নিজ স্বার্থেই নারীর সৌন্দর্যের মানদণ্ড নির্ধারণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। মানবিক অবস্থান থেকে এভাবেই নারী বিচ্যুত হয়ে সমাজে হয়ে পড়ে অপাঙ্‌ক্তেয়। নারীর হৃদয়ের গুহায়িত সৌন্দর্যের সন্ধান কেউ করেনা। এভাবেই : 'কেউ বুঝতে পারছে না, কেউ জানতে পারছে না কুলসুমের হৃদয়ের কোন গোপন কোণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। এ রক্তের রঙ লাল নয়– এ রক্ত সবুজ। এ রক্তের উৎস দেহ নয়– এ রক্তের উৎস মন।' ('শেওলা সবুজ রক্ত', Drm †_‡K wbiš[ii, MímgM : ২৯) পরবর্তী গল্প 'মাস্টার' তেমন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচিত নয়। বিষয়টি গতানুগতিক। গৃহশিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যকার ভালোলাগা-ভালোবাসা-পরিণয়– এরকমই একটি আবহ গল্পজুড়ে বিস্তৃত হয়েছে। সুহানীর কাছে হাশেম ভাইয়ের মতো মাস্টার আর হয় না। মাস্টার হাশেম ভাইয়ের কথার ফুলঝুরি মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট করে রাখতো সুহানীকে। বলা যায় হাশেমের জাদুকরী কথার আবেশেই সুহানী ও তার মাস্টারের পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু ভালোবাসা আর সংসার এক নয়। বাসরঘরেই সুহানীর মোহভঙ্গ হয়। যে হাশেম ভাইয়ের কথা তাকে মুগ্ধ করেছিলো, সে কথাই সুহানীর কাছে এখন অবোধ্য। কেননা হাশেম ভাই যে কেবল তার নিজের কথা বলতে ও শোনাতেই ব্যস্ত, সুহানীরও যে কিছু বলবার আছে– তা যেন হাশেম ভাইয়ের আমলেই নেই। সুহানী উপলব্ধি করে যে : 'এতগুলো বছর ও শুধু হাশেম ভাইয়ের কথাই শুনে এসেছে। হাশেম ভাই ওর একটি কথাও শোনেনি। কোনোদিন শুনতে চায়নি। কেবল নিজের কথা বলেছে। সুহানীর নিজেকে বড্ড ফাঁকা মনে হলো।' ('মাস্টার', Drm †_‡K wbiš[ii, MímgM : ৩১) এভাবেই সুহানী হয়ে উঠলো সমাজের অগণিত উপেক্ষিত নারীর প্রতিচ্ছবি। হাশেম ভাইয়ের মতোই সমাজ নারীর কোনো কথা শুনতে চায় না, কেবল তার নিজস্ব বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয় নারীর উপর। আজো আমাদের সমাজবাস্তবতায় সংসারে নারীর নিজের মতো করে বলবার কিছুই থাকে না। নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কের বেড়াজালে গড়ে ওঠা সংসারে নারীর সকল স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটে, মানবতা হয় ভূলুণ্ঠিত। সংসার প্রকারান্তরে পরিণত হয় প্রহসনের রঙ্গমঞ্চে। আলোচ্য গল্পে সুহানীর ভাবনায় জারিত হয় অগণিত নারীর ব্যর্থ জীবনের হাহাকার : 'হাশেম ভাই ওর স্বামী হতে পারলো না। ... বাসরঘরের সব আলো, রঙ আর গন্ধটুকু কোথাও খুঁজে পেলো না। খাটের উপর ঘুমন্ত মানুষটির মাঝে প্রিয়তমকে দেখতে পেলো না। মনে হলো বাসর ঘরটি শুধুই পড়ার ঘর– আর হাশেম ভাই শুধু তার মাস্টার। আর কেউ না, আর কেউ না, আর কেউ না।' ('মাস্টার', Drm †_‡K wbiš[ii, MímgM : ৩১) আলোচ্য গ্রন্থের 'ইচ্ছার বাগান কবিতা– আমার ভালোবাসা' গল্প নারীজীবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচিত। আমাদের সমাজবাস্তবতায় বিবাহিত জীবনে স্ত্রী সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে স্বামীর পুনরায় বিয়ে করার বিষয়টি অত্যন্ত স্বাভাবিক চিত্র হলেও এক্ষেত্রে একই পরিস্থিতিতে নারীর জন্য

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া ততটাই প্রশ্নবিদ্ধ। সন্তান বিবাহিত নারী-পুরুষ– উভয়েরই কাম্য হলেও এক্ষেত্রে সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের যতোটা স্বাধীনতা নারীর ক্ষেত্রে ততটাই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কেননা : 'যদিও প্রজননে নারীর মুখ্য ভূমিকা; কিন্তু প্রজনন সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পুরুষের। যৌন জীবনে নারী পুরুষের ইচ্ছা ও চাহিদা দ্বারা পরিচালিত হয়; পুরুষের পরদার গমন ক্ষমার চোখে দেখা হয়; কিন্তু নারীর 'পদস্খলন' গুরুতর শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়।'[৮] নিজের একান্ত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নকল্পে নারীর নিজস্ব মতামত সামাজিকীকরণের মানদণ্ডে নিরূপিত হয়। সমাজ আরোপিত শৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্নকারী সমাজের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয়– এরকমই একটি ভাবকল্প নিয়ে আলোচ্য গল্পের আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে। পুতুল খেলতে খেলতেই কবিতার মধ্যে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে যা তার বিয়ের পরে আরো তীব্ররূপ লাভ করে। অথচ স্বামী সাইফের বাবা হবার শক্তি নেই। কেবল তাই নয়, নিজের অক্ষমতার বিষয়টিও সাইফ আগে থেকেই জানতো। তাইতো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ থেকে বরাবর সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। কবিতা তার প্রতি এ প্রবঞ্চনাকে মেনে নিতে চাইলো না; বরং নিজের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে সে স্বামী সাইফের বন্ধু তুরীনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। প্রচলিত সমাজবাস্তবতার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে কবিতা নিজ জীবনের স্বপ্নপূরণের পথে নিজেই এগিয়ে গেলো। কবিতার এহেন পদক্ষেপ সমাজের দৃষ্টিতে অনভিপ্রেত, বেমানান। কেননা : 'সমাজ নারীর জীবনকে এমন একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে দেয় যে নারী সেই বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে।'[৯] কেবল তাই নয়, সামাজিকীকরণের অজুহাতে পুরুষতন্ত্র কেড়ে নেয় নারীর স্বাধীন সত্তার চেতনাবোধ। নারীর কল্পনার জগতও এর ফলে হয়ে পড়ে সীমাবদ্ধ। প্রকৃত বাস্তবতা হলো : 'এখনও একজন নারী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারেন না প্রথাগত ধ্যানধারণার এই সমাজ বাস্তবতায়।'[১০] এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গল্পের কবিতা চরিত্রটি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নিজের কৃতকর্মের জন্য কবিতার কোনো অনুশোচনা বা আক্ষেপ নেই; বরং আত্মমুক্তির দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে তার উচ্চারণ : 'আমার ইচ্ছার জন্ম দিতে আমি যদি পথ খুঁজে পাই, তবে কি তা গ্রহণ করা আমার অন্যায়? ... বুকের ভেতর ইচ্ছার আগুন পুষে রেখে সারাটা জীবন কেঁদে মরতে পারবো না।' ('ইচ্ছার বাগান কবিতা– আমার ভালোবাসা', Drm †_‡K wbiŠÎi, MímgM : ৩৫) এভাবেই আলোচ্য গল্পে কবিতার দৃঢ়তা ও ইচ্ছাপূরণের সংকল্পের অবয়বে সেলিনা হোসেন নারী ভাবনার প্রচলিত ছকটিকে ভেঙে দিয়েছেন। কবিতার মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর অভীপ্সাটি শিল্পিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী গল্প 'কান্নার তৃতীয় দিন' নারীজীবনের বঞ্চনা-অবহেলা-উপেক্ষার শিল্পভাষ্য। বাইশ বছরের দাম্পত্য জীবনের আসাড়তা, অর্থহীনতা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও ব্যর্থতার হাহাকারে পরিপূর্ণ পঁয়ত্রিশ বছরের জমিলা খাতুনের রিক্ত-নিঃস্ব জীবনের আখ্যান নিয়ে গল্পটি নির্মিত। যৌথজীবনে নারী-পুরুষ উভয়ের অসম সম্পর্ক কীভাবে নারীজীবনে অতলান্ত শূন্যতার জন্ম দেয়– তারই চিত্রায়ণ 'কান্নার তৃতীয় দিন' গল্প। হামিদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

এবং জমিলা খাতুনের দাম্পত্যজীবনে একচেটিয়া প্রভাব ছিলো হামিদ আলীর। কোনো বিষয়ে জমিলা খাতুনের মতামতের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি; এমনকি যৌনজীবনেও তার একান্ত চাহিদার মূল্যায়ন হয়নি। জমিলা খাতুনের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা আর উপেক্ষার চিত্রটি গল্পে রূপায়িত হয়েছে এভাবে : 'অনেক রঙিন কল্পনা করতে গিয়ে শিহরণ জাগতো জমিলা খাতুনের দেহে। ভাবতো কোনো অবসর ক্ষণে স্বামী তার ঘোমটা নিজের হাতে তুলে আনবে কিংবা একটা গোলাপ কুঁড়ি খোঁপায় গুঁজে দিয়ে বুকের কাছে টেনে নেবে। কিন্তু হঠাৎ করেও তা কোনোদিন হয়নি। কাছে অবশ্য টেনেছিলো হামিদ আলী শুধুই তার প্রয়োজনে।' ('কান্নার তৃতীয় দিন', Drm †_‡K ‡biš͍i, MímgM : ৩৭) দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে এহেন একচেটিয়া পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবপ্রসূত নারী-উপেক্ষার চিত্রটি আমাদের সমাজবাস্তবতায় বিরল কোনো ঘটনা নয়, বরং এটিই প্রকৃত চিত্র। তাইতো হামিদ আলীর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হতে দেখা যায় না জমিলা খাতুনকে। কেননা জমিলা খাতুনের জীবনে তো হামিদ আলী একরকম অনুভূতিহীন, অস্তিত্বহীন প্রায়। নিঃসঙ্গ জীবনের অতলান্ত ব্যর্থতার হাহাকারে তাই : 'আজ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও নিজের অতৃপ্ত কামনাগুলো ভয়ানক বিব্রত করে তোলে জমিলা খাতুনকে।' ('কান্নার তৃতীয় দিন', Drm †_‡K ‡biš͍i, MímgM : ৩৭) কেবল জমিলা খাতুনই নয়; এহেন অনুভূতিতে বিব্রতবোধ করে অগণিত বঞ্চিত নারী— নিজের একান্ত কামনা-বাসনাগুলোকে নিজের ভেতরে অবদমিত করে রাখতে বাধ্য হয়েছে যারা। কেননা তথাকথিত পুরুষতন্ত্র নারীকে এভাবেই পুরুষের ভাবনার ছকে আবদ্ধ করে ফেলে তার স্বকীয়তাকে অবমূল্যায়ন করে চলেছে। এখনও আমাদের সমাজবাস্তবতায় : 'একজন মধ্য তিরিশের যুবক বিপত্নীক হলে তার পক্ষে সহজেই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা সম্ভব। অথচ একই বয়সের একজন নারী স্বামী প্রয়াত হলে তার পক্ষে পুনরায় সংসারী হওয়া প্রায় অসম্ভব। নারীর এমন ট্র্যাজেডির সঙ্গে কোনো পুরুষই পরিচিত হবে না।'[১১] পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসন এভাবেই নারীর মানবিক আবেদনকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেছে অবলীলায়। স্বাভাবিকভাবেই তাই জমিলা খাতুনদের অন্যের সুখী-হাস্যোজ্জ্বল দাম্পত্যজীবনের চিত্র অবলোকন করে আত্মদহনে জর্জরিত হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। জমিলা খাতুনের নিঃসঙ্গ জীবনের হাহাকারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীজীবনের বঞ্চনার এক বিশেষ রূপের পরিচয় প্রতিবিম্বিত হয়েছে শৈল্পিক দক্ষতায়।

'গোলাপ ফোটা সকাল' গল্পের বিষয় নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও মানবিক সৌন্দর্যের টানাপোড়েন। দৈহিক সৌন্দর্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও আমাদের সমাজবাস্তবতা নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। আলোচ্য গল্পে লেসিনা দেখতে বিশ্রী, কদাকার। তার বাবা মি. আহমেদ নিজেও ছিলেন দেখতে কালো ও কুৎসিত। মেয়ে যেন বাবার রূপের ঐতিহ্যকেই বহন করে এনেছে। কিন্তু মি. আহমেদ আর লেসিনা উভয়ের জন্য সমাজের বিদ্রূপ একরকম ছিলো না। নিজের রূপহীনতার প্রসঙ্গে মি. আহমেদের স্মৃতিচারণ এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য : 'বাবা

বলতেন, 'ভাগ্যিস এই ছেলে তোমার মেয়ে হয়নি। মেয়ে হলে ওকে বিয়ে দিতে আমাদের পথে দাঁড়াতে হতো।' মা হাসতেন। বলতেন, 'বিয়ের নাড়ু, ব্যাঁকা হবে দোষ নেই।' ('গোলাপ ফোটা সকাল', Drm †_‡K wbišÍi, MímgM : ৪০) অথচ নিজের মেয়ে লেসিনাকে যতোই মি. আহমেদ 'বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, মনের সৌন্দর্যেই মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়' বলে প্রবোধ দিন না কেন, মেয়ের কদাকার রূপ ভেতরে ভেতরে তাকেও বিব্রত না করে পারেনি। লক্ষণীয় : 'মি. আহমেদ কিছুতেই স্বস্তি পান না। মনে হয় তার যেন ভুল হয়ে গেছে। লেসিনার জন্মটা না হওয়াই ভালো ছিলো।' ('গোলাপ ফোটা সকাল', Drm †_‡K wbišÍi, MímgM : ৪১) মি. আহমেদের এই বিব্রতবোধ তথাকথিত সামাজিকীকরণ বা পুরুষতন্ত্রের ফল। কেননা :

> পুরুষের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এমন কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে যেগুলো পুরুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। পুরুষের মধ্যে পিতৃতন্ত্র আবিষ্কার করেছে দৃঢ় প্রত্যয়, আগ্রাসিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিচারবুদ্ধি বা যৌক্তিক ও স্বাধীন চেতনা। অপরদিকে সমাজ নারীর মধ্যে আবিষ্কার করেছে, অমায়িকতা, বিনয়, বিনম্রতা, সহানুভূতিশীলতা, আবেগপ্রবণতা, পরনির্ভরশীলতা ও কোমলতা।[১২]

অতএব বাহ্যিক সৌন্দর্যের পরিমাপে নারীর মূল্যায়ন আমাদের সমাজবাস্তবায় অনভিপ্রেত কোনো বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তাই লেসিনার মতো হাজারো নারী প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হয় বিরূপ-কঠোর সমাজবাস্তবতার। একইসঙ্গে সমাজে মানুষ হিসেবে নারীর অসম অবস্থানটিও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'কাকজ্যোৎস্না' গল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে সংসারের বোঝা টানতে গিয়ে আটাশ বছরের যৌবনদীপ্ত জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে নিঃস্ব-অসহায় এক তরুণীর জীবনের মর্মস্পর্শী হৃদয়বেদনাকে উপজীব্য করে। মাত্র আটাশ বছরেই 'বড়ো আপা' খ্যাত এই তরুণী পুরো পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে তার দায়িত্ববোধের কাছে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছে নিজ জীবনের সমস্ত স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার। জীবনের গুরুভার বহনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কোনো পথই তার জানা নেই। দায়িত্ববোধের যাঁতাকলে, জীবিকার প্রশ্নে সে হয়ে পড়ে স্বপ্নহীন। নিজের ভেতরে চেপে রাখা অবদমিত জীবনাকাঙ্ক্ষা ক্রমে যেন তাকে বিকারগ্রস্ত করে তোলে। অথচ এ পরিস্থিতি থেকে তার মুক্তির উপায় নেই, এমনকি মুক্তির আশা সে করেও না। সমাজে 'ভালো মেয়ে' হয়ে থাকবার প্রত্যয়ে বিসর্জন দেয় স্বপ্ন দেখার সাহস ও শক্তিকে। তাইতো নিজের ছোটভাইয়ের প্রতি তার স্পষ্ট উচ্চারণ : 'পালিয়ে যাবো? আমাকে কলঙ্ক দেবে, আমার গায়ে থুতু ছিটাবে? এখন দেখছিস না আমার কতো সম্মান। লোকে বাহবা দেয়, লক্ষ্মী মেয়ে বলে সমাদর করে!' (কাকজ্যোৎস্না', Drm †_‡K wbišÍi, MímgM : ৫৫) সমাজপ্রসূত 'ভালো মেয়ে' পরিচয়ের মোহের সীমানা অতিক্রম করে এ গল্পের বড়ো আপা তাই কোনোভাবেই নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখার ও বেঁচে থাকবার সীমাহীন আকাশ স্পর্শ করার সাহস ও শক্তি অর্জন করতে পারে না। ফলে নিজের অভাবগ্রস্ত পরিবারের দায়ভার গ্রহণের ব্যাপারটির চেয়েও আলোচ্য গল্পে বড়ো আপার তথাকথিত

সামাজিকীকরণের উপায়হীনতার করুণ দিকটি গল্পে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। একইসঙ্গে বড়ো আপার এই উপায়হীনতা হাজারো নারীর সামাজিক অনুশাসনজনিত প্রতিবন্ধকতাকেই যেন প্রকারান্তরে প্রকট করে তুলেছে।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ ও নাম-গল্প 'উৎস থেকে নিরন্তর'। স্বামীর অবর্তমানে অন্য পুরুষের দ্বারা স্ত্রীর গর্ভধারণ ও অবৈধ সন্তানের জন্মদান এবং শেষপর্যন্ত মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত স্বামীর তাকে মেনে নেয়া– এরকম একটি ভাবকল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে 'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পের আখ্যানভাগ। গল্পে ধনীলোকের এক মদখোর ছেলে তাহের জোর করে সুরত আলীর স্ত্রী ওজুফাকে যৌনসম্ভোগে বাধ্য করে। ফলে ওজুফা গর্ভবতী হয়। সুরত আলী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা জানতে পারে। কিছুকাল সে চরম মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে কাটায়। তারপর ওজুফা যখন অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দেয়, তখন মানবিক প্রেমবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরত আলী বলে : 'আমি ওরে মানুষ করবো ওজুফা। ও আমার ছেলে। তোর রক্ত আছে ওর গায়ে– ও তোর ছেলে– ও মানুষের ছেলে। আমি আর কিছু জানতে চাই না– ও আমার– ও আমার– ও আমার।' ('উৎস থেকে নিরন্তর', Drm †_‡K wbiš—i, MímgM : ৫৯) ভাবের সঙ্গে আবেগ এবং আবেগের সঙ্গে নীতিবোধকে স্বীকার করা হলেও গল্পের কোনো কোনো অংশে নারীর সামাজিক অধস্তনতার বিষয়টি, নারীর প্রতি সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পে সুরত আলীর অনুপস্থিতিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওজুফার দেহভোগ করে মালিকের বখাটে ছেলে তাহের। জেল থেকে বের হয়ে গর্ভবতী স্ত্রী ওজুফার স্ফীত উদর সুরত আলীর চিত্তে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে আগুনের উত্তাপ সর্বপ্রথম ওজুফার শরীরকেই বেছে নেয়। গল্পে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে এভাবে : 'শরীরের রক্ত চিনচিন করে উঠলো সুরত আলীর। মজুরের ঘরে মালিকের ছেলে? নিষ্ঠুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ওজুফার উপর। নির্দয়ের মতো মারলো। ... ওজুফার আর্ত চিৎকারে ভরে গেলো বস্তীর আকাশ। ... প্রতিদিন ওজুফার কান্নায় ভরে ওঠে বস্তীর আকাশ।' ('উৎস থেকে নিরন্তর', Drm †_‡K wbiš—i, MímgM : ৫৮-৫৯) এভাবে নারীই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে পুরুষের যাবতীয় পাশবিকতার, নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের মাধ্যম। কেননা : 'নারীজীবনের সংকটের উৎস হচ্ছে তার শরীর আর সামাজিক অনুশাসন বা সমাজ-নির্ধারিত জীবন।'[১৩] সমাজ এভাবেই নারীর জীবনকে সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে পুরুষের দ্বারা সামাজিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় নারী। পুরুষ এভাবেই নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। সংবেদনশীল মন দিয়ে সেলিনা হোসেন আলোচ্য গল্পগ্রন্থে নারীজীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ করেছেন অসাধারণ শিল্পকুশলতায়।

RjeZx †g‡Ni evZvm

সেলিনা হোসেনের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ RjeZx †g‡Ni evZvm[১৪]। আলোচ্য গ্রন্থে এক ধরনের হৃদয়-উত্তাপ থেকে উৎসারিত দশটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলো যথাক্রমে– 'আসিফ আহমদ, বন্ধুবরেষু', 'গোলাপকে ভালোবাসতে হলে', 'জ্যামিতিক ছকের বাইরে', 'ছায়াসূর্য', 'অজবীথি', 'মৃত্যুর জন্য উৎসব', 'মুস্তাফা মরেছে তাই', 'স্বর্ণচাঁপা', 'অনুভবে আলোয়' এবং 'বুকের ভেতর নদী'। প্রত্যেকটি গল্পই এক একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব ও বন্ধুস্থানীয় কয়েকজন সাহিত্যিকের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। চলমান জীবনের স্রোতধারায় অসংখ্য সমস্যার আবর্তের মধ্যেও হৃদয়-উৎসে ভালোবাসার মহাপ্লাবন জীবনের মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনের জয়গানে উজ্জীবিত হতে চায়। কেননা : 'মানব-হৃদয় ব্যবহারিক জীবনের সকল সমস্যাকে আত্মসাৎ করেই সামুদ্রিক প্লাবনের অবাধ উচ্ছ্বাসে ঊর্মিমুখর হয়; উচ্ছ্বসিত সেই তরঙ্গমালা ভাসিয়ে নেয় জীবনের মাপা নীতিবোধগুলোকে।'[১৫] RjeZx †g‡Ni evZvm এই ঊর্মিমুখর ভালোবাসারই গান। এ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে রূপায়িত নারী-জীবন সঙ্গত কারণেই জীবনের নানামুখী জটিলতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিক্ষুব্ধ রূপটিকে তুলে ধরার পাশাপাশি জীবনের অপার সম্ভাবনার ইঙ্গিতটুকুকেও স্পষ্ট করেছে।

প্রথম গল্প 'আসিফ আহমদ, বন্ধুবরেষু' যেখানে উত্তম পুরুষের জবানীতে এক মেয়ে আসিফের সঙ্গে তার হৃদয়বৃত্তির অনুভূতি ব্যক্ত করেছে। আসিফের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক, অথচ সে কিনা স্বজ্ঞানে অবহিত ছিলো আসিফ শিখাকে পছন্দ করে, ভালোবাসতো দীপিতাকে। আসিফ নারীর মধুচক্রে মক্ষিকার মতো ঘুরে বেড়াতো যদিও শিখা কিংবা দীপিতা– এদের কাউকেই সে পায় নি। একসময়ে আসিফ বিদেশে পাড়ি জমায়। অথচ আসিফ যে বিদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার যৌবন-সুধা আকণ্ঠ পান করছে– এ বোধটি তার শুভাকাঙ্ক্ষিণী মেয়েটি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেও যখন বলে : 'আমি তোমার জন্য এখনো অপেক্ষা করে আছি আসিফ।' ('আসিফ আহমদ, বন্ধুবরেষু', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM : ৬৯) তখন নারীর হৃদয়বৃত্তির অনাবিষ্কৃত রহস্য ও দোলাচল পাঠককে অবাক না করে পারে না। কেননা বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার এই গভীরতা ধারণ করার মতো এমন নিষ্ঠাময়ী নারী সমাজের সাধারণ দৃশ্যচিত্র নয়। মানবজীবনের ক্রমাগত নিঃসঙ্গতা ও জীবনজটিলতা থেকে উত্তরণের অবলম্বন হিসেবে শেষপর্যন্ত ভালোবাসার কাছেই দ্বারস্থ হতে হয় মানুষকে– এরকম একটি ভাবনাই হয়তো সেলিনা হোসেন আলোচ্য গল্পে আসিফের জন্য প্রতীক্ষারত মেয়েটির বিশ্বস্ত অনুভূতির আলোকে রূপায়িত করেছেন। 'গোলাপকে ভালোবাসতে হলে' গল্পটির নামেই বোঝা যায় যে এটিও একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প। সুবর্ণ তার বন্ধু খালেদকে ভালোবাসতো। কিন্তু বুলেটবিদ্ধ হয়ে খালেদের মৃত্যুকে কোনোভাবেই সুবর্ণ মেনে নিতে পারে নি। এক রাশ রক্তের মধ্যে চুপচাপ খালেদের শুয়ে থাকাটা সুবর্ণকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কেননা : 'খালেদের ওই একই প্রতিজ্ঞা ছিলো। কখনোই

কারো কাছে নতজানু হবে না। কিন্তু খালেদ কি সত্য রক্ষা করতে পেরেছে? অস্ত্রের কাছে নতজানু হয়েছিলো খালেদ।' ('গোলাপকে ভালোবাসতে হলে', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM: ৭০) খালেদের এভাবে জীবন থেকে চলে যাওয়ার পর অফিসের কাজে সুবর্ণর মন বসে না। নতুন রিসেপসনিস্ট নীপা আহমদের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়। ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে সুবর্ণর মানসিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন আসে। নীপার কাছেই সে শোনে জীবনের মাহাত্ম্যের জয়গান, আশা ও স্বপ্নের হাতছানি। নীপাই তাকে অনুভব করায় যে : 'কোথাও কোথাও নতজানু হওয়া বোধ হয় ভালো। যন্ত্রণা অনেক কমে যায়। স্বস্তি পাওয়া যায়।' ('গোলাপকে ভালোবাসতে হলে', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM : ৭২) শেষ পর্যন্ত সুবর্ণর ভাবনায় এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে যে : 'তুই অস্ত্রের কাছে নতজানু হয়েছিলি খালেদ আর আমি ভালোবাসার কাছে। তুই অস্ত্রের কাছে নতজানু হয়ে মরে গেছিস, আমি ভালোবাসার কাছে নতজানু হয়ে বেঁচে আছি।' ('গোলাপকে ভালোবাসতে হলে', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM : ৭৩) আর এভাবেই এ গল্পে নীপা চরিত্রটি জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তাকে, নির্ভরতার অবলম্বন হিসেবে জীবনের অপার সম্ভাবনার আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তোলে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'জ্যামিতিক ছকের বাইরে' গল্পে নারীজীবনের এক বিশেষ রূপ প্রতিভাত হয়েছে। আমাদের সমাজে কেবল নারীর ক্রমাগত চাপে, নারীকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে অনেক পুরুষ জড়িয়ে পড়ে দুর্নীতি ও সমাজগর্হিত নানামাত্রিক অপরাধে। সংসারে নারীর নানামুখী চাহিদার জোগান দিতে গিয়ে ঘুষ খাওয়া, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া ইত্যাদি নানারকম অপকর্মে জড়িয়ে পড়া পুরুষের চিত্র আমাদের সমাজবাস্তবতায় বিরল কোনো দৃশ্যপট নয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য গল্পের নীলা এক ব্যতিক্রমধর্মী নারীচরিত্র। এম.এ. পাশ করার পর দু'বছর বেকার জীবনের গ্লানি ও হতাশায় নিমজ্জিত থেকে শেষপর্যন্ত বড়োলোক মামার সুপারিশে গল্পের নায়ক মাহমুদের চাকরিটা হয়ে গেলো। কিন্তু যে আবেগ নিয়ে মাহমুদ চাকরিতে যোগদান করলো, সে আবেগ স্তিমিত হতে সময় লাগেনি। কেননা দৃঢ়চেতা মাহমুদের মনে হতে থাকলো : 'আমার এম.এ. পাশ ডিগ্রীর দরখাস্তের ওপর বড়োলোক মামার সুপারিশ মানেই নিজের শিক্ষা ও যোগ্যতাকে অসম্মান করা। ... মামার রিকমেন্ডেশনে নিজের অস্তিত্বকে আমি তুচ্ছ করেছি।' ('জ্যামিতিক ছকের বাইরে', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM : ৭৩) নিজ অস্তিত্বের অবমাননার যন্ত্রণা মাহমুদকে যখন বতিব্যস্ত ও অসহায়-বিপর্যস্ত করে তুলছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে নীলা, যাকে নিয়ে মাহমুদের সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ ছিলো, ভালোবাসার গভীর আস্থায় অবলীলায় মাহমুদকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলো। নীলা সেই নারী জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠলো যারা দৃঢ়ভাবে অনুভব ও বিশ্বাস করে যে : 'শুধু নারী অধিকার বিষয়েই নয়, সমাজের যে কোনো বিষয়ে নারী এগিয়ে আসবে, তার বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে। ... মেয়েরা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও বেশি সমাজ সংস্কারের কাজ করতে পারে এটা মেয়েদের জানতে হবে।'[১৬] তাই চাকরি বিষয়ে মাহমুদের দোটানা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে সে সহজভাবেই সমাধানের পথে চালিত করতে পেরেছে। মাহমুদের উৎকণ্ঠায় নীলার দৃঢ় উচ্চারণ :

'– তোমার না অনেক স্বপ্ন নীলা? – স্বপ্নগুলো থাকবে। বাঁচিয়ে রাখবো। কিন্তু তোমার যন্ত্রণাময় বুকের উপর দাঁড়িয়ে নিজের সুখ খুঁজবো না।' ('জ্যামিতিক ছকের বাইরে', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM : ৭৬) এভাবেই নীলা হয়ে উঠলো এক অনবদ্য নারী চরিত্রের প্রতীক, যাঁর ছোঁয়ায় কেবল পুরুষই সঠিক পথের দিশা খুঁজে পায় না বরং সমাজ-সংসার থেকে অনেক অন্যায়-আচরণের ভিত্তিটিও সমূলে উৎপাটিত হয়ে পড়ে অবলীলায়। 'মৃত্যুর জন্য উৎসব' গল্পে বিপর্যস্ত মানসিকতার কবলে পড়ে মানবিকতা কেমন করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে– তারই চমৎকার চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। উত্তম পুরুষের জবানীতে গল্পটিতে সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক জটিলতা কেমন করে সামাজিক ও মানবিক বোধগুলোকে অসাড় করে তোলে, জীবনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটায় এবং অবরুদ্ধ-অসহণীয় জীবন-যন্ত্রণার মুখোমুখি করে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে– তারই মর্মস্পর্শী চিত্রায়ণ ঘটেছে। একই সঙ্গে খাপছাড়া ভাবনার অবয়বে নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে। আলোচ্য গল্পের পটভূমি চুয়াত্তরের বাংলাদেশের স্থিতি ও স্বস্তিহীন সমাজবাস্তবতা। এ সমাজবাস্তবতায় অনবরত বিপর্যস্ত মানসিকতার শিকার হয়ে ক্রমাগত দেউলে হয়ে যাওয়া মানবতা কোনো স্থির আকাঙ্ক্ষায় ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে জীবনমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না; গল্পে সীমা নামের মেয়েটিও তাই সময়ের বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে ফ্রাসট্রেশনে ভুগতে থাকে। জীবনের সুন্দর স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা তার আয়ত্বে থাকে না। তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে : 'বিয়ে করে জীবনটা ভারবাহী করাটা অর্থহীন। সামান্য স্কুল শিক্ষয়িত্রীর বিয়ে করাটা বিলাসীতা হয়ে যায়।' ('মৃত্যুর জন্য উৎসব', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM : ৮৬) একই হতাশা লক্ষণীয় গল্পের কথকের অফিসে চাকরির আশায় আসা রিজিয়া নামের মেয়েটির মধ্যেও। দীপ্তিহীন এই মেয়েটির নিস্প্রভ দৃষ্টিতে জীবনের কোনো উত্তাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাবা মারা যাবার পরে মা ভাইবোন নিয়ে বড়ো সংসারের দায়ভার বহনের ক্ষমতা ছিলো না রিজিয়ার। যে কোনো প্রকারেই একটি চাকরির কোনো সুরাহা করতে না পেরে একপর্যায়ে আত্মহননের মধ্য দিয়ে সে জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচে। শিক্ষিত মেয়ে সীমা এবং চাকরি প্রত্যাশী অথচ বিফল রিজিয়ার মধ্যদিয়ে প্রকারান্তরে অস্থির, স্থিতিহীন নির্মম সমাজবাস্তবতার চিত্রটি যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। গল্পে সামাজিক-মানবিক সংকটের বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠ চেতনার আলোকে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> লেখাপড়া জানা মেয়েদের যন্ত্রণা অনেক। ওরা না পারে এগোতে, না পারে পেছাতে। ... পোশাকে নাগরিক। চেতনায় কৃষক পরিবারের কিশোরী মেয়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অর্ধেক আধুনিক। মানসিকতায় মধ্যবিত্ত বাঙালি। সংস্কারে আড়ষ্ট। সবচেয়ে বড়ো কথা একদঙ্গল সংস্কার তাদের অক্টোপাশের মতো পেঁচিয়ে রেখেছে। ... তোমার কথাই ধরো না। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছো বলে খুব একটা মহৎ কিছু করছো ভেবে তৃপ্তি পাও। অন্তত আমার সামনে তাই দেখাও। আসলে কিন্তু তা নয় সীমা। নয় বলেই মরমে গুমরে মরছো। ফ্রাসট্রেশন অজগরের মুখের মতো দাঁত বের করে তোমাকে গ্রাস করছে। আর তুমি ভেড়ার পালে বাঘ পড়ার মতো চোখ বন্ধ করে ভাবতে চাইছো যে তোমার কিছুই হয়নি। ('মৃত্যুর জন্য উৎসব', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM : ৮৮)

এভাবেই জবুথবু হয়ে অসহায় মানবতা মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের টানাপোড়েনে ক্রমাগত নিস্তেজ ও নিঃসাড় হয়ে পড়ছে। রিজিয়ার মৃত্যু তাই ক্ষণিকের জন্য মনকে স্থবির করে দিলেও তা মনের গভীরে দাগ কেটে যায় না। কেননা এ মৃত্যু জীবনের জন্য কোনো সুন্দর প্রচেষ্টাকে সফল করার অভিপ্রায়ে ঘটেনি, যার জন্য উৎসব হতে পারে এবং যে মৃত্যুতে উজ্জীবিত হওয়া যায়। এ মৃত্যু যেন মানবতার অক্ষমতাকে ঢাকবার প্রচেষ্টা। সীমার হাতাশাবোধে আক্রান্ত হওয়া ও তাতেই ব্যপ্ত থাকা এবং রিজিয়ার গৌরবহীন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কেবল সমাজের অসহনীয় আর্থ-সামাজিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির বাস্তবচিত্রটিই উন্মোচিত হয়নি বরং ঝিমিয়ে পড়া, গুটিয়ে যাওয়া বিবেকবোধকে জাগরণের প্রচেষ্টাটুকুও সুস্পষ্ট হয়েছে। 'অনুভবে আলোয়' RjeZx †g‡Ni evZvm গল্পগ্রন্থের একটি ভিন্ন ধাঁচের গল্প। বারীর মায়ের দৈহিক সৌন্দর্য নেই, ফলে তার বাবা মাকে গ্রামে রেখে বারীকে নিয়ে শহরে চলে যায়। শহরে এসে বারীর বাবা সুন্দরী রাহিজা খানমকে বিয়ে করে। নতুন মার অপরূপ সৌন্দর্য বারীকেও মুগ্ধ করে। কিন্তু তার দুঃখিনী মায়ের কথা ভেবে পিতার এই দ্বিতীয় সংসারে তার মন বসে না। মানসিক যন্ত্রণায় বারী ছটফট করে। জীবন সম্পর্কে তার যন্ত্রণাকাতর মনে এক ধরণের বিতৃষ্ণা জন্মে। তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে সারাদেশ কম্পমান। ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ প্রায়। বারীর মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি শিরশিরিয়ে ওঠে। তারপর পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাত্রি আসে। নতুন মা থরথর করে কাঁপে, বাবার মুখে ভাষা স্তব্ধ। কার্ফ্যু শিথিল হলে অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের সারির মতো ছুটে চলে। রাস্তায় রাস্তায় লাশের স্তূপ। বারীর মনে শুধু একটা মুখ জেগে ওঠে– ঈদগাঁ গাঁয়ের বিষণ্ন মাকে এখন তার দারুণ মনে পড়ে। আলোচ্য গল্পের পটভূমিতে নারী-জীবনের দু'টি বিশেষ দিকের উন্মোচন লক্ষণীয়। কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের কারণেই বারীর বাবা তার জন্মদাত্রী মাকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিয়ে করে। গ্রামে যে নারীকে নিয়ে সংসার করা যায়, যে নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিয়ে পুরুষকে পিতৃত্বের গৌরবে অভিষিক্ত করে, শহরে এসে পুরুষ সেই নারীকেই অবহেলা করে, অন্য নারীকে নিয়ে অবলীলায় ঘর বাঁধে। এভাবেই : 'পিতৃতন্ত্রের প্রভাবে পুরুষ নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে নিজস্ব ইচ্ছা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। ... নারীর সম্মতিতে নয়, নারী কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার বলে নয়, পুরুষ জোর জবরদস্তিতে নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে।'[১৭] বারীর মা যেন গল্পে অসহায়-অবহেলিত-নির্যাতিত নারীজীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে নারীর শরীর কেমন করে তার যাবতীয় সংকটের উৎস হয়ে ওঠে– আলোচ্য গল্পে তারও শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে। অপরদিকে বারীর মা এই গল্পে যেন শোষিত-অবহেলিত দেশমাতৃকার সমার্থক হয়ে রূপায়িত হয়েছে। গল্পে বারী তার মা আর পূর্ববাংলার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। চমৎকারভাবে বারীর ভাবনার মধ্য দিয়ে শৈল্পিক দক্ষতায় সেলিনা হোসেন গল্পে আলোচ্য বিষয়টিকে রূপায়িত করেছেন এভাবে:

বাবা আজকাল উঁচু গলায় পশ্চিমা গোষ্ঠী কর্তৃক এদেশের শোষণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে। বাবার মুখে শোষণের কথা শুনলে বারীর হাসি পায়। ঈদগাঁ গ্রামের ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে মার কথা মনে পড়ে। বারীর চেতনা ধাক্কা খায়। বাবা– বাবা তো পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর মতো তার পূর্ববাংলা মাকে পরম অবহেলায় ছুড়ে ফেলেছে। মার বিক্ষত বুকের মতো নিপীড়িত আত্মার মতো পূর্ববাংলা। ('অনুভবে আলোয়', RjeZx †g‡Ni evZvm, MímgM : ১০১)

এভাবেই গল্পটিতে নারীর অবয়বে স্বদেশ-চেতনার শিল্পিত রূপায়ণ ঘটেছে।

†Lvj KiZvj

সেলিনা হোসেনের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ †Lvj KiZvj [১৮]-এ লেখকের শিল্পিমানস যথেষ্ট পরিণত, সংযত, জীবনকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধির পরিচয়বাহী বিষয়-ভাবনায় সংহত, গল্পের আঙ্গিক-কুশলতায় অনবদ্য। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের আটটি গল্প যথাক্রমে 'নতুন জলের শব্দ', 'খোয়াই নদীর বাঁক বদল', 'বাবলা কাঁটায় আকাশ', 'সুখের পিঠে সুখ', 'ভালোবাসার আমতুতু চর', 'দাদআলীর কলজে', 'মৌসুমে ডিমের গন্ধ', ও 'খোল করতাল'। গল্পগুলোতে বিন্যস্ত নারী-জীবনের বহুমাত্রিক প্রকাশ সেলিনা হোসেনের রচনার বস্তুনিষ্ঠতা ও স্বতন্ত্র শৈল্পিক দক্ষতার পরিচায়ক। 'নতুন জলের শব্দ' গল্পে মানবজীবনের হৃদয়বৃত্তির নানাবিধ দোলাচল ও দ্বন্দ্বমুখর টানাপোড়েনের বাস্তবচিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে সেলিনা হোসেনের অন্তর্দৃষ্টিবলে জীবনের লোভলালসার যাঁতাকলে অবরুদ্ধ মানবতার বিপর্যয়ের নির্মম দেশচিত্রটিও উন্মোচিত হয়েছে। এ গল্পের নায়িকা জমিলা যেন 'বিশ্বাত্মার প্রসাদধন্য সেই অনন্যা নারী, যার ভাবতন্ময় জীবনের বৃত্তে মানবীয় অনুরাগ ও প্রকৃতির প্রভাব মুক্ত হয়ে জীবনকে এক স্বার্থহীন, অনাবিল ঔদার্যে উপলব্ধি করার অবকাশ দেয়।'[১৯] 'চরধূমানী'র নির্মম প্রকৃতির উদার দিগন্তব্যাপী ধূসর প্রান্তরে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে জমিলা ধূপছায়া রোদের আগুন-আভায় ও নদীর বুকে উথাল-পাথাল জলের স্বচ্ছন্দ লীলার মধ্যে একাকার হয়ে যেতে চায়, প্রকৃতির নির্জনভূমিতে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার আনন্দে সে মশগুল হয়। চরধূমানী তার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে, তাই একে সে নিজের ছাড়া অন্য কারোর ভাবতেই পারে না। কিন্তু যৌবনোচ্ছল তরুণী জমিলার যৌবনের বান যেদিন উপছে পড়তে চায়, সেদিন সে অন্য এক চাহিদার তাড়নায় চঞ্চল হয়। জমিলার ভাবনায় জারিত হয় যৌবনচঞ্চল দৈহিক চাহিদার প্রবলতা : 'সন্ধ্যার পূর্বক্ষণের বিরিং লাল আকাশ দেখতে দেখতে উনিশ বছরের যৌবনটা নিষ্ফল মনে হয়। মনে হয় আকাশের মতো টুকটুকে লাল হতে হতে একসময় ওটা টুপ করে নদীর বুকে ডুবে যাবে। আর কি। বুকটা মোচড়ায়। ভশ্-শালিকের কিচিরমিচির তখন যৌবনের শেষ সঙ্গীত হয়ে কানে বাজে।' ('নতুন জলের শব্দ', †Lvj KiZvj, MímgM : ১১৩) জমিলা অনুভব করে চরধূমানীর চিরাচরিত অভ্যস্ত ছাউনিতে তার জন্য যেন কোনো আনন্দের প্রতীক্ষা নেই। তাগড়া জোয়ান কালাম একদিন মুখে ভরা নদীর হাসি নিয়ে জমিলার হৃদয়ের রাজা হয়ে আসে। জমিলার শূন্য হৃদয়ে ভালোবাসার প্রবল বর্ষণ শুরু হয় একইসঙ্গে :

> বাইরে চরধূমানী বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যায়। স্রোত বয় ধানক্ষেতে, বাঁশযমা ঘাসের ফাঁকে, হেলেঞ্চার চিকন পাতায়, হোগলার ছাউনির ওপর। স্রোত বয় জমিলার মনেও। পরদিন ঘাসের গায়ে গা মিশিয়ে জমিলার অস্থিরতা একদম চুপ করে যায়। কান পেতে অনুভব করে একটা নিষিদ্ধ শব্দ কেমন কেঁপে কেঁপে বাঁশযমার বুকের ওপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। বাঁশযমার সবুজ নরম শরীরের গন্ধে জমিলার উষ্ণ আমেজ অভিভূত হয়ে থাকে। গড়িয়ে পড়া রোদের বিচূর্ণ কণা জমিলার শরীরের বিষুবরেখা স্পষ্ট করে তোলে। কালামের চওড়া বুকের ঘন লোমে অদ্ভুত ইচ্ছের দপ্দপানী। সে দপ্দপানী সম্বল করে শুধু একগাদা ইচ্ছের নিখুঁত রূপায়ণ হয়ে যায় স্যাঁতসেতে মাটির গায়ে। নীলাক্ষীর ঘোলা জলে তখন ভালোলাগার আঁকিবুঁকি। ('নতুন জলের শব্দ', †Lvj KiZvj, MímgM : ১১৫)

কালামের প্রতি জমিলার এই আকর্ষণ ও ভালোবাসার প্রবণতা যেন মওসুমের প্রথম বৃষ্টি কিংবা নতুন জলের স্পর্শ। সেই উদ্দাম-উচ্ছল জলের শব্দ ওকে মাতাল করে দেয়। জমিলা এ ভাবনায় উপনীত হয় যে : 'জলের শব্দ মানেই জীবন। নতুন জীবন। জলের শব্দ ভালোবাসার মতো।' ('নতুন জলের শব্দ', †Lvj KiZvj, MímgM : ১১৫) জমিলার মনে কালামের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার ব্যাপারে কোনো রকমের দ্বিধা বা প্রশ্ন জাগতে দেখা যায় না। আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের বিষয়ে নারীর ভাবনা অনেকাংশেই জড়তাগ্রস্ত। এহেন সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণে নারী তার ভাবনার অজান্তেই একধরণের অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়। কেননা : 'নৈতিক সঙ্কটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী যে দিকটিকে বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেয় পুরুষ তা বিবেচনা করেনা কারণ নারীর অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষিত পুরুষের চাইতে ভিন্ন। এই ভিন্নতা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত।'[২০] আলোচ্য গল্পে জমিলা এক্ষেত্রে নারীর গতানুগতিক নীতিবোধের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে যেন মানবিকবোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষপর্যায়ে লক্ষণীয় যে নির্মম বাস্তবতা জমিলার সব স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে। মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার প্রকাশ হয় চরের ফসল নিয়ে। লোভ আর অধিকারের কাছে ভালোবাসার মর্মান্তিক পরাজয় ঘটে। ফসলের দখল নিয়ে আলীমুদ্দীন ও তাহের আলীর দলের মধ্যে যে লাঠালাঠির নির্মম দৃশ্যের অবতারণা হয় সেদিন, জমিলাকে হতবাক করে দিয়ে কালামের তেল চকচকে লাঠির আঘাত জমিলার জন্মদাতা মকবুল পাটারীর দেহটাকেও ছাড় দেয়না। নীলাক্ষীর কোল ঘেঁষে মকবুল পাটারীর নিথর দেহটা ঢলে পড়ে। একই সঙ্গে ঢলে পড়ে জমিলার বিশ্বাস ও ভালোবাসা। নিজের অস্তিত্ব তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। জমিলা অনুভব করে : 'এ জমি চাষ করেছে ওর বুড়ো বাপ, ধান লাগিয়েছে– আগাছা সাফ করেছে– বুকের মমতা দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অথচ সে যখন এ ধানের অধিকারী নয় তখন ওর কাছে আলীমুদ্দীনও যা তাহের আলীও তা।' (নতুন জলের শব্দ', †Lvj KiZvj, MímgM : ১১৪) জমিলার মনে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। এ ক্ষোভ সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার নির্মমতাকে প্রকাশ করে অবলীলায়। শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট অবহেলিত অসহায়-বঞ্চিত-নিরন্ন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিবাদ ও ক্ষোভের প্রতীক হয়ে ওঠে জমিলা। তাই জমিলার চেতনায় প্রতিফলিত প্রতিশোধের প্রবল স্পৃহা নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিবাদকেই প্রতিবিম্বিত করে। সেকারণেই লক্ষণীয়: 'কান্না নয়

জমিলার দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। ছুটে যায় ধানের স্তূপের কাছে। হাতের কুপি দিয়ে আগুন ধরায় শুকনো খড়ে। মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে পালা করে রাখা ধানের আঁটি। দুই প্রতিপক্ষ দল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।' ('নতুন জলের শব্দ', †Lvj KiZvj, MímgM : ১১৭) এভাবেই জমিলা কেবল নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযন্ত্রণার নির্মমতাকে ধারণ করেনা বরং হয়ে ওঠে শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিবাদী সত্তার যোগ্য প্রতিনিধি। 'খোয়াই নদীর বাঁক বদল' গল্পটি মনুমিয়ার বুকভরা আশা, আনন্দ এবং হতাশা ও নিরানন্দের এক বেদনাঘন চিত্রায়ণ। জমি বাড়ানোতেই মনুমিয়ার আনন্দ। সে ভাবে খোয়াই নদীর পাড়ের বিশাল ভূখণ্ডের মালিক একদিন সে হবে। জমি বাঁধা নিয়ে সে গরীব চাষীদের টাকা ধার দেয়। কিন্তু দরিদ্র-অসহায় চাষীরা কোনোদিন টাকা পরিশোধ করতে পারে না। ফলে জমি তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এভাবেই মুনমিয়ার জমির পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যদিও গ্রামের সকলের চেয়ে তার জমির সংখ্যা বেশি। কিন্তু এই সম্পত্তি করার তীব্র নেশায় মনুমিয়া পরিবারের সদস্যদের ভালোমন্দকে দেখবার সময় করে নিতে পারেনা এবং সে চেষ্টাও তার নেই। একপর্যায়ে ঘোষণা আসে যে খোয়াই নদীর গতিধারা পরিবর্তন করে তিন মাইলব্যাপী পরিত্যক্ত এলাকায় মাছ চাষের লেক ও হাঁস-মুরগীর খামার হবে, বিরাট এলাকাজুড়ে ফলের বাগান গড়ে উঠবে। গ্রামবাসীর অবস্থার তখন ব্যাপক পরিবর্তন হবে। কেবল মনুমিয়ার অনুভবে জরিত হয় :

> অসংখ্য কোদালের মাটি কাটার শব্দ। ঝুপ-ঝুপ। মাটি কাটা হচ্ছে। মনুমিয়া বুকের পাঁজরে হাত দেয়। কোপটা যেন ওখানে পড়েছে। না ওখানে নয়। ঠিক কলজের ওপর। না তাও না। মাথার মধ্যে। উঁচু পায়ে, পিঠে। মনুমিয়া পাগলের মতো সারা শরীরে হাতড়ে বেড়ায়। ... খোয়াইর পানিতে পা ডুবিয়ে মনুমিয়া চোখের সামনে দিশপাশ অন্ধকার দেখে কেবল। (খোয়াই নদীর বাঁক বদল', †Lvj KiZvj, MímgM : ১২৪)

সেলিনা হোসেন এ গল্পে ভাগ্যলাঞ্ছিত মানবজীবনের করুণ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। গল্পের মূল বিষয়ের বাতাবরণে নারী জীবনের এক বিশেষ দিকেরও প্রকাশ ঘটেছে। মনুমিয়ার কন্যা নফিজা সন্তান জন্মদানে অসমর্থ হওয়ায় স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেও তার নিগ্রহের সীমা নেই। কেননা : 'মনুমিয়া একটা সত্য বোঝে তা হলো উৎপাদনক্ষম জমি মানেই জীবন। সে কারণেই বাঁজা বড়ো মেয়েটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না ও।' ('খোয়াই নদীর বাঁক বদল', †Lvj KiZvj, MímgM : ১১৮) দশ বছরের বিবাহিত জীবনে কোনো সন্তান হয়নি বলে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে অবলীলায় পুনরায় বিয়ে করেছে। স্বামী পরিত্যক্ত এই নারী পিতার ঘরেও যেন অপাঙ্‌ক্তেয়। লক্ষণীয় যে, বাঁজা অপবাদ দিয়ে যে সময় নফিজাকে স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে হয়েছিলো তখনও পর্যন্ত প্রকৃত সমস্যাটি আদৌ নফিজার না তার স্বামী হাবিবের– সে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। কাজেই যে সমস্যা নারী বা পুরুষ যে কারোই হওয়া স্বাভাবিক তার জন্য প্রথমেই নারীকে বিনাপ্রশ্নে দোষী সাব্যস্ত করার হীন সামাজিক সত্যটি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এভাবেই : 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানকে সুদৃঢ় করা হয়। ... নারীও মানুষ; পুরুষও মানুষ।

কিন্তু নারীর মানবাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয় সামাজিক অনুশাসনের পরিবৃত্তে।'[২১] মানুষ হিসেবে এখনও সমাজে নারীর যথার্থ মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। তাইতো আলোচ্য গল্পে ভাগ্যবিড়ম্বিত নফিজার জন্যও পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব আসে পাশের গ্রামের তোবারকের কাছ থেকে। তবে এটি নিছক বিয়ে নয়– একধরনের বিনিময় বলা যেতে পারে। কেননা : 'ও নফিজাকে বিয়ে করতে রাজি আছে, মনুমিয়া যদি কাঠা দশেক জমি লিখে দেয়।' ('খোয়াই নদীর বাঁক বদল', †Lvj KiZvj, MímgM : ১২২) অর্থাৎ নফিজার মূল্য নির্ধারিত হয় মনুমিয়ার জমির পরিমাপের ভিত্তিতে। এভাবেই সমাজে নারী-পুরুষের বিষম অবস্থানের বৈরী রূপটিও পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পে নফিজা চরিত্রের উল্লেখযোগ্য একটি দিক হলো তার চিন্তা-চেতনার অনমনীয়তা। স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে আসার পরে একবারের জন্যও তার মধ্যে কোনো অনুতাপ বা হতাশা পরিলক্ষিত হয় না। বরং বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালোবাসাহীন এহেন দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে সে যেন মুক্তি পেলো। নফিজা পিতা মনুমিয়ার সঙ্গে স্বামী হাবিবের বাদানুবাদ হলেও নফিজা অনুভব করেছিলো :

> যে জীবনটাকে চুকিয়ে-বুকিয়ে দেয়া হলো তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেনো? নিজে যদি বাঁজা নাও হয় তবু ঐ বাড়িতে আর ফিরে যেতে পারবে না। গুমোট সম্পর্ক ওর সহ্য হয় না। ও চায় খোলামেলা-যখগা জীবন। নফিজা জানে হাবিব একটা গাংগিলা-মরা নদী। যৌবনের তথতথি নেই। সেই শীতল সোহাগ ওকে মৃত্যুর স্পর্শ দিতো। বুকটা কেমন চেপে আসতো নফিজার। অনেক আগেই চলে আসা উচিত ছিলো ওর। দশটা বছর অযথা নষ্ট করেছে। সে বছরগুলো ফিরে পাবার জন্যে নফিজার বুকের ভেতর এখন হাজার যন্ত্রণার গপগপি। ('খোয়াই নদীর বাঁক বদল', †Lvj KiZvj, MímgM : ১১৮-১১৯)

নফিজা এভাবেই প্রচলিত প্রথাবদ্ধ নারী-ভাবনার সংস্কারের বিপরীত মেরুতে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেছে। যদিও আমাদের সমাজবাস্তবায় বিশেষ করে নফিজা যে সামাজিক পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত, সে অবস্থানের কোনো নারীর এহেন ভাবনার দৃঢ়তা সাধারণ কোনো পরিচিত সামাজিক সত্যকে ধারণ করে না। বরং অগণিত নারী এখনও সংসার নামক প্রহসনের রঙ্গমঞ্চে নিরবে-নিভৃতে নিজের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনাকে মেনে নিয়েছে তথাকথিত সামাজিকীকরণের প্রভাবে। এক্ষেত্রে নফিজা এক ব্যতিক্রমী ভূমিকায় নারীর অবস্থানকে সুস্পষ্ট করেছে। এই নারী অনুভব করেছে মানবিক অধিকারবোধের চেতনার গভীরতাকে :

> নারী পরিবারে কেন সুখী হয় না তার কারণটি নারীকেই জানতে হবে। সে হয়তো স্বামীর কাছে গুরুত্ব পায় না, স্বামী পরকীয়া করে, মেয়েটা প্রতিবাদ করে না সমাজের ভয়ে। কাজেই সবকিছু থাকার পরও হতাশায় ভোগে। নারীকেই বুঝতে হবে এই হতাশা মানসিক ব্যাপার। এটা থেকে বের হবার জন্য বাস্তববাদী হতে হবে।[২২]

এই বাস্তবানুভূতিই শেষ পর্যন্ত নফিজার চেতনাকে কেবল নারী বা পুরুষ হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে নিজের অধিকারবোধের ব্যাপারে সজাগ সচেতন করে তোলে। 'বাবলা কাঁটায় আকাশ' গল্পটিতে নারী চরিত্রের সরব উপস্থিতির বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে না থাকলেও স্কুলের মাস্টার আলতাফের নিজস্ব ভাবনা ও চেতনার মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়টি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিম্বিত হয়েছে। স্কুল-মাস্টার

আলতাফের শাদাসিধে জীবনযাপানের বাইরে খুব বড়ো রকমের চাওয়া-পাওয়া নেই। তার একমাত্র পিছুটান বুড়ো মা, যিনি বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে অথচ ছেলে বিয়ে করে ঘরে বউ আনছে না বলে পুত্রের সঙ্গে প্রায়ই রাগ ও অভিমান করে। আলতাফ মায়ের কথাবার্তা খুব একটা মনোযোগ দেয় না। কেননা ওকে কেন্দ্র করে মা-র যে ধরনের অভিযোগ তার মোকাবেলা করার সাধ্য নেই আলতাফের। কেউ না জানলেও আলতাফ জানে নিজ জীবনের এক গোপন কথা। তার ভাবনাজুড়ে আবর্তিত হয় ঘটে যাওয়া কোনো এক ঘটনায় পূর্বাপর বৃত্তান্ত :

> আঠারো বছর বয়সে ও একটা লম্বা গাছে উঠেছিলো। সে গাছের ডাল ভেঙ্গে মড়মড় করে নিচে পড়ে গিয়েছিলো। জ্ঞান ফিরেছিলো দু'দিন পরে। বাবা শহরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলো। ভাঙ্গা পা ভালো হতে সময় লেগেছিলো পুরো দশ মাস। বাড়ি আসার আগে জেনেছিলো ও পুরুষত্বহীন হয়ে গেছে। বাবা হবার ক্ষমতা ওর নেই। ডাক্তারের কাছ থেকে খবরটা শুনে বাবা ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলো। সারা পথ ফিসফিস করে বলেছিলো, গাঁয়ে ফিরে ও যেন কাউকে খবরটা না বলে। কে জানে তার মনে কি ছিলো। হয়তো ভেবেছিলো, সব কথা বেমালুম চেপে গিয়ে ছেলেকে তার বিয়ে দিবে। কিন্তু সে সুযোগ বাবা পায়নি। সাতদিন পর দু'দিনের জ্বরে সব শেষ।' (বাবলা কাঁটায় আকাশ', †Lvj KiZvj, MímgM : ১২৯)

গল্পটিতে আলতাফের ব্যক্তিগত বেদনার নীরব প্রকাশ পাঠককে বেদনাহত করে ঠিকই তবে আলতাফের বাবার অন্তর্গত ভাবনার হঠকারিতা নারীর প্রতি সামাজিক উন্নাসিকতার হীন মানসিকতাকেও প্রতীয়মান করে তোলে। ছেলে পুরুষত্বহীন– এ চরম সত্য জানার পরেও আলতাফের পিতা ছেলের বিয়ের স্বপ্ন পুষে রাখে। নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের ভাবনা তাকে যতোটা আলোড়িত করে তেমন করে এর ফলে অন্য একটি নারীর জীবন কেমন করে স্বপ্নহীন হয়ে উঠতে পারে– সে বোধ তাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করে না। সমাজে এভাবেই : 'পুরুষ তার স্বার্থে নারীর জীবনকে এরকম করে তুলছে। নারীর জীবন তাই ব্যক্তিগত নয়, পুরোপুরি রাজনৈতিক। নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাই অসম, সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।'[২৩] এভাবেই সত্য গোপন করে বিয়ে নামক প্রহসনের যূপকাষ্ঠে অগণিত নারীর জীবনকে পদদলিত করার হীন মানসিকতার চিত্রটি আমাদের সমাজবাস্তবতায় বিরল কোনো ঘটনা নয় বরং এটিই প্রকৃত সত্য। 'সুখের পিঠে সুখ' গল্পে সেলিনা হোসেনের স্বভাবগত রোমান্টিক ভাবনার এক সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আবেগমিশ্রিত ব্যর্থ প্রেমের এক আত্মঘাতী চিত্র। সেইসূত্রে নিজের জীবনকে নিয়ে ভাবার এবং একান্ত নিজের মতো করে উপলব্ধির মানবিক অধিকার নারীরও আছে– এই বাস্তবচিত্রটিও আলোচ্য গল্পে বস্তুনিষ্ঠভাবে শিল্পিত হয়েছে। গল্পে মণ্ডল মারফতী লাইনের লোকজন দেখলেই ভক্তিভাবে আপ্লুত হয়। একদিন মণ্ডলের ঘরে এ রকম একটি লোকের আবির্ভাব ঘটে। মণ্ডল তাকে যথেষ্ট সমাদর করে ঘরে স্থান দেয়। কিন্তু সে লোকটি মারফতী লাইনের লোক নয়। লোকটি এসেছে মণ্ডলের ছোট বউ-এর বাপের বাড়ি জামতলী থেকে। মণ্ডলের ছোট বউ বিয়ের পরে বাপের বাড়ি থেকে আসার পরে আর কোনোদিনও সেখানে যায়নি। মণ্ডলের কথায় জানা যায় যে

জামতলীতে বউ-এর সঙ্গে কার নাকি প্রেম ছিলো। বাপ নাকি তার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। লোকটি মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে যায়। কনের পূর্ব ইতিহাস না জেনে ছোট বউ ঘরে এনেছে মণ্ডল। এক সময় যাকে মন দিয়েছিলো, পিতার বিরোধিতায় কুমারী অবস্থায় মণ্ডলের বউ তাকে পায় নি। তাই মণ্ডলের ঘরে এসে সে নিজে যেমন জ্বলেপুড়ে মরছে, তেমনি মণ্ডলকেও অন্তর্দাহে দ্বগ্ধ করছে। মণ্ডল ছোট বউ-এর মনের তল পায় না। নারীর মনের ইতিহাস উদঘাটন করা মণ্ডলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তো সে জানে না ছোটগিন্নির মন এখন অহর্নিশি ডুকরে ওঠে আপনা আপনি বলে : 'বিয়ের পর থেকে শুধু তোমার অপেক্ষাতেই আছি। আর কতোকাল জীবনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে হাঁটবো আসকার? আর তো পারিনা। তুমি আসো না কেনো? তুমি এলে এখনো আমি ঘর ভাঙতে পারি।' ('সুখের পিঠে সুখ', †Lvj KiZvj, MímgM : ১৩৪) আসকার ঠিকই এসেছিলো, কিন্তু তারপরেই মারা যায়। এই গল্পে ভালোবাসার রোমান্টিক ভাবনার মধ্যেও নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর চিত্রটি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে ছোটগিন্নীর বসবাস, সে পারিপার্শ্বিকতায় ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে দশ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ককে অস্বীকার করার মধ্যে নারীর অন্তরের শক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। আলোচ্য গল্পে ছোটগিন্নী এ বাস্তবসত্য অনুধাবন করেছে যে : 'অন্তরস্পর্শশূন্য দাম্পত্য জীবনে মানুষের পারিবারিক বন্ধন আছে, অন্তরবন্ধন নেই। অন্তরবৈষম্য ও ব্যক্তিক অনৈক্যে দাম্পত্যশৃঙ্খল কখনো হয়ে পড়ে সংঘাতময়, বিপন্ন ও সংকটাপন্ন। জনারণ্যে বাস করেও অনেকে হতে পারেনা নিঃসঙ্গতামুক্ত।'[২৪] সে-কারণেই ভালোবাসার মানুষের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার মধ্যে ছোটগিন্নী অনুভব করেনি সামাজিক গ্লানির প্রথাবদ্ধ বিধিনিষেধ। কেবল তাই নয়, এতদিনের সংসার ভেঙে দিতেও তার কোনো কুণ্ঠাবোধ নেই। এ যেন এ সময়ের এক ব্যতিক্রমী নারীসত্তা। অগণিত নারী যেখানে তথাকথিত সামাজিকীকরণের শৃঙ্খলে বয়ে চলেছে ভালোবাসার সংস্পর্শহীন দাম্পত্য জীবনের বোঝা, সেখানে এ গল্পের ছোটগিন্নী নিঃসন্দেহে এক অভিনব সংযোজন। নারীর আত্মমুক্তির, আত্মজাগরণের অভীপ্সার শিল্পসম্মত রূপায়ণ ঘটেছে ছোটগিন্নী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। 'ভালোবাসার আমতুতু চর' গল্পের বিষয় জুড়ে জীবনের প্রতি যে দরদ ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সাধারণ জীবনের প্রতি সেলিনা হোসেনের গভীর মমত্ববোধ। এই গল্পটিতে : 'চিরন্তন বাংলাদেশ যেন তার সন্তানদের নিয়ে অপরূপভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।'[২৫] চর অঞ্চলের মূর্খ জলিল মামার বাড়িতে থেকে এক পাল মোষের তত্ত্বাবধান করে। হাড় কিপটে মামার কাছে জীবনের মানবিক সম্পর্কের চেয়েও অর্থের গুরুত্ব অনেক বেশি। নিজের জমির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্নে জলিলের ভাগের জমিও সে ভোগ-দখল করে। কিন্তু জলিল সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয়, সে তার প্রিয় মোষগুলোর পরিচর্যা করেই ধন্য। মোষগুলোর সঙ্গে মামাও তাকে একটা মোষ ছাড়া কিছু ভাবে না। গল্পটিতে জলিলের হৃদয় জুড়ে ভালোবাসার এক অমর প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। গল্পটির মধ্য দিয়ে মানুষের লোভ-লালসার সমান্তরালে চরাচরব্যাপী সর্ববন্ধনমুক্ত এক নৈর্ব্যক্তিক ভাবকল্পের অনুসরণীয় সান্নিধ্যে সাড়া দেওয়া ঔদার্যের শিল্পিত প্রকাশ

ঘটেছে। গল্পের বিষয়বস্তুকে ছাপিয়ে যে দিকটি পাঠকের বিবেককে নাড়া দিয়ে যায় তা হলো জলিলের মামাতো বোন ময়নার অসহায়ত্ব ও সমাজে নারীর অসম অবস্থানের ভাবকল্পটি। ময়নার পায়ে একটা খুঁত থাকায় তার বিয়ে হচ্ছে না। অবশ্য টাকা-পয়সা খরচ করলে বিয়েটা হতে পারে। কেননা :

> হাওলাদারের পোয়াডা তো কয়, দুই কানি জমি লেইখ্যা দিলে তোমারে বিয়ে করবো। ... দুইদিন পরে ময়নাকে কারা যেন দেখে গেলো। তাদেরও অনেক দাবি। ... ময়নার তো কোনো পছন্দ অপছন্দ নেই। বরই জোটে না, তার আবার বাছ-বিচার কি? ... ময়নার সমস্ত আবেগ ফুলে-ফেঁপে ওঠে। কিছুতেই কান্না থামতে চায় না। ('ভালোবাসার আমতুতু চর', †Lvj KiZvj, MímgM : ১৩৬-১৩৯)

এভাবেই সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে নয় বরং পণ্য হিসেবেই নারীকে লাভ-লোকসানের পাল্লায় পরিমাপের এ বড়ো পরিচিত সমাজচিত্র। আমাদের সমাজবাস্তবতায় ময়নার মতো অবহেলিত-বঞ্চিত-অসহায় নারীর সংখ্যা অগণিত। সামাজিক সংকীর্ণ এই মানসিকতার মূলেও নারীকে দমিয়ে রাখার প্রবণতার আড়ালে প্রকারান্তরে নারী নির্যাতনের চিত্রটিই প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। কেননা : 'নারীও মানুষ; পুরুষও মানুষ। কিন্তু নারীর মানবাধিকার যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, নিজ জীবনের উপর অধিকার, নিজ দেহের উপর নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, পছন্দ-অপছন্দের অধিকার যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তবে কি তা নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে না?'[২৬] আলোচ্য গল্পের ময়না সমাজের হাজারো নারীর উপর নেমে আসা নির্যাতনের ভয়াবহতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। নারীর প্রতি সহিংসতার আরেক মাত্রা লক্ষণীয় আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'দাদআলীর কলজে' গল্পে। আলোচ্য গল্পে দাদআলীর জীবনে একমাত্র কন্যা ঝোরা ব্যতিত আনন্দের আর কোনো উপলক্ষ নেই। বছর পাঁচেক আগে স্ত্রী মারা যাবার পরে ঝোরাই তার সঙ্গী। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জন্য বন্য থেকে কাঠ কাটতে প্রতি বছর একদল লোক আসে সুন্দরবনে, অস্থায়ী ডেরা বাঁধে, দশ মাস থাকে এবং কাঠ কাটা শেষ করে আবার ফিরে যায়। দাদআলীও তার মেয়ে ঝোরাকে সঙ্গে নিয়ে কেওড়া কাঠ কাটতে সুন্দরবনে এসেছে। গাছ হিসেবে টাকা দেওয়া হয় প্রত্যেক শ্রমিককে। দাদআলীর যেন ফুরসত নেই। অনেক বেশি কাঠ কেটে সে মেয়ের বিয়ের জন্য অর্থের জোগান দিতে ব্যস্ত। গল্পে বিষয়টি রূপায়িত হয়েছে এভাবে : 'কেওড়া গাছের গুঁড়িতে যখন কুড়োলের এক একটা কোপ দেয়, তখন দাদআলীর মনে হয় ঝোরার সুখের দিন তরান্বিত করছে ও। কোনো রকম হাইপাইয়ের মধ্যে নেই। শুধু বোঝে কাজ।' ('দাদআলীর কলজে', †Lvj KiZvj, MímgM : ১৪৩) কিন্তু দাদআলীর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে সময় লাগেনা। কাঠ কাটতে আসা দলের করিম সর্দারের লোভের হিংস্র দৃষ্টি পড়ে ঝোরার যৌবনতপ্ত শরীরের ওপর। আকার-ইঙ্গিতে ঝোরাকে তার কামনার জালে জড়াতে চায় করিম সর্দার। একদিন উদগ্র বাসনার চরিতার্থ করার সুযোগও পেয়ে যায় সে। দাদআলী গভীর বনে অনেক বেশি কাঠের আশায় চলে যায়, অন্যদিকে

ঝোরাও নিজের আনন্দে বনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কখন অজান্তেই বনের অনেক ভেতরে চলে আসে তা টের পায় না। যখন বুঝতে পারে তখন :

> বাবার কাঠ কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ভয়ে ওর থিতুবিতু অবস্থা। ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই একদম করিম সর্দারের মুখোমুখি। করিম সর্দার ওর হাত ধরে। ... করিম সর্দারের উচ্চ হাসিতে ঝোরার মিহি কণ্ঠ মিলিয়ে যায়। ঝোরার চোখে পানি নেই। সে চোখে আগুন। কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না ও। কিন্তু গায়ের জোরে কুলিয়ে উঠতে পারে না। করিম সর্দারের গায়ে আজ অসুরের শক্তি। ... আইরা ফুলের ঝোপের আড়ালে করিম সর্দার ঝোরার লমশমি যৌবন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পরিশ্রান্ত ঝোরার মুখের ওপর করিম সর্দারের উমলি নিশ্বাস। ('দাদআলীর কলজে', †Lvj KiZvj, MímgM : ১৪৭)

অন্যদিকে গভীর বনে তখন দাদআলীও বাঘের আক্রমণের কবলে পড়ে এবং একপর্যায়ে বাঘটা দাদআলীর কলজে টেনে বের করে নেয়। এভাবেই করিম সর্দার এবং বাঘের হিংস্রতা ও লোলুপতা এক সমান্তরালে চিত্রিত হয়েছে। কেবল তাই নয় বরং : 'নারীর শরীর যে নারীর নয়, ওই শরীরের ওপর যে তার নিয়ন্ত্রণ নেই।'[২৭]— এই ভাবসত্যটিও প্রতিপাদ্য হয়েছে এ গল্পে। ঝোরার প্রতি এই সহিংসতা সমাজবাস্তবতায় নারীর অধস্তন অবস্থাটিকে মূর্ত করে তোলে। ঝোরা তার মনের আনন্দের খোঁজে বনের গভীরে না গেলে এহেন বিব্রতকর সহিংসতার মুখোমুখি হতো কি না তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। অনেকের এও মনে হতে পারে যে পিতার অবর্তমানে ঘরের বাইরে যখন তখন যাওয়া ঝোরার মতো যৌবনচঞ্চল নারীর অনুচিত কর্ম। তবে একথাও স্বীকার্য যে :

> সমাজ আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে যে, নারী নির্যাতনের শিকার নারী তার নির্যাতনের কারণ এবং নির্যাতনের জন্য দায়ী। পুরুষ অপরাধী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে বিশ্বাস এই যে, সে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। অর্থাৎ সে জৈবিক নিয়ম দ্বারা চালিত হয়েছে কিংবা/এবং তাকে প্রলোভন দেওয়া হয়েছে। ফলে নির্যাতনের যে শিকার সে অপরাধী সাব্যস্ত হয় এবং আসল অপরাধী নির্যাতনের শিকার গণ্য হয়।[২৮]

সমাজ এভাবেই নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার ক্ষেত্রভূমিটি প্রস্তুত করে দেয়। 'মৌসুমে ডিমের গন্ধ' গল্পেও নারীর অসম সামাজিক দিকটি রূপলাভ করেছে সমাজবাস্তবতার নিরিখে। মোতালেব ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলো, কিন্তু পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে কোনো সন্তান জন্ম দিতে পারেনি তার বউ। বুকে অহরহ সে শূন্যতা ও বেদনা নিয়ে মোতালেব মাছ ধরা নিয়ে মেতে থাকে। ভুলে থাকতে চায় নিজের জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা ও হাহাকারবোধকে। গল্পটিতে মোতালেবের ব্যক্তিগত বেদনার নীরব প্রকাশ ছাড়াও নারীর প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতিফলন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মোতালেবের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্য দিয়ে। কেননা : 'আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শি সবাই বলে আর একটা বিয়ে করতে। তাদের মতে এমন সংসার করার চাইতে না করাই ভালো।' ('মৌসুমে ডিমের গন্ধ', †Lvj KiZvj, MímgM : ১৪৯) সমাজে-পরিবারে নারীর নিজস্ব সত্তা ও ভূমিকাকে এভাবেই অবহেলা-অনাদরে অবমূল্যায়ন করা হয়। বিবাহিত জীবনে সন্তান

ধারণকেই নারীর কর্তব্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত করে মানবিক সত্তাকে অবলীলায় পদদলিত করার এ দৃশ্যপট আমাদের সমাজবাস্তবতার এক নির্মম সত্য। ‘খোল করতাল’ গল্পটি সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের নিদারুণ কষ্ট-যন্ত্রণা, হতাশা-বঞ্চনা-অবহেলার এক অনবদ্য দলিল। গল্পে জীবনের যাঁতাকলে পিষ্ট, অভাব-অনটনে জর্জরিত আয়াত আলী ও মা-মরা কিশোর ছফদর জীবিকার অন্বেষণে দু'মুঠো অন্নের নিশ্চয়তায় গ্রাম থেকে শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। শহরে এসেও তাদের জীবনের গ্লানি শেষ হয় না। যে কোনোভাবেই হোক বেঁচে থাকাটাই তাদের জীবনের একমাত্র উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে। এভাবেই : ‘জীবনের আহ্বানে, বেঁচে থাকার আকুল বাসনায় মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে শহরে। কিন্তু গ্রামের মতো শহরেও এরা অপাঙ্‌ক্তেয়, অবশেষে উন্মূলিত, জীবনবিচ্যুত, আশারিক্ত।’[২৯] খোল করতাল গল্পে আয়াত আলী ও ছফদরের ভাগ্যান্বেষণে সেই নিরন্ন-উন্মূলিত-আশাহত মানুষের জীবন-যন্ত্রণার পরিচয় বিম্বিত হয়েছে। জীবনযুদ্ধে এইসব আশাহত মানুষের জীবনে তাই প্রেম-ভালোবাসার মতো মানবিকবোধের আবেদন হয়ে পড়ে ঠুনকো। তাই গল্পে আয়াত আলীর প্রতি আমিনার অন্তর্জলি ভালোবাসাকে অনুভব করতে ব্যর্থ হয় আয়াত আলী। আমিনা যখন বলেছিলো : ‘ভালোবাসা বিনে ব্যাঁইচা থাকার কুনো স্বাদ নাই আয়াত ভাই।’ (‘খোল করতাল’, †Lvj KiZvj, MímgM : ১৫৪) তখন নির্বিকারভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়া ছাড়া আয়াত আলীর করণীয় কিছুই ছিলোনা। কিন্তু পরে আমিনা যখন পরের বউ হয়ে চলে যায় তখন তার অভাব আয়াত আলীর অন্তঃকরণে তুষের আগুন ধরিয়ে দেয়। উপায়হীন আয়াত আলীর বাউল-মন খোল করতাল বাজিয়ে অজানা-অচেনা জীবনের দুর্বিপাকে আবর্তিত হয়। জীবন যেখানে প্রাপ্তিহীন, অস্তিত্বের সঙ্কটে জর্জরিত সেখানে নারীর ভালোবাসার কোমল পরশও স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। খোল করতাল গল্পে মানবিক আবেদনের সেই ব্যর্থতার করুণ চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

ciRb¥

সেলিনা হোসেনের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ ciRb¥[৩০] মোট সাতটি গল্পের এক অনবদ্য সংকলন। সমাজজীবনের নানাবিধ অনুষঙ্গের বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পগ্রন্থে। মানবজীবনের প্রাত্যহিক যাপিত-জীবনের মধ্যকার নানান খুঁটিনাটি বিষয় শৈল্পিক রূপলাভ করেছে গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে। গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো যথাক্রমে ‘পরজন্ম’, ‘ভিটেমাটি’, ‘যুদ্ধজয়’, ‘ঋণশোধ’, ‘মীর আজিমের দুর্দিন’, ‘জলের রেখা’ এবং ‘স্রোত’। গল্পগুলোর বিচিত্র ক্যানভাসে সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক চিত্র উন্মোচনের পাশাপাশি নারীজীবনের নানা ইতিবৃত্তও প্রতিভাত হয়েছে। ‘বাংলাদেশের নারীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে’[৩১]– তারই বস্তুনিষ্ঠ শব্দভাষ্য আলোচ্য গল্পগ্রন্থ। ‘পরজন্ম’ গল্পটি আটষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ কাজেম আলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কাজেম আলীর চার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো। শেষ বয়সে কলেরায়

আক্রান্ত হয়ে বাকী দু'ছেলে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাজেম আলী যেন সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ে। চারপুরুষ ধরে বসবাস করা বিশাল ভিটেয় এখন থাকবার মতো কেউই অবশিষ্ট রইলো না। নিজের একাকিত্বের অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে একটি ভাবনাই কাজেম আলীকে চিন্তাগ্রস্ত ও বিমর্ষ করে তোলে : 'এরপর কি হবে? ভাবতেই কাজেম আলীর বুক কেঁপে যায়। তার মৃত্যুর পর এই ভিটে অন্যের দখলে চলে যাবে যার জন্ম কাজেম আলীর ঔরসে নয়।' ('পরজন্ম', ciRb¥, MímgM : ১৬১) কাজেম আলীর ভাবনায় একে একে অতীতের নানা খণ্ডচিত্র, যুদ্ধের ভয়াবহতা, নিজের সন্তানদের মর্মান্তিকভাবে শহীদ হওয়া– প্রভৃতি ভাবনার মধ্য দিয়েই নারী-জীবনের টুকরো টুকরো দৃশ্যচিত্র উদ্ভাসিত হয়ে সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত সত্তার স্বরূপটিকে প্রতিবিম্বিত করে তুলেছে। কাজেম আলীর ভাবনার স্রোতে বিবৃত হয় তার স্ত্রী আসমানী খাতুন ও পারিবারিক জীবনের আবহটি :

> আসমানী খাতুন ওদের ছয় ছেলের কোমরে ঘুন্টি বেঁধে দিতো। দুরন্ত ছেলেগুলো সারাবাড়ি মাতিয়ে রাখতো। কাজেম আলী কখনো বিরক্ত হয়ে পিটুনী লাগাতো। হা হা করে ছুটে আসতো আসমানী খাতুন। আসমানী খাতুন বড়ো বেশি বুকে আগলিয়ে রাখতো ছেলেগুলোকে। অন্য মায়েরাও কি এমন করে? কৈ কাজেম আলীর তো তেমন স্মৃতি নেই। ওর মা কাজের ফাঁকে ওর দিকে নজর দেবার সময়ই পেতো না। কতোদিন কাজেম আলী রাত্রিবেলা না খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে, ওর মা ডাকেনি। আসমানী খাতুন এতো বেশি করতো কেন? নিজ হাতে নাওয়ানো-খাওয়ানো না হলে তার স্বস্তি ছিলো না। কাজেম আলী একটু বড়ো হলে সবকিছু একা একাই করতো। কখনো দুপুরবেলা নিজের হাতে ভাত নিয়ে খেয়ে বেরিয়ে যেতো। ওর মা জানতোও না। অতো বড়ো সংসারে মা ছিলো বড়ো বউ। সবার দিক খেয়াল রাখতে রাখতে নিজের কথা আর ছেলের কথা ভুলেই যেতো। ('পরজন্ম', ciRb¥, MímgM : ১৬৩)

বর্ণনাটির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নারীর মাতৃত্বের অপরিসীম ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের মহিমা ব্যক্ত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি সংসারের যাবতীয় দায়িত্বের অন্তরালে নারীর নিজের প্রতি নিজের ও পরিবারের অন্য সবার যত্নহীনতার বিষয়টিও লক্ষণীয়। পরিবারে নারীর নিজের জন্য বরাদ্দকৃত একান্ত নিজস্ব বলে কোনো সময় ও স্থান নেই বললেই চলে। নারী নিজের জন্য কাজ করে না; সে কাজ করে স্বামী, সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্য। সমাজ নারীর ভূমিকাকে এভাবেই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে দেয় যেখানে : 'আদর্শ নারী হবে পতিগতপ্রাণা; সে স্বামী ও সন্তানের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে; পরিবারের জন্য আত্মবিসর্জন, আত্মত্যাগ আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য। নিজের জন্য নারী কিছু করবে না; করবার অধিকার তার নেই।'[৩২] কাজেম আলীর মায়ের ভূমিকাটি গল্পে এভাবেই সমাজসত্যের আলোকে রূপলাভ করেছে। যে সমাজে নারীর যথার্থ ভূমিকা স্বীকৃত নয়, সে সমাজে আটষট্টি বছর বয়সের কাজেম আলী তাই কেবল বংশ রক্ষার খাতিরেই নির্দ্বিধায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের কুলসুমকে পুনরায় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে । কুলসুম হয়ে ওঠে কাজেম আলীর ভিটেতে পাঁচ পুরুষের পত্তনের একমাত্র উপলক্ষ্য। পুনরায় বিয়ের শিহরণ কাজেম আলীকে ভেতরে ভেতরে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। বিষয়টি গল্পে অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে :

একটা হলুদ প্রজাপতি বারবার তার কাছে উড়ে আসে। মাথার ওপর দিয়ে চক্কর খেয়ে একসময় চুলের ওপর বসে। সিকান্দার হি হি করে হাসে।

– মিয়াবাই হাপনের মাথায় পেরজাপতি!

কাজেম আলী চুপ করে থাকে। হাত দিয়ে প্রজাপতিটা উড়িয়ে দেয়।

– মিয়াবাই মাথায় পেরজাপতি বসলে নিহি বিয়া হয়। ও মিয়াবাই হাপনের মাথায় পেরজাপতি! সিকান্দার হো হো হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। ... ঐ হাসি একসময় কারো দু'হাত ভরা কাঁচের চুড়ির মতো রিনরিন শব্দে কাজেম আলীর শরীরে ঢুকতে থাকে। শব্দটা কাজেম আলীর শরীরে ঢুকতেই থাকে। দু'হাত ভরা রেশমী চুড়ির শব্দ উদ্দাম হয়ে উঠছে। ('পরজন্ম', ciRb¥, MímgM : ১৬৫-১৬৬)

এ বিয়েতে কুলসুমের মতামতের চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে তার অস্তিত্বের সঙ্কট। ভাইয়ের সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে কাজেম আলীর সংসারে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্তে এ বিয়ে তার নিকট অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত। অস্তিত্বের সঙ্কটে এভাবেই নারীর সমস্ত স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটে। কুলসুম নারীজীবনের সেই সঙ্কটকেই মূর্ত করে তোলে যেখানে : 'নারীর নিজের নামে পরিচয় নেই; স্বামী বা সন্তানের নামে তার পরিচয় নিরূপিত হয়।'[৩৩] আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'ভিটেমাটি' গল্পের বিষয়বস্তু অনেকটা 'পরজন্ম' গল্পের মতোই। এ গল্পেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে হাফিজ মিয়ার নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব জীবনের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যুদ্ধে একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে হাফিজ মিয়া রিক্ত জীবনের বঞ্চনার হাহাকার ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় জর্জরিত। বুড়ো মাকে নিয়ে টেনেহিঁচড়ে কোনোরকমে তার দিন অতিবাহিত হয়ে চলে। মুক্তিযুদ্ধে ছেলের মহান আত্মত্যাগ হাফিজ মিয়ার জীবনে প্রতিশ্রুত আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধপরবর্তী স্বাধীন দেশে হাফিজ মিয়ার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম হয়ে ওঠে আরো বেশি মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার নিমর্ম চিত্রায়ণ ঘটেছে এ গল্পে। হাফিজ মিয়ার ভাবনায় ও গল্পের একমাত্র নারীচরিত্র হাফিজ মিয়ার স্ত্রীর পরিচয়টি গল্পে বিধৃত হয়েছে এভাবে : 'বারোটা ছেলেমেয়ে জন্ম দিয়ে লতিফের মা-র শরীরে কিছু ছিলো না। লতিফ ছিলো সংখ্যায় তেরো। ওকে জন্ম দিয়ে ওর মা মরলো। ছেলের কান্নাটাও শোনেনি।' ('ভিটেমাটি', ciRb¥, MímgM : ১৭২) বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাজে বিরাজমান নারীর প্রজনন-স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা ও নারীর সামাজিক অচলায়তনের পরিচয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বছর বছর ঘন ঘন সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারায় অগণিত নারী, তার প্রজনন-স্বাস্থ্য দারুণভাবে অবহেলিত হয় এবং নারী হয়ে ওঠে সন্তান জন্মদানের যন্ত্রস্বরূপ। এক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব মতামত গ্রহণ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকাই থাকে না। বংশ রক্ষার অজুহাতে পুরুষ এভাবেই নারীর শরীরের ওপর তার কর্তৃত্ব কায়েম করে। মানুষ হিসেবে নারীর মানবিক পরিচয় এভাবেই সমাজবাস্তবতার নির্মম পরিহাসে ভূলুণ্ঠিত হয়ে নারীর অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণা এভাবেই প্রকারান্তরে সমাজে নারীর ভূমিকাকে স্ত্রী ও

মায়ের ভূমিকায় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। এভাবেই : 'নারীর উপর (সামাজিক) ভূমিকা সমাজ চাপিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ নারীর স্বাধীন সত্তার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে।'[৩৪] 'যুদ্ধজয়' গল্পের মূল উপজীব্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ের স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় জর্জরিত মানবাত্মার করুণ কাহিনি। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, তাদের চিকিৎসা-সেবার করুণ চিত্র এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যকার অসঙ্গতি ও টানাপোড়েনের বাস্তব দেশচিত্রটি আলোচ্য গল্পে মুক্তিযোদ্ধা মাসুদের ভাবনার আবর্তে শিল্পরূপ লাভ করেছে। একই সঙ্গে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর গৌরবময় অংশগ্রহণের বিষয়টিও যথার্থভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কেবল অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাই একমাত্র সত্য নয়। নারী তার অপরিমেয় ভালোবাসা, সেবা-যত্ন দিয়েও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণার শক্তি হিসেবে যুদ্ধজয়ের ইতিহাসে নিজের গৌরবময় অবস্থান স্পষ্ট করেছে। আলোচ্য গল্পে দেখা যায়, মাসুদসহ মোট দশজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে একটি বাড়িতে রাখা হয়েছে। যুদ্ধের পর ওদের জন্য চিকিৎসা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলেও মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় সময় অতিবাহিত করছিলো। যুদ্ধজয়ের আনন্দ বেদনায় পরিণত হয়েছিলো। কেননা :

> ওদের জন্যে কি আরো কিছু করা যেতো না? মাসুদের মনে হয় এই বাড়িটার ওপর অনবরত শুকনো পাতা ঝরে। আস্তে আস্তে এটা তলিয়ে যাবে, কোনোদিন কেউ আর ওদের কথা মনে রাখবে না। ... কেবলই মনে হয় দেশের জন্যে যুদ্ধ মানে কি এমন নিদারুণ নির্বাসন। ... স্বাধীনতা একটা দাঁতাল শুয়োর। কেড়ে নেয় জীবনের বাকি দিনগুলোর আলো-বাতাস, রোদ-বৃষ্টি। ('যুদ্ধজয়', ciRb¦, MímgM : ১৭৯-১৮০)

বিষণ্ন মাসুদের জীবনে আশার আলো জ্বেলে দেয় নার্স মিনু। যুদ্ধ যেখানে মাসুদের জীবন থেকে ভালোবাসার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটায়, মিনু ততটাই প্রাণবন্ত ও ভালোবাসাপূর্ণ এক জীবনের হাতছানি নিয়ে মাসুদের আশাহীন জীবনে পূর্ণতার দ্যোতক হয়ে আসে। কেবল সেবা দিয়েই মিনু মাসুদকে সুস্থ করে তোলেনি বরং তার ভালোবাসার শক্তি দিয়ে জীবনের প্রতি মাসুদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে শেষ পর্যন্ত ইতিতে পৌঁছে দেয়। মিনুর ভালোবাসাকেও মাসুদ যুদ্ধের মতোই জয় করে নেয়। আর এভাবেই নারী ও স্বদেশ একাকার হয়ে যায় গল্পটিতে। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় অন্তর্লীন এক জীবনবিমুখ যোদ্ধাকে জীবনের অপার সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিতে মিনু নামের মেয়েটি আবারো জীবনমুখী করে তোলে— এ-ও এক যুদ্ধজয়। সেই যুদ্ধজয়ের নেপথ্যে নারীর অপার ভালোবাসা ও হৃদয়ের অমিত শক্তির স্ফুরণ গল্পটিকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছে। 'ঋণশোধ' গল্পটিতে শ্রেণি-বৈষম্যের নির্মম যাঁতাকলে পিষ্ট নিম্নবর্গের মানুষের জীবন-যন্ত্রণার বঞ্চনা-হাহাকার ও অসহায়ত্ব সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গে শিল্পিত হয়েছে। গল্পে দরিদ্র মেহের আলী, পোস্ট অফিসের চিঠি বিলি করার দায়িত্ব যার কাঁধে, নিজ সংসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খায়। ঘরে অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা করানো, বিয়ের যোগ্য মেয়ে নূরীর বিয়ের ব্যবস্থা করা বা দু'মুঠো ভাতের জোগান দেয়া— কোনোটাই তার জন্য সহজসাধ্য

নয়। এমনকি স্ত্রীর মৃত্যুর পর দাফনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে মেহের আলী বুড়ো আবদেল মুনশীর পঞ্চাশ টাকার মানি অর্ডার বিলি না করে নিজেই সেটা স্ত্রীর দাফনের কাজে লাগাতে বাধ্য হয়। মেহের আলী ভেবেছে পেনশন পেলে এই টাকা সে আবদেল মুনশীকে ফেরত দিয়ে দেবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে মেহের আলী নিজেই যখন অসুস্থ হয়ে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তার চাকরিটাই চলে যায়। দিন গড়াতেই থাকে কিন্তু পেনশনের টাকা আর আসে না। মেহের আলীর জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান হয় না। গল্পটিতে শ্রেণি-বৈষম্যের নির্মম শিকার নিম্নবর্গের মানুষের জীবন-যন্ত্রণার অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট-হাহাকারের সমান্তরালে এ সমাজের মধ্যে আরো বেশিমাত্রায় অসহায়-অবহেলিত নারীজীবনের বঞ্চনার চিত্রটি মেহের আলীর কন্যা নূরী'র মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন সেলিনা হোসেন। বাইশ বছর বয়সের নূরীর ভালোবাসার স্বপ্ন ফ্যাকাসে হয়ে যায় অভাব-অনটন-দারিদ্র্যের নির্মম ছোবলে। জীবনের স্বাভাবিক গতিতে ছন্দপতন ঘটে। নূরীর দিকে তাকালেই মেহের আলীর মনে হয় : 'ইদানিং মেয়েটা কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে। ডাকলে সাড়া দেয় না। ঢেঁকির ওপর পা গুটিয়ে বসে থাকে, নইলে পুকুরপাড়ের জাম্বুরা গাছের তলাই এখন ওর প্রিয় জায়গা। ... কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বয়সে, শরীরে ধড়মড়িয়ে বাড়ছে। মেহের আলীর আতঙ্ক, ওর মার দুশ্চিন্তা।' ('ঋণশোধ', ciRb¨, MímgM : ১৮৫) নূরীর বিয়ে দিতে না-পারার অসামর্থ্য মেহের আলীকে আতঙ্কিত ও নূরীর মাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। এই 'আতঙ্ক' ও 'দুশ্চিন্তা'র উৎস সমাজ-প্রসূত। ঘরে যৌবনপ্রাপ্ত কন্যার বিয়ে সময়মতো দিতে না-পারলে সমাজের চোখে সেই মেয়ে ও তার পরিবারের সম্মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়। অথচ একই বয়সের পুত্র সন্তানের জন্য অনুরূপ পরিস্থিতিতে পিতা-মাতা অথবা পরিবার থাকে তথাকথিত 'আতঙ্ক' ও 'দুঃশ্চিন্তামুক্ত'। কেবল নিম্নবর্গের নারীই নয় ব্রাত্য-নারী থেকে সমাজের উচ্চবর্গের নারীর প্রতিও একইরকম সামাজিক বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান। নারী-পুরুষের অসম সামাজিক অবস্থান প্রকারান্তরে সমাজের সার্বিক অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। কাজেই মানুষ হিসেবে :

> নারীকে স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তা হিসেবে গড়ে উঠতে দেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনয়ন করতে গিয়ে বাধ্যতামূলক কতগুলো কাজ যেমন, বিবাহ, মাতৃত্ব, গার্হস্থ্য কর্মাদিতে নারীকে এককভাবে আবদ্ধ রাখার নিয়ম-নীতি যেমন শিথিল করতে হবে তেমনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গিগত আচরণেরও পরিবর্তন জরুরী।[৩৫]

'মীর আজিমের দুর্দিন' গল্পের পটভূমি বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় একাত্তরের স্বাধীন বাংলাদেশের অর্জন ও প্রাপ্তির মধ্যকার অসঙ্গতি, আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের বিচিত্র টানাপোড়েন। গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, দেশের প্রতি প্রবল মমত্ববোধে উজ্জীবিত মানবাত্মা পারিপার্শ্বিক অবক্ষয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়ে কীভাবে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে– চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত মীর আজিমের চরিত্রের অবয়বে আলোচ্য গল্পে সমাজবাস্তবতার এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ দোলাচলের দেশচিত্রটি শিল্পরূপ লাভ করেছে। এ গল্পেও নারী-জীবনের জন্য প্রযোজ্য সমাজ

নির্ধারিত প্রচলিত সীমাবদ্ধ রূপটি মীর আজিমের স্মৃতিচারণে তার মৃত স্ত্রীর সার্বিক অবয়বে শিল্পিত হয়েছে এভাবে : 'বউটি ভালো। চমৎকার রাঁধে। যত্ন করে খাওয়ায়। সর্দি হলে বুকে পিঠে রসুন দিয়ে গরম সর্ষের তেল মালিশ করে দেয়। ... এ ছাড়াও গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে কাঁথা সেলাই করে। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে। এর বেশি একজন মানুষের কাছ থেকে আর কিইবা চাইতে পারে মীর আজিম।' ('মীর আজিমের দুর্দিন', ciRb¨, MímgM : ১৯২) মীর আজিমের চেতনাকে যখন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', স্লোগানের শক্তি উজ্জীবিত প্রাণশক্তিতে প্রেরণা জোগায়, মীর আজিমের স্ত্রীর ভাবনাকে তখন পারিবারিক গৃহস্থালীর দায়িত্ববোধ আচ্ছন্ন করে রাখে। পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন সমাজ এভাবেই সমাজে নারী-পুরুষের মানবিক ভূমিকার মধ্যে বিভাজন তৈরি করে, যেখানে : 'জীবনের সকল ক্ষেত্র পুরুষের কর্মক্ষেত্র। নারীর কর্মক্ষেত্র কেবল গৃহ ও সংসারের গৃহস্থালী। ... জন-জগত (Public World) পুরুষের কর্মক্ষেত্র; ঘর নারীর কর্মক্ষেত্র। ঘরের বাইরে, জন জগতে নারী অদৃশ্য।'[৩৬] নারীর 'ভালোত্ব' ও 'মন্দত্ব' তাই সমাজ নির্ধারিত সংজ্ঞা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; এ সংজ্ঞা মানবিকবোধ দ্বারা পরিচালিত নয়। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'স্রোত'। অর্থ আর বংশগৌরবের প্রবল প্রতাপ ও অহমিকায় অন্ধ শেখ চাঁদ কিছুতেই তার একমাত্র মেয়ে পারুলের অতি সাধারণ ঘরের ছেলে চুন্নুর প্রেমে পড়াকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত পারুল চুন্নুর সঙ্গে পালিয়ে রচনা করে তার ভালোবাসার সংসার। এতে তীব্র অপমানিত বোধ করেন শেখ চাঁদ। প্রতিশোধ স্পৃহায় নিজের একমাত্র কন্যাও হয়ে ওঠে তার প্রতিপক্ষ। যদিও চুন্নুর সঙ্গে পারুল সুখী ছিলো, কিন্তু শেখ চাঁদের কাছে সুখের পরিমাপের মানদণ্ড হলো অর্থ এবং প্রতিপত্তি। অবশেষে শেখ চাঁদের অহমিকার কাছেই প্রাণ গেলো পারুলের। নিজ হাতে একমাত্র কন্যাকে হত্যা করে শেখ চাঁদ তার অপমানের বদলা নিলো। গল্পে উপজীব্য এটুকুই। কিন্তু এরই মধ্যে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে সমাজে নারীর অসহায়ত্ব, অধিকারবোধের সীমাবদ্ধতা এবং নারীর আত্মজাগরণের দৃঢ় অভীপ্সা। পারুলের শোকে কাতর ও বিহ্বল পারুলের মায়ের যে রূপ এ গল্পে অঙ্কিত হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে পরিবার ও সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থার চিত্রটি বিম্বিত হয়েছে। গল্পে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> মেয়ের শোকে মুহ্যমান জোহরা খাতুনও মাথার ঘোমটা বাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে শেখ চাঁদ চট করে তার কান্নাভেজা চোখ দেখতে না পায়। নিয়ম এমন, বলে দিয়ে জারি করতে হয় না, আপন বলয়ে চলে। ... শেখ চাঁদ জোহরা খাতুনকে নিষ্ঠুর কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'মাইয়ার আশা ছাড়ান দাও'। ... জোহরা খাতুনের সাহস নেই কিছু জিজ্ঞেস করার। এক মাত্র মেয়ের জন্য জোহরা খাতুনের বুক খাঁ খাঁ করে। ('স্রোত', ciRb¨, MímgM : ২০২-২০৩)

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে একদিকে জোহরা খাতুনের চরিত্রের অবয়বে যেমন চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে পরিবারে নারীর নিজস্ব ভূমিকার সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও প্রকাশিত হয়েছে। পরিবারের সর্বময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যেন পুরুষের; নারী কেবল সিদ্ধান্ত মেনে চলার নিয়ামক। জোহরা

খাতুনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এই সামাজিক সত্যটি প্রতিভাত হয়ে উঠে যে : 'পিতৃতন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার সামর্থ্য নারীর নেই। পুরুষের বাধা অগ্রাহ্য করে স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করা নারীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কাজেই, পিতৃতন্ত্রে পুরুষ ক্ষমতার অধিকারী, নারী ক্ষমতাহীন।'[৩৭] তবে সামাজিক এই বিভাজন রেখাকে অতিক্রমণে সর্বাগ্রে নারীকেই সচেতন হতে হবে। নিজের মানবিক অধিকাবোধ সম্পর্কে সজাগ না হতে পারলে সামাজিক বাধার দেয়ালটি অতিক্রম করা নারীর পক্ষে দুঃসাধ্য। গল্পে শেখ চাঁদকে যদি তথাকথিত সামাজিক প্রতিবন্ধক মনে করা যায়, সেক্ষেত্রে পারুলের ভূমিকা নিঃসন্দেহে নারীর আত্মমুক্তির প্রত্যয়টিকে ধারণ করে। অর্থ-প্রতিপত্তি দিয়ে নয় বরং হৃদয়ের মূল্যেই মানুষকে বিচার করতে হয়। তাই গল্পে লক্ষণীয় : 'শেখ চাঁদের ঘরে থেকেও পারুল ওর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে নিয়েছে। শেখ চাঁদের নিয়মের বাইরে যেতে ভালোবাসে। শেকল ভাঙাই আনন্দ। পরিমাপ করতে চায়না এর জন্যে কি পরিমাণ মূল্য দিতে হবে।' ('স্রোত', ciRb¥ MímgM : ২০৪) পারুলও তাই আত্ম-মুক্তিকল্পে হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়েছে। শেখ চাঁদ নামক পুরুষতন্ত্রের বাধা অগ্রাহ্য করে নিজের মুক্তির পথ নিজেই খুঁজে নিয়েছে। আর এভাবেই সেলিনা হোসেনের আত্মনির্মিত নারীরা : 'আত্মজাগরণের সূত্রে পরাভব নয়, পুরুষবশ্যতা নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তির পথ খুঁজে নেয়।'[৩৮]

gvblwU

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে উপলব্ধির এক অসাধারণ শিল্পরূপ সেলিনা হোসেনের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ gvblwU[৩৯]। গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মোট পনেরটি গল্পের বিচিত্র ক্যানভাসে সহজ, অনাড়ম্বর ও ঝরঝরে ভাষায় সমকালীণ বাংলাদেশের নানামুখী জীবন-জটিলতা ও সমাজবাস্তবতার যথাযথ বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে। একই সঙ্গে সেলিনা হোসেনের : 'মননকে জীবন-জটিলতার নানা অবস্থার প্রেক্ষিতে ও তাঁর শিল্পধারণার মধ্য দিয়ে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়।'[৪০] আলোচ্য গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলো যথাক্রমে 'মানুষটি', 'জলহাওয়া', 'প্রার্থনা', 'কষ্টিপাথর', 'দাঁড়কাক', 'স্পর্শ', 'ঘৃণা', 'ঘর জুড়ে জ্যোৎস্না', 'বাঁচা', 'বসন্ত বাউরি', 'ময়েজের পরাজয়', 'শব্দ ও কাঁচি', 'ক্রোধ', 'ঊনসত্তর' এবং 'থুতু'। gvblwU শীর্ষক গল্পগ্রন্থে সেলিনা হোসেনের সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনার পরিচয় যেমন লক্ষণীয় তেমনি : 'লেখিকার রচনাশৈলীরও কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এ বইয়ে। সে পরিবর্তন অবশ্যই তাঁর সাহিত্যিক ঋজুতা ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের মনের খবর সহজভাবে তিনি পাঠকের মনের দোরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্বতা সর্বত্রই মৃদুভাবে নিজের উপস্থিতি জানায়।'[৪১] প্রথম গল্প 'মানুষটি'তে একটি মানুষের চরিত্রকে ঘিরে কিছু বাইরের,

কিছু মনের ভেতরকার মনস্তত্ত্বের আলোচনা স্থান পেয়েছে। লোক-স্বভাবের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলো মিলিয়ে মানুষটির চরিত্র গড়ে তোলা হয়েছে। লোকটির নাম মশিউর হাসনাইন, পিতা ইমাজউদ্দিন, গ্রাম নিশ্চিন্তপুর, ডাকঘর অমলহোম, জেলা ফরিদপুর। মানুষটি প্রবল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, ইগোর প্রাবল্যে তাড়িত। যে কোনো বিষয়ের সামান্য বিচ্যুতিতে তার চরম বিরক্তি। ভালোবাসার কোনো বাহ্যিক প্রকাশের দ্বারা তার হৃদয় কখনো দুর্বল হয় না। স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা সবাই মানুষটিকে সমীহ করে চলে। সবাই তার ব্যক্তিত্বের ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকে। গল্পটিতে একজন লোকের আত্মগর্বী, গম্ভীর. দেমাগী ও অহংবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকেই বড়ো করে দেখানোর প্রয়াস লক্ষণীয়। মানুষটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিকের উন্মোচন সূত্রে আলোচ্য গল্পে নারীজীবনের নানাবিধ অনুষঙ্গেরও বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। ভালোবাসাহীন সম্পর্কের টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত অথচ চলমান দাম্পত্যজীবনের চিত্রটি আলোচ্য গল্পে মানুষটির চরিত্রের বর্ণনার আলোকে রূপলাভ করেছে। কেবল সংসার টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে আমাদের সমাজবাস্তবতায় অনেক নারী অবলীলায় দিনযাপনের গ্লানি মেনে নিতে বাধ্য হয়। কেননা :

> মানুষটির মুখের দিকে তাকাতে পারে না স্ত্রী, ভাবে কেমন করে এর সঙ্গে পঁচিশ বছর কাটলো? যেন এই কাটিয়ে দেওয়াটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। তবু দিন কাটে, সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, রাত আসে। এক খাটে দাম্পত্য জীবনকে ভোগ করতে হয়। বিবিমিষা প্রবল হলে দুজনে দুজনের দিকে পিঠ দিয়ে ঘুমায় তবু বিছানা বদল হয় না। ('মানুষটি', gvblwU, MímgM : ২১০)

সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে নারী এভাবেই ভালোবাসাহীন, শ্রদ্ধাহীন সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়। সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো সাহসও অনেক ক্ষেত্রে নারীর থাকে না, সমাজই সেই সাহস তৈরি হতে দেয় না। ফলে : 'নারীর পারিবারিক সম্পর্ক থাকলেও আন্তরিক বন্ধন গড়ে ওঠে না; এহেন দাম্পত্যজীবনে অন্তরশূন্যতায় নিঃসঙ্গতাবোধে আক্রান্ত হয় নারী, দৈনন্দিন জীবনধারায় বিরাজ করে এক অপার শূন্যতা ... নির্জনে নিভৃতে একান্ত ভাবনায় নারী হয়ে ওঠে বিষণ্ন বিপন্ন।'[৪২] পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে নারীর নিজস্ব চিন্তা-চেতনার বিকাশ হয় পুরুষের ভাবনার অবয়বে। নারীর ভাবনা তখন আর কেবল নারীরই থাকে না। এমনকি কখনো কখনো নারীই হয়ে ওঠে নারীর প্রতিপক্ষ। এরকম একটি বিষয় আলোচ্য গল্পে মানুষটির স্ত্রী এবং মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুষঙ্গে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> ওদের প্রেমের বিয়ে। বাবা-মার আপত্তি ছিলো এ বিয়েতে। কিছু সময়ের ব্যবধানে বাবা মেনে নিলেও মা মানতে পারেনি। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে ঝগড়া হয়। তুমুল বেধে যায় দুজনের। মা এবং বউর ঝগড়া নীরবে শুনতে হয় মানুষটিকে। ওর বউ বলে, বুড়ি শকুন। চেহারা কী। যেন শাকচুন্নি। ওর মাও সমানে চেঁচিয়ে ওঠে। যা মুখে আসে তাই বলে। বলে, ডাইনি একটা। আমার ছেলেটাকে তাবিজ করেছে। পাগলের বংশ। মায়ের চরিত্রের ঠিক নেই। পোড়া কপাল আমার। সেজন্য ছেলেটা এমন খাদে গিয়ে পড়েছে। ('মানুষটি', gvblwU, MímgM: ২১০)

নিজের অক্ষমতা আড়াল করতে গিয়ে অনেক সময় পুরুষ নারীকে অহেতুক সন্দেহ করে। আলোচ্য গল্পের মানুষটিও এর ব্যতিক্রম নয়। কলেজ থেকে অধ্যাপক স্ত্রীকে কলেজের অধ্যক্ষ কাজের প্রয়োজনে তার অফিস কক্ষে ডাকলে মানুষটির মধ্যে সন্দেহ দানা বেধে ওঠে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে এভাবে : 'কুৎসিত মুখভঙ্গি করে মানুষটি বলে, সেদিন শরিফ আফতাব তোমাকে দুবার কলেজে ডেকেছিলো কেন? কেন তুমি আশি মিনিট তার ঘরে ছিলে? প্রেমে পড়েছো নাকি?' ('মানুষটি', gvbl\wU, MímgM : ২১১) এভাবেই নারী পুরুষের দ্বারা মানসিক নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। নারীর স্বাভাবিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। সমাজে এভাবেই : 'নির্যাতন ও তার আনুষাঙ্গিক ভীতির দ্বারা নারীকে আতঙ্কিত করে রাখা হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানকে সুদৃঢ় করা হয়।'[৪৩] পরবর্তী গল্প 'জলহাওয়া' পল্লীর এক কিষাণ পরিবারের কাহিনি। এ গল্পে পল্লীর খেটে খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার নির্মম লড়াই, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ও নিপীড়িত ভাগ্য-বঞ্চিত অবহেলিত মানবাত্মার করুণ চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। শ্রেণি-সংগ্রামের বিষয়টি আলতোভাবে কাহিনির গা স্পর্শ করেছে এবং গল্পটিতে ছাত্র-রাজনীতিরও সামান্য ইঙ্গিত লক্ষণীয়। তবে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে গল্পে নারীর প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতার বিষয়টিও একই সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়েছে। আলোচ্য গল্পের কসিরন বেওয়া সমাজের অবহেলিত সেই নারী, যিনি সংসারের প্রয়োজনে রাতদিন খেটেও তার প্রাপ্য সম্মান পাননি, সমাজে-পরিবারে তার নিজস্ব কোনো ভাবনারই মূল্যায়ন হয় না। যদিও কসিরন বেওয়া ছাড়া সংসারের বেশিরভাগ কাজই অসমাপ্ত থেকে যায়, তবুও সংসারে তার নিজের একান্ত বলতে কোনো স্থান বা সময় নির্ধারিত হয় না। গল্পে বিষয়টি প্রতিবিম্বিত হয়েছে এভাবে :

> ও জানে ও না নড়লে ওর সংসার নড়ে না। সেই তো কোন ভোরে মাঠে গরু বেঁধে এসে পান্তা খেয়ে ঘুঁটে দিতে বসা, ঘুঁটে দিয়ে গোয়াল পরিষ্কার। দুটো গরু হলে হবে কি, লাদাচনা কি কম? তারপর একপাল হাঁস-মুরগির খোঁয়াড় খোলা, ডিম গুনে ঘরে তোলা, খুদকুঁড়ো মাখিয়ে দেওয়া। ঘরবাড়ি ঝাঁট দেওয়া, হাঁড়িকুড়ি মাজা, রাঁধতে বসা। এতেই তো বেলা গড়িয়ে যায়।... এভাবে আটচল্লিশ বছর কেটে গেছে। কেবলই মনে হয় বাপের সংসার থেকে নিজের সংসারে এসেও ও নিজের জন্য কিছুই করতে পারেনি। কোথাও ওর নিজের জন্য কোনো ফাঁক ছিলো না। ('জল হাওয়া', gvbl\wU, MímgM : ২১২-২১৩)

এভাবেই নারী সমাজে-পরিবারে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, মানুষ হিসেবে নারীর মানবাধিকার চরমভাবে অবহেলিত হয়। নারীর ভূমিকাকে সীমিত ও গণ্ডিবদ্ধ করে পুরুষ প্রকারান্তরে নারীর ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুকৌশলে। নারী হয়ে ওঠে বংশরক্ষার মাধ্যম। যদিও প্রজননে নারীর ভূমিকাই মুখ্য তবুও সন্তান জন্মদানের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষ কর্তৃক। কসিরন বেওয়া তাই পরপর নয়টা মৃত ছেলের জন্ম দিলে এর দায়ভার বর্তায় তারই ওপর। এমনকি : 'শেষ সন্তানটা মরা হলে আক্কাস আলী খুব চেঁচামেচি করেছিলো, শালা আমি আবার বিয়ে করবো। আমার ফুটফুটে সন্তান চাই।' ('জলহাওয়া', gvbl\wU, MímgM : ২১৫) সমাজে এভাবেই নারীকে উপেক্ষা করে, প্রজননে নারীর ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করে 'পিতৃত্বকে সমাজের স্থিতি

ও সংরক্ষণে মুখ্য চালিকাশক্তি বলে উপস্থাপিত করে পুরুষ নারীর উপর নিজ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।'[৪৪] আলোচ্য গল্পের কসিরন বেওয়ার অবয়বে সমাজের অগণিত নারীর প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষার চিত্রটি বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপলাভ করেছে। 'প্রার্থনা' গল্পে পুরুষের প্রতারণার শিকার এক নারীর অসহায়ত্ব ও উপায়হীনতার মর্মন্তুদ আখ্যান রূপায়িত হয়েছে। সরস্বতী চমৎকার মাটির পুতুল বানায়। করিমগঞ্জে এমনটি আর কেউ পারে না। কিন্তু সরস্বতী ভালো নেই। ভালো থাকার মতো অবস্থাও তার নয়। কেননা :

> পুতুলের শ্রেষ্ঠ কারিগর সরস্বতী আচার্য মাঝে মাঝে তাজা পুতুলের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাবা গরিব বলে ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে না। দু'একবার যা কথা হয়েছিলো, তা ওর মা'র পছন্দ হয়নি। ঐ পর্যন্তই। তেমন জোরে-সোরে কখনো ওর বিয়ের কথা হয়নি। ... সরস্বতীর বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস আসে। আসলে আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাকলে বাবাদের বুকে দুঃখ থাকে। বাবাদের কষ্ট কিছুতেই কমে না। ('প্রার্থনা', gvblwU, MímgM : ২২০-২২১)

দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের নির্মম যাঁতাকলে মানবজীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষারই অপমৃত্যু ঘটে প্রতিনিয়ত। কিন্তু দারিদ্র্যের ভয়াবহতা নারী-ও পুরুষের জীবনের প্রাপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিভাজন রেখা সৃষ্টি করলে সমাজে নারী ও পুরুষের অসম সামাজিক অবস্থানটি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। বিবাহযোগ্য কন্যা ঘরে থাকলে পিতামাতার দুশ্চিন্তার অন্ত থাকেনা; অথচ পুত্র-সন্তানের ক্ষেত্রে একই সমস্যায় সমাজ পিতামাতার উপর এহেন চাপ তৈরি করেনা। সেকারণেই :

> প্রদীপ আচার্যের বুড়ো বয়সের সন্তান বড়ো আদরের, বড়ো আকাঙ্ক্ষার সরস্বতী মাটির পুতুলের সঙ্গে নিজের তুলনা করে বিমূঢ় হয়ে থাকে। মন খারাপ নয়, দুঃখ নয়, শুধু এক অস্বস্তিকর অবস্থা এখন ওর। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, এমন কেউ কি নেই যে বলবে, সরস্বতী তুমি আর তোমার পুতুল খুব সুন্দর। তুমি শুধু আমার আর কারো নও। ('প্রার্থনা', gvblwU, MímgM : ২২১)

অবশেষে সরস্বতীর জীবনেও কাঙ্ক্ষিত দিন আসে। জীবনচন্দ্র সরস্বতীর ভালোবাসার মানুষ হয়ে তার স্বপ্নকে সফল করবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সরস্বতী জীবনচন্দ্রকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ভালোবাসার পরিণতিতে একপর্যায়ে সরস্বতী মা হতে চলে। একইসঙ্গে আনন্দ ও শঙ্কায় দিন কাটে সরস্বতীর। কেননা : 'কুমারী সরস্বতী মা হতে চলেছে। কুমারী সরস্বতীর চোখের সামনে আশ্চর্য পুতুলের জগৎ। ও ব্যাকুল হয়ে পুতুল দেখে। ও আর কিছু করতে পারে না। ও বোবা হয়ে গেছে। প্রতি শনিবার জীবনচন্দ্র আসে। ও সেই অপেক্ষায় থাকে। বুকের আতঙ্ক নিয়ে কাটাভরা অপেক্ষা।' ('প্রার্থনা', gvblwU, MímgM : ২২৪) জীবনচন্দ্র যদিও সরস্বতীকে আশ্বস্ত করেছিলো এবং সরস্বতীর সমস্ত দায়িত্ব নেওয়ার অভয় দিয়েছিলো কিন্তু সেই আশ্বাস ছলনায় পর্যবসিত হতে সময় লাগলো না। জীবনচন্দ্রের ভালোবাসার অন্তরালে প্রতারণার চিত্রটি গল্পে বিধৃত হয়েছে এভাবে :

জীবনচন্দ্র সরস্বতীকে বলে গেছে, সপ্তাহখানেকের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে। কয়েক সপ্তাহ চলে গেলেও ও আর আসেনি। প্রদীপ আচার্য লোক পাঠিয়েছিলো। খবর এসেছে ও এখন চা বাগানে নেই। কাজ নিয়ে কোথায় গেছে কেউ বলতে পারেনা। সরস্বতীর মা ঘরে বসে মুখে আঁচল গুঁজে কাঁদে, পাছে শব্দ বেরুলে কেউ শুনতে পায়। সরস্বতী এখন রাত্রিবেলা ছাড়া বেরোয় না। ওর পেটটা অনেক বড়ো হয়ে গেছে। ওকে ঘরের মাচানের ওপর লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পাড়ার লোকে জানে ও মাসির বাড়ি কিছুদিন থাকবে। ওর মাসির খুব অসুখ। ('প্রার্থনা', gvbl\U, MímgM : ২২৫)

এভাবেই পুরুষের প্রতারণার শিকার নারী সমাজের চোখে হয়ে পড়ে অশুচি ও ঘৃণ্য। একই কাজে অংশগ্রহণকারী পুরুষ থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সমস্ত অপবাদ-গ্লানির ভার নারীকেই বয়ে বেড়াতে হয়। নারীর স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটে তথাকথিত সামাজিকীকরণের অজুহাতে। তাই এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে :

সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, কিন্তু নারী-পুরুষের সমতার বাস্তবায়ন ঘটেছে একথা সঠিকভাবে বলা যাবে না। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা সব ক্ষেত্রেই সমতার নীতি ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। যে আধুনিকতা মানব সমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলো, সমতার অঙ্গীকার করেছিলো তা শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশবাদ ও অধস্তনের বলয় সৃষ্টি করেছে; মানবতার লাঞ্ছনা, অবমাননা, নিগ্রহের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে সারা বিশ্বে।[৪৫]

পরবর্তী গল্প 'কষ্টিপাথর' মাতৃহীন যুবক জহিরের জীবনযুদ্ধের এক করুণ আখ্যান। মা মারা যাবার পরে চাচার বাসায় থাকা জহিরের সামনে জীবনের বিচিত্র অলিগলি তার নির্মম বাস্তবতা নিয়ে আবির্ভূত হয়। জহিরের ভাবনায় প্রতিফলিত হয় তার মা, চাচি ও চাচাতো বোন রিতার জীবনচিত্রের বিচিত্র টানাপোড়েন। জহিরের মায়ের যে চিত্র গল্পটিতে অঙ্কিত হয়েছে তাতে একজন স্নেহময়ী চিরন্তন মাতৃময়ী রমণীর ছবি ফুটে উঠেছে। জহিরের চেতনায় তার মায়ের অভিব্যক্তি এরকম : 'কিছুতেই ভুলতে পারে না যে শুধু ওর জন্যে ওর মা বৈধব্যের নিঃসঙ্গ দিনগুলো ধূসর করে তুলেছিলো। মামারা দুবার বিয়ে ঠিক করেছিলো। তার একটাই উত্তর ছিলো, জহিরকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।' ('কষ্টিপাথর', gvbl\U, MímgM : ২২৭) নারী এভাবেই কখনো স্বামী-সংসারের প্রয়োজনে, কখনো-বা সন্তানের জন্যে নিজের একান্ত ভাবনা ও চাহিদাকে ভুলে থাকে। নারীর নিজস্ব জীবন বলতে কিছু থাকে না; মাতৃত্বের অজুহাতে নিজের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সমাজ তাকে মহত্ত্বের মর্যাদায় গৌরবান্বিত করে, অন্তরালে হারিয়ে যায় নিজের একান্ত ব্যক্তিসত্তার অনুভূতি ও চাওয়া-পাওয়ার অধিকার। জহিরের মায়ের মধ্য দিয়ে গল্পে নারীজীবনের এই বিশেষ দিকের প্রতি অবগত হওয়া যায়। অন্যদিকে সমাজ-পরিবারের জন্য নিজস্ব সত্তা বিলিয়ে দেয়া নারী নিজেই জানে না যে সে আদৌ সুখী বা তৃপ্ত কি না। অথচ নিজেকে সুখী করে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টায় নারী কখনো-বা আশ্রয় নেয় বস্তুগত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেবের পরিসীমায়। জহিরের চাচির অবয়বে নারীর এই বিশেষ রূপের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'ও গভীর চোখে চাচির দিকে তাকায়। মোটা, ফর্সা, গা-জুড়ে গয়না, মুখে একধরনের আলগা হাসি থাকে

সারাক্ষণ, নিজেকে প্রাণপণে সুখী প্রমাণ করার চেষ্টা।' ('কষ্টিপাথর', gvblিU, MímgM : ২২৮) এভাবেই জহিরের চাচির মতো অগণিত নারী আমাদের এই সমাজে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে কেবল সংসারের প্রয়োজনে নিজেকে সুখী প্রমাণের চেষ্টায় ব্যপৃত থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নারীর মানবিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। কেননা : 'যে স্ত্রী নিজেকে গুল্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেয়, মানব হিসেবে তার ব্যক্তিসত্তা লোপ পায়; নিজের বিকাশ এবং নিজেকে মহীরূহে পরিণত করার সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পরিবর্তে সে তার স্বতন্ত্রতা বিসর্জন দিয়ে একটি প্রতিবন্ধী ক্ষীণজীবী লজ্জাবতী লতায় পর্যবসিত হয়।'[৪৬] আলোচ্য গল্পে নারীর বিশেষ এক রূপের সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটে। জহির তার চাচাতো বোন রিতাকে ভালোবেসে ফেলে। জহির ধরেই নিয়েছিলো যে রিতা তার ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া দিবে। কিন্তু জহিরের প্রস্তাবে রিতার উচ্চারণ :

> জহির কিছু বলার আগেই ও শুরু করে, কী বলবেন আমি জানি, কিন্তু যা হবার নয় তা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভালো জহির ভাই।
>
> – কেন হবার নয়?
>
> – মানুষের ভালোলাগার ওপর তো জোর চলে না।
>
> – আমাকে তোমার ভালোলাগে না?
>
> – না।
>
> রিতা অস্বাভাবিক হাসিতে ঘর মাতিয়ে তোলে, দুঃখ পেলেন? দুঃখের কী আছে। ... রিতার ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ তীরের মতো এসে মগজে বেঁধে। ইচ্ছে করে ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দিয়ে ওর পরজন্ম উড়িয়ে দিতে। ('কষ্টিপাথর', gvblিU, MímgM : ২৩২)

আলোচ্য কথোপকথনে দুটি বিষয় লক্ষণীয়; প্রথমত, রিতার নিজের মতামত প্রকাশের দৃঢ়তা এবং দ্বিতীয়ত, জহিরের জেদের তীব্রতা। রিতার এই 'না' বলার ক্ষমতা মূলত নারীর ঘুরে দাঁড়ানোকে ইঙ্গিত করে। নারীর নিজস্ব সত্তাকে মূল্যায়নের প্রশ্নে নারীকেই আগে সচেতন হতে হবে। নিজের অধিকারবোধ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে, তবেই নারীর মানবিক সত্তার মূল্যায়ন সম্ভবপর। অন্যদিকে জহিরের ক্রোধ প্রকারান্তরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বরূপটিকেই প্রতিবিম্বিত করেছে। যে সমাজ নারীর মতামতের তোয়াক্কা করে না; অবলীলায় নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাহন করে তোলে নারীকে, সে সমাজ নারীর এহেন চারিত্রিক দৃঢ়তায় হতবাক ও ক্রোধান্বিত হতে বাধ্য। জহিরের জেদের তীব্রতা সেই সামাজিক সত্যকেই প্রকাশ করেছে শিল্পিতভাবে। 'দাঁড়কাক' গল্পে নারীর প্রতি সহিংসতার এক বিশেষ রূপের প্রতিফলন লক্ষণীয়। তেতাল্লিশ বছর বয়সের আব্দুল মান্নান, গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে যে 'কাউয়া মউন্যা' হিসেবে পরিচিত, জীবনের দায়ভার থেকে মুক্ত হতে চায়। অন্যের জমি চাষ করে জীবনধারণের মতো পরগাছা বৃত্তির বিভীষিকা ও অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের পিতা হওয়ার দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়ার তাড়না তাকে বিচলিত করে রাখে সর্বক্ষণ। কিন্তু

পরিপার্শ্বের প্রতিকূলতার সঙ্গে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতে হতে তার ভেতরে জমে ওঠা হতাশা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নিজের স্ত্রীর উপর অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। গল্পে নারীর প্রতি সহিংসতার মর্মান্তিক দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

> লোকটি বৌর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। আচ্ছা করে পিটিয়েও নিজের রাগ ঠাণ্ডা করতে পারেনি। ... ও বিড়ি টানতে পারে না, ছুড়ে ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ পায়ে বউর সামনে এসে দাঁড়ায়। ... লোকটি কয়েক ঘা দমাদম লাগিয়ে দেয়। সায়দা গড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে যায় কুলোর চাল। পেটে অসম্ভব খিদে নিয়ে ও বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে। লোকটি এমন করেই ওর সঙ্গে পনেরো বছর ঘর করলো। ওর বুক ফেটে যায়। লোকটি ঘরে ঢুকে চৌকিতে বসে বিড়ি ধরায়, তারপর চিত হয়ে শুয়ে পায়ের উপর পা উঠিয়ে দেয়। বিড়ির সুখটানের সঙ্গে ও বউর কান্না শোনে। ওর আনন্দ হয়, তৃপ্তির স্রোত বয়ে যায় শরীরে। একটা বিড়ি ফুরিয়ে যাবার পরও আর একটা ধরায়। ও কিছুটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সবকিছু ভাবতে চায়। ইচ্ছে করলেই ও সায়দাকে বাদ দিয়ে অন্য নারী ঘরে আনতে পারে। শুধু ইচ্ছে আর কিছু লাগে না। সিদ্দিক সাতটি বিয়ে করেছে, একটি ছেড়েছে, অন্যটি এনেছে। মেয়ে মানুষ এখানে এমনই সস্তা। .. বউকে ও ভালোবাসে না, সে তার প্রয়োজন। ('দাঁড়কাক', gvblwU, MíngM : ২৩৪)

এখানে নারীর প্রতি সহিংস নির্যাতনের করুণ চিত্রই কেবল প্রকাশিত হয়নি বরং সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা, নারীর অসহায়ত্ব এবং সেইসূত্রে পুরুষের ক্ষমতার অহমিকা ও নিজের অক্ষমতাকে আড়াল করবার অভিপ্রায়টুকুও রূপায়িত হয়েছে। গল্পের সায়দা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের অগণিত নির্যাতিত নারীর অসহায়ত্বের প্রতিচ্ছবি। আলোচ্য গল্পের সায়দা স্বামীর নির্যাতন সহ্য করেই পনের বছর সংসার জীবন অতিবাহিত করেছে বিনা প্রতিবাদে। সায়দার এহেন অবস্থা পাঠককে এই বোধে উপনীত করে যে : 'পিতৃতন্ত্রের ঐতিহ্যে লালিত নারী, নির্যাতনকে জীবনের বাস্তবতা মনে করে এবং প্রতিবাদ না করে ঢেকে রাখে। ... শত শত বছর এ ধারণা লালন করা হয়েছে যে, দৈহিক শক্তিবলে স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়ার বা তাকে নিয়মানুবর্তী করার অধিকার স্বামীর আছে।'[৪৭] এহেন সমাজবাস্তবতায় পুরুষ নারীকে ব্যবহার করে নিজের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখবার প্রয়াসে। স্বাভাবিকভাবেই তাই সায়দার কান্না যখন থেমে আসে আব্দুল মান্নানের তা পছন্দ হয় না। সদম্ভে সে উচ্চারণ করে :

> কাঁদা থামলো কেন? কাঁদো আরো কাঁদো। লোকটি আবার মারে। সায়দাও হিংস্র হয়ে কুলো নিয়ে তেড়ে ওঠে। দু'চার ঘা খেয়েও সায়দা আর কাঁদে না। লোকটি উঠোনে নেমে আসে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সায়দাকে দেখে। ও গ-জ-গ-জ করছে, নিচু স্বরে গাল দিচ্ছে, আল্লাহর কাছে মরণ চাইছে। সায়দার কান্না না শুনে লোকটির খারাপ লাগছে। ('দাঁড়কাক' , gvblwU, MíngM : ২৩৫)

'ঘৃণা' গল্পে নিপীড়িত মানবমনের অবস্থাকে মনস্তাত্ত্বিক কৌশলে রূপ দেওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়। গল্পে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাদায়ক নির্মম বাস্তবতার অনুষঙ্গে রূপায়িত হয়েছে মানবমনের বিচিত্র টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ জীবনবাস্তবতার করুণ চালচিত্র। স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে পাকবাহিনীর সঙ্গে যারা প্রাণপণ করে যুদ্ধ করেছিলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক শ্রেণির স্বার্থপর লোকের সর্বগ্রাসী ভোগদখল ও ক্ষমতার

কাছে তারা হার মানে। গল্পে চান গাজি স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিজয়ী হয়েও স্বাধীন দেশে সে এখন পরাজিত সৈনিকদেরই একজন। প্রচণ্ড বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে গাঁয়ের অন্যান্য পরিবারের মতো চান গাজির পরিবারও আশ্রয় নিয়েছে বেড়িবাঁধের উপর টং ঘরের মাচায়। সময়ের চলমান স্রোতে চান গাজির বেঁচে থাকার সব আশা আর আনন্দ যেন বানের জলের মতোই ভেসে যায়। চান গাজি তার আট সন্তানসহ তার স্ত্রী, বিধবা বোন ও বোনের ছয় সন্তান এবং কিছু গরুবাছুর ও ছাগল নিয়ে বন্যার পানিতে টিকতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে বেড়িবাঁধে আশ্রয় নেয়। তার মনের বিকৃত ভাবনায় সে শত্রু নিধনের পরিকল্পনা করে। তার সন্তানদের যে এখন শত্রু হননের সৈনিক ভাবে। প্রতিবছর একটা করে সৈনিক তার সঙ্গে যুক্ত হয়। বানের জলে ভেসে আসা যে সাপটি তার টং ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, তাকেও সে বাঁচিয়ে রাখে। কেননা চান গাজির ভাবনায় সে সাপটিও তার শত্রু খতম করতে পারে। বন্যার্তদের সাহায্যার্থে রিলিফের মাল নিয়ে আসা মন্ত্রী এবং তার সঙ্গে আসা গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই চান গাজির বিবেচনায় তার চিহ্নিত শত্রুদলের সদস্য। স্বাধীন দেশে চান গাজি কাঙ্ক্ষিত মুক্তির প্রত্যাশায় আরো একবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে চায়। এ লক্ষ্যেই তার সেনাবাহিনীতে প্রতিবছর নতুন সদস্য বাড়াতে সে উদগ্রীব– এরকম একটি ভাবকল্পকে অবলম্বন করে 'ঘৃণা' গল্পটির আখ্যানভাগ নির্মিত হলেও এরই মধ্য দিয়ে নারীজীবনের এক বিশেষ দিকের উন্মোচন লক্ষণীয়। চান গাজির কাঙ্ক্ষিত সৈন্যদলের সদস্যসংখ্যা তথা সন্তানের সংখ্যা বাড়াতে গিয়ে এক্ষেত্রে তার স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। গল্পে বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে এভাবে :

> মাঝে মাঝে গুলমত বানু বিষণ্ন হয়ে যায়। এক অপরিচিত দৃষ্টিতে চান গাজিকে দেখে। পঞ্চম সন্তান জন্মের পর ওর শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ছেলে দেখে চান গাজি পাগলের মতো খুশি হয়ে ওঠে। বিগলিত চিত্তে বলে, আমার আর একটা সৈনিক বাড়াইলা বউ? গুলমত বানু ক্লান্ত বেদনার্ত কণ্ঠে বলে, আমি আর পারুম না। এইবার ক্ষ্যান্ত দ্যান।
>
> – না।
>
> হিংস্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে চান গাজি। ('ঘৃণা', gvbl\\U, MímgM : ২৪৫)

চান গাজির সন্তান কামনা এবং তার স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার অবমূল্যায়নে এই সমাজসত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে :

> নারীর শরীর নারীর নয়, ওই শরীরের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ নেই। পুরুষ নারীর শরীরকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে। নারীদেহকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পুরুষের– এটাই হলো পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি। নারীর গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং নারীর স্বাস্থ্য সেবা নিরূপণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুরুষ এই অধিকার প্রয়োগ করে।[৪৮]

কেবল গল্পে বর্ণিত চরিত্র হিসেবেই নয় বরং বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় গুলমত বানুর মতো অসহায়, বিষণ্ন নারীর সংখ্যা অগণিত, যারা প্রতিনিয়ত তথাকথিত চান গাজিদের ইচ্ছা পূরণের উপায় বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। 'বসন্ত বাউরি' গল্পে বিবৃত হয়েছে আলি হোসেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সয়ফুল বিবি, গ্রামের লোকেরা যাকে গয়লা বুড়ি নামেই ডাকে, নিষ্ঠুর সময়ের স্রোতে যে ছিটকে পড়েছে নিজের কাদাজলের

সংসার থেকে অথৈ পানিতে, তারই জীবন-বঞ্চনার করুণ ইতিবৃত্ত। গয়লা বুড়ির সঙ্গে তার স্বামী আলী হোসেনের বয়সের ব্যবধান ছিলো অনেক। সতিনের ছেলেগুলোর ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে সর্বদা এক অদ্ভুত হিংস্রতা ঝকমক করতো। সেই হিংস্রতার ভয়াল থাবায় গয়লা বুড়ি হারায় তার সন্তান রমিজ ও তমিজকে। রমিজ খুন হয় আর তমিজ বাড়ি থেকে প্রাণভয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। গয়লা বুড়ির ভাবনায় প্রতিবিম্বিত হয় তার অসহায়-বঞ্চিত জীবনের করুণ হাহাকার :

> এ জীবনে ওর বোঝাই হলো না যে স্বামী কি? অথচ নিজেকে অদ্ভুতভাবে আড়াল করে রাখতে পেরেছে। স্বামীকে দেখিয়েছে সুখী গৃহিণী, বাবা-মাকে দেখিয়েছে সে সুখী গৃহিণী, আর নিজেকে পেষণ করেছে অনবরত। একদিন এই পেষণ ওর আনন্দ হয়ে উঠেছিলো, ভেবেছিলো এভাবেই বুঝি দিন চলে যাবে। ইদানিং সবকিছু ফাঁকা লাগে, ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে। কিন্তু কোথায়? ... শৈশব থেকে এই পর্যন্ত তো কেবলই নিজেকে সংকুচিত করেছে। কেবলই যন্ত্রণা এবং পেষণ, এভাবেই দিন গড়ালো, কিছুই করা হলো না, কিছুই না। ('বসন্ত বাউরি', gvblwU, MímgM : ২৬১-২৬৩)

গয়লা বুড়ির মতোই বাংলাদেশের অগণিত নারীকে নিজ সত্তা বিসর্জন দিয়ে কেবল পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিতে তথাকথিত 'ভালো নারী' হওয়ার চেষ্টায় আজীবন ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। কেননা পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজবাস্তবতায় : 'ভালো নারী হিসেবে গণ্য হচ্ছেন যিনি স্ব-সত্তা বিলীন করে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারেন; আবার, মন্দ নারীতে পরিচিত হচ্ছেন যিনি আত্ম-মর্যাদাবোধ দিয়ে পরিচালিত হন কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নন।'[৪৯] শ্রেণি-বৈষম্যের শিকার নিম্নবর্গের পুরুষের অবস্থা অত্যন্ত নির্মম ও করুণ হলেও এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের নারীর অবস্থা যে আরো শোচনীয় ও মর্মান্তিক– এ বিষয়টিই আলোচ্য গল্পে বস্তুনিষ্ঠভাবে শিল্পরূপ লাভ করেছে।

'শব্দ ও কাঁচি' গল্পটি অসহায়-দরিদ্র-বানভাসী মানুষের জীবনবাস্তবতার রোজনামচা। গ্রামের অসহায় নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের বিধিলিপি সমাজের ক্ষমতাধর উচ্চবর্গের মানুষের হাতে এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ধান পাকার আগে বর্ষা এসে গেলে এবং পাহাড়ি ঢলে বান নামলে অসহায় দরিদ্র এই মানুষেরা আর মানুষের পর্যায়ে থাকেনা, তাদের জন্তুর মতো হয়ে যেতে হয়। গ্রাম থেকে হতদরিদ্র এইসব মানুষ জীবিকার সন্ধানে ছুটে আসে শহরে। কিন্তু শহরেও তাদের অনিশ্চয়তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। কেবল টিকে থাকার জন্য শুরু হয় মানবেতর জীবনযাপন। এরকম হতদরিদ্র হাওর অঞ্চলের অসহায় মানুষের রিক্ত-বঞ্চিত জীবনের কাহিনি নিয়ে 'শব্দ ও কাঁচি' গল্পের আবহ নির্মিত। মনতাজ ও ভাদুলি হাওড় অঞ্চলের অসহায় নিম্নবর্গের দারিদ্র্যক্লিষ্ট খেটে-খাওয়া মানুষ। তাদের জীবনযাপনে প্রতিফলিত হয়েছে পোড় খাওয়া মানুষের জীবনযুদ্ধের ইতিকথা। একই সঙ্গে গল্পটিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের জটিলতা ও টানাপোড়েনের বিচিত্র অনুষঙ্গের বাস্তব চিত্রায়ণ ঘটেছে। বিয়ের ছয় বছরের মধ্যে কোনো সন্তান হয়নি বলে ভাদুলি স্বাভাবিক প্রবণতায় ধরে নিয়েছে যে সমস্যাটা ওকে ঘিরেই আবর্তিত। সেই অপরাধের গ্লানি নিজের ভেতরে ধারণ করে ভাদুলি ক্ষত-বিক্ষত

হয়। কখনো একা একা সে গুনগুনিয়ে কাঁদে। কিন্তু মনতাজ এ বিষয়ে একদিন সরকারি ডাক্তারখানায় যাওয়ার পরে এক দ্বান্দ্বিক জটিলতার মুখোমুখি হয়। বিষয়টি গল্পে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> ডাক্তার দুজনকে পরীক্ষা করে দেখার কথা বলার পর মনতাজ অবাক হয়ে যায়।
>
> – দুইজনরে কেন? দোষ তো মেয়েমানুষের থাকে ডাক্তার সাব।
>
> – কে বলেছে? সব বাজে কথা। দুজনকেই দেখতে হবে।
>
> দুজনের কথা শুনে মনতাজের বুকের ভেতর ভয় ঢোকে। যদি অপরাধটা ওর হয়? তাহলে পৌরুষের লজ্জা ও লুকোবে কি করে? ... যদি প্রমাণ হয় যে অপরাধ ওর তাহলে ভাদুলির ওপর কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যাবে।' ('শব্দ ও কাঁচি', gvbl\U, MímgM : ২৭০-২৭১)

এভাবেই পুরুষ নিজের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখে নারীকে অবদমনের কৌশলে। সমাজে পুরুষ-নারীর সম্পর্ক তাই অসম এবং দমননীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য গল্পে পৌরুষের অবমাননার ভয়ে আতঙ্কিত মনতাজের এই আচরণগত গোপনীয়তা রক্ষার কৌশল 'আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ও বহুবিচিত্র মনে হলেও তা প্রকারান্তরে নারীর উপর পুরুষের নির্যাতনেরই এক বিশেষ কাঠামো। এটি পুরুষের কাছ থেকে নারীর প্রাপ্য নিত্যনৈমিত্তিক আচরণ।'[৫০] আমাদের সমাজ-বাস্তবতায় ভাদুলির মতো অসহায় নারীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত মনতাজের মতো পুরুষ চরিত্রের অভাব নেই বরং এটিই প্রকৃত সত্য। নারী কেবল পুরুষের অধীনেই নিজের ভূমিকাকে চিহ্নিত করেনা ক্ষেত্রবিশেষে নারীও পুরুষের সঙ্গে এক কাতারে নিজের যোগ্যতায় আপন ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম; বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস নারীর সেই সংগ্রামমুখর আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস কেবল নির্যাতিত-নিপীড়িত নারীজীবনের করুণ আখ্যানই নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারীর গৌরবময় অংশগ্রহণের ইতিবৃত্ত। পুরুষের সঙ্গে এক কাতারে সহযোদ্ধার সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে নারী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত। 'ঊনসত্তর' শীর্ষক গল্প নারীর সেই সাহসী সংগ্রামের গৌরবগাথা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ-এর মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ঊনসত্তরের গণআন্দোলন। এ আন্দোলন ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে ধাপে ধাপে উঠে এসেছে। এ সময়ের অনেক ছোট-ছোট ঘটনা আমাদের অবরুদ্ধ জীবনকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালে এসে তা প্রচণ্ড বিক্ষোভের রূপ ধারণ করে এবং এর ফলে পাকিস্তানি রাজনীতি থেকে স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে বিদায় নিতে হয়। এ সময়কে উপজীব্য করে লেখা 'ঊনসত্তর' শীর্ষক গল্পে সামগ্রিকভাবে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতাপূর্ণ অস্থিতিশীল সময় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে আমাদের তরুণ সমাজ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো। অধিকার আদায়ের এই সংগ্রামে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিবাদী জনতা অংশগ্রহণ করেছিলো অদম্য সাহসিকতায়। গল্পের সাজ্জাদ ও সাহানা, যারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়েও সম্পৃক্ত ছিলো বৃহৎ গণ-আন্দোলনের সঙ্গে। গণ-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গাঘাত রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ প্রাঙ্গণে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। সংগ্রামমুখর সেই বিক্ষুব্ধ সময়চিত্রটি গল্পে অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় রূপলাভ করেছে :

> সবুজ মতিহার দিনে দিনে রূপ বদলাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে দেয়ালের লিখন। দ্রুত কঠিন হয়ে উঠছে মতিহারের ছাত্র-শিক্ষক। সবাই ঋজু, কঠিন– যখন কথা বলে বদলে যায় দৃষ্টি, মুখের আদল। সাহানা অনুভব করে জঙ্গি-মিছিলের প্রচণ্ড গতি। ... উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো প্রতিদিন ঢাকার খবর গড়িয়ে আসে মতিহারের বুকে। বিক্ষোভ-মিছিল-সভা– কোনো কিছুর বিরাম নেই। দাবির পর দাবি। দাবি আর মিছিল। মিছিল আর ঘেরাও। মতিহার থমথম করে। ... আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তিন দিনের কর্মসূচি পালিত হয় মতিহারেও। মশাল মিছিলে অংশ নিয়ে একদম পাল্টে যায় সাহানার অনুভূতি। মনে হয় বুকের মধ্যেও ঐ আগুনের শিখা দপদপ করছে। ... বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদী মিছিল বের করে। মিছিল শহরের দিকে এগিয়ে যায়। মিছিলের প্রথম দিকে মেয়েদের সঙ্গে সাহানা হাঁটছে। ('উনসত্তর', gvblwU, MímgM : ২৮১-২৮৪)

কেবল মিছিলের সম্মুখভাগেই নয়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংগ্রামমুখর পথচলায় নারী এভাবেই নিজের সমঅংশগ্রহণের গৌরবময় ভূমিকায় নিজের সুদৃঢ় অবস্থানকে সুস্পষ্ট করেছে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'থুতু'। গল্পের কাহিনি মিজান নামক তরুণের সামাজিক অবক্ষয়জণিত হতাশায় নিমজ্জিত মানসিক সংকট ও টানাপোড়েনের বিচিত্র অনুষঙ্গে রূপলাভ করেছে। মিজান মহিউদ্দিন, মোটামুটি বিত্তশালী ব্যবসায়ী বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করা বেকার হতাশাগ্রস্ত ছাব্বিশ বছর বয়সের এক টগবগে যুবক। বেকার হলেও বাপের উপার্জন ওর পকেটে থাকে। আর্থিক অনটন না থাকলেও অস্থিরতা মিজানের পিছু ছাড়েনা। কেননা বাবার পরিচয়ে কিংবা ঘুষ দিয়ে মিজান এগুতে চায় না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী থাকার পরেও সর্বত্র সে হয়ে পড়ে অপাঙ্‌ক্তেয়। সামাজিক অবক্ষয়ের বাস্তবচিত্র আলোচ্য গল্পে উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

> অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে যখন আর ঘুম আসেনা তখন দ্রুত মনে হতে থাকে এখনই সময় অনেক কিছু ছিন্ন করার। কী? এক. মগজের ঘুঁটে, যেটা মানুষ এই শহরের দেয়ালে সেঁটে শুকোবার জন্য রেখে দিয়েছে। দুই. ভালোমন্দ, যেটা এই শহরে ডাস্টবিনে জমিয়ে রাখা হয়েছে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়ার জন্য। তিন. ক্রোধ, যেটা দ্রুত হিমায়িত হয়ে যাচ্ছে এই শহরের ধমনী থেকে। ('থুতু', gvblwU, MímgM : ২৮৮)

এহেন অসহনীয় অবরুদ্ধ জীবনবাস্তবতায় মিজান ক্রমাগত বিবমিষায় আক্রান্ত হয়। ও বুঝতে পারে না যে কেন সে আর থুতু ফেলতে পারেনা, থুতু ফেলতে গেলেই বমির ভাব হয়। ও তখন তাড়াতাড়ি থুতু গিলে ফেলে। চারপাশের অস্থিতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক সমাজবাস্তবতার অচলায়তনের মধ্যে মিজানের চেতনা লোপ পায়। পরিপার্শ্বের পঙ্কিলতায় থুতু ফেলবার মতো স্থান অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে মিজান ছুটে যায় সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়া ষোলো বছরের পতিতার কাছে। মিজানের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে একটি ভাবনা : এই বেশ্যা সমাজের গায়ে থুতু দেবার জন্য আমি বেশ্যার গর্ভে একটি সন্তান জমাতে চাই।' ('থুতু', gvblwU, MímgM : ২৮৭) গল্পটিতে মিজান চরিত্রের অবয়বে সামাজিক অবক্ষয়ের অসহ স্বরূপটি যেমন প্রতিভাত হয়েছে তেমনি সমাজ নারীকে কেমন করে 'পতিতা'য় পরিণত করে

– তারও জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষণীয়। গল্পে ষোড়শী ফালানি কেমন করে মহুয়া হয়েছে সেই ইতিবৃত্ত ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। একইসঙ্গে চিকিৎসার প্রয়োজনে মহুয়ার জরায়ু কেটে বাদ দেয়ার প্রসঙ্গটি টেনে এনে মিজানের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে বিস্তৃত করা হয়েছে। চাইলেও মহুয়া আর মিজানের সন্তানের মা হতে পারবে না। গল্পে মহুয়ার তথা ফালানির চিকিৎসার প্রসঙ্গটি বিশেষ একটি কারণেও উল্লেখযোগ্য। গল্পে বর্ণিত হয়েছে : 'কী অসুখ হয়েছিলো জানতাম না', শুধু জেনেছিলাম আমার জরায়ু কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেদিন ছুটি হবে তার আগের দিন রাত্রে যে তরুণ ডাক্তার আমাকে দেখতো সে আমার কাছে আসে। কতোক্ষণ গল্প করে। একসময়ে বলে, তুমি খুব সুন্দর। ডাক্তার আমার বুকে হাত দেয়। আমি বাধা দিতে পারিনি।' ('থুতু', gvbl\U, MímgM : ২৯০) এ বর্ণনায় নারীর প্রতি পুরুষের লোভাতুর হিংস্রতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। আমাদের মনে পড়ে যায় যে : 'শরীরের কারণে নারী পুরুষতন্ত্রের শিকার। নারীর শরীর তার সংকটের উৎস।'[৫১] নারী তার প্রতি এহেন অত্যাচারের বিরোধিতা না করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নীরব থাকে। তাই তো আলোচ্য গল্পে মহুয়া তথা ফালানিও হাসপাতালের তরুণ ডাক্তারের অন্যায় আচরণের কোনো প্রতিবাদ করতে বা বাধা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নারীর এই নীরবতা বা মেনে নেয়ার প্রবণতা তথাকথিত সমাজবাস্তবতা তথা পুরুষতন্ত্রের ফল। কেননা:

> ছোটকাল থেকে ও ক্রমাগতভাবে সেক্স ভূমিকায় সামাজিকীকরণের দ্বারা নারীকে দেখানো হয়েছে যে, পুরুষের যৌন আচরণের জন্য নারী দায়ী এবং নারী বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ দুই শিক্ষা নারীকে নির্যাতন সম্পর্কে নির্বাক করে দিয়েছে এবং তারা যদি অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসে, তবে অন্যরা তাদের কথা বিশ্বাস করে না।[৫২]

তাই দেখা যায় আলোচ্য গল্পের ফালানির মতো আমাদের সমাজের অনেক নারীও তার প্রতি নির্যাতনের বিষয়টিকে গোপন রেখে অনুশোচনায় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। নিম্নবর্গের থেকে উচ্চবর্গের নারী– সবার ক্ষেত্রেই এই সামাজিক বাস্তবতা একইরকম নির্মম ও সত্য।

gwZRv‡bi †g‡qiv

সেলিনা হোসেনের ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ gwZRv‡bi †g‡qiv[53] (১৯৯৫)। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো হলো– 'মতিজানের মেয়েরা', 'আকালির স্টেশনের জীবন', 'বৈধব্য', 'হৃদয় ও শ্রমের সংসার', 'নদে এলো বান', 'ইজ্জত', 'মুখ', 'মেয়েলোকটা', 'লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর' এবং 'পারুলের মা হওয়া'। gwZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের মোট দশটি গল্পের বিচিত্র ক্যানভাসে উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলাদেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্বরূপ, সম্পর্কের ভেতরকার অসঙ্গতি, সর্বোপরি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের টানাপড়েনের বহুমাত্রিক অনুষঙ্গ এবং সেই সূত্রে সমাজব্যবস্থার বহুমাত্রিক চিত্র। গল্পগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বিন্যস্ত নারীজীবনের চালচিত্র। একক কোনো গল্প নয়, একটি মাত্র কাহিনি নয় বরং

Dhaka University Institutional Repository

টুকরো টুকরো নানা কাহিনির বিচিত্র বিন্যাসে বাংলাদেশের নারীজীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি রূপায়িত হয়েছে g\ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের শব্দভাষ্যে। ব্রাত্যনারী থেকে অভিজাত নারী, নিম্নবর্গের নারী থেকে উচ্চবর্গের নারী, সাধারণ সরল গ্রাম্য নারী থেকে প্রখর রাজনীতি-সচেতন নারী, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সব স্তরের নারীকেই গল্পের চরিত্র ও বর্ণনার আধেয় করে তুলেছেন সেলিনা হোসেন। কেবল গল্পে বিবৃত জীবন নয় বরং গল্পের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে যে জীবন, সেই জীবনের বৌদ্ধিক দিকটিই পাঠকের বোধের সীমায় নিয়ে এসে তীব্র আবেদন তৈরি করেছেন সেলিনা হোসেন g\ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থে। সেলিনা হোসেন গল্পের শরীরে এমনভাবে নিজস্ব ভাবনাকে, নিজস্ব অন্বিষ্টকে রূপায়িত করে তোলেন যে গল্পের কাঠামো ও গতিপ্রবাহ সঞ্চরণশীল থেকে পরিণামের দিকে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যায়, ভাবনার আরোপণ তাত্ত্বিক বা আরোপিত হয়ে পড়ে না। গল্পের আবহে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের জটিলতা, সমাজে নারীর প্রকৃত সত্তার স্বরূপ-সন্ধান, ব্যক্তিক আত্মমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা— এককথায় বাংলাদেশের সমাজসত্যের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে g\ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থে।

g\ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'মতিজানের মেয়েরা'। গ্রামের নিম্নবর্গের কোনো নারীর বিয়ে নামক সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, পরিবারে-সমাজে নারী নির্যাতনের নানামাত্রিক বাস্তবতা, পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে নারী-অধঃস্তনতার নির্মম চিত্র, যৌতুক প্রথার ভয়াবহতা, নারীর প্রতি প্রচলিত বহুবিধ সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেইসূত্রে সমাজবাস্তবতার আলোকে নারীর প্রকৃত সত্তার স্বরূপ-সন্ধান এবং নারীর আত্মজাগরণের অভীপ্সা— প্রভৃতি নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মতিজান। তাকে অবলম্বন করেই গল্পে কাহিনির বিস্তার এবং মতিজানের শাশুড়ি গুলনূর, স্বামী আবুল, আবুলের বন্ধু লোকমান, নূরের মা, বুধে, মতিজানের বড়ো ভাই এবং মতিজানের দুই মেয়ে প্রমুখ চরিত্রের আবির্ভাব। বিয়ে শুধু দুজন নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনই নয়, এ ক্ষেত্রে যুক্ত হয় দুটি ভিন্ন পরিবার— তাদের সংস্কৃতি, জীবনযাপন প্রণালি। আমাদের সমাজে নানা কারণেই মেয়েদের জন্য বিয়ে বিষয়টি চ্যালেঞ্জিং। নিজের পরিবার ছেড়ে আসার কষ্ট সামলাতে না-সামলাতেই শ্বশুরবাড়ির এক অচেনা পরিবেশ ও জীবন প্রণালির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় অধিকাংশ মেয়েকে। হঠাৎ করেই পাল্টে যায় তাঁর বহুদিনের অভ্যস্ত জীবন। বিয়ে-পরবর্তী এই নাজুক সময়টাতে শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ এবং সদস্যদের আচরণ যদি হয় প্রতিকূল, তাহলে তো কথাই নেই। বিরূপ পরিবেশে নারী তখন কেবল অসহায় ও অবলম্বনহীন হয়েই পড়েনা বরং সম্মুখিন হয় নানাবিধ পারিবারিক ও সামাজিক জটিল-কুটিল পরিস্থিতির। 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পের মতিজানও এরকমই এক জটিল-কুটিল সমাজবাস্তবতার ঘূর্ণিজালে আবর্তিত নির্যাতিত এক নারী। বিয়ের পর স্বামীর সংসারে সে হয়ে যায় 'বাড়তি মানুষ'। নিজের সংসারে তার কোনো কর্তৃত্ব নেই, শাশুড়ি তার ওপর কর্তৃত্ব করে। এই সংসারে মতিজানের অবস্থান কোথায়, তার প্রয়োজনটাই-বা কি–– সেটাও সে

জানে না। কেননা : 'মাথার ওপর আছে শাশুড়ি, সংসার তার, সে সংসারে মতিজান বাড়তি মানুষ। এই বাড়তি মানুষ হওয়ার কষ্ট ওর বুক জুড়ে। শাশুড়ির তীক্ষ্ণ বাক্যবান বুক পুড়িয়ে খাক্ করে দেয়। তখন মতিজানের হৃদয় থেকে সংসারের সাধ উবে যায়। ও বিধবা হতে চায়।' ('মতিজানের মেয়েরা', gwZRv‡bi †g‡qiv, MímgMÖ : ২৯৩) মতিজানের পিতা বিয়ের সময় কথা দিয়ে যৌতুক দিতে না পারায় মতিজান সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে জীবন কাটায়। বিশেষ করে স্বামীর মুখোমুখি হতে চায় না। তার জীবনের স্বাভাবিক গতিতে ছন্দপতন ঘটে। যৌতুকের ভয়াল থাবায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে মতিজানের সাধ ও আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নগুলো। গল্পে যৌতুকের ভয়াবহতার চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

> গুলনূর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, বিহার সময় তুমহার বাপে কহাছিলো আমার আবুলক ঘড়ি দিবে, সাইকেল দিবে। অক্যুনও প্যাঠালে না ক্যানহে? ... যৌতুকের ব্যাপারটি নিয়ে গুলনূর এখন সরাসরি ক্রোধ প্রকাশ করে। চেঁচিয়ে বলে, তুমহার বাপ একটা মিথ্যুক, প্রতারক। সাইকেল, ঘড়ি দিতে না পারবে তো কহাছিলো ক্যানহে?
>
> গুলনূর উত্তেজনায় গালাগাল, চেঁচামেচি করে। আবুলও মায়ের সঙ্গে যোগ দেয়। সেদিন মতিজানের কণ্ঠ ধরে আসে, চুপ থাকতে পারে না। কাঁপা গলায় বলে, বাপজান ঠগ লয়, গরীব। বাপজান মিথ্যুক লয়, পয়সা ন্যাই বুল্যাক, ঘড়ি, সাইকেল কিনব্যার সময় লাগিছে।
>
> -- চোপ হারামজাদী। আবার বড় কথা।
>
> গুলনূর ওর চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। গলায় দড়ি দিয়ে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। সারাদিন খেতে দেয়নি। ... সন্ধ্যায় গুলনূর দড়ি ধরে টেনে ডোবার ধারে নিয়ে গিয়ে বলে, হামি আর তুমহাক ভাত খ্যাওয়াবার প্যারমো না। খ্যাও, খ্যাও, ঘাস খ্যাও। ('মতিজানের মেয়েরা', gwZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ২৯৩-২৯৪)

সমাজে যৌতুকের অভিশাপ বাংলাদেশের অগণিত নারীর জীবনকে প্রতিনিয়ত কীভাবে পদদলিত করে মানবতাবোধকে বিপর্যস্ত করে তুলছে, সমাজের নিম্নবর্গ থেকে উচ্চবিত্ত নারী কেমন করে যৌতুক নামক এই অভিশাপের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে চলেছে— মতিজানের জীবনের মর্মন্তুদ পরিস্থিতি সে-কথাই যেন ব্যক্ত করে। পুরুষতন্ত্রের কারণে নারীর ভাবন মূলত হয়ে পরে পুরুষেরই ভাবনা। পুরুষের ভাবনার ছকেই নারীর জীবন আবর্তিত হয়। বিশেষ করে আধুনিক চিন্তাচেতনার দ্বারা দীক্ষিত নয় যে নারী, তার পক্ষে কখনোই নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। নারী পুরুষতন্ত্রের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে নারীর দ্বারাই নারী নির্যাতিত হয়। নারীই হয়ে ওঠে নারীর প্রতিপক্ষ। মতিজানের শাশুড়ি গুলনূর যেন এ ভাবনারই প্রতিভূ। নিজে নারী হয়েও মতিজানের প্রতি গুলনূরের কোনো সহমর্মিতা গল্পে লক্ষ করা যায় না। গ্রামের লোকের কাছে 'শক্ত ম্যায়ামানুষ' হওয়াটাকে তাই গুলনূর গৌরবের মনে করে। কাজেই স্বামীকে নিয়ে সংসারের সাধ মিটলো না বলে মতিজানের অভিমান হলে স্বামী তাকে বলে দেয় : 'হামাক কিছু কব্যা না। হামি কিছু জ্যানি না। কিছু করব্যার প্যারামো না। মা-ই সব। হামার বুকের মদ্যি পা থুয়্যা চ্যাপা র‍্যাখছে।' ('মতিজানের মেয়েরা', gwZRv‡bi †g‡qiv, MímgMÖ : ২৯৩) স্বামী আবুলের কাছে স্ত্রী ও মা, অর্থাৎ কোনো

নারীই গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে গাঁজা খায় আর নিজের খেয়ালখুশি মতো চলে, স্ত্রীকে অগ্রাহ্য করে। মতিজানের দিন আর রাত কাটে একা একা, 'বিছানায় ছটফট করে'। এহেন পরিস্থিতিতে মতিজানের জীবনে আবির্ভাব ঘটে আবুলের বন্ধু লোকমানের। লোকমানের সঙ্গে গোপন শারীরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মতিজান মা হতে চলে। এ কেবল মতিজানের মা হওয়ার বাসনার পূর্ণতাপ্রাপ্তি নয় বরং এরই মধ্য দিয়ে মতিজান চরিত্রের প্রতিবাদী সত্তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। ক্রমাগত জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যুতে, অবহেলা-বঞ্চনার হাহাকারে, বঞ্চিত-ব্যথিত মানবাত্মা যেন সমস্ত বঞ্চনার মর্মমূলে আঘাত হানতে উদ্যত হয়ে উঠেছে। মতিজান তাই নিজের বড়ো ভাইকে শাশুড়ির কাছে অপমানিত হতে দিতে নারাজ। তীব্র ভাষায় তার উচ্চারণ :

> না, আপনেরা কষ্ট করবার প্যারবেন না। বাবা তো মিথ্যুক আর ঠগ হয়্যা গেছে। কিসের আবার ঘড়ি, সাইকেল? আর হামি? হামি তো গরু হয়্যা গেনু। ওরা হামাক ঘাস খ্যাবার কহে। খি খি হাসিতে মতিজান বাড়ি মাতিয়ে তোলে। এ বাড়িতে আসার পর এই প্রথম ওর বাঁধভাঙ্গা হাসি। ('মতিজানের মেয়েরা', g‡ZRv‡bi tg‡qiv, MÍmgM : ২৯৫)

স্বামীর কাছে সম্পর্কের যথাযথ প্রতিদান না পেয়ে স্বামীর বন্ধু লোকমানকেই অবশেষে মতিজান তার নারী সত্তার পূর্ণতার উপায় হিসেবে বেছে নেয়। সমাজ-গর্হিত সম্পর্ক নিয়ে মতিজানের চিত্তলোকে কোনোরকম পাপবোধ বা অনুতাপ পরিলক্ষিত হয় না। মতিজানের মা হওয়ার প্রসঙ্গটির মধ্য দিয়ে আলোচ্য গল্পে সমাজে নারীর অধস্তনতার আরেকটি দিকের উদ্ভাসন ঘটে। আমাদের সমাজে এখনো কন্যা সন্তান যেন কারো কাম্য নয়। বিষয়টিকে যেভাবেই প্রকাশ করা হোক না কেন, পুত্রসন্তানই যে শেষপর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে— এ সমাজসত্যকে যেন এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। মতিজানের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। পুরুষতন্ত্রের বাতাবরণে গুলনূরের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সমাজ-ভাবনার প্রতিধ্বনি :

> মাইয়া ছাওয়াল বিয়াবার পারব্যা না।
> মতিজান বলে, আপনার আবার পুরুষ ছাওয়ালের শখ ক্যানহে? আপনার ছেলে তো আপনাকে পুছে না।
> — না পুছলে তোর কি রে হারামজাদী। তুই ছেলে বিয়োবি, না বিয়ালে ভালো হবে না কহ্যা দিল্যাম।
> ('মতিজানের মেয়েরা', g‡ZRv‡bi tg‡qiv, MÍmgM : ২৯৭)

এভাবে সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে : 'নারী নিজেই জানে না কেন যে পুরুষ চায়, চায় পুত্র সন্তান, পুত্রের পুত্র। শুধু জানে পুরুষ বংশরক্ষা করে, কিন্তু সত্যিই সেটা কীভাবে ঘটে সে বিষয়ে নারী সচেতন নয়।'[৫৪] পর পর দুই মেয়ের জন্ম দেয় মতিজান। পুত্রসন্তান জন্ম না নিলে নারীকে অগ্রাহ্য করে পুরুষ। পুরুষতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত নারীর কাছেও তার কোনো গুরুত্ব থাকে না। যেমন শাশুড়ি গুলনূর মতিজানের কন্যাসন্তান জন্মদানের বিষয়টিকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। বংশরক্ষার জন্য ছেলের আবার বিয়ে দিতে উদ্যোগী হয় গুলনূর। মতিজানের উদ্দেশ্যে তার আক্রোশপূর্ণ উচ্চারণ :

> যে বউ কেবল মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয় তাকে সে সংসারে রাখবে না। ছেলে বাড়ি এলে এই বউকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিবে। ... গুলনূর চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে, অক্যুনই অক্যুনই হারামজাদীর বাড়ি থিকা ব্যার করবো। ... আজ থিকা হামার সংসারে তুমহার ভাত ন্যাই। হামি হামার ছাওয়ালোক আবার বিয়া করামো, হামার বংশে বাত্তি লাগবো। ('মতিজানের মেয়েরা', g‌ZR‌v‡bi †g‡qiv, MímgM : ২৯৮)

সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের প্রশ্নে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে নারী নয় বরং পুরুষই দায়ভার বহন করে। অথচ সমাজবাস্তবতায় এ দায়ভার অবলীলায় নারীর উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে বিষয়ে নারীর প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা থাকে না, সমাজ ও পুরুষতন্ত্র নারীকে সেই বিষয়ের জন্যই প্রকাশ্যে হেয় প্রতিপন্ন করে। আলোচ্য গল্পে মজিতানের মেয়ে জন্ম দেয়ার বিষয়টিকেও সমাজের এই হীন মানসিকতার মোড়কে আচ্ছাদিত করে রূপায়িত করা হয়েছে। নারীর প্রতি পশ্চাৎপদ এহেন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার অনগ্রসরতার চিত্রটি যথার্থভাবে উন্মোচিত হয়েছে এবং সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটিও একই সঙ্গে মূর্ত হয়েছে। লক্ষণীয়, 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পের শেষটুকু খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। পুত্রসন্তানের প্রত্যাশায় শাশুড়ি ও স্বামীর অবহেলা, ধিক্কার চরমে পৌঁছলে সবাইকে সচকিত করে খি খি করে হেসে ওঠে মতিজান বলে : 'বংশের বাত্তি? আপনের ছাওয়ালের আশায় থাকলে হামি এই মাইয়া দুডাও পেত্যাম না।' ('মতিজানের মেয়েরা', g‌ZR‌v‡bi †g‡qiv, MímgM : ২৯৮) গ্রামের শক্ত মেয়েমানুষ শাশুড়ির বিস্ফারিত চোখের সামনে দু'হাতে দু'মেয়েকে বুকের সঙ্গে যখন আঁকড়ে ধরে মতিজান, তখন : 'মায়ের বুকের ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে চোখে সবার দিকে তাকায় মতিজানের মেয়েরা।' ('মতিজানের মেয়েরা',g‌ZR‌v‡bi †g‡qiv, MímgM : ২৯৮) শেষ পর্যন্ত নারীই হয়ে ওঠে নারীর আশ্রয়। নারীকে রক্ষাকল্পে নারী প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে নারীর তথা সমাজের প্রচলিত অচলায়তনের। নারী হয়ে ওঠে নারীর রক্ষা কবচ। কেননা: 'নারীর নিজস্ব জগত নারীকেই জানতে হবে।'[৫৫] গল্পের শেষাংশে এসে মতিজান চরিত্রের এই যে প্রচলিত সামাজিক অব্যবস্থাপনার প্রতিপক্ষে অবস্থান নেয়া, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানো— আমাদের সমাজবাস্তবতায় এ চিত্র একান্তই দুর্লভ। কেননা প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে :

> 'যা কিছু ব্যক্তিগত তাই রাজনৈতিক'— নারীর জীবনকে এখন এভাবেই দেখা হয়। নারীজীবনের সংকটের উৎস হচ্ছে তার শরীর আর সামাজিক অনুশাসন বা সমাজ নির্ধারিত জীবন। সমাজ নারীর জীবনকে এমন একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে দেয় যে, নারী সেই বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে। নারীর ব্যক্তিক আচরণ কার সঙ্গে কেমন হবে, সমাজই নির্ধারণ করে দেয়।[৫৬]

স্বাভাবিকভাবেই তাই আলোচ্য গল্পের শেষাংশে মতিজানের ভূমিকা প্রসঙ্গে কৌতূহল উদ্দীপিত হয়। মূলত সেলিনা হোসেন তাঁর গল্পের নারীকে প্রজ্ঞা আর সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পের নারী তাই জীবন যেমন হওয়া উচিত সেই নিরিখেই নিজ ভূমিকায় প্রোজ্জ্বল। সমাজ বদলাবে, নারীই হয়ে উঠবে নারীর আশ্রয়, যৌথ জীবনযাপনের অংশ-- এই দৃঢ় প্রত্যয়দীপ্ত আশাবাদে

পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য করে আত্মমুক্তির আর আনন্দের পথ নিজে নিজেই খুঁজে নেবে নারী। আত্মমুক্তির সেই আলোকিত পথ ধরেই আলোচ্য গল্পের মতিজানও তাই তার মেয়েদের নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নে-আকাঙ্ক্ষায় গৌরবান্বিত।

g‍ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'আকালির স্টেশনের জীবন'। নিম্নবিত্ত খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। সেলিনা হোসেনের গল্পে বিশেষভাবে লক্ষণীয় : 'জীবনের আহ্বানে, বেঁচে থাকার আকুল বাসনায় তাঁর প্রিয় মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে শহরে। কিন্তু গ্রামের মতো শহরেও এরা অপাঙ্‌ক্তেয়, অবশেষে উন্মূলিত, জীবনবিচ্যুত, আশারিক্ত।'[৫৭] 'আকালির স্টেশনের জীবন' গল্পে এইসব উন্মূলিত-নিরন্ন-আশাহত মানুষের জীবন-বঞ্চনার হাহাকার সুস্পষ্ট। গল্পটিতে আকালি চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে জীবিকার আশায় বা জীবনের হাতছানিতে শহরে ছুটে আসা নিম্নবর্গের মানুষের জীবন-যুদ্ধের বিচিত্র টানাপড়েনের চিত্রটি সমাজবাস্তবতার আলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আকালিদের কোনো স্বপ্ন থাকতে নেই জীবনে। কেননা :

> সেই তো কবে থেকেই এই অমানুষ হওয়া শুরু। ওর দেড় বছর বয়সে যেদিন সৎমা ঘরে এলো সেই থেকে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বুঝতেই পারেনি মানুষ কী, ভালোভাবে বাঁচা কী। তেরো বৎসর বয়সে সৎমার নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য দূর সম্পর্কের এক ফুফুর সঙ্গে গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিলো। ইচ্ছে ছিলো বাসাবাড়িতে কাজ করে নিজের রোজগারের পথ নিজে দেখবে, একটু ভালোভাবে বাঁচবে। এই কমলাপুর স্টেশনে ফুফু ওকে বসিয়ে রেখে কোথায় যে চলে গেলো আর দেখা হলো না। তেরো বছর পেরিয়ে গেছে, এখন ওর বয়স ছাব্বিশ। কত বাসায় কাজ পেলো, কতোজনের হাত বদল হলো, সেসব হিসেব এখন ও আর করে না। ('আকালির স্টেশনের জীবন', g‍ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩০০)

গ্রাম থেকে উন্মূলিত আকালিদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা সমাজবাস্তবতার কালো থাবায় এভাবেই হারিয়ে যায়। জীবন তাদেরকে কোনো সুখ বা স্বস্তির আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হয়। জীবনকে বোঝার মতো টেনে বেরানো ছাড়া আকালিদের কোনো গত্যন্তর থাকে না। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে স্টেশনের অনিশ্চিত জীবনই তাদের সম্বল হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় :

> রাত নামলে ওর শরীর বিষে টইটুম্বর। নীল বিষ চুঁইয়ে পড়ে মালগাড়ির ঘুপচিতে, স্টেশনের শেষ প্রান্তে, প্লাটফরমের নিচে ঘাসের ওপর কিংবা গোডাউনের পাশে রেলের পুরনো কামরায়। ওর ঘর নেই, ঘরের জন্য ওর টানও নেই। ভাবে, ঘর নেই তো কী হয়েছে, কমলাপুর রেলস্টেশন তো আছে–– যেখানে দিব্যি শরীর বেচা যায়, দু'পয়সা আয় হয়। ভাত জোটে, কাপড় জোটে। ... জীবনে ওর কিছু তো আর হারবার নেই–– পাওয়ারই বা কি আছে? এই তো সেদিন, সেই তেরো বছর বয়সে একজন পুরুষ মানুষ ওকে বয়স্ক করে দিয়েছিলো। সেদিন ও বিস্ফারিত চোখে দেখেছিলো কেমন করে পা বেয়ে রক্ত নামে। ... লোকটি দশটি টাকা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলো। ও চিৎকার করে বলেছিলো, আমি টাকা চাই না। আমারে রক্তের দাম দ্যান। ('আকালির স্টেশনের জীবন', g‍ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ২৯৯)

সমাজে আকালির মতো মেয়েরা তীব্র যন্ত্রণা ও রক্তের দাম না পেলেও খুব সহজেই 'বেশ্যা' উপাধি পেয়ে যায়। যে পুরুষের বদৌলতে সমাজ নারীর ললাটে 'বেশ্যা' উপাধি এঁকে দেয়, সেই পুরুষের জীবনে কোনো ব্যত্যয় হয় না। কেবল অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে নারী একেলা। পুরুষতন্ত্র এভাবেই আত্মভোগের লাম্পট্যে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করেও খুব সহজেই পার পেয়ে যায়। সমাজে বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষের যে অধিকার ও অভিগম্যতা আছে, নারীর সেসব নেই। নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাই অসম, সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এসব কারণেই পুরুষের দ্বারা সামাজিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় নারী। পুরুষ তার স্বার্থে নারীর জীবনকে এরকম করে তুলেছে। এই অনভিপ্রেত কঠোর সমাজ-সত্যটি 'আকালির স্টেশনের জীবন' গল্পে জীবনঘনিষ্ঠ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে : 'গ্রামীণ নারী এভাবেই পুরুষকেই ধ্যানজ্ঞান মনে করেছে। তার ভেতরে গড়ে উঠেছে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বোধ। গ্রামীণ নারীর যৌনজীবনও এভাবেই পুরুষের বশ্যতা মেনে নিয়েছে। তার জীবনকে সে পুরুষের কাছে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করেছে।'[৫৮] কিন্তু সেলিনা হোসেন নারীভাবনার প্রচলিত এই ছকটাকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন, 'আকালির স্টেশনের জীবন' শীর্ষক গল্পের আকালির মাধ্যমে। গ্রামের অভাব-অনটন আর অনিশ্চয়তার জীবন থেকে পালিয়ে আসা নিম্নবর্গের এই ষোড়শী 'তুচ্ছ কাজের মেয়ে' আর 'বেশ্যা' মেয়েটি তাই রাজপুত্রের মতো দেখতে বাড়ির মালিকের ছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। সমাজ অভিহিত এহেন 'অনৈতিক' সম্পর্কের মধ্যে আকালি কোনো পাপ খুঁজে পায়নি। তার সঙ্গসুখ আকালির ভালো লেগেছিলো। কেননা সেই পুরুষ ছিলো তার আকাঙ্ক্ষার পুরুষ, তার স্বপ্নের 'রাজপুত্র'। এরকম অনৈতিক সম্পর্কের মাঝেই সে অনুভব করেছিলো :

> রাজপুত্রের মতো ছেলেটির গরম নিঃশ্বাস বয়ে যাচ্ছে ওর শরীরে। এক ধরনের ব্যাকুলতা প্রবল বেগে ওকে গ্রাস করেছিলো এবং ছেলেটির সঙ্গসুখ ওর একটুও খারাপ লাগেনি। এরপর এমনই আরো কতো রাত কেটেছে। নিজের ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া আকালির তখন ভালোমন্দ বোধ ছিলো না-- ওর কাছে সেই ছেলেটির আবেদন ছিলো গভীর। ('আকালির স্টেশনের জীবন', g‡ZR¨v‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩০০)

আকালির এই বাস্তবতা অজানা নয় যে, শ্রেণি-অবস্থানের কারণে তার চেয়ে উঁচু স্তরে অবস্থিত 'রাজপুত্রে'র মতো ছেলেটিকে তার ভালোবাসার স্বপ্ন দেখাটাও অন্যায়। ওদের সঙ্গে ভালোবাসা হয় না। কিন্তু :

> ঐ সুখটুকু ও নিজেও ভোগ করেছিলো। এর জন্য ওর কোনো দুঃখ নেই, বরং এখনও মনে করে সেই দিনগুলো ওর সুখের দিনই ছিল। কখনো মনে হয়নি যে ও ধর্ষিত হচ্ছে ; যে কোনো সময় ওর পা বেয়ে নতুন তাজা রক্ত নেমে আসতে পারে। ঐ কয়েকটি দিনের স্মৃতিই ওর সুখ-- হোক অন্যায়, তবু যা ওর ভালোলাগা ছিলো, তা ও ন্যায় বলেই মানে। ('আকালির স্টেশনের জীবন', g‡ZR¨v‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩০০)

আকালির ভালোলাগা-ভালোবাসা, ন্যায়-অন্যায়বোধ সমাজের দৃষ্টিতে অতি নগণ্য বিষয়। তাই বাড়ির গৃহিণী যেদিন তার চুলের মুঠি ধরে ওই বাড়ি থেকে বের করে দেয়, তখন তার আর কোনো দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। বাড়বাড়ন্ত শরীরের বড় পেট দেখে বস্তির আশ্রয়দাত্রী 'বিচার' চাওয়ার কথা জানালে আকালি তার তীব্র বিরোধিতা করে। নিজের ভালোলাগা-ভালোবাসার অনুভূতিকে সে সমাজের ন্যায়-অন্যায়বোধের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে নারাজ। সমাজবাস্তবতার প্রচলিত অন্যায়-অচলায়তনের বিপরীত স্রোতে দাঁড়িয়ে তার ভাবনা জীবনের আহ্বানে ও জয়গানে মুখরিত হয়ে সমাজবাস্তবতার পশ্চাদ্দেশে চপেটাঘাত করে এভাবে :

> আকালি চুপ করে থাকে। নিশি ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়, নিজের সর্বনাশ নিজে বুঝস নাই?
>
> -- ক্যান সর্বনাশ, সর্বনাশ করেন? আমার কুনু সর্বনাশ অয় নাই। নিশি দাঁত কিড়মিড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, ব্যাডাডা কেডা?
>
> -- জাইনা কি অইবো?
>
> আমি গিয়া জিগামু, বিচার চামু।
>
> বিচার? আকালির মাথা ঘুরে ওঠে। অন্যায় কোথায় যে বিচার?
>
> ...
>
> চিৎকার করে ওঠে নিশি, কবি না ব্যাডাডা কেডা?
>
> আকালি প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়ে বলেছিলো, না।
>
> -- তোর সন্তানের বাপ লাগবো না?
>
> -- না।
>
> আকালির চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চকচকে নীল ওর কালো চোখের তারায়। নিশি ওর দিকে তাকিয়ে থমকে যায়। তারপর গলা নামিয়ে বলে, কী কস? ('আকালির স্টেশনের জীবন', gwZR¨‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩০১)

আকালির কাছে সম্পর্কের মানবিক বোধটুকুই যথেষ্ট। সামাজিক স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা সে করে না। সমাজবাস্তবতার একদম বিপরীত স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে সহজ-সাবলীলভাবে তাই সে বলতে পারে, তার সন্তানের বাপের প্রয়োজন নেই। আকালির মধ্য দিয়ে আলোচ্য গল্পে : 'পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে তৈরি হওয়া নারীভাবনার ছক এভাবেই ভেঙে দিলেন সেলিনা হোসেন। এই ভাবনা নিঃসন্দেহে তার চেতনাপ্রসূত, নারীর আত্মমুক্তির নতুনসূত্র তুলে ধরে পাঠকের সামনে, বিশেষ করে আধুনিক নারীর সামনে।'[৫৯] বাংলাদেশের সমাজ-বাস্তবতায় আকালি সমাজের স্বাভাবিক কোনো নারীর ভূমিকায় আর আটকে থাকে না। সে হয়ে পড়ে অনন্যা। যে অন্যায়ের কারণ নারী নিজে নয়, বরং সমাজ যে পাপের, যে অন্যায়ের সূতিকাগার-- সে অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করার স্পর্ধা এখনও আমাদের প্রচলিত সমাজবাস্তবতায় নারীর মধ্যে যথাযথভাবে লক্ষণীয় নয়। সে প্রেক্ষাপটে আকালি নিঃসন্দেহে 'গল্পকার সেলিনা হোসেনের আত্মনির্মিত নারী, তাঁর চেতনার রঙে নির্মিত।'[৬০] নারী কেবল নারী হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে তার মানবিক মূল্যবোধের অধিকারটুকু অর্জন করবে, আদায় করে নেবে-- এই প্রত্যয়দীপ্ত আশাবাদ আলোচ্য গল্পে আকালির মধ্যে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন সেলিনা হোসেন। কেননা :

এখন নারীকে নিজের যোগ্যতায় পথ তৈরি করতে হবে। নারীর সামনে সমাজের নিজস্ব কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। নারীর জন্য পারিবারিক, সামাজিক সুযোগ পুরুষের মতো অবাধ নয়। এ দৃশ্য তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত একই রকম। নারীকে প্রতিবন্ধকতার দেয়ালে আঘাত করতে হবে।[৬১]

আলোচ্য গল্পের আকালি তাই কেবল গ্রাম থেকে উঠে আসা নিম্নবর্গের উন্মুলিত মানুষের জীবনযুদ্ধে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট আর সমাজের নিস্পেষিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হয়েই থাকে না, বরং গল্পকারের প্রাগ্রসর ভাবনায় হয়ে ওঠে নারীর আত্মজাগরণের শিল্পসন্তান।

g‼ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'বৈধব্য'। সামাজিক বিধিনিয়মের কঠোর বন্ধন এবং কুসংস্কার-অজ্ঞতা কীভাবে জীবনকে বিষিয়ে তোলে, জীবনের সুকুমার পথটিকে কণ্টকাকীর্ণ করে এবং এর চাপে সমাজে অবহেলিত পশ্চাৎপদ নারী কীভাবে নিজ জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার বদলে বৈরী জীবনকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়, পরিণামে জীবন তার কাছে হয়ে পড়ে বিবর্ণ-ধূসর-- সেই আলেখ্যই 'বৈধব্য' গল্পে বিধৃত হয়েছে শিল্পকুশলতায়। সমাজ-নির্মিত পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অসহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নারী কেমন করে অবলীলায় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টায় ব্রতী থাকে, সমাজ এবং পুরুষতন্ত্র নারীকে তার ভাবনার নিজস্ব চেতনার-বলয় তৈরিতে কেমন করে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে-- এ সমস্ত বিষয়ই আলোচ্য গল্পে আছিয়া চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। নুরু মুন্সীর সংসারে তেমন অভাব নেই। মোটামুটি সচ্ছলই বলা যায়। জমিজমার চাইতেও আছে তার বিশাল বাঁশ বাগান। কিন্তু তার সুখের সংসারে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কন্যা আছিয়া। নুরু মুন্সীর প্রিয় বন্ধু ভোম্বল, জ্যোতিষবিদ্যায় যার গভীর আস্থা, কন্যা আছিয়াকে নিয়ে ভোম্বলের ভবিষ্যদ্বাণী নুরু মুন্সীর যাবতীয় ভাবনার মূল বিষয়। ভোম্বলের মতে : 'তোর এই মেয়ের হাতে বৈধব্য আছে। ... একটা গোমেদ পাথরের আংটি রূপা দিয়ে বানিয়ে মেয়ের অনামিকায় পরিয়ে রাখিস। শনি কেটে যাবে।' ('বৈধব্য', g‼ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩০৩) এরপর থেকেই আছিয়ার জীবন বদলে যেতে থাকে। ওর বৈধব্য নিয়ে বাবা নুরু মুন্সী খুব চিন্তিত। কেমন করে এই বৈধব্যকে ঠেকানো যায় সেই চিন্তায় একঝাড় বাঁশ বিক্রি করে গঞ্জ থেকে একটা আংটি বানিয়ে নিয়ে আসে আছিয়ার জন্য। আছিয়াকে নিয়ে তার মায়েরও ভাবনা কম নয়। নুরু মুন্সীর মতে, প্রায় উনিশ বছর বয়স হলেও আছিয়ার বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন হয়নি। আছিয়া তার বাবার এইরকমের ভাবনায় যেন খুশিই হয়, কেননা তারও ধারণা : 'মেয়েমানুষের বেশি বুদ্ধি না থাকাই ভালো। মা তো কেবল সারাদিন রাঁধে। রাঁধার জন্যে কি বুদ্ধি লাগে? ভোম্বল কাকাও বলে, মেয়েদের বেশি বুদ্ধি হলে সংসার নষ্ট হয়।' ('বৈধব্য', g‼ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩০৪) এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজবাস্তবতা নারীর ভাবনায় মূলত পুরুষের তথা সমাজের ভাবনাকেই বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলে। নারীর ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বোধও স্বাভাবিকভাবেই তার নিজের থাকে না। গল্পে আছিয়ার ধারণার মধ্য দিয়ে এ সমাজ সত্যটি উন্মোচিত। একই সঙ্গে সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির

সংকীর্ণতাটুকুও অপ্রকাশ্য থাকে না। নিজস্ব বিচার বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্কের পরিবর্তে অন্ধবিশ্বাস নুরু মুন্সীকে আচ্ছন্ন করে বেশি মাত্রায়। ফলে কন্যা আছিয়ার বৈধব্য ঠেকানোর উপায় এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে তার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে না। সমস্ত সংসারে এই দুশ্চিন্তার কালো ছায়া বিরাজমান থেকে ঘরের স্বাভাবিক শান্তি বিঘ্নিত করে তোলে। এ সমস্ত কিছুই আছিয়াকে ব্যাকুল করে, ব্যথিত করে। কেননা :

> আছিয়ার মা গুনগুন করে কাঁদে। আছিয়া নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। দুঃখ না, রাগ না, এক অদ্ভুত বিষণ্নতা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ... কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই জীবন বোঝার মতো হয়ে যাচ্ছে। এই আংটিটা হাতের ওপর যেন দশ মন ওজনের। ও কি করবে? কোথায় গেলে স্বস্তি হবে? বাবা ফিরে পাবে শান্তি এবং মাও? ... চকচকে রুপোর আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। ইচ্ছে হয় খুলে ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু ভয় হয়। এক অজানা ভয় ওকে জাপটে ধরে রাখে। ... নিজের ওপর এক বিশাল ক্রোধ ওকে ছিন্নভিন্ন করে। ('বৈধব্য',g‡ZR\bi †g‡qiv, MímgM : ৩০৮-৩০৯)

এভাবেই আছিয়া পরিবারের অসহ গ্লানিময় পরিস্থিতিকে নিজের দায়ভার বলেই মেনে নেয়। কেননা এখনও 'একজন নারী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারেন না প্রথাগত ধ্যানধারণার এই সমাজ বাস্তবতায়।'[৬২] আছিয়া সে-কারণেই তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বয়সের আবদেলের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবে খুশিমনে রাজি হয়ে যায়। যদিও গল্পের কোথাও এ বিয়ে নিয়ে আছিয়ার ওপর কোনো রকমের চাপ প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। কিন্তু সেই চাপ বা তাগাদা আছিয়া অনুভব করে নিজের ভেতর থেকে। সমাজ আরোপিত এই অপ্রকাশ্য চাপকেই আছিয়া ভালোবাসা ভেবে ভুল করে। একরকম আছিয়ার ইচ্ছেতেই আবদেলের সঙ্গে তার বিয়েটা হয়ে যায়। এ বিয়েতে আছিয়ার মায়ের প্রবল সম্মতি ছিলো, কেননা তার ধারণা : 'আবদেলের ঘরে প্রাচুর্য আছে, মেয়ে সুখে থাকবে।' ('বৈধব্য', g‡ZR\bi †g‡qiv, MímgM : ৩১২) আছিয়ার মায়ের এহেন ভাবনার আবরণে নারীর হৃদয়ের ব্যাকুলতা, তার আবেগ-অনুভূতির গুরুত্বহীনতা, সর্বোপরি নারীর একান্ত চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজপ্রসূত অবহেলা আর উদাসীনতার বিষয়টিও রূপ লাভ করেছে। আবদেলের সঙ্গে আছিয়ার বিয়ে পরবর্তী দৃশ্যপট নারীর স্বপ্নভঙ্গ, আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ও অতলান্ত দুঃখ-বেদনার স্বরূপটিকে প্রতিবিম্বিত করে তোলে :

> যতো দিন যায় আছিয়া উপলব্ধি করে ব্যাকুলতাই প্রেম নয়। প্রেমের জন্য আরো বাড়তি কিছু চাই। এই বোধ ওকে তাড়িত করলেও নিজের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারে না। আবদেল ওকে যত্ন করে। হাট থেকে ভালো মাছ তরকারি কিনে আনে। তেল, সাবান, ডুরে শাড়ি এনে দেয়। আছিয়ার ভালো লাগে না। ও আবদেলের কাছে আরো আবেগ চায়। সে আবেগ ওর নতুন যৌবনের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু আবদেল এসব বোঝে না। বোঝে পাঙ্গাস মাছ আর সুবাসিত তেলই বুঝি আছিয়ার জন্য জরুরি। ও একা একা সময় কাটায়।... এই কষ্ট কাউকে বোঝানো যায় না। প্রচণ্ড এক শূন্যতা কুরে খায় ওকে। ওর ইচ্ছে করে এই সংসার থেকে পালিয়ে যেতে। বারবার মনে হয় ও এক অদৃশ্য শেয়ালের জ্বলজ্বলে দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ... বছর গড়াতেই আছিয়া বোঝে ওর দিনগুলো সব শেয়ালের গর্তে চলে গেছে। আবদেলের সাহচর্যে ওর জন্য কোনো উত্তাপ নেই। ('বৈধব্য', g‡ZR\bi †g‡qiv, MímgM : ৩১২)

উত্তাপহীন জীবন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায় আছিয়া। জীবনে না-পাওয়ার বঞ্চনা তাকে ব্যথিত ও হতাশায় নিমজ্জিত করে তোলে। অবশেষে সেই মুক্তি মেলে, বছর দেড়েকের মাথায় কলেরায় আবদেলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আছিয়া বিধবা হয়। এই বৈধব্য যেন তার অনেক আকাঙ্ক্ষার মুক্তির বাতায়ন হয়ে ওঠে। তাই আছিয়া তার পিতাকে অবলীলায় বলতে পারে :

> তুমি কষ্ট পেয়ো না বাবা। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। আমার কোনো দুঃখ নেই।
>
> -- তুই কি এমন চেয়েছিলি?
>
> আছিয়া নুরু মুন্সীর চোখে চোখ রাখে।
>
> -- হ্যাঁ বাবা।
>
> নুরু মুন্সী চোখ নামিয়ে নেয়। ... বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এই বৈধব্যের জন্য আছিয়ার কোনো দুঃখ নেই।
>
> ('বৈধব্য', g‡ZR‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩১৩)

আছিয়ার এই সরল স্বীকারোক্তি সামাজিক অনুশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ নারীর আত্মমুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত। সমাজ বাস্তবতায় এহেন দৃঢ়চেতা নারীর আনাগোনা লক্ষণীয় সাধারণ ব্যাপার না হলেও, নারী তার মুক্তির পথ নিজেই খুঁজে নেবে, তৈরি করবে আপন ভুবন-- এমনটাই সেলিনা হোসেনের অভীপ্সা। যে জীবন আছিয়া অতিবাহিত করে চলেছিলো তার চেয়ে 'বৈধব্য'র মধ্য দিয়ে যে জীবন সে পেতে চলেছে, সেই বন্ধনমুক্ত, স্বস্তিদায়ক একান্ত আপনার করে উপভোগ করা জীবনই আছিয়ার কাম্য হয়ে ওঠে। ফলে আলোচ্য গল্পের মধ্যেও সেলিনা হোসেনের নিজস্ব-ভাবনার চেতনা-প্রসূত নারীর প্রতিচ্ছবি শিল্পরূপ লাভ করেছে। লক্ষণীয় : 'নারী-অধস্তনতার ছবি নয়, তার পরাজয়ের কাহিনি নয়, সেলিনা হোসেনের গল্পের অধিকাংশ নারীই দারুণ লড়াকু।'[৬৩] ঠিক তেমন প্রবলভাবে না হলেও তথাকথিত সমাজবাস্তবতার সংকীর্ণতার মর্মমূলে আলোচ্য গল্পের আছিয়ার, বৈধব্যকে সাদরে গ্রহণ করার মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নারীর আত্মজাগরণের মূলমন্ত্রটি অনুরণিত হয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায়।

g‡ZR‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'হৃদয় ও শ্রমের সংসার'। নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে, পারস্পরিক সুস্থিরতা, আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের পথ ধরেই কোনো সংসারের বুনিয়াদ মজবুত হতে পারে। সংসার কেবল নারী বা শুধু পুরুষের একক অবদানে সার্থক হতে পারে না। নারী-পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টায়, ভালোবাসা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ এবং ত্যাগ করার মানসিকতার মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পরিবারই সমাজ ও রাষ্ট্রে যথার্থ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এভাবেই একটু একটু করে দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। অথচ এর ব্যত্যয় হলেই পরিবার নামক কাঠামোটির ভেতরে-বাইরে তৈরি হয় টানাপড়েন এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অবশ্যম্ভাবীভাবে সমাজ-রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, মানবতাবোধ হয় বিপর্যস্ত। আমাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় নারী

বিভিন্ন মাত্রিকতায় অসম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। সমাজ নারীকে, পুরুষের অধস্তন রাখতেই মহাব্যস্ত। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের, আপন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ-আরোপিত বিধি-বিধানের কঠিন বেড়াজাল। পিতৃতন্ত্র চিরকালই নারীকে দাবিয়ে রেখেছে, তাকে মানুষ হিসেবে নয় বরং নারী হিসেবেই বিবেচনা করেছে। অথচ এও সত্য যে, এই কণ্টকাকীর্ণ পথ থেকে আলোর পথে আসার ইচ্ছে এবং দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলার ক্ষেত্রে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে। নিজেকে জাগাবার দায়ভার এক্ষেত্রে নারীর। নারীর আত্মমুক্তির পথ তাকেই চিহ্নিত করতে হবে সেই সঙ্গে প্রতিবাদ করার এবং 'না' বলার মতো দৃঢ়তা ও সাহস অর্জন করতে হবে। এরকমই এক পটভূমিতে 'হৃদয় ও শ্রমের সংসার' গল্পের আবহ নির্মিত হয়েছে।

গল্পে আঠার বছরের ফুলবানু তার পিতা আমজাদ মিয়ার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ফুলবানুর মতামতের কোনোরকমের তোয়াক্কা না করেই পিতা আমজাদ মিয়া মেয়ের দাদার বয়সী কাশেম খানের সঙ্গে, ইতোমধ্যে যার ঘরে তিন স্ত্রী বর্তমান, তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করেছে। বিনিময়ে আমজাদ মিয়াকে কাশেম খান বারো কাঠা জমি লিখে দেবে আর ফুলবানুকে দেবে গা-ভর্তি সোনাদানা। ফুলবানুকে অবলম্বন করে কিছু সম্পত্তি উপার্জনের স্বপ্ন দেখে পিতা আমজাদ মিয়া। এই বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে পিতা-কন্যার মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। গল্পে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় আবহটি বিধৃত হয়েছে এভাবে :

> আমজাদ মিয়া সরাসরি মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। বলে, কিছু বুলছিস না যে? সম্বন্ধ পছন্দ হয়নি?
>
> -- এইডা কুনু সম্বন্ধ লয়।
>
> ফুলবানু চোখে আগুন ছুটিয়ে বলে।
>
> -- ক্যানহে খারাপ কি? শত শত বিঘা ভুঁই, আমবাগান, বাড়ি ...
>
> -- শত শত বউ ...
>
> -- পুরুষ মানষে চারডে বিয়্যা করব্যার প্যারে।
>
> -- আর বয়স?
>
> -- পুরুষ মানষের বয়স কিছু নয়। ('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', g¨ZR‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩১৪)

এভাবেই পুরুষতন্ত্র, সামাজিকীকরণের নামে, তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকে নারীর উপর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু ফুলবানু এই বিপর্যয়ের মুখে স্থির সিদ্ধান্তে অনড়। সে এই প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে পালিয়ে যায় না, কান্নায় ভেঙে পড়ে না, এমনকি পারিবারিক এই চাপকে মোকাবেলা করার মানসিকতায় পিতার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে নিজের প্রতিবাদী সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় :

> যে জনক ওর সুখ চিন্তা না করে নিজেদের লোভের কাছে ওর সবকিছু জমা করেছে, তাদেরকে ও কিছুই পেতে দেবে না। এ বিয়ে হবে এবং কাশেম খানকে কোনো জমি দিতে হবে না। ... ওর ছোট মতিবানু রান্না করছে। ওকে দেখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিচলিত কণ্ঠে বলে, বুবু তুই আব্বাক ক যে এই বিয়া হবি না। ফুলবানু হেসে ফেলে। বলে, হবি না ক্যানহে ? হবি। হামি কাশেম খানকে বিয়্যা করম।

-- বুবু, তুমি পাগল হল্যা?

-- হল্যাম।

ফুলবানু খিলখিলিয়ে হাসে।

-- গা-ভরা গয়না দিবি, বাক্স-ভরা শাড়ি দিবি। স্নো-পাউডার ত্যালের শিশি কতো কি? ক্যাবল হামার বাপে ভুঁই প্যাবে না।

-- ভুঁই প্যাবে না তো বিয়্যা হবি ক্যান?

-- ভুঁই ছাড়াই বিয়্যা হবি। ('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', gÄZR¨vi‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩১৪-৩১৫)

এভাবেই ফুলবানু তার উপর নেমে আসা সমাজ-প্রসূত পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার দেয়াল অতিক্রম করতে চেয়েছে। কেবল পিতাই নয়, কাশেম খানকেও ও দেখে নিতে বদ্ধপরিকর। ফুলবানু এতো দুর্বল নয়। সমাজ-সংসারকে বৃদ্ধাঙুলি দেখাবার মতো দৃঢ়তা তার আছে। কেননা :

> ও এই সংসারকে মোকাবিলা করতে চায়, যে সংসার টেনে ধরে ঘাড়, পা উঠিয়ে দেয় ঘাড়ের ওপর এবং ঘাড়টাকে চেপে ধরে মাটির সঙ্গে, গেঁথে দিতে চায় মাটিতে, যেন ঘাড়টা আর সোজা হতে না পারে। ... ও ভীত হতে চায় না। ও সাহসী ও একরোখা থাকবে। মতিবানু ওকে স্বপ্ন দেখাতে চায়, জীবনের স্বপ্ন, সংসারের স্বপ্ন। কিন্তু জানে তা হবে না। পিতার লোভের কাছে ওর স্বপ্ন মূল্যহীন। ('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', gÄZR¨vi‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩১৫-৩১৬)

তাই ফুলবানু তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সমাজ-সংসারের প্রচলিত অন্যায়-বিধি-বিধানের বিপক্ষে অবস্থান নিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না। সে উপলব্ধি করে যে : 'নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি যদি নাই থাকে, তবুও না বলার শক্তি থাকা নারীর জন্য প্রয়োজন।'[৬৪] পিতাকে তাই পরাজিত করে সে কাশেম খানকেও দেখে নেবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বিয়ের ঠিক আগের দিন, সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই ফুলবানু কাশেম খানের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় এবং তার ইচ্ছেমতোই কাশেম খানের বাড়িতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। বিয়ের রাতেই ফুলবানু ও কাশেম খানের কথোপকথন পাঠককে আরেক সমাজ-সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় এবং সেই সূত্রে সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত অবস্থানটিও চিহ্নিত হয়ে পড়ে :

গভীর রাতে কাশেম খানের লোভাতুর হাত ওকে আঁকড়ে ধরে। বলে, হামার পুত্র চ্যাই। বংশরক্ষ্যা চ্যাই। রুখে উঠে ফুলবানু, পুত? পুত কি আসমান থিক্যা পড়ব্যা অক্যান। যদি আপনের দোষ থাকে?

-- দোষ?

কাশেম খান গর্জে ওঠে। চাপাস্বরে খিলখিলিয়ে হাসে ফুলবানু। বলে, যে বেডা মানষের তিন বউয়ের পুত হয় না ...

-- খামোশ! ('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', gÄZR¨vi‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩১৯)

আমাদের সমাজ-বাস্তবতায় কন্যা শিশু কতোটা অনাদর আর অবহেলার শিকার, সমাজে নারীর প্রতি এই উপেক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিটুকু এই কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। যে কোনো অপরাধে বা সমস্যায় সমাজ নারীকেই কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করায় অবলীলায়। তাই দেখা যায়, বিয়ের পরেও ফুলবানু পর পর দুমাস ঋতুমতি হলে :

কাশেম খান জ্বলে উঠে বলে, বাঁজা মেয়ে মানুষ।

-- বাঁজা আপনি না হামি? ডাক্তারের কাছে চলেন। পরীক্ষা হবি।

-- পরীক্ষা?

কাশেম খান বিব্রত বোধ করে। ('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', g‖ZR¨‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩১৯)

কাশেম খান নয় বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজই বিব্রত বোধ করে ফুলবানুর এহেন দৃঢ়তায়। আমাদের সমাজবাস্তবতার এক করুণ দিক হলো, সন্তান ধারণের সফলতা-ব্যর্থতার দায়ভার অবধারিতভাবে নারীর উপরই বর্তায়। পুরুষও যে এই ব্যর্থতার হোতা বা কারণ হতে পারে-- এ সত্য স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃত হয় না। এমনকি ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে পুরুষের সম্পৃক্ততার বিষয়েও এক ধরনের ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত সমাজবাস্তবতা হলো : 'যদিও পরিবার পরিকল্পনার কর্মীরা বলেছে সন্তান না হওয়ার বেলায় নারী-পুরুষ উভয়েরই ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু পুরুষের ত্রুটি কি স্বীকার করা যায়? সব দোষ তো বাঁজা মেয়েমানুষের।' ('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', g‖ZR¨‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২০) কিন্তু ফুলবানু এই প্রচলিত ধারণাকে অস্বীকার করেছে। কেননা : 'লোভী পিতাকে ও পরাজিত করেছে। এখন লোভী স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াই।' ('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', g‖ZR¨‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২০) এ লড়াইয়ে নারীকে একাই মনোবল যোগাতে হয়। পরিবার-সমাজের এতদিনের প্রচলিত অসার ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধাচরণের এ লড়াইয়ে নারীকে একাই মাঠে নামতে হয় অদম্য সাহস নিয়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে যখন ধরা পড়ে যে, কাশেম খান কোনোদিনও পিতা হতে পারবে না, তখন : 'ওর ঝলমলে চোখের দিকে তাকিয়ে কাশেম খানের দৃষ্টি হিম হয়ে যায়। মা হতে না পারার কষ্টে ওর তো দুঃখ পাবার কথা। ওর দৃষ্টিতে বেদনা কই?' ('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', g‖ZR¨‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২০) কষ্ট-বেদনার পরিবর্তে ফুলবানুর বুক জুড়ে যেন জয়ের আনন্দ। পিতা ও স্বামী-- দু'জনকে হারানোর আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত। সামনের আরো যে লড়াই আছে সেখানেও সে জিততে চায়। এখন সে বেরিয়ে আসবে কাশেম খানের সংসার নামক প্রহসন থেকে, মুক্তি নেবে সে। তার ভাবনায় যুদ্ধজয়ের তৃপ্তি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এভাবে :

তেমন কেউ কি নেই যে ওর জীবনটা অর্থবহ করবে?

ফুলবানুর হৃদয় জুড়ে একটি ধ্বনি, আছে, আছে। নইলে এই গ্রামগুলোর বিশাল হয়ে ওঠা মিথ্যে। এবার ও একজন ভালোবাসার মানুষ খুঁজে নেবে। যার সঙ্গে শ্রম ও ভালোবাসার ভাগাভাগি করে গড়বে নতুন জীবন।

('হৃদয় ও শ্রমের সংসার', g‖ZR¨‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২০)

আলোচ্য গল্পের ফুলবানু শ্রম ও ভালোবাসায় গড়া নতুন জীবন খুঁজে পাবে কি না-- বিষয়টি স্পষ্ট না হলেও সেলিনা হোসেনের ভাবনায় সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রমের মধ্য দিয়ে নারী নিজেই নিজের কাঙ্ক্ষিত পথটি বেঁছে নেবে-- এ আশাবাদই দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

g‡ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের পঞ্চম গল্প 'নদে এলো বান'। সমাজের নিম্নবর্গের এক অসহায় দরিদ্র মেয়ে টাপারা। অভাব তার নিত্যসঙ্গী। জীবনে 'আনন্দ', 'সুখ', 'স্বপ্ন', 'আকাঙ্ক্ষা'–– শব্দগুলি যার অভিধানে নিশ্চিহ্ন। জীবনের রূঢ়-বাস্তবতা যাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, এমনকি কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়াতেই দেয়নি, সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট-অভাবতাড়িত মেয়ে টাপারার সাহসী হয়ে ওঠা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর জীবনভাষ্য 'নদে এলো বান' গল্পটি। প্রচলিত সমাজের জীর্ণ-ঘুণে ধরা পচনশীল মূল্যবোধের মর্মমূলে আঘাত হেনেছে টাপারার জীবন সংগ্রামে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার তীব্রতা ও জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সমাজবাস্তবতায় এখনও অগণিত টাপারা কেবল সমাজ নির্মিত অনুশাসনের শৃঙ্খলে বলি দিতে বাধ্য হয় নিজের জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, সাধ ও ন্যায্য অধিকার। সামাজিক চাপ ও বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে জীবনের সুকুমার বৃত্তির সমস্ত পথ। কিন্তু অসহ জীবন-যন্ত্রণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বা প্রতিবাদী হয়ে ওঠার প্রবণতা নির্যাতিত-বঞ্চিত নারীর মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে। টাপারা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেলিনা হোসেনের নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়কেই যেন রূপদান করেছে। টাপারার জীবনের বঞ্চনার কোনো শেষ নেই। অভাব-দারিদ্র্য জীবনের সমস্ত আয়োজনকে কীভাবে অসার করে তোলে তা টাপারা ভালোভাবেই অনুভব করে। কেননা :

> ও জানে কাঁটা ওর বাবাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়াতেই দেয়নি, যেখানেই পা ফেলেছে ওর বাবা সেখানেই বিঁধেছে। পরের জমিতে বদলা খেটে খেটে সংসারে আয় বাড়াতে পারেনি। বাড়িয়েছে খাবার মুখ। ... ওর বাবার তো ওর জন্মের আগে থেকেই এক চোখ নেই–– কি অদ্ভুত এই নেই শব্দ। ওর চারদিকে এখন এই নেই, নেই ধ্বনি। যেদিন বাবা ভাত জোটাতে পারে না, সেদিন খিদের যন্ত্রণায় ছোট ভাইবোনগুলো কাঁদে, মা কখনো রেগে গিয়ে ওদের পিঠে দুপদাপ কিল দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, মর, মর। মরতে পারিস না? ... তখন ওর জিদ বাড়তে থাকে–– জীবনকে দু'হাতের মুঠোয় কচলে দেবার জিদ।
> ('নদে এলো বান', g‡ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২১)

জীবনের নানাবিধ বঞ্চনা ও না-পাওয়ার হাহাকারই টাপারার মধ্যে ক্রমে ক্ষোভ-প্রতিবাদের আগুন জ্বেলে দেয়। টাপারা ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে জীবন থেকে তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করলেও পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নেয়। পালিয়ে বাঁচা নয় বরং বঞ্চনার হাহাকারের মধ্য থেকেই টাপারা এই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে চায়। গল্পে লক্ষণীয় : 'যৌতুক দিতে পারছে না বলে ওর বিয়ে হচ্ছে না। এই যন্ত্রণায় বাবা কুঁকড়ে থাকে। ভাবতেই, থু করে ওঠে ও, বুকের ভেতর খচখচ শব্দে কিছু একটা দাপায়। ও বুঝতে পারে যে এটা ওর জিদ। এই জিদ ওকে সাহসী করে এবং পথে নামায়।' ('নদে এলো বান', g‡ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২২) গ্রামের হারুন মোল্লার কাছ থেকে টাকা ধার করে, সামান্য পুঁজি সম্বল করে সাদিপুর ঘাট থেকে ভারতীয় শাড়ি কিনে এনে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে টাপারা। এভাবেই জীবনের অচল চাকাটিকে সচল করবার দায়ভার নিজের হাতে তুলে নেয় সে। সংসারে খানিকটা স্বচ্ছলতা আনার

আপ্রাণ চেষ্টায় লোকালয়ে ও চেঁচায়, প্রতিবাদ করে, অন্যের মুখের ওপর নিজের বিশ্বাস প্রবল প্রত্যয়ে ঘোষণা করে :

> কেউ যদি বলে, কাজটা কি ভালো করছিস? মেয়েমানুষের এমন পথেঘাটে চলাফেরা ঠিক নয়।
>
> — বেঠিকই বা কেন?
>
> রুখে ওঠে ও।
>
> -- দেখো, তেজ দেখো। ভালো বললে মন্দ বোঝে।
>
> -- মন্দ বুঝবো না কেন? ভাই বোনগুলো যখন ভাতের জন্য কেঁদেছিলো তখন কি দু'মুঠো ভাত দিয়েছিলো কেউ? বাবা যে যৌতুকের জন্য আমার বিয়ে দিতে পারেনি তার জন্য কেউ কি মাথা ঘামিয়েছিলো? ... আমার বাপেরে তো সবাই কানা দানেশ ডেকেই খালাস। কাজ দিয়ে সাহায্য করেছে কেউ? খাটিয়ে মেরেছে, কিন্তু পয়সা দেয়নি। কাকে না চিনি। সবার চেহারা আমার চেনা হয়েছে। ... টাপারা নিজের পরিবর্তনে অবাক হয়। রোজগেরে মেয়ে হয়ে, ও বাবার সম্মান ফিরিয়ে আনতে চায়। ('নদে এলো বান', g‖ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২২-৩২৩)

এভাবেই টাপারা প্রথাগত সামাজিকীকরণের বিরুদ্ধে নারীর অবস্থানকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। টাপারা উপলব্ধি করেছে : 'অর্থ ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। অর্থমুক্তি আর স্বাধীনতা একসঙ্গে জড়িত। শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়, এর পাশাপাশি প্রয়োজন নিজের অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ।'[৬৫] এভাবেই টাপারা হয়ে উঠেছে নারীর সম্ভাবনাকে জাগ্রত করার অনুপ্রেরণা, আত্মজাগরণের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলমুক্তির যথার্থ যোগ্য প্রতিনিধি। তাই তো টাপারা আর পেছনের কথা ভাবতে চায়না, জীবনে মেনে নেয়া, মানিয়ে নেয়ার পরিবর্তে সে নিজ জীবনের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণা মেটাতে চায় আপন চাহিদার পরিমাপে। নিজের ভালোবাসার মানুষকেও সে নিজেই বেছে নিতে সক্ষম হয়। ভোগের জন্য শরীর নয় বরং ভালোবাসার বিশ্বস্ততায়, নির্ভরতায় সে সম্পর্কের বাঁধনকে মজবুত করতে সক্ষম হয় তার জীবনে। তার ভালোবাসার নদে এভাবেই আত্মমুক্তির বান ডেকে যায়। টাপারা হয়ে ওঠে অগণিত নারীর স্বপ্নপূরণের, আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণার উৎস।

g‖ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের ষষ্ঠ গল্প 'ইজ্জত'। একটি নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং এর পটভূমিতে বিন্যস্ত টুকরো টুকরো দৃশ্যপটের সমন্বয়ে সমাজবাস্তবতার চিত্রায়ণ এবং সমাজে নারীর অবস্থান ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ-সন্ধানের প্রয়াস 'ইজ্জত' গল্পে লক্ষণীয়। মালেকাকে ওর স্বামী লতিফ গলা কেটে খুন করেছে। কেবল তাই নয়, খুনের পরে মালেকার দু'টুকরো দেহ গ্রামের পাশের বিলে ফেলে দিয়েছে। মালেকার দু'ভাই কদিন পরে এসে মালেকার পচা দেহ নৌকার সঙ্গে বেঁধে জাইলাবিল থেকে দুর্গাপুর থানার ঘাটে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ততোদিনে দেহ পচে যাওয়ায়, সেটা দাফন করার মতো অবস্থায় ছিলো না। মালেকার ভাইয়েরা তার পচা দেহ সোমেশ্বরী নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে যেন বিপদমুক্ত হয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচে। মালেকার হত্যাকাণ্ড নিয়ে তার ভাইদের কোনোরকমের মাথাব্যথা নেই। এমনকি এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে গ্রামে

থানা-পুলিশের কোনো ব্যাপারও হয়নি। মালেকার অপরাধ একটাই সবার কাছে যে, সে নষ্টা-ভ্রষ্টা মেয়েমানুষ। মাইনকা ওকে পছন্দ করেছে, এটাই মালেকার অপরাধ। মালেকার খুন হওয়ার পরে সোমেশ্বরী নদীর ঠাণ্ডা জলের শীতল স্পর্শে তার দিব্যদৃষ্টি খুলে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে এনে এবং বিভিন্ন চরিত্রের চেতন ও অবচেতন মনের নানা ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তা-চেতনার আলোকে সেলিনা হোসেন এ গল্পে সমাজ-জীবনের নানামাত্রিক জটিলতা এবং নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার চিত্রটি অত্যন্ত শিল্পকুশলতায় রূপদান করেছেন। মালেকার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগণিত নারীর জীবন-বঞ্চনার করুণ হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। আজো আমাদের সমাজবাস্তবতায় বেশিরভাগ নারীর পৃথিবীর পরিধি, চেতনার বিস্তার চারদেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ। বিশাল পৃথিবীর অসীম জানাশোনার আকাশের উন্মুক্ত পরিধি নারীর জন্য নয়। মৃত্যুর পরে মালেকার দিব্যদৃষ্টির আলোয় প্রতিফলিত হয় এই সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি :

> ওহ্ কি সুন্দর এই দুনিয়া। ওর দীর্ঘশ্বাস ছুটে যায় চারদিকে। তারপর মাঠের মাঝখানের তালগাছের নিচে বসে পড়ে ও। কতোদিন এই গাছটির দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলো এখানে এসে দু'দণ্ড দাঁড়াবে। দেখবে আকাশ কতো উঁচু? দেখবে আকাশ কতো বড়ো? কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার জো ছিলো না। শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, পুকুরঘাট-- এই তো ছিলো ওর প্রতিদিনের দুনিয়া। ('ইজ্জত', gwZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২৭)

এভাবেই সমাজ নারীকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে তার মানবতাবোধকে করে চলেছে পদদলিত। কেবল তাই নয়, একই ঘটনায় সমাজ নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেও পুরুষের বেলায় তেমনটি করতে দেখা যায় না। সতীত্ব, পবিত্রতা রক্ষার সমস্ত দায়ভার পুরুষতন্ত্র সুকৌশলে নারীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সমাজবাস্তবতার এই সংকীর্ণতার প্রতিফলন ঘটেছে মালেকার ভাবনায় :

> পাপ কি? পুণ্য কি? ইহলোক কি? পরকাল কি?
> মালেকা কিছুই বুঝতে পারেনি। এখনও পারছেনা। শুধু ওর ছাব্বিশ বছর বয়সটা প্রশ্ন হয়েই থাকে। যে লোক চারজন স্ত্রী নিয়ে এক বাড়িতে বাস করে সে চরিত্রবান, সে ভ্রষ্ট নয়। এতে নাকি সম্মান বাড়ে, বংশের ইজ্জত। যে নারী শুধুই ভালোবাসার কাঙাল হয়-- জীবনকে অন্যরকম করে সাজাতে চায়, চারজন স্ত্রীর একজন হতে চায় না, সব অপরাধ তার? সে বংশের ইজ্জত নষ্ট করে, তাই তাকে মরতে হবে ! ('ইজ্জত', gwZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২৭)

এহেন চরিত্রহীন বোনের লাশ দাফন করতে মালেকার ভাইদের তাই কোনোরকমের আগ্রহ ছিলো না। বরং মালেকার মৃত্যু তাদের আরো বেশি অপমানের হাত থেকেই যেন বাঁচিয়ে দিল। বংশের ইজ্জত নিয়েই তাদের যেটুকু ভাবনা। অথচ এই ইজ্জতদার ভাইয়েরা নিজের জন্মদাত্রী মায়ের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালনে অপারগ। মালেকার ভাইদের মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনের চিত্রটি গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এভাবে :

> গোয়ালঘরের পাশে বড়ো ভাইয়ের বউ বাসি ফেন ফেলে গেছে। ওর পাগল মা, যার পরনে এক টুকরো চট-- শরীর উদোম, মাথার চুল জটা পাকিয়ে আছে, সে ওখানে বসে ফেনের ভেতর থেকে ভাত খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। মুরগিটা গোটা দশেক বাচ্চা নিয়ে তার পাশে ঘুরঘুর করছে। মুরগিটা ওর মাকে ভয় পায় না। বরং ওর মা যখন হাত দিয়ে বাচ্চাগুলো তাড়াতে যায় তখন রুখে

ওঠে। মুরগি রুখে উঠলে ওর মা কুকরি মেরে সরে যায়। তখন মুরগি ওর বাচ্চাগুলো নিয়ে ফেনের ভেতর পড়ে যাওয়া ভাতগুলো খেতে থাকে। মালেকা দেখে ওর মা কেমন অসহায়ভাবে বসে থাকে। ওর মা মুরগির সঙ্গেও পেরে ওঠে না। ... মা আর মুরগি–– মুরগি আর মা। এই মায়ের ছেলেরা বংশের ইজ্জত নিয়ে মাথা ঘামায়! ('ইজ্জত', g‡ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২৮)

এই বিবরণে সমাজবাস্তবতার এক নির্মম কঠিন সত্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বৃদ্ধা মায়ের প্রতি অবহেলার নগ্নরূপ এমন বাস্তবসম্মত করে আলোচ্য গল্পে রূপায়িত যে তা কেবল মানবতার পদস্খলনের চিত্রকেই উন্মোচিত করেনা, একইসঙ্গে পাঠকের বিবেক-বোধকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। এই সমাজে : 'বোনের শরীর শিয়াল-শকুনে খেলে কতোটা ইজ্জত বাড়ে সেটা ওরা বোঝে না; ধর্মমাফিক দাফন না হলে কতোটা ইজ্জত বাড়ে সেটাও ওরা বোঝে না। বোঝে মেয়েমানুষের মিথ্যে অপবাদ।' ('ইজ্জত', g‡ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২৭-৩২৮) মূলত সমাজই নারী-পুরুষের আচরণের নিয়ন্ত্রক। সমাজ একই সমতলে নারী ও পুরুষকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে। প্রকৃতপক্ষে :

নারী ও পুরুষকে পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, অনুশাসন একদৃষ্টিতে দেখে না। নারীর জীবন পুরুষের তুলনায় তাই অধস্তন। ... বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষের যে অধিকার ও অভিগম্যতা আছে, নারীর সেসব নেই। নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাই অসম, সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এসব কারণেই পুরুষের দ্বারা সামাজিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় নারী।[৬৬]

আলোচ্য গল্পেও দেখা যায়, বাজারে কালু মোল্লার চায়ের দোকানের আড্ডায় ছুটিতে-আসা দুর্গাপুর থানার পুলিশ মোসলেম হাওলাদার, যিনি ইজ্জতের একজন বড়ো রক্ষক, আত্মতৃপ্তি ও গর্বের সঙ্গে দুর্গাপুর থানায় সংঘটিত কোনো এক ঘটনার বর্ণনাচ্ছলে প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতার সংকীর্ণ মানসিকতার ও পশ্চাৎপদতার বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

একবার এক লোক তার বড়ো ভাইয়ের বিধবা বৌয়ের কাটা মাথা নিয়ে থানায় চলে আসে। বলে, বংশের ইজ্জত রক্ষার জন্য চরিত্রহীন এই মেয়েমানুষটাকে আমি হত্যা করেছি। ভেবে দেখেন আপনারা কতো বড়ো ঈমানদার লোক।

পেছন থেকে একজন বলে, ঐ লম্পট লোকটার গল্প আর বলবেন না। ওতো বড়ো ভাইয়ের বউয়ের ইজ্জত নষ্ট করতে চেয়েছিলো। ভাবী রাজি হয়নি বলেই তো রেগে খুন করেছে।
মোসলেম হাওলাদার চটে ওঠে বলে, পুরুষ মানুষ তো একটু আধটু করবেই। ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব ...।

('ইজ্জত', g‡ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩২৯)

এভাবেই অত্যন্ত হাস্যকর, যুক্তিহীন অথচ কঠিন-কঠোর সমাজ-অভ্যন্তরস্থ প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে আলোচ্য গল্পে শিল্পিতভাবে রূপদান করা হয়েছে। সমাজের এই অচলায়তনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠার মানসে মালেকার ভাবনায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে অগণিত নারীর কণ্ঠস্বর : 'প্রচণ্ড তীব্রতায় ও অনুভব করে যদি আর একবার বেঁচে উঠতে পারতো? ঐ ইজ্জতের পাছায় লাথ্থি মারার জন্য ও আর একবার বাকলজোড়া গ্রামে ফিরে আসতে চায়।' ('ইজ্জত', g‡ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩৩০) এভাবেই 'ইজ্জত' গল্পে চেতন ও

অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কেবল সমাজবাস্তবতার তথাকথিত নিয়ম-শৃঙ্খলার অসারতা, সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার স্বরূপ এবং নারীর বঞ্চনা-হাহাকারের নির্মম করুণ রূপেরই প্রতিফলন ঘটেনি বরং সেইসূত্রে নারীর ঘুরে দাঁড়ানো বা প্রতিবাদী হওয়ার অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়ে নারীর আত্মমুক্তির ও অদম্য আকাঙ্ক্ষারও রূপায়ণ ঘটেছে।

gwZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের সপ্তম গল্প 'মুখ'। চেহারায় সুন্দর হলেই কোনো মানুষকে সুন্দর বলা যায় না। যার স্বভাব, চরিত্র ও রীতি-নীতি সুন্দর সেই প্রকৃত সুন্দর। চারিত্রিক গুণাবলিই মানুষের মর্যাদা বিচারের মাপকাঠি। মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব বাহ্য-সৌন্দর্যের চাকচিক্যে নয়, মনের লাবণ্যে। অথচ আমাদের সমাজবাস্তবতায় এ পরম সত্য আজ ভূলুণ্ঠিত, অপমানিত। মানুষের মনের সৌন্দর্য নয় বরং বাহ্যিক মুগ্ধতা, বাইরের আবরণের মিথ্যে প্রলোভন মানবতাকে প্রতিনিয়ত পদদলিত করে চলেছে। নারীর ক্ষেত্রে এ সত্য আরো ভয়ানকভাবে বাস্তব। আজো সমাজে নারীর মূল্য নির্ধারণের প্রধানতম বিবেচ্য থাকে তার বাইরের রূপ-সৌন্দর্য। অন্তরের গুণাবলি এই বাইরের চাকচিক্যের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। সমাজ আজো নারীকে মানুষ হিসেবে মূল্য দিতে ব্যর্থ। দেখতে ভালো নয় বলে পরিবারে সমাজে অগণিত নারীকে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হয় বিরূপ-কঠোর সমাজবাস্তবতার। বঞ্চিত-অবহেলিত সেই নারীর কাছে সমাজের সব মানুষই হয়ে ওঠে প্রতিপক্ষ, সবার চেহারায় নিপীড়িত-ব্যথিত সেই নারী-আত্মা অবলোকন করে একই 'মুখ' এবং তা কোনোভাবেই আর মানুষের মুখ থাকে না, হয়ে ওঠে যাবতীয় সামাজিক অন্যায়-অবিচার, প্রতিবন্ধকার অবরুদ্ধ দেয়ালের প্রতিবিম্বস্বরূপ। আলোচ্য 'মুখ' গল্পে নারীর তথা মানুষের সৌন্দর্যের স্বরূপসন্ধান ও এর মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতার সংকীর্ণতা, অসারতা এবং মানবতার অবমাননার দৃশ্যপট চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। গল্পে বর্ণিত হয়েছে নুহারিন নামক এক তরুণীর বাহ্যিক সৌন্দর্য কেমন করে সমাজে তার মূল্য নির্ধারণের পরিমাপক হয়ে ওঠে–– সেই মর্মন্তুদ আখ্যান। কেবল গায়ের রঙ কালো বলে নুহারিন নিজের মধ্যে সবসময় গুটিয়ে থাকে। সংসারে অবহেলা, বঞ্চনা তার নিত্যসঙ্গী। নুহারিন কোনো স্বপ্ন দেখেনা, স্বপ্ন দেখবার কোনো সাহসও তার হয় না। জীবনের প্রবল উত্তাপ অনুভবের কোনোরকম যোগ্যতাই যেন তার নেই। নিজেকে নিয়ে বেশি কিছু সে ভাবতে পারে না, তার চিন্তা এগোয় না। কেননা :

> এখানে ওখানে গড়িয়ে গড়িয়ে ও বড়ো হয়েছে। এখন বয়স আঠারো- বড়ো ভাইয়ের সংসারে বোঝা, ভাইয়ের সাত ছেলেমেয়ে। মাঝে মাঝে নুহারিনের মনে হয় ছোট ঘরে ওরা যেন কিলবিল করে, শুঁয়োপোকা নয়, তবে পোকা। এসবের মাঝে ও নিজেকে বেমানান মনে করে, বাড়তি, ফেলে দিলে হয় আর কি। কিন্তু কোথায় যাবে? ও দেখতে ভালো না, গায়ের রঙ কালো, গায়ে গতরে মাংস নেই। যৌবন জ্বলে ওঠে না। ভাইয়ের বউ সারাক্ষণ বলেন, এমুন মাইয়ারে বিয়া করবো কেডা? ভবিষ্যৎ আন্ধার। ... ওর ভেতর কুঁকড়ে যেতে থাকে। কুঁকড়ে তো যাবেই। যার যৌবন জ্বলে ওঠে না তার ভেতরটা তো কুঁকড়ে যাবেই। ('মুখ', gwZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩৩০)

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত অনগ্রসরতা এভাবেই মানুষের স্বাধীন চেতনার মৃত্যু ঘটায়, মানবতা হয় বিপর্যস্ত। জন্ম থেকেই না-পাওয়ার হাহাকার, বঞ্চনা-অবহেলা নুহারিনকে মেরুদণ্ড সোজা করতে দেয়নি। তাই তার কথা বলা সাজে না, কথা বলাও সে শেখেনি। এভাবেই, 'সমাজ নারীকে গভীর অবদমনে রাখে, মানুষ হয়ে ওঠার স্বাভাবিক পথটিকে অবরুদ্ধ করে দেয়।'[৬৭] নারীভাবনা হয়ে পড়ে পুরুষেরই ভাবনার প্রতিফলন। সমাজ নারীর চারদিকে বিধিনিষেধের সুকঠিন প্রাচীর তৈরি করে এমন এক জটিল পরিস্থিতিতে নারীকে নিক্ষেপ করে যে, নারীর নিজস্বতা বলতে আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কেননা, 'পুরুষতন্ত্রের কারণে নারীর ভাবনা মূলত হয়ে পড়ে পুরুষেরই ভাবনা। পুরুষের ভাবনার ছকেই তখন নারীর জীবন আবর্তিত হয়।'[৬৮] আলোচ্য গল্পের নুহারিনও বাহ্যিক সৌন্দর্যের এই মিথ্যে অহমিকার জালে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। কেবল নুহারিনই নয়, আমাদের সমাজবাস্তবতায় অসংখ্য নারী এখনও শুধুমাত্র 'গায়ের রঙ কালো', 'দেখতে ভালো নয়' 'আকর্ষণীয় ফিগার নেই'-- এসব মন্তব্যের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত। নারীর শিক্ষা-দীক্ষা, মহৎ গুণাবলি, চরিত্রের সততা প্রভৃতি এই তথাকথিত বাহ্যিক সৌন্দর্যের অন্তরালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মুখে যতো নীতিকথাই বলা হোক না কেন, এখনও সমাজে নারীর সুন্দর মুখের কদর অনেক ক্ষেত্রেই তার গুণাবলির চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায়। এই সমাজ সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার বা অস্বীকারের কোনোই উপায় নেই; বরং এটিই প্রকৃত বাস্তবতা। নুহারিনের অনুভবে আশেপাশের সবাইকে একইরকম নিষ্ঠুর ও বিবেকবর্জিত মনে হয়। এমনকি :

> কেউ খালা, কেউ ফুফু, কেউ মামি, কেউ চাচি-- কিন্তু নুহারিন চোখ বুঝলে সবার চেহারা একরকমই দেখতে পায়। ... ওর মাথার ভিতর যন্ত্রণা হয়। ও হাসতে ভুলে যায়। কাউকে প্রাণ খুলে হাসতে দেখলে ও ভয় পায়। ... ওর চারপাশের মানুষেরা, বিশেষ করে যাদের সংসারে ও নুন খেয়েছে, এমন মানুষেরা ওর কাছে আলাদা হয় না। এমনকি কখনো কখনো তারা বিড়াল কিংবা শিয়াল-- মুখটা মানুষের মুখ থাকে না। ('মুখ', g‍ZR‍v‍‡bi †g‍‡qiv, MímgM : ৩৩০-৩৩১)

এভাবেই নিজেকে সবার কাছ থেকে গুটিয়ে নেয় নুহারিন নামের অষ্টাদশী তরুণীটি। গল্পে লক্ষণীয়, তারই সমবয়সী আরেক তরুণী আলিমনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আলিমন দেখতে অনেক সুন্দর, তার বাবা-মা আছে এবং সে কারো বোঝা নয়। আলিমন নিজের ভালোবাসার কথা, স্বপ্নের কথা নুহারিনের সঙ্গে ভাগ করে নিতো। আলিমনের স্বপ্নকে ঘিরে নুহারিনের হৃদয় গহীনেও আনন্দের বান ডেকে যেতো। আলিমনকে অন্য সবার থেকে আলাদা মনে হতো নুহারিনের। অথচ সেই আলিমনই যখন ভালোবাসার মানুষকে অবহেলা করে মনের আনন্দে বিয়ের উৎসবে মেতে ওঠে তখন :

> নুহারিনের মনে হয় আলিমন একটা আস্ত ভাগাড়। দুর্গন্ধ আসছে। ওর দৃষ্টিতে শুকুনের ছায়া। ও মিছেমিছি ওর মধ্যে রূপকথা খুঁজছে-- সরোবরের পদ্মের ঘ্রাণ পেয়েছে। ... ওর মুখটা খালা, ফুফু, চাচি, মামির মুখের মতো-- একজনের মুখ। ওকে আর আলাদা ভাবা যায় না। আলিমন যদি ওকে একবার বলতো, বুঁচিরে আমার বুকটা ফাইটা যাইতাছে। আমি ওরে ভুলমু কেমনে? বুঁচিরে ভালোবাসার বড়ো জ্বালা ...। তাহলে ও আলিমনকে মানুষ মনে করতে পারতো। ('মুখ', g‍ZR‍v‍‡bi †g‍‡qiv, MímgM : ৩৩২)

বাহ্যিক সৌন্দর্যের চাকচিক্যের আবরণে এভাবেই হৃদয়ের মানবতার, সততার পদ্মফুলটি ঝরে পড়ে অবলীলায়। নুহারিনের হৃদয়ের গুহায়িত যে সৌন্দর্য, যার প্রভায় আলোকিত হতে পারে সমাজ-সংসার, সে সৌন্দর্য ম্লান হয়ে পড়ে তথাকথিত বাহ্যিক সৌন্দর্যের মিথ্যে অহমিকার অন্তরালে। সমাজ এভাবেই নারীর প্রকৃত মেধাকে অগ্রাহ্য করে মানবতাকেই প্রকারান্তরে অপমানিত করে চলেছে। নুহারিন এই সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মুখে চপেটাঘাত করেছে তার অন্তরের সৌন্দর্যের শক্তি দিয়ে। আলিমনের বিয়ের উসবে নুহারিনের অন্তরের সততা ও দৃঢ়তা লক্ষণীয় :

> নুহারিন এগিয়ে যায়। ওর ভাবী আলিমনের মুখ উঁচু করে ধরে বলে, দ্যাখ নুহা কি সোন্দর লাগতাছে।
>
> মূহুর্তে কাণ্ডটা ঘটে যায়।
>
> থুঃ থুঃ করে নুহারিন একদলা থুথু ছিটিয়ে দেয় আলিমনের নকশা করা মুখের ওপর। ... ধপ করে দাওয়ার ওপর বসে পড়লে ওর মনে হয় আলিমনের চকচকে শরীর আছে, ওর আছে হৃদয়-- সে হৃদয় ফুটে আছে, কিন্তু দেখার কেউ নেই। ('মুখ', g‡ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩৩৩)

নুহারিন যে সাহস ও শক্তির দৃঢ়তায় আলিমন তথা প্রচলিত সমাজের অচলায়তনের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে তা আমাদের সমাজের নারীর স্বাভাবিক প্রবণতায় বা আমাদের সমাজবাস্তবতার সাধারণ দৃশ্যপট নয়। বরং বাহ্যিক চাপে কুঁকড়ে থাকা নুহারিনই অধিকতর সত্য। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, 'সেলিনা হোসেন গল্পের মধ্যেই ভরে দেন তার ভাবনাকে।'[৬৯] তাই তাঁর গল্পের নারীরা অবলীলায় অগ্রাহ্য করে পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন সমাজবাস্তবতার প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতার জীর্ণ কাঠামোটিকে। আলোচ্য গল্পে নুহারিনের অন্তরের সৌন্দর্য যেন মানবতার জয়গানে মুখরিত এবং নারীর আত্মজাগরণের, আত্মমুক্তির যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে সমাজ-সত্যের মিথ্যে, জড়তার অহমিকার মূলে সজোরে আঘাত হেনেছে।

g‡ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের অষ্টম গল্প 'মেয়েলোকটা'। গল্পের নাম থেকেই অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে এ গল্প নারীর মানুষ হয়ে ওঠার গল্প নয়, বরং মানুষ পরিচয়কে ছাপিয়ে নারীর মেয়েলোক হয়ে ওঠার প্রসঙ্গই গল্পের আখ্যানে সমাজবাস্তবতার আলোকে রূপ লাভ করেছে। একইসঙ্গে সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটিও আলোচ্য গল্পে স্পষ্ট হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র বাষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধা তারাবানুকে ঘিরে গল্পের আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পরে পুত্রই তারাবানুর আশ্রয় হয়ে ওঠে। সবার ছোট পুত্র তাহেরের সংসারে তারাবানু যেন বোঝা হয়ে উঠেছিলো। সেই পুত্রের সংসারে তারাবানুর স্থান স্থায়িত্ব পায়নি। খেতে না পারার কষ্টে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নেমে এসেছিলো তারাবানু। যদিও তারাবানুর প্রকৃতপক্ষে কোনো ঘরই কোনকালে ছিলোনা। কেননা :

> স্বামী ওসমান ছিলো রগচটা মানুষ, কথায় কথায় তার হাতের বাঁশের কঞ্চি লকলকিয়ে উঠতো-- ওটা লাল করে দিতো তারাবানুর পিঠ-- ও মুখ বুজে সহ্য করেছে। কাউকে পিঠ খুলে দেখায়নি। সারাজীবন তো ও কারো না কারো অনুগত থাকতে চেয়েছে,

> অন্যের মুখে ভালো মেয়ের প্রশংসা শুনবে বলে। ... ঘর? ও পেছনে ফেলে আসা রাস্তার দিকে তাকায়। ওর তো কোনো ঘর নেই। যে স্বামী জুলুম করে সেটা কি স্বামীর ঘর? নাকি নিজের ঘর হতে পারে? যে ছেলে বের করে দিতে চায় সেটাই-বা কেমন ঘর? ('মেয়েলোকটা', g‌ZR‌v‡bi †g‡qiv, M‌ímgM ঃ ৩৩৩-৩৩৪)

সমাজ এভাবেই নারীর নিজস্ব অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। 'ভালো মেয়ে' হওয়ার কতিপয় শর্তে আবদ্ধ করে সমাজ নারীর জীবনকে মূলত অধস্তন করে তোলে। সমাজবাস্তবতার আবরণে তথাকথিত পুরুষতন্ত্র নারীকে নিজস্ব ভাবনার বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলে নিজস্ব প্রয়োজনের স্বার্থে। সমাজের এই সংকীর্ণ মানসিকতার বাস্তবসম্মত চিত্রটি গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে এভাবে :

> মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ বলে তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হয়নি। তাই ও পথঘাট তেমন চেনে না। ... বিয়ের আগে বাবা-মা বলতো, ডাঙর মেয়ের বাড়ির বাইরে যেতে নেই। লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরে থাকো। ও তাই থেকেছে। বিয়ের পর শাশুড়ি বলেছে, পুকুরপাড়ের সীমানার ওপারে যেতে নেই। যায়নি তারাবানু। ('মেয়েলোকটা', g‌ZR‌v‡bi †g‡qiv, M‌ímgM ঃ ৩৩৩)

সমাজ তারাবানুকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে তাকে মেয়েমানুষে পরিণত করেছে, যার স্বপ্নের সীমানা পুকুরপাড় ছাপিয়ে সুদূরের আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে না, নিজস্বতা বলতে তার কিছুই থাকে না। সে কখনো-বা স্বামীর কখনো-বা সন্তানের ঘাড়ে বোঝাস্বরূপ। সেই তারাবানু খিদের জ্বালায় অবশেষে পথে বেড়িয়ে পড়ে। সবকিছু তার অচেনা-অজানা। গ্রামের বাইরের সেই অজানা পথেই ঘটনাক্রমে দুঃসহ মৃত্যুবরণ করে তারাবানু। কিন্তু মরেও সে তার 'মেয়েমানুষ' উপাধি থেকে বেরুতে পারে না, যেমনটি পারেনি বেঁচে থেকেও। তারাবানুর আর মানুষ হয়ে ওঠা হয় না। মৃতদেহ নিয়ে আলোচ্য গল্পে বিধৃত টুকরো টুকরো দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়ে পড়ে নির্মম, নিষ্ঠুর অসার সমাজবাস্তবতা :

> তারাবানু এখন বেওয়ারিশ লাশ।
>
> বারোটার দিকে দু'একজন স্থানীয় সাংবাদিক ভিড় করে ইউএনও অফিসে। ভদ্রলোক চেয়ারের ওপর পা-তুলে মুখের ওপর কাগজ ধরে পড়ছিলেন আর পান চিবুচ্ছিলেন। ওদের পায়ের শব্দে তিনি ভুরু কুঁচকে তাকালেন। মিজান খানিকটা রাগী কণ্ঠে বললো, চৌরাস্তার মোড়ে একটা লাশ পড়ে আছে জানেন?
>
> তিনি নির্বিকার উত্তর দিলেন, শুনেছি একজন মেয়েলোক মরে পড়ে আছে। ... থানার দারোগা মহাবিরক্ত। বললেন, ... মেয়েলোকের লাশ এভাবে পড়ে থাকা কি উচিত? যেন মেয়েলোক মরেছে এটাই দারোগার চোখে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। মিজান থানা থেকে বেরিয়ে চৈত্রবল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে যায়। লাশের কথা জিজ্ঞেস করতেই বলে, ও আমাদের এলাকার কেউ নয়। পাগল-টাগল হবে হয়তো। মেয়েলোক তো আর ভবঘুরে হতে পারে না। ওরা তো ঘরেই থাকবে। ... এরপর চেয়ারম্যান দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, মেয়েলোকটা মরার আর জায়গা পেলো না। কেন যে এদের ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয়। ... মর্গে মেয়েলোকটা ফুলতে থাকে। ও আর তারাবানু নয়। মানুষ নয়। মেয়েলোক। ('মেয়েলোকটা', g‌ZR‌v‡bi †g‡qiv, M‌ímgM ঃ ৩৩৬-৩৩৭)

এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নারীর প্রকৃত অবস্থান, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা, নারীর সামাজিক-পারিবারিক ও ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠতায় রূপায়িত হয়েছে। সর্বোপরি মানুষ হওয়ার বদলে

মেয়েলোকে পরিণত হওয়া তারাবানু মানবতার লজ্জাজনক অবমাননার ইতিবৃত্তকেও একই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত করেছে।

g‌ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের নবম গল্প 'লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর'। পুরুষ নারীকে শুধু যে সন্তান জন্মদানের যন্ত্র মনে করেই শারীরিক আনন্দ পেয়ে তৃপ্ত হয়, নারী আনন্দ পেল কী পেল না তা লক্ষ করার প্রয়োজনীয়তাটুকুও অনুভব করে না-- এইসব মনোশারীরিক বিষয়কে উপজীব্য করেই লেখা হয়েছে 'লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর' গল্পটি। একই সঙ্গে কেবল নিম্নবর্গের নারীজীবনের অধস্তনতার চিত্রই নয়, সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের কাছেও যে নারীর নিজস্ব সত্তার কোনো গুরুত্ব নেই-- এই সমাজসত্যটিও আলোচ্য গল্পে বিধৃত হয়েছে। গল্পে মেডিকেলে তৃতীয় বর্ষে পড়া ভালো ছাত্রী হিসেবে পরিচিত লিপিকার বিয়ে হয় এমন এক ভালো পাত্রের সঙ্গে যে তার শরীরটাই পেতে চেয়েছে, কিন্তু মনের গহীনে আলো ফেলে সেখানে জমাট বাঁধা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার কোনো মূল্যই স্বীকার করেনি। মন ও শরীরের সম্পর্কের যৌথ অনুভবই হচ্ছে মনোশরীরের বিষয়। একচেটিয়া অধিকারবোধ চাপিয়ে দিয়ে এহেন যৌথ সম্পর্কে কখনোই সুখী হওয়া সম্ভব নয়। এই বিয়েতে লিপিকা পুরোপুরি নিজেকে তৈরি করে নিতে পারেনি, অনেকটা পারিবারিক চাপেই তাকে আফসার মাহবুব নামক ব্যক্তির সঙ্গে, যার অনেক টাকা এবং যে মনে করে সংসারে যা কিছু ঘটবে তা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই ঘটবে, বিয়ে নামক সামাজিক সম্পর্কে জড়াতে হয়। লিপিকা মনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে ব্যক্তিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সে-সবই জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছে। লেখাপড়া শেষ করে সে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, অর্জন করতে চেয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা। লিপিকা বিশ্বাস করে :

> এখন নারীকে নিজের যোগ্যতায় পথ তৈরি করতে হবে। নারীর সামনে এখন সুযোগ অবারিত। প্রয়োজন নিজেদের অধ্যবসায়, মেধা, পরিশ্রম, জ্ঞান দিয়ে নিজেদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত করা। ... প্রতিযোগিতা একটি কঠিন জায়গা। নারীকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আমার সাহস নিয়ে নামতে হবে। মেয়েদেরকে প্রতিবন্ধকতার দেয়ালে আঘাত করতে হবে। নিজেদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে হবে নিজেদেরকেই।[৭০]

পরিবার, সমাজ-সংসার নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জনের পথে পদে পদে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তৈরি করে রেখেছে। লিপিকার নিজের বিয়ের সিদ্ধান্তে তাই তার নিজস্ব মতামত গুরুত্ব পায়নি। কেননা : 'এ বাড়িতে বাবার ওপর কেউ কথা বলতে পারে না। লিপিকা জানে, মাও পারে না। মা বলতেও চায়না– বাবা যা বলে তাই মানে। মাঝে মাঝে লিপিকা ভীষণ বিরক্ত হয়। মা কি নিজে কিছু ভাবতেও পারে না? এমন নিষ্ক্রিয়, চিন্তাহীন কেন? কোনো মানুষের ভাবনা থাকবে না এমন তো হয় না।' ('লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর', g‌ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩৩৭) আসলে পিতৃতন্ত্র এভাবেই নারীকে দাবিয়ে রেখেছে। আফসার মাহবুব পিতৃতন্ত্রেরই যোগ্য প্রতিনিধি। মেডিকেলে পড়ুয়া শিক্ষিত আধুনিক নারীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে সানন্দে গ্রহণ

করতে তার আপত্তি না থাকলেও নিজের স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে :

> উনিশ শতকে সংস্কার আন্দোলনের মূল সুর ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষের যোগ্য সহধর্মিনী গড়ে তোলা। এখনও পর্যন্ত এই ধারাই অব্যাহত আছে। পুরুষের যোগ্য নারী, যোগ্য সহধর্মিনী বিষয়টি সবাই চিন্তা করে, এর বিপরীতে নারীর যোগ্য পুরুষ শব্দটি কেউ ভাবে না। উনিশ শতক, বিশ শতক শেষ হয়ে একুশ শতক এসেছে। এসেছে অনেক পরিবর্তন, নতুন নতুন চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, কিন্তু নারীকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় সেই পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে।[৭১]

লিপিকার লেখাপড়া করে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে আফসার মাহবুব নিজের অর্থবিত্তের পরিমাপে তুলনা করতে তাই দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। লিপিকা ও আফসার মাহবুবের কথোপকথন-সূত্রে আলোচ্য গল্পে পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসী চেহারাটা পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয় এভাবে :

> -- তুমি কি ভেবেছো বিয়ে করে তুমি আমার আমিত্বটুকুও দখল করে নিয়েছো?
>
> -- হ্যাঁ, তাতো নিয়েছি। এখন থেকে তোমার সবকিছু আমার। তোমার মেধা, সৌন্দর্য, নারীত্ব, সবকিছু। তোমার কোনো কিছুই তোমার না।
>
> -- তাহলে তোমার মেধা, সৌন্দর্য, পুরুষত্বের ওপর কার অধিকার?
>
> -- আমার জিনিস তো আমারই।
>
> -- তাহলে আমারটা আমার নয় কেন? তোমার জিনিস দিয়ে তুমি ইচ্ছে মাফিক চলবে, আর আমারগুলো তোমার পায়ের তলায় পিষ্ট হবে?
>
> -- তুমি ভুলে যেও না লিপিকা যে, তুমি মেয়ে। ('লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর', g‡bvRv‡bi †g‡qiv, MíмgMÖ : ৩৪২-৩৪৩)

এভাবেই সমাজ-ভাবনা, আচার-আচরণের প্রথাগত সামাজিকীকরণের মোড়কে প্রকারান্তরে পুরুষতন্ত্রই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তৈরি করে দেয়। লিপিকার অনুভবে জারিত হয় যে : 'ওর সামনে থেকে আফসার মুছে গিয়ে একটা পীড়ন যন্ত্র ভেসে ওঠে। বাবা ওকে তার নিজস্ব পদ্ধতির পীড়ন যন্ত্র থেকে বের করে আর একটি পীড়ন যন্ত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে।' ('লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর', g‡bvRv‡bi †g‡qiv, MíмgMÖ : ৩৪৩) লিপিকা এও উপলব্ধি করে যে : 'পুরুষতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় নারীর শরীর, শুধুই নারীর শরীর।'[৭২] তার ভাবনায় এ সত্যও অজানা থাকেনা যে, শেষ পর্যন্ত এই শরীরই নারীর অহঙ্কারের, গৌরবের বিষয় হয়ে ওঠে। সন্তানের গৌরব পুরুষের চেয়ে নারীর বেশি। কেননা, নারীর শরীরেই সন্তানের ভ্রুণটি বড়ো হয় ও বিকশিত হতে পারে, পুরুষ শত চেষ্টা করেও সে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। নিজের অধিকারটুকু অর্জন করে নেওয়ার, আদায় করে নেওয়ার অভিপ্রায়ে লিপিকার দৃঢ় উচ্চারণ : 'আমার শরীর বিক্রি করবো তোমার কাছে। ... সংসারের ভিতে যদি পরস্পরের ভালোবাসা না থাকে তাহলে সেটাই তো কেনাবেচা-- আমি দেবো তুমি কিনবে, তুমি দেবে আমি কিনবো। ('লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর', g‡bvRv‡bi †g‡qiv, MíмgMÖ : ৩৪৩) আলোচ্য গল্পে লিপিকা যথার্থ অর্থেই সেলিনা হোসেনের

ভাবনার নারীজীবনের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। নারী ভাবনার প্রচলিত ছকটিকে, সামাজিক প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বিরুদ্ধ স্রোতটিকে অতিক্রম করার অপ্রতিরোধ্য আবেগে লিপিকা অনুভব করে : 'সম্পর্ক রেখে সম্পর্কের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? লিপিকা নিজের সঙ্গে তর্ক করে, কেন নয়? এটাই একজন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অর্জনের পথ-- এভাবেই নিজেরটুকু আলাদা করে রাখতে হবে, যেটাকে অধিকার বলা হয়, যেটার জন্য এতো লড়াই।' ('লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর', g¨ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩৪২) এভাবেই নারীকে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, নিজের পথ নিজেকেই আবিষ্কারের শক্তি ও সাহস জোগাতে হয়। শেষ পর্যন্ত আফসার মাহবুবরা লিপিকাদের প্রবল দৃঢ়তার নিকট অসহায় ও পরাজিত হতে বাধ্য হয়। সমাজ-সংসারে এভাবেই নারীর আয়নায় পুরুষের তথা সমাজবাস্তবতার ঠুনকো অহমিকার চেহারা প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে সমাজে নারীমুক্তির, আত্মজাগরণের, জেগে ওঠার আকাঙ্ক্ষার মূলসূত্রটিও প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাস্তবতার আলোকে : 'পুরুষতন্ত্রের কাছে নারীর পরাজয় নয়, পরাভব নয়, পুরুষতন্ত্রকে আগ্রাহ্য করেই নারীমুক্তি পেতে হবে'[৭৩] -- এই দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য গল্পে লিপিকার দৃঢ়, অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনোবলের মধ্য দিয়ে।

g¨ZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের দশম ও সর্বশেষ গল্প 'পারুলের মা হওয়া'। মা হতে পারা যে কোনো নারীর জন্য আনন্দের, গৌরবের। 'পারুলের মা হওয়া' গল্পের পারুল বেগমও মা হতে চলেছে। কিন্তু পারুলের এই মা হতে পারার প্রক্রিয়াটি আমাদের প্রথাগত সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে স্বাভাবিক নয়। বরং বিষয়টিকে সমাজ গর্হিত কাজ বলেই মানা হয়। কেননা পারুলের হবু সন্তানের কোনো পিতৃ-পরিচয় পাওয়া যায় না। পারুল বেগম নিজেও তার অনাগত সন্তানের পিতৃপরিচয়ের ব্যাপারে একরকম ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। এহেন সন্তান সমাজের চোখে স্বীকৃত নয়, কিন্তু সমাজবিরুদ্ধ এই কাজটিকেই সানন্দে নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়ার অভিপ্রায়ে পারুল করে যায় দৃঢ়তার সঙ্গে। এরকম একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচ্য 'পারুলের মা হওয়া' গল্পের কাহিনি আবর্তিত। নারীর আত্মজাগরণের, আত্মমুক্তির সোপান হয়ে উঠেছে গল্পের পারুল বেগম। সমাজের নিম্নবর্গের এক নারী পারুল বেগম, যাকে মাত্র দেড় বছর আগে সন্দীপ থেকে দিনমজুর আব্বাস আলি বিয়ে করে সংসার পেতেছিলো, যার সংসারে অঢেল প্রাচুর্য না-থাকলেও দু'বেলা খেয়েপড়ে ভালোভাবেই দিনাতিপাত করা যেতো। কিন্তু মাস ছ'য়েক আগেই কোনোকিছু না বলেই স্বামী আব্বাস আলির হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়াটাকে পারুল মেনে নিতে পারেনি। স্বামীর এরকম চলে যাওয়ার কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে ভেতরে ভেতরে পারুল ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পারুলের মনে হতে থাকে যে : 'লোকটি কোনো কারণ ছাড়া ওর নারীসত্তাকে উপেক্ষা করেছে। এই অপমান ওকে তীব্রভাবে দহন করেছে। ওর ভেতরটা পুড়ে যায় নারীত্বের অবমাননায়।' ('পারুলের মা হওয়া', g¨ZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩৪৫) পারুল যখন গ্রামের আলম চাচার কাছে জানতে পারে যে, তার স্বামী মনপুরার চরে গিয়ে ধান কাটে এবং সেখানে সে আবারো

বিয়ে করেছে, তখন তার ভেতরকার সমস্ত হতাশা, যন্ত্রণা ও দ্বিধা কাটিয়ে সে তার পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। পারুল অনুভব করে : 'এই হতাশা মানসিক ব্যাপার। এটা থেকে বের হবার জন্য বাস্তববাদী হতে হবে। মেয়েদের নিজেকেই নিজের পরিবর্তন করতে হবে। ... দাম্পত্য জীবন বা নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক তাকে রক্ষণশীলতার বাইরে নিয়ে আসতে হবে।'[৭৪] সম্পর্কের সামাজিকীকরণের ওপর পারুলের আর আস্থা বা নির্ভরতা কোনোটাই থাকে না। নিজের জীবনের সমস্ত আনন্দ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সে যেন অবলীলায় নিজস্ব ভাবনার অনুসারেই নির্ধারণ করার মনোবল অর্জন করে। ফলে দু'মাস পরে গর্ভবতী হলে এবং আরো তিনমাস পরে ব্যাপারটি যখন ওর নিজের কাছে পরিষ্কার হয়, তখন ও চিন্তাগ্রস্ত বা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার পরিবর্তে অজানা আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে :

> স্বামী ছাড়া মা হওয়া ভালো না মন্দ এ বোধ ওর মনেই আসে না। মা হয়েছে শুধু এই বোধ ওকে সম্পন্ন মানুষ করে দেয়। ... শরীরের দাবি মেটানোর জন্য ওর যাকে পছন্দ হয় তাকেই প্রশ্রয় দেয়। যার সঙ্গ ওর ভালো লাগে সেটা ওর আনন্দ-- সন্তানের পিতা নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। ('পারুলের মা হওয়া', gyZR¨‡bi †g‡qiv, MímgMÖ : ৩৪৬)

বলা বাহুল্য, আলোচ্য গল্পের পারুল ভিন্নধাঁচে গড়া অন্য নারী। আমাদের সমাজের প্রচলিত প্রতিবন্ধকতায় এহেন নারী স্বাভাবিকভাবেই বাস্তবতার সঙ্গে যেন মেলে না। সচেতন ভাবনা থেকেই সেলিনা হোসেন নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্পকে পারুল চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন। পারুল নিম্নবর্গের অসহায় বঞ্চিত নারীর আসন থেকে রূপান্তরিত হয় অগণিত নারীর আত্মমুক্তির প্রেরণার উৎসে। কাজেই : 'সে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য করে আত্মমুক্তির আর আনন্দের পথ নিজে নিজেই খুঁজে নিয়েছে। এই নারী এই সময়ের ব্যতিক্রমী আরেক নারী।'[৭৫] প্রচলিত সমাজবাস্তবতার বিরুদ্ধে পারুলের কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয় নিজের অধিকার অর্জনের দীপ্ত অঙ্গীকার :

> একদিন তারার মা ওর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললো, তোর প্যাড হইছে নি পারুইল্যা?
> ও লাজুক হেসে মাথা নাড়ে।
> -- কছ কি। স্বামী নাই...
> -- প্যাড হইতে স্বামী লাগেনি?
> -- ল্যাদার বাপ লাইগত ন।
> -- বাপ লাইগব কিয়ের লাই। আঁই বাপ, আঁই মা।
> ... আঁই হোলাহান মানুষ কইরুম। ভাত দিউম, কাপড় দিউম, বাপ দি করিউম কি? ঐতো আইতনের স্বামী দু'গা হোলামাইয়া থুই ভাগি গেছে। কি অইছে? বাপ ধুই হানি খাইবনি? যেগুনের বাপ নাই হেগুন মানুষ হয় না?
> ('পারুলের মা হওয়া', gyZR¨‡bi †g‡qiv, MímgMÖ : ৩৪৬)

পারুলের এই অকাট্য যুক্তির কাছে সমাজবাস্তবতার মিথ্যে অহমিকার ফানুসটি মুহূর্তেই ফাঁপা হয়ে যায়। পাঠকের বোধের কাছে হাজারো প্রশ্ন ভিড় করে আসে। বিবেকবোধ তাড়িত না হয়ে পারে না। পারুলের মধ্য

দিয়ে অগণিত নারীর ভেতরকার জমাটবদ্ধ প্রশ্নের বদ্ধ দরোজাটি সশব্দে খুলে যেতে থাকে। পারুল হয়ে পড়ে সমাজের অবহেলিত-বঞ্চিত-ব্যথিত নারীর আত্মমুক্তির দিশারী স্বরূপ। রাত দুপুরে মাঝে মাঝে গ্রামের দু'একজন পুরুষ এসে পারুলের সন্তানের স্বীকৃতি চাইলেও পারুল তাদের সে ইচ্ছাকে নাকচ করে দিতে একমুহূর্তও দ্বিধা করে না। সে জানে :

> পুরুষ মানুষগুলো পিতৃত্বের কর্তৃত্ব চায়। আর কিছু না, সন্তানকে লালন-পালন নয়, ওকে নিজের কাছেও নেবে না-- প্রকাশ্যে পরিচয় দিয়ে স্বীকারও করবে না। শুধু জেনে আনন্দ পেতে চায় যে পারুলের গর্ভে তারই সন্তান। হায় পুরুষ মানুষ! ... ওরা কে যে সন্তানের কর্তৃত্ব জানতে চায়? ওরা কারা? ওরা একটা জাত। এটা ওদের স্বভাব। কিন্তু কেউই জানবে না আমি কার সন্তানের মা-- শুধু আমি, শুধু আমিই ঈশ্বর। ('পারুলের মা হওয়া', gllZRv‡bi †g‡qiv, MímgM : ৩৪৭)

পারুল এভাবেই পুরুষতন্ত্রের বিপক্ষে নারীর প্রতিবাদী সত্তার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। পারুলের এহেন আচরণ প্রচলিত সামাজিক বাস্তবতা হয়তো নয়, কিন্তু সমাজে পারুলরা এভাবেই নিজের আধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রতিবাদী ভূমিকায় আবতীর্ণ হবে-- আলোচ্য গল্পে সে-ভাবনারই যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অসমতা এবং তা হতে উদ্ভূত জটিলতার অবসান ঘটবে, নারী-পুরুষের সম্পর্ক একদিন সমান ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই সমতার পথ ধরেই সমাজ, সভ্যতা অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এবং সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে-- এ আকাঙ্ক্ষার যথার্থ চিত্রায়ণ ঘটেছে gllZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলোর বিচিত্র ক্যানভাসে। নারীমুক্তি না-ঘটলে বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি অসম্ভব। মুক্তিযুদ্ধের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেশের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ নারীকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা হেয় করে কোনোভাবেই লাভ করা বা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করা সম্ভবপর নয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে নারীর জীবন কেমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে, নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত অসমতা, সম্পর্কের নানামাত্রিক জটিলতা-- প্রভৃতি বিষয়কে গল্পের উপজীব্য করে পাঠকের আবেগ আর বোধের সীমায় নিয়ে এসেছেন সেলিনা হোসেন আলোচ্য gllZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের পটভূমিতে। নারীর চেতনার যে স্বচ্ছ আয়না, সেখানে কেবল পুরুষের চেহারাই আভাসিত হয়ে উঠবে না বরং নারীর বোধেও জাগ্রত হবে আত্মজাগরণের অভীপ্সা ও আত্মমুক্তির দৃঢ় অঙ্গীকার। gllZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থ যেন নারীর সেই আত্মমুক্তিরই জীবনভাষ্য।

Abpv cwYgv

সেলিনা হোসেনের সপ্তম গল্পগ্রন্থ Abpv cwYgv [76]-তে মোট পনেরটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো যথাক্রমে ‘দু’রকম যুদ্ধ’, ‘বাড়ি ফেরা’, ‘পাখি ধরা’, ‘বদলে যাওয়া’, ‘দুর্নীতি’, ‘ফিরে দেখা’, ‘রহমত আলীর শকুন দেখা’, ‘পূর্ণবালার নুড়ির গয়না’, ‘পুনরায় ইহকাল’, ‘রইস্যা চোর’, ‘মর্গ’, ‘দ্বন্দ্ব’, ‘থাবা’, ‘শেষ চিঠির পরে’, এবং ‘অনূঢ়া পূর্ণিমা’। গল্পগুলোতে সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ যেমন লক্ষণীয় তেমনি একই সঙ্গে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক নারীজীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের নারীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে, যাপিত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও যে আরও নানান দেখবার ও বুঝবার দিক রয়েছে– গল্পগুলোর বিচিত্র ক্যানভাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে যাপিত জীবনের নানামুখী অনুষঙ্গ। সেলিনা হোসেনের লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বলা যেতে পারে ‘মানব প্রগতির স্বার্থেই তিনি বিচরণ করেন ঐতিহ্যলোকে, কখনো-বা ইতিহাস, কখনো-বা সংক্ষোভময় সমকালে।’[৭৭] আলোচ্য অনূঢ়া পূর্ণিমা গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো সেলিনা হোসেনের ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতনতার অসাধারণ শিল্পভাষ্য। ‘দু’রকম যুদ্ধ’ গল্পের পটভূমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। গল্পে মহান আত্মত্যাগের বলে বলীয়ান বীর বাঙালির অদম্য সাহস ও সংগ্রামের ইতিহাসকে পটভূমিতে রেখে মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ও গৌরবময় অংশগ্রহণের স্বরূপ-সন্ধান করা হয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরজানের আত্মত্যাগ-সাহস-সংগ্রামের এক অনবদ্য চিত্রায়ণ পাঠককে বার বার ইতিহাসের আলোকিত সমাজবাস্তবতার মুখোমুখি করে তোলে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ কেবল অস্ত্র হাতেই ছিলো না, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সেবা ও সহযোগিতার ভূমিকাতেই নারী তার দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি বরং লক্ষণীয় যে : ‘কিছুক্ষণ আগেও তিনজন পাকিস্তানি সেনাকে নূরজান শরীর দিয়ে খুশি করেছে। তীব্র কষ্ট বুকে চেপে রেখে ও ওদের চকচকে মুখ দেখেছে, আর ভেবেছে এটাই ওর যুদ্ধক্ষেত্র– অস্ত্র দিয়ে নয়, নিজের শরীর দিয়ে উদ্ভাবন করতে চায় যুদ্ধের কৌশল।’ (‘দু’রকম যুদ্ধ’, Abpv cwYgv, গল্পসমগ্র : ৩৫১) পাকবাহিনীর ক্যাম্পে অবস্থান করে গোপনে নূরজান নানা খবরাখবর পৌঁছে দিতো মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পে। গল্পটি একই সঙ্গে নারীর যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের বাস্তবতাকেও প্রতিভাত করে এভাবে :

> আপনে কইয়্যা দ্যান মাইনডা কোনহানে পুঁতা লাগবো। মুই পুঁতুম। কে কে যাইবো কন। অহনই যাঅন লাগবো। ওর দৃঢ় কণ্ঠ গমগম করে ঘর জুড়ে। নিজাম মাস্টার এবং অন্য পাঁচজন ছেলে স্তব্ধ হয়ে নূরজানের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে। মেয়েটির কণ্ঠ যেন বজ্রধ্বনির মতো, ওরা নূরজানের সামনে অসহায় বোধ করে। যেন ওরা এতোদিন কোনো অপারেশনে যায় নি। ওরা কি আসলেই জানে যুদ্ধ কি? যেভাবে নূরজান যুদ্ধটাকে নিজের মতো করে দেখছে, সেভাবে? (‘দু’রকম যুদ্ধ’, Abpv cwYgv, MímgM : ৩৫৩)

এভাবেই গল্পে নূরজান চরিত্রের আলোকে মুক্তিযুদ্ধে নারীর স্বতন্ত্র ভূমিকা অভিব্যঞ্জিত হয়েছে শৈল্পিক দক্ষতায়। 'বাড়ি ফেরা' গল্পটিতে নারী-নির্যাতনের বীভৎসতা ও নারীর প্রতি সামাজিক সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ মানসিকতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। আছিরুদ্দীনের আঠার বছর বয়সের মেয়ে মেঘলা ব্র্যাকের স্কুলে পড়ে। পড়ালেখার ফলে মেয়েটির চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আসে। এতে মেঘলার বাবা খুশি হলেও তার ভাবনায় প্রতিফলিত হয় নারীর প্রতি সামাজিক উপেক্ষা : 'ওর পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে মেঘলাই বড়ো। চটপটে। আছিরুদ্দীনের ভাষায় ভীষণ বুদ্ধি মেয়েটির। তারপর বড়ো করে শ্বাস টেনে বলে, মেয়েটা যদি আমার ছেলে হতো! এ দীর্ঘশ্বাসের জবাব হয় না। মায়ের ধারণা মেয়ে হওয়াটা মস্ত অপরাধ। মেয়েদের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হয়।' ('বাড়ি ফেরা', Abpv cwYgv, MímgM : ৩৫৫) মেঘলাকে কেন্দ্র করে তার বাবা-মায়ের এই আক্ষেপ ও পুত্রসন্তানের জন্য হাহাকার প্রকারান্তরে সমাজে নারী-পুরুষের অসম সামাজিক অবস্থাকেই মূর্ত করে তুলেছে। কেননা : 'পুরুষতন্ত্রের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারী নয়, পুরুষকে প্রাধান্য দেয়, পুত্রসন্তান কামনা করে।'[৭৮] নারীও যে মানুষ, বুদ্ধি-বিবেচনায় নারীও যে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে; কখনো-বা পুরুষকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে– এহেন ভাবনা থেকে সমাজ যেন অনেকটা নিষ্ক্রিয়-নির্বাক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নারীর অধস্তন অবস্থাকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। গল্পটিতে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা কত ভয়াবহ হতে পারে তার বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষণীয় পিতাকে নিয়ে সদর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মেঘলার ওপর নেমে আসা পাশবিক নির্যাতনের চিত্রটির মধ্য দিয়ে :

> চারজনে মেঘলাকে টানতে টানতে ইটখোলার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। চারটি ছেলে হো হো করে হাসে। উচ্চ হাসির রোলে চাপা পড়ে যায় মেঘলার চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে একজন পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর মুখ বেঁধে দেয়। ও একজনের হাত কামড়ে দেয়, অন্যজনের মুখ খামচিয়ে রক্ত বের করে ফেলে। ওইটুকুই। ব্যস, মেঘলার যুদ্ধ শেষ। ইটখোলার ইটের পাঁজার আড়ালে ওরা ওরই শাড়ি দিয়ে ইটের সঙ্গে ওর দুহাত বেঁধে রাখে। তারপর একে একে... কতোবার... মেঘলা মনে করতে পারে না। ও জ্ঞান হারায়। ('বাড়ি ফেরা', Abpv cwYgv, MímgM : ৩৫৬)

মেঘলাকে ধর্ষণের মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতনের এক বিশেষ মাত্রা রূপলাভ করেছে। নারীকে ধর্ষণ করে পুরুষ পাশবিক উল্লাসে মেতে ওঠে, এ উল্লাস নারীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন বা নিয়ন্ত্রণের অবদমিত চেতনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা : 'ধর্ষণের আসল উদ্দেশ্য যৌন বাসনার চরিতার্থতা নয়; সমাজ পুরুষের মধ্যে যে পৌরুষের প্রতিচ্ছবি এবং নারীর মধ্যে যে নারীত্বের প্রতিচ্ছবি অংকন করে দিয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ ধর্ষণ। ধর্ষণ ক্ষমতা ও ক্রোধের যৌন বহিঃপ্রকাশ।'[৭৯] আলোচ্য গল্পে মেঘলার ওপর ধর্ষণের এহেন পাশবিকতা যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের আগ্রাসী ক্ষমতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি। নারীর প্রতি পাশবিকতার এক মর্মান্তিক আখ্যান 'পাখি ধরা' গল্পটি। সমাজের কোথাও নারী নিরাপদ নয়। শিশু থেকে বৃদ্ধা– সব বয়সেই নারী নানা মাত্রিকতায়

নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। আলোচ্য গল্পে মাত্র পাঁচ বছরের শিশুকন্যার প্রতি পুরুষের লালসার ভয়াল থাবা বিস্তার লাভ করেছে। গল্পে বিষয়টি উঠে এসেছে এভাবে :

> ঢাকার মহানগর হাকিমের আদালত প্রাঙ্গনে পাঁচ বছর বয়সী হাতিয়া ধর্ষিত হওয়ার পর থেকেই সাংবাদিক তুহিন ও মুহিব শিশু-সংক্রান্ত বিবেচনায় খানিকটা বিহ্বল হয়ে যায়। নিজেদের শৈশব বিবর্ণ হতে থাকে। ... ওরা জানে যখন ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে তখন আদালত প্রাঙ্গনে কর্তব্যরত পুলিশ ছাড়া আর কেউ ছিলো না। কিন্তু আসামি হয়েছে ধনুসার গাঁয়ের একজন যে ওখানে বসে দিনের বেলা কলা বিক্রি করে। রাতে বারান্দায় ঘুমায়। সাপ্তাহিক ছুটির দিন গাঁয়ে ফিরে যায়। গালভাঙা বিবর্ণ চেহারা, এই গাঁয়ের এবড়োথেবড়ো সড়কের মতো। দরুদ পড়ার মতো অনবরত আউরেছে একটি বাক্য, ওই তারিখে আমি গাঁয়ে ছেলাম। কেউ শোনে নি ওর কথা। শুধু মুহিব আর তুহিনের মনে হয়েছে নিজেদের চামড়া বাঁচাবার জন্য ওকে পুলিশের দরকার। ('পাখি ধরা', Abpv cwYgv, MímgM : ৩৫৮)

এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজবাস্তবতায় বিরাজমান অরাজকতা ও নারী-নিষ্পেষণের এক করুণ দিকের উন্মোচন ঘটেছে। ক্ষমতাধর পুরুষ নিজের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে নারীকে অবলীলায় ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম মানবিকবোধ ও বিচার-বিবেচনার চেতনাও যেন লোপ পায়। যে সমাজে আইনের রক্ষক পুলিশের নির্যাতন-পাশবিকতার ছোবল থেকে পাঁচ বছরের শিশুকন্যারও মুক্তি মেলেনা, সে সমাজে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধস্তন অবস্থার বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাই লক্ষণীয় :

> খবরের কাগজের পাতায় নারী-ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের জন্য নিগ্রহ এমনকি হত্যা ইত্যাদি খবর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বস্তুত আমাদের সমাজে প্রতিটি নারী সদাসর্বদা নির্যাতনের আতংকে ভোগে। এমন কি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মার্কিন নারীরা নির্যাতনের ভয় থেকে মুক্ত নয়।[৮০]

যে সমাজে পাঁচ বছরের শিশুর ওপর ধর্ষণের মতো ভয়াবহ নির্যাতন সংঘটিত হতে পারে সে সমাজে 'ফতোয়া দিয়ে কোনো মেয়েলোককে পোড়ানো' কিংবা 'নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্যে শহর থেকে পুলিশ এসে গাঁয়ের নিরপরাধ মানুষ ধরে নিয়ে যাওয়া' অথবা 'তথাকথিত ক্ষমতাধর সব্বাইর কামে লাগা পতিতার জন্য ফতোয়ার বিধি প্রযোজ্য না হওয়া' ইত্যাদি সামাজিক অনাচার সাধারণ দৃশ্যপট হিসেবেই বিবেচিত। 'পাখি ধরা' গল্পে ঘুণে ধরা, ক্ষয়ে যাওয়া সামাজিক অবক্ষয়ের জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে। 'দুর্নীতি' গল্পে নারী-জীবনের এক বিশেষ রূপ চিত্রিত হয়েছে। কখনো কখনো সমাজের অন্যায়-অনিয়মের পেছনে নারীরও পরোক্ষ ভূমিকা থাকে, পুরুষের অনৈতিক কার্যকলাপের কারণ ও যোগসূত্র হিসেবে নারীর প্ররোচনা থাকে– এরকম একটি ভাবকল্প নিয়ে 'দুর্নীতি' গল্পের পটভূমি নির্মিত হয়েছে। নিয়ামত রসুলের জীবনে সদ্যবিবাহিত স্ত্রী আফরোজা নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ। গল্পটিতে আফরোজার চরিত্রটি যেভাবে আভাসিত হয়েছে তাতে সমাজে-পরিবারে নারীর নেতিবাচক ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এভাবে :

> বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই বউ বলেছে, তোমার চাকরিতে উপরিপাওনা আছে বলেই এখানে বিয়েতে রাজি হয়েছি, নইলে রাজি হতাম না। আমার জন্য কতো প্রস্তাব ছিলো আমি রাজি হইনি। ... আমি কিন্তু অল্প টাকায় সংসার চালাতে পারবো না। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। ... আমি কিন্তু আর বেশি দিন এই বাড়িতে থাকবো না। একটা ভালো এলাকায় বড়ো বাড়ি তুমি ভাড়া করবে। এমন ছোট জায়গায় ছোট বাড়িতে থাকলে মন ক্ষুদ্র হয়ে থাকবে। সামনে বাচ্চাকাচ্চা হবে। ওদের আমি বড়ো পরিবেশে আরাম-আয়েশে বড়ো করতে চাই। ('দুর্নীতি', Abpv cwYgv, MímgM : ৩৬৫-৩৬৮)

আফরোজা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজে-পরিবারে নারীর নীতিহীন, অবিবেচনা প্রসূত ভূমিকার চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। স্বামীর আর্থিক সংগতি বিবেচনা না করে আফরোজা নিয়ামতকে ঘুষ খেতে প্ররোচিত করে। এহেন অন্যায় পথে নিজ জীবনে সচ্ছলতা আনতে বদ্ধপরিকর সে। এমনকি এতে করে তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হলেও আফরোজার ভাবনায় কোনো পরিবর্তন বা প্রভাব পড়তে দেখা যায় না। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই গল্পটি সমাপ্তি লাভ করে। একই সঙ্গে নারী-জীবনের নেতিবাচক বিশেষ দিকের স্বরূপটিও সমাজসত্যের আলোকে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। পুরুষের অনৈতিক কাজের পশ্চাতে কখনো কখনো নারী প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নারী কেবল সৃষ্টিই করে না, প্রেরণাদাত্রী হয়েই থাকে না, কখনো কখনো দুর্নীতির উৎস হিসেবেও নিজের হীন ভূমিকাকে সুস্পষ্ট করে তোলে– আলোচ্য গল্পে আফরোজার অবয়বে নারীর সেই বিশেষ নীতিহীন অমানবিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। ভাষা-আন্দোলন বাঙালিদের জন্যে একটি দিক নির্দেশনামূলক ঘটনা। ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানিরা নিজেদেরকে বাঙালি হিসেবে ভাবার সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। কারণ, ভাষার ওপর আঘাত আসার পর বাঙালিদের কাছে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে ফুরিয়ে আসতে থাকে। ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব ও ব্যাপ্তি আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। ভাষা-আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগের উদ্দীপনা ও সম্পৃক্ততা আমাদের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। সেলিনা হোসেনের 'ফিরে দেখা' গল্পের আলোকে ভাষা-আন্দোলন ও নারীজীবনে এর প্রভাব ও গভীরতার বিষয়টি ইতিহাস-ঐতিহ্যের পটভূমিতে শিল্পিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মার্ট মেয়ে বীথির জীবনে বায়ান্ন এক অনবদ্য আবেগ ও তীব্রতার জন্ম দিয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া-পাওয়ার চেয়েও তাই বীথির জীবনে বায়ান্নোর আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার আবেদন অনেক বেশি বাস্তব ও গভীর। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন বীথির চেতনাকে উজ্জীবিত করে তোলে, তাই তার ভাবনা এরকম :

> ও মনে করে এই সময়টাকে ওর সফল করতে হবে। এ সময়টায় হেরে গেলে হারিয়ে যাবে ওর জীবনের অনেকটা– শুধু ওর নয়, ওর ছেলেমেয়েরাও হারাবে পাঁজরের হাড়। দেখবে শরীরের একটা কিছু নেই– মিসিং লিঙ্ক। ... আমার পারিবারিক জীবনকে সুন্দর রাখার জন্য আমি ভাষা-আন্দোলনকে সফল করতে চাই। আমি তো দেখতে চাই না যে আমার চোখের সামনে আমার

> বর্ণমালা পুড়ছে। আমি তো দেখতে চাই না যে আমার ছেলেমেয়েদের উর্দু শিখতে হচ্ছে। আমি আমার গান গাইতে ভুলে যাবো। না, এমন দিন আমি আমার জীবনে আসতে দেবো না। ('ফিরে দেখা', Abpv c¨Ygv, MímgM : ৩৭১-৩৭৪)

ভাষা-আন্দোলনের প্রবল প্রাণাবেগ হৃদয়ে ধারণ করে বীথি তাই তার বিয়ের দিন সকালেই মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য বেরিয়ে যায়। চমৎকার চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে ভাষা-আন্দোলনের দুর্বার প্রেরণাকে গল্পে চিত্রিত করেছেন সেলিনা হোসেন এভাবে :

> গায়ে হলুদের তোড়জোড় চলছে। উঠোনে মহিলারা গোল হয়ে বসেছে। এক পাটায় মেহেদি বাটা হচ্ছে, অন্য পাটায় কাঁচা হলুদ। বড়ো আকারের একটি রুই মাছও কাটছে একজন। সবজি-আনাজ টাল করে রাখা হয়েছে একপাশে। উঠোনে বড়ো চুলো করা হয়েছে। শুকনো কাঠ জ্বলছে দাউদাউ। বীথি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এক নজর দেখে মনে হয় বর্ণমালা পুড়ছে। মেহেদির পাতা নয়, শিলের নিচে পিষ্ট হচ্ছে একটি 'ম' কিংবা 'অ'। বটিতে কাটা হচ্ছে একটি 'ক'। টুকরো টুকরো হচ্ছে বর্ণমালা। ('ফিরে দেখা', Abpv c¨Ygv, MímgM : ৩৭৬)

এভাবেই ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে নারীজীবনের সম্পৃক্ততার গৌরবময় ইতিহাসের মহান সত্যটি রূপায়িত হয়েছে বীথি চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহসী ভূমিকার মাধ্যমে। যুদ্ধ মাত্রই বর্বরতার জন্ম দেয়। যুদ্ধ চলাকালীন হিংসা, প্রতিহিংসা সর্বদাই মানবতা বিরোধী এবং নিষ্ঠুরতায় ভরপুর থাকে। সুস্থ মানুষের পক্ষে খুন করা সম্ভব হয় না। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা একটি মানসিক বিকৃতি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের দোসর রাজাকাররা বাঙালি নারী-পুরুষ ও শিশুর উপর যে ধরনের জঘন্য অত্যাচার করেছিলো তার সবটুকু হয়তো এখনো প্রকাশিত হয় নি। নিজের দেশে স্বাধীনভাবে বাস করার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই থাকে। নিজেদের ভালোমন্দ চিন্তা করার অধিকারও সকল জাতির থাকে। কিন্তু বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিরা যে ধরনের অত্যাচার চালিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে তার অর্থ ঠিক অভিধানেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের পাশবিকতা বিশ্বের ঘৃণ্য নির্যাতনকেও হার মানিয়েছে। ঐ সকল অত্যাচারের খণ্ডচিত্র আমাদের ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। সেলিনা হোসেনের 'রহমত আলীর শকুন দেখা' তেমনই একটি গল্প। গল্পটি যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সেই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের নির্মম সাক্ষী। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাসায় বাস করেও রহমত আলী বুঝতে পারেনি যে মিনহাজউদ্দিন একজন মুক্তিযোদ্ধা। মিনহাজউদ্দিন ও তার স্ত্রী রোকেয়া দুজনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন দেখা রহমত আলীর মতো রাজাকারের দৃষ্টিতে ভয়ানক অন্যায় ও দুঃসাহস হিসেবে বিবেচিত। ভেতরে ভেতরে প্রতিশোধ-স্পৃহায় জর্জরিত হতে থাকে রহমত আলী। একদিন সে সুযোগও এসে যায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে মিনহাজউদ্দিন ও রোকেয়ার খবর জানিয়ে দিতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রহমত আলী। গল্পে যুদ্ধকালীন সময়ের বিভীষিকা ও নারীর প্রতি পাশবিকতার চিত্রায়ণ ঘটেছে এভাবে :

> সবুজ রঙের জিপটা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামানো হয় পাঁচ-ছয়টি মেয়ে। ওরা নামতে চায় না। নানা কিছু আঁকড়ে ধরে বাধা দেয়। এসব দেখে রাগে, উত্তেজনায় জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে যায় রহমত আলী। চিৎকার করে বলে, বেয়াদব, বেতমিজ। হারামজাদিগুলোর তো খুশি হয়ে ওদের পা চাটা উচিত। ওদের পা ধুয়ে পানি খাওয়া উচিত। কুকুরের বাচ্চাগুলো নখরামি করছে। সৈনিকরা মেয়েগুলোকে টানতে টানতে বড়ো ঘরটায় ঢোকায় এবং অফিসারটি সেই ঘরে প্রবেশ করে। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। – সাবাস! রহমত আলী চেঁচিয়ে জানালার শিকে ঘুষি মারে। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দৃষ্টি। মনে মনে বলে, মেয়ে-মানুষকে তো মানুষে খাবে। শকুনে তো খাবে না। ... রহমত আলীর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ওরা রোকেয়াকে আনতে ওর বাবার বাড়িতে যায়। সে রাতে ক্যাম্পের কোনো ঘর থেকে ভেসে আসে রোকেয়ার গোঙানি। অফিসার একবারই। তারপর তুলে দেয় সেপাইদের হাতে। ... পরদিন ও গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে ফাঁস লাগায়। কিন্তু সেপাইরা টের পেয়ে গেলে মরা আর হয় না। সেপাইরা মহা ফুর্তিতে গাছে ঝোলানোর জন্য রোকেয়াকে হাত-পা ধরে দোলাতে দোলাতে বকুলতলায় আনে। ধর্ষণের অত্যাচারে বিধ্বস্ত রোকেয়া মরতে গিয়েও মরতে পারেনি। এখন অচেতন। ('রহমত আলীর শকুন দেখা', Abpv c‡Yqv, MímgM : ৩৮০-৩৮১)

পাকিস্তানি সেনাদের বিকৃত অত্যাচারের চিত্রটি বাস্তবতার আলোকে গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। যুদ্ধের সময়ে ঘটে যাওয়া এ ধরনের ঘটনাকে সাহিত্য হিসেবে পরিবেশন করা বেশ কঠিন কাজ। একমাত্র দক্ষ শিল্পীরাই পারেন সংকটকালীন এ ধরনের স্মৃতিকে আত্মস্থ করে সাহিত্যকর্মে রূপায়িত করতে। সেলিনা হোসেন সেই কঠিন ও মহান দায়িত্বটি পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য গল্প তারই শৈল্পিক নিদর্শন। আজীবন বঞ্চনা ও অতৃপ্তির কারণে যারা পরের সুখ ও সাচ্ছন্দ্য সহ্য করতে পারেন না– তাদের মনোযাতনা ও নিঃসঙ্গতাকে উপজীব্য করে লেখা 'পূর্ণবালার নুড়ির গয়না' গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে অসহায়-দরিদ্র এক বয়সী নারী পূর্ণবালা। জীবনযুদ্ধে জর্জরিত অসহায় এক বৃদ্ধা কীভাবে ক্রমশ নিজস্ব অবস্থান ও পরিপার্শ্বের প্রতি আস্থা হারান, আত্মজনের প্রতি হন বিরূপ, কিভাবে মর্মযাতনা ও নিঃসঙ্গতা তার পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়ে, তার ভেতরে ঈর্ষা ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়– তারই এক জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পের পূর্ণবালার চরিত্রের অবয়বে। পূর্ণবালা এক অসহায়-বঞ্চিত নারী-জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার অসহায়ত্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

> পূর্ণবালা বয়সী নারী। কতো বয়স? নিজেও জানে না। ঘরসংসার ছিলো। এখন কেউ নেই। স্বামী মরেছে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে। বেহেড মাতাল ছিলো। একমাত্র ছেলে নিরুদ্দেশ। বেঁচে আছে না মরে গেছে সে খবর পূর্ণবালার কাছে নেই। ও এখন কবং পুরিয়ার পাহাড়ি কন্দর থেকে পাথর কুড়ায়। চলে যায় খাগড়াছড়ি সদরের উত্তর-পশ্চিমে। বাঙ্গালকাটি, ভাইবোন ছড়ি এমন কত জায়গা– শৈশব থেকে চেনা এসব জায়গা, এখন সবকিছু নতুন পূর্ণবালার কাছে। এই চেনা জায়গায় থেকে ওকে নতুন করে বেঁচে থাকা শিখতে হচ্ছে। ... পূর্ণবালার কষ্ট অন্যত্র। বয়সী নারীর বালিকা হয়ে যাওয়ার বেদনায় ও এই আশৈশব চেনা প্রকৃতির দিকে থুতু ছুড়ে মারে। নিজেকেই প্রশ্ন করে, কার সঙ্গে তোর রাগ পোড়ারমুখী? রাগ যৌবনের সঙ্গে। বুড়ো মহাজন যুবতী চাঁদমুখীকে মোটরসাইকেলে নিয়ে উধাও হবে কেন? বুড়োর তো উচিত ওকে ডেকে চেঙ্গী নদীর ধারে গল্প করা। ('পূর্ণবালার নুড়ির গয়না', Abpv c‡Yqv, MímgM : ৩৮২)

নিজের অতৃপ্ত যৌনবাসনার অচরিতার্থতাজনিত ব্যর্থতায় পূর্ণবালা ক্রমাগত ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটে চলে একান্ত নিভৃতে। বঞ্চিত-জীবনের অন্তর্জালায় তার ভেতরে ঈর্ষা ও ক্ষোভের জন্ম হয়। তাইতো মহাজনের সঙ্গে যুবতী চাঁদমুখীর ওঠাবসা তার সহ্য হয় না। চাঁদমুখীর মুখে মহাজন সম্পর্কিত আবেগময় কথাবার্তা শোনার পরে পূর্ণবালার ঈর্ষান্বিত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এভাবে :

> পূর্ণবালা চোখে আগুন ঝরায়, হারামজাদি, বেশ্যা।
>
> গর্জে ওঠে চাঁদমুখীও, তুইই বেশ্যা। শকুনের মতো আমার জওয়ানকীর দিকে তাকিয়ে থাকিস। অন্যের সুখ সয় না।
>
> রাগে অন্ধ হয়ে যায় পূর্ণবালা। ওর হাতের রঙিন নুড়িগুলো চাঁদমুখীর মুখের ওপর হাওয়াই বাজির মতো ঝরে পড়ে। ও আহত হয়। ('পূর্ণবালার নুড়ির গয়না', Abpv c\Ygv, MímgM : ৩৮২-৩৮৩)

নানাধরনের বঞ্চনা ও অমনোযোগের ফলে বৃদ্ধা পূর্ণবালার যে মর্মযাতনা ও দ্বান্দ্বিক সংকট তার ভেতরে ক্রোধ ও ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে– তারই বাস্তবনিষ্ঠ চিত্রায়ণ ঘটেছে পূর্ণবালার ক্ষোভ ও চাঁদমুখীর প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণের মধ্য দিয়ে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় একজন বয়সী পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ঘটনা অতি সাধারণ চিত্র হলেও একই বয়সী নারীর যৌনবাসনার আকাঙ্ক্ষাকে কখনোই সমাজ ভালো দৃষ্টিতে দেখে না। অবদমিত সে অচরিতার্থতাজনিত যৌনবাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নারীর অসংলগ্ন আচরণের মধ্য দিয়ে। তথাকথিত সামাজিকীকরণের অজুহাতে নারীকে এভাবেই অবদমিত করে রাখার বিধান সমাজে প্রচলিত। বলা যেতে পারে : 'নারী-পুরুষের সম্পর্কের অনৈক্য তথা সমাজসৃষ্ট এই বিভাজন কীভাবে নারীর জীবনকে বিপন্ন ও অসহায় করে তোলে'[৮১] তারই সচিত্র প্রতিবেদন 'পূর্ণবালার নুড়ির গয়না' গল্পটি।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'মর্গ', 'থানা', ও 'অনূঢ়া পূর্ণিমা'– এই গল্পত্রয়ের পটভূমি অনেকটা একই বিষয়কে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে। গল্পগুলোতে নারীর শরীর কেমন করে, কীভাবে নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় তারই বাস্তবচিত্র উন্মোচিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরেই নারী নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সামাজিক অনুশাসনের অধীনে। নারী নির্যাতন সর্বজনীন, কোনো আর্থ-সামাজিক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। কেননা : 'সকল সম্প্রদায়, উচ্চ মধ্য, নিম্ন বিত্ত; ধনী, নির্ধন; শিক্ষার সকল স্তরের পুরুষ নারী নির্যাতন করে– তারা বিবাহিত, অবিবাহিত, তালাক প্রাপ্ত, পরিত্যক্ত।'[৮২] আর সকল প্রকার নির্যাতনের হাতিয়ার বা উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে নারীর শরীর। আলোচ্য গল্পগুলোতে নারীর প্রতি নির্যাতনের এই বিশেষ মাত্রাটি সমাজসত্যের আলোকে শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'মর্গ', গল্পে শচীন্দ্র পূর্ণিমা রানীকে ভালোবাসার আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখিয়ে মূলত তার দেহভোগে তৃপ্ত হতে চেয়েছে। 'থাবা' গল্পে বানুসা শহরে কাজ খুঁজতে এসে বস্তির আব্দুল গফুর কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। আব্দুল গফুরের 'বান্ধা মাইয়ামানুষ' হিসেবে বস্তিতে তার আশ্রয় জোটে। অন্যদিকে 'অনূঢ়া পূর্ণিমা' গল্পে বানিয়াশান্তার নিষিদ্ধ পল্লীর অধিবাসী লীলা জীবিকার

সন্ধানে, পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়ভার মেটাতে নিজের শরীরকে পণ্যে পরিণত করতে বাধ্য হয়। এমনকি সমাজ তাকে 'বেশ্যা' পরিচয়ে চিহ্নিত করে তার কাছ থেকে ভালোবাসার সমস্ত অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নিতে কার্পণ্য করে না। গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে লেখক ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সংকট ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি নিপীড়ন ও অবদমনের বিশেষ কৌশলকে রূপদান করেছেন সমাজবাস্তবতার আলোকে। 'মর্গ' গল্পে পূর্ণিমা ও শচীন্দ্রর ভালোবাসার নেপথ্যে ছিলো প্রতারণার ফাঁদ, নারীদেহ-ভোগের উন্মাদনা। বিষয়টি গল্পে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> শচীন্দ্র গাঢ় কণ্ঠে বলে, আমাদের প্রেম রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মতো পবিত্র। পূর্ণিমা তুমি আমার আকাশ। এ আকাশকে কখনো ধুলো ছোঁবে না। পূর্ণিমা অভিভূত। পূর্ণিমা আবেশে বিহ্বল হয়। শচীন্দ্র ওর হাত সচল করে, কর্ষিত হতে থাকে পূর্ণিমার শরীর। পূর্ণিমা জানতেও পারে না যে শচীন্দ্র প্রেম বোঝে না, বোঝে শরীর। ... একদিন পূর্ণিমার গর্ভ হয়। ও বিশ্বাস করতে পারে না নিজের শরীরকে। ও ছুটে যায় শচীন্দ্রের কাছে। শচীন্দ্র হা হা করে হাসতে হাসতে বলে, বিয়ে? রাধাকৃষ্ণের প্রেমে আবার বিয়ে কি? ... পূর্ণিমার হৃদয় আর্তনাদ করে। ওই আর্তনাদ থেকে মুক্তি চায় শচীন্দ্র। ও পূর্ণিমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ঘর থেকে বের করে। ভালোবাসার কথা বলতে বলতে মেঠো পথ পেরিয়ে জঙ্গলে আসে। সেখানে নেকড়ে হয় শচীন্দ্র। ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ণিমার ওপর। পূর্ণিমা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে, রক্ত ঝরে এবং সে রক্তের প্রতিটি ক্ষত শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে যায়। ও শরীর দিয়ে শুনতে পায় শচীন্দ্রর কঠিন কণ্ঠ, কেন পূর্ণিমার বিয়ের সাধ, কেন ঘরের স্বপ্ন, কেন সন্তানের পিতৃত্বের দাবি, এতো সাহস পূর্ণিমার কোথা থেকে হয়!
> ('মর্গ', Abpv cïYgv, MímgM : ৩৯১-৩৯২)

'থাবা' গল্পের বানুসা এবং তার দশ বছর বয়সের কন্যা ফুলেসার প্রতি নির্যাতনের উপজীব্য হয়ে ওঠে তাদের শরীর এবং পুরুষের নারীদেহ ভোগের বিকৃত লালসা। বস্তি দখলের পায়তারায় দু'পক্ষের শক্তি প্রদর্শনের ও ক্ষমতা দখলের উপায় বা মাধ্যম হয়ে ওঠে নারীর শরীর। কেননা বানুসাকে অবলীলায় ভোগ করে চলে বস্তিতে আশ্রয়দাতা আব্দুল গফুর। অন্যদিকে আব্দুল গফুরকে খুনের মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে প্রতিপক্ষ আব্দুল জলিলের বস্তি দখলের পায়তারার মোক্ষম অস্ত্র হয়ে ওঠে বানুসা। এমনকি বানুসার দশ বছরের মেয়ে ফুলেসাও পুরুষের বিকৃত-লালসার হিংস্র থাবা থেকে পরিত্রাণ পায়নি। নারীর শরীর কীভাবে তার সংকটকে ঘনীভূত করে তোলে তারই বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ ঘটেছে গল্পটিতে এভাবে :

> আব্দুল গফুর বলে, 'তোমার বাপে তো তোমার মায়েরে ফেলে দিয়ে অন্যখানে চলে গেছে। তোমার মা তোমারে নিয়ে শহরে আসছে কাজ খুঁজতে'। বানুসা ফোঁস করে উঠে বলে, 'আপনে অরে এ্যাতো কথা কন ক্যান? ও একটুখানি মাইয়া।'
> – কে বলেছে ও একটুখানি মেয়ে। মেয়ে হলেই হলো। একটুখানি, তেকটুখানি নাই। তারপর চোখ নাচিয়ে কুৎসিত ভঙ্গিতে বলে, মনে রাখবে তুমি আমার। আর কারো দিকে চোখ দিওনা। ... আব্দুল গফুর ওকে ব্যবহার করতেই বেশি ব্যস্ত। আব্দুল গফুর তো প্রথমেই ওর হাতে মায়া বড়ির প্যাকেট তুলে দেয়। ... এতোক্ষণে ওর গায়ে কেরোসিন ঢালা হয়েছে। আগুন জ্বলে ওঠার আগে ও শুনতে পায় কেউ একজন বলছে, এখন থেকে বস্তির দখল আমাদের। আব্দুল গফুরকে আর এখানে আসতে হবে না। বানুসা বিবিকে আগুনে পুড়িয়ে মারার দায়ে পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াবে। তারপর ওদের হা হা হাসি বানুসার দু'কান ভরে বাজে। আব্দুল গফুরের জন্য বানুসার কোনো দুঃখ নেই। ও জানে আব্দুল গফুর ওকে ব্যবহার করেছে, এখন এরা করছে। শুধু

ফুলেসার শ্মশানের মতো ভবিষ্যৎ ওকে পীড়িত করে রাখে। কিন্তু পীড়ন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। বানুসার শাড়িতে আগুন জ্বলে ওঠে। বস্তিতে চিৎকার। হৈ চৈ। ... ও মাগো, বলে তারস্বরে চেঁচায় ফুলেসা। পুলিশের থাবা ওর মুখ চেপে ধরে। পাশ থেকে একজন বলে, শিশুটার মুখটা এমন করে চেপে ধরলেন কেন? ছেড়ে দেন।

পুলিশের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তার মুখের ওপর পড়ে। ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বলে, ও আবার শিশু কি? ওতো মেয়ে!

সেই পুলিশের থাবার নিচে ফুলেসা যখন হাঁসফাঁস করছে অন্য পুলিশ তখন রাইফেলটা মাটিতে দাবিয়ে বলে, মেয়েরা আবার শিশু হয় নাকি! ('থাবা', Abpv c\Ygv, MímgM : ৪০০-৪০৪)

এভাবেই পুরুষতন্ত্র ভোগের লালসাকে তৃপ্ত করার বাসনায়, নিজের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে নারীর মানবিক অধিকার হরণ করে। নারী আর মানুষ থাকে না হয়ে পড়ে পণ্যসামগ্রী বা পুরুষের স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যম। যে সমাজ মাত্র দশ বছরের শিশুকেও কেবল নারী হিসেবেই হেয় জ্ঞান করে সে সমাজে নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতা রমণীর প্রতি অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপটি সহজেই অনুমেয়। 'অনূঢ়া পূর্ণিমা' গল্পে সমাজের চোখে পতিতা নারী লীলার তাই সমস্ত স্বপ্ন ও ভালোবাসার মানবিক অধিকার লুণ্ঠিত হয়। সে কেবলই পুরুষের যৌন-লালসার সঙ্গী হয়, জীবনসঙ্গী হওয়ার অধিকার তার নেই। সুন্দরবনের দুবলার চরে রাসমেলা দেখতে আসা লীলা মনের অজান্তেই ভালোবাসার শিহরণ অনুভব করে। রাসমেলা দেখতে আসা জনৈক ছেলেটির সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই লীলা এক অসাধারণ অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ঘটনাক্রমে ছেলেটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেও লীলার মনে কোনো অস্বস্তি দেখা যায় না। বরং তার মনে হতে থাকে যে : 'এই প্রথম একজন পুরুষ যাকে ও ভালোবেসে শরীর দিয়েছে। প্রচণ্ড আনন্দ ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ব্যবসার বাইরে এ যৌনসুখ অপার্থিব, অলৌকিক। নিজের জীবন ধন্য মনে হয় লীলাময়ীর।' ('অনূঢ়া পূর্ণিমা', Abpv c\Ygv, MímgM : ৪২১) কিন্তু লীলার মোহভঙ্গ হতে সময় লাগলো না। মেয়েটিকে ভোগ করলেও তার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ছেলেটি যেন নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ে। ছেলেটির সমস্ত আবেগ, ভালোবাসার তীব্রতা মুহূর্তেই কর্পূরের মতো উবে যায়। গল্পে ছেলেটির চরিত্রের অসততা ও প্রতারক-মানসিকতার স্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

ছেলেটি চিৎকার করে ওঠে, বানিয়াশান্তার নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে তুমি?

মেয়েটি জলের মধ্যে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে, তুমি আমার ভগবান হও। আমি আর কোনো ভগবান চাইনা। শুধু তোমাকে চাই।

– ছাড়ো, সরো। বেশ্যা একটা!

ছেলেটি এক ধাক্কায় মেয়েটিকে সরিয়ে দেয়।

মেয়েটি চিৎকার করে, তাহলে কি ঐ বিদেশী জাহাজের খালাসিরা আমার ভগবান হয়ে থাকবে?

ছেলেটি উত্তর দেয় না। জল ছেড়ে উঠে পড়ে। দ্রুত পালাতে থাকে। ('অনূঢ়া পূর্ণিমা', Abpv c\Ygv, MímgM : ৪২২)

ছেলেটি পালাতে থাকে, কেননা নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য যে রমণীর দ্বারস্থ হওয়া যায় তাকে সমাজ ও পরিবারের চৌহদ্দির ভেতরে আনবার মতো সৎসাহস তার নেই। পতিতা নারীর দেহ ভোগ করেও

সমাজে পুরুষটি দিব্যি ভালোমানুষের তকমা গায়ে লাগিয়ে ঘুরতে পারে, সমস্ত গ্লানি ও অপবাদ বরাদ্দ থাকে নারীর জন্য। 'মর্গ', 'থাবা' ও 'অনূঢ়া পূর্ণিমা' গল্পগুলোর অসহায়-বঞ্চিত নারীরা সবাই সমাজের নিচুতলার অধিবাসী। টিকে থাকবার প্রয়োজনে, অস্তিত্বের সংগ্রামে তাদের দেহ অবলীলায় ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে যায় পুরুষ; নারী-নিগ্রহের এরকম চিত্র কেবল সমাজের নিম্নবর্গের মধ্যেই বিদ্যমান– বিষয়টি মোটেই সেরকম নয়। নিম্নবর্গের নারী থেকে উচ্চবর্গের নারী, সাধারণ সরল গ্রাম্য নারী থেকে প্রখর রাজনীতি-সচেতন নারী– সমাজের সকল স্তরেই নারীর শরীর তার সংকটকে ঘনীভূত করে তোলে এবং সকল নারীর ক্ষেত্রেই নির্যাতনের মাত্রা ও পটভূমি প্রায় একইভাবে নির্ণিত। কেননা একথা স্বীকার করতেই হবে যে : 'গভীর রাতে বাড়িতে একা থাকার ভীতি কিংবা অশ্লীল টেলিফোন বার্তা থেকে আতংক নারীর অজানা নয়। সে জানে যাত্রী বোঝাই বাসে চিমটি কাটা, দ্রুতগামী গাড়ি থেকে শীষ দেওয়া, কথোপকথনের সময় নারীবক্ষের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করা এসব থেকে তার মুক্তি নেই।'[৮৩]

GKv‡ji cvšÍvewo

সেলিনা হোসেনের MímgM-র অন্তর্ভুক্ত অষ্টম ও সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ GKv‡ji cvšÍvewo [84]। গল্পগ্রন্থে মোট আটটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো যথাক্রমে 'নকশা', 'পলাতক রঙ', 'গুণবতীর স্বপ্ন', 'খরচ', 'দুঃখ', 'উপকথা', 'একালের পান্তাবুড়ি', ও 'চার যুবকের বিলাপ'। সেলিনা হোসেনের গল্প শুধু গল্প নয়, নানা ভাবনার বীজমাত্র। সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নানামুখী অনুষঙ্গের শৈল্পিক প্রকাশ তাঁর গল্পভাবনার অবয়বে বিন্যস্ত হয়েছে। সমাজসত্যের বহুমাত্রিক প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে তিনি একটির পর একটি সার্থক ছোটগল্প লিখে গেছেন। তাঁর অপরাপর গল্পগ্রন্থের মতো GKv‡ji cvšÍvewo গল্পগ্রন্থেও সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রজ্ঞা আর সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টির আলোকে রূপায়িত হয়েছে নারী-জীবনের বহু-বিচিত্র অভিধা। গল্পগুলো পাঠকের নারীবিষয়ক আত্মসচেতন ভাবনাকে আলোড়িত করে প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপটিকে উন্মোচিত করে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'নকশা' নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযুদ্ধের ইতিবৃত্ত। গ্রাম কিংবা শহর– উভয় ক্ষেত্রেই অসহায়-দরিদ্র মানুষের জীবন-যাত্রায় কোনো আশার আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায় না। গল্পে বর্ণিত দারুণ বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ শিউলির জীবনের বাস্তবতা এই বিশেষ সত্যকে স্বীকার করেই আবর্তিত হয়। গ্রামের দরিদ্র মেয়েটি বিয়ের পরে স্বামী রিকশাওয়ালা রহিমের হাত ধরে শহরে এসেও এই অসহায়ত্বের ছোবল থেকে রেহাই পায় না। জীবনযুদ্ধের নির্মম যাঁতাকলে পিষ্ট হয় তার সমস্ত স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা। এরকম ভাবকল্প নিয়ে গল্পটির পটভূমি তৈরি হলেও এরই মধ্য দিয়ে টুকরো টুকরো ভাবনা বা ঘটনার আলোকে প্রতিভাত হয়েছে নারীর সামাজিক অবস্থান ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতার যথার্থ স্বরূপটি। শিউলি বুদ্ধিমতী হলেও সে নারী, তাই সে বঞ্চিত হয় তার মৌলিক অধিকার থেকে। কেননা :

'প্রাইমারী স্কুল শেষ হতেই বাবা বললেন, মেয়েদের বেশি লেখাপড়ার দরকার নেই। মা বললেন, সারাজীবন তো হাঁড়িই ঠেলবে। আর পড়ে কি হবে।' ('নকশা', GKv‡ji cvš Íveiio, MímgM : ৪২৫) শিউলির মা মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেই খুশি, মেয়ের ব্যক্তি সত্তার স্বাধীন অস্তিত্ব অনুধাবনের ক্ষমতাই তার তৈরি হয়নি। তাই দেখা যায় : 'মা ঘুরে ওর দিকে তাকালে শিউলি বুঝতে পারে মায়ের চেহারায় আলো নেই, অন্ধকার। মা নিজেও সেটা জানে না। বোকার খুশিতে রান্না করছে।' ('নকশা', GKv‡ji cvš Íveiio, MímgM : ৪২৭) সমাজে এভাবেই নারী পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে প্রচলিত জীবনভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পুরুষের ভাবনার ছকেই তার ভাবনা গড়ে ওঠে। সমাজ এভাবেই নারীর জন্য ঘরের ত্রি-সীমানাকে তার পৃথিবী হিসেবে জ্ঞাত করায়। নারীর নিজস্ব অস্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা লোপ পায় তথাকথিত নিয়ম-নীতির বেড়াজালে। একই সঙ্গে সমাজে নারীর অধস্তন বা অসম সামাজিক মর্যাদার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। নারী কেবলই পুরুষের ইচ্ছার বাহন এবং ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়। শহরে এসে শিউলির অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গে বিষয়টি খোলাসা হয়ে যায়, উন্মোচিত হয় পুরুষের বিকৃত মানসিকতার স্বরূপ :

> শিউলির এখন নতুন যাত্রা। ও শহরে এসেছে। রহিমের হাত ধরে শহরের গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে বাস থেকে নামে। ওর চটপটে সপ্রতিভ দৃষ্টিতে শহরের ধুলো এসে লাগে। ও কৌতুহল নিয়ে চারদিকে তাকায়। প্রথমে ধাক্কা খায় মানুষের সঙ্গে। সেটা সামলে উঠতে না উঠতে পেছন থেকে একটি থাবা এসে পড়ে ওর পাছার ওপর। মানুষের ভিড়ে ও পেছন ফিরে তাকাতে পারে না। ও দ্রুত সামনেও যেতে পারে না। প্রবল অস্বস্তি শরীর জুড়ে। সেই থাবাটি ওর পৃষ্ঠদেশ ঘুরে বেড়ায়। ('নকশা', GKv‡ji cvš Íveiio, MímgM : ৪২৮)

কার্যত ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারী নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। পুরুষের হীন বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদ করার সাহসও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর থাকে না। এক ধরনের অপরাধবোধে আক্রান্ত নারী নিজেকেই এহেন ঘটনার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে থাকে। নারীর এরকম মানসিকতার পেছনেও প্রকারান্তরে পুরুষতন্ত্রের অবয়বে সমাজবাস্তবতাই দায়ী। শিউলির মতো আমাদের সমাজের প্রায় অধিকাংশ নারীকেই জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে এই হীন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই সামাজিক সত্যকে অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ নেই বরং এটিই প্রকৃত বাস্তবতা। আলোচ্য গ্রন্থের 'পলাতক রঙ' এবং 'গুণবতীর স্বপ্ন' গল্প দু'টির পটভূমি আদিবাসী সমাজ, তাদের আচার-সংস্কার, বিশ্বাস-মূল্যবোধ, অস্তিত্বের সংগ্রাম, বেঁচে থাকার কষ্ট, জীবন সংগ্রামের কষ্ট এবং বাঙালি বসতি দিয়ে দখল হয়ে যাওয়া ভূমির জন্য হাহাকার। একজন সচেতন লেখকের সংবেদনশীল মন দিয়ে সেলিনা হোসেন আদিবাসী সমাজের উন্মূলিত মানুষগুলোর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে গভীর মমতায় জীবনঘনিষ্ঠভাবে প্রতিবিম্বিত করেছেন গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে। অবহেলিত-অস্তিত্বের প্রশ্নে ক্ষত-বিক্ষত এই আদিবাসী সমাজেও নারী-নিগ্রহের চিরন্তন রূপটি প্রতিভাত হয়েছে। অসহায় মানুষগুলোর বঞ্চিত জীবনের ভেতরে নারীর অবস্থান আরো বেশি মাত্রায় অবহেলিত, পর্যুদস্ত। যুদ্ধ কিংবা

বিবাদ— তা যে-সমাজের মধ্যেই সংঘটিত হোক না কেন তাতে নারীর প্রতি নিপীড়নের কৌশল ও নির্যাতনের মাত্রাটি প্রায় অভিন্ন। নারীর প্রতি সহিংসতার ভয়াবহতা ও নির্মমতা আলোচ্য গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতার নিরিখে রূপলাভ করেছে। 'পলাতক রঙ' গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুদীপ, প্রেমিকা বিদিতা অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করে বিদেশে চলে গেলে, কতগুলো দিন উদভ্রান্তের মতো কাটানোর সময়টাতে বন্ধু ও রুমমেট শুভপ্রিয় তাকে বান্দরবানের পাহাড়ি গাঁয়ে বেড়াতে নিয়ে আসে। এটা শুভপ্রিয়ের গ্রামের বাড়ি। শুভপ্রিয়ের ধারণা এখানে কয়েকদিন থাকলে সুদীপ নিজের কষ্ট থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। এখানে এসেই সুদীপ মুখোমুখি হয় কঠিন বাস্তবতার। সে অনুভব করে :

> কিভাবে শুভপ্রিয়র ঠাকুরদাকে হত্যা করেছে এই অঞ্চল রক্ষা করতে আসা একশ সৈনিক। আড়ালে লুকিয়ে থেকে শুভপ্রিয়র পুরো পরিবার সেই হত্যা দেখেছে। ... শুভপ্রিয়র ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র বলে, তোমরা আমাদের ভূমি জোর করে দখল করে রেখেছো। এখন আমাদের জীবনের ক্রান্তিকাল। চারদিকে লড়াই। বাঙালিদের আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা ওদের ঘরবাড়িতে আগুন দেই। আর, বুকের ভেতর থেকে রাইফেল নিয়ে চলে যাওয়া সৈনিকদের ঘৃণা করি। আর ওদের জিপের চলে যাওয়ার শব্দ পেলে আমরা ভাবি, নরকটা আমাদের ঘরের দুয়োরে কেন? আমাদের তো এখনও মৃত্যু হয়নি। সুদীপ ভাবে, এমন শান্ত নিরিবিলি অসীম বিথারী সবুজের মাঝে কেন গর্জে উঠবে অস্ত্র? একি সেই বিদিতার জীবন-সংক্রান্ত দর্শনের একটুখানি? নিজের দখলটুকু রাখার জন্য পুড়িয়ে দিতে হবে অন্যের অংশ? ও তখন ভাবে আমার বুকের ভেতরের কোন জায়গা কতটুকু পুড়ে গেলো এই বেদনার কাছে তা কতোই তুচ্ছ! ('পলাতক রঙ', GKv‡ji cvš[Í]ive‡o, MímgM : ৪৪৬)

সুদীপের সামনেই ঘটে যায় পাহাড়ি-বাঙালি দ্বন্দ্বের শিকার হওয়া, শুভপ্রিয়ের বোন কাজলিকার উপর বর্বরতার অমানুষিক নির্যাতন। সুদীপ প্রত্যক্ষ করে :

> উপুড় হয়ে পড়ে আছে কাজলিকা। উলঙ্গ। ওর কাপড়চোপড় চারদিক ছড়ানো। ওর পা বেয়ে রক্তের স্রোত নেমেছে। তখন পর্যন্ত রক্ত গড়িয়ে পড়া বন্ধ হয়নি। সুদীপ ব্যাপারটা বুঝতে পারে। জিপটা যে সমতলে রেখেছিলো সেখানে সুস্পষ্ট চাকার দাগ। থেঁতলে আছে ঘাস, দেবে গেছে কাঁচামাটি। সুদীপের শরীর শক্ত হয়ে যায়। বুকটাও ক্রোধে, ঘৃণায় শক্ত হয়ে ওঠে। এই নির্মমতার সাক্ষী হতে ও চায়নি। এই নির্মমতার স্মৃতি নিয়ে ও বেঁচে থাকতে চায়না। ('পলাতক রঙ', GKv‡ji cvš[Í]ive‡o, MímgM : ৪৪৯)

এভাবেই গল্পটিতে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে আদিবাসী জীবনের টিকে থাকার লড়াই, জীবনযুদ্ধের নির্মম পরিহাস এবং নারীর প্রতি নির্যাতনের বীভৎসতার করুণ চিত্র। 'গুণবতীর স্বপ্ন' গল্পেও ধ্বণিত হয়েছে আদিবাসী জীবনের বঞ্চনার সুতীব্র হাহাকার। কীভাবে পটুয়াখালীর সাগর পাড়ে বন আবাদ করে রাখাইনদের বসতি গড়ে উঠেছে, অস্তিত্বে সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে তাদের টিকে থাকার লড়াই এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কায় পূর্বপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে তাদের প্রতিনিয়ত তাড়িত করে বেড়ায়— তারই বাস্তবচিত্র উন্মোচিত হয়েছে গল্পটিতে। গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে রাখাইনদের পূর্বপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী, যা তাদের অস্তিত্বের সঙ্কটকে মূর্ত করে তুলেছে এভাবে : 'রাখাইন অধ্যুষিত অঞ্চলের চারদিকে বাঁধ বা বেড়িবাঁধ নির্মিত হলে এবং নদীগুলো ভরাট হলে আর

আরাকান ভূখণ্ড থেকে এই অঞ্চলে আগমনের দুইশত বৎসর পূর্ণ হলে এই এলাকায় বসবাস করা উচিত হবে না।' ('গুণবতীর স্বপ্ন', GKv‡ji cvš—fvewo, MímgM : ৪৫১) ভবিষ্যদ্বানীটি শুনলে চিৎকার করে মিয়াচিং। বলে : 'মানি না। মানবো না। আমরা নিজভূমে পরবাসী হবো না।' ('গুণবতীর স্বপ্ন', GKv‡ji cvš—fvewo, MímgM : ৪৫১) বরিশালের বাপস্টিক মিশনে লেখাপড়া শিখতে যাওয়া মিয়াচিং-এর মধ্যে বৃদ্ধা গুণবতী তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামের যোগ্য প্রতিনিধিকে খুঁজে বেড়ায়। সুদীর্ঘ গল্পটি রাখাইনদের জীবন-সংগ্রামের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। মামাফ্রুর স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে তাদের জীবন-বঞ্চনার করুণ ইতিহাস :

> তখন ওর বয়স কতোই বা হবে? ছয় কি সাত? একজন দিদি, একজন বাবা, একজন মা, দুজন কাকা, একটা পেঁচা– কি সুন্দর ছিলো সেদিনের সকালটা। কতগুলো গরু, অনেকগুলো হাঁস-মুরগি, কবুতর, কাঠের বাক্সে ভরা খরগোশ, ভাবতে পারে না মামাফ্রু। ... ঐ বয়সে ও জানতোনা স্থানীয় লোকদের লোভ ছিলো ওদের জমি-বাড়ির জন্য। ওরা চেয়েছিলো রাখাইন সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে উৎখাত করে ওদের সম্পত্তি দখল করে নিতে। সেই সুন্দর সকালে বাবা যখন জমিতে গেলো, সেখান থেকে বাবা-কাকাদের ধরে নিয়ে গেলো আবুল হাশেমের লোকেরা। রাতের বেলা গাঁয়ের শেষ সীমানায় এক কুঁড়েঘরে বেঁধে রেখে সেই কুঁড়েতে আগুন লাগিয়ে দিলো। ... গভীর রাতে বাড়িতে আগুন দিয়ে মাকে ধরে নিয়ে গেলো। মামাফ্রু জানে সেদিন রাতে ওর মা ধর্ষিত হয়েছিলো। ওর দিদিমাই বলেছে ওকে। বলেছে পুরুষ মানুষের প্রতি ঘৃণা থেকে। ওদের নির্মমতা বোঝাতে। অজ্ঞান অবস্থায় ওর মা'কে শয়তানেরা ফেলে গিয়েছিলো ঐ ডোবার ধারে। একদম ন্যাংটো, ক্ষতবিক্ষত শরীর। ... দু'দিন পর ওর মা'র জ্ঞান ফিরেছিলো। ওকে দেখতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওকে মা'র কাছে যেতে দেয়া হয়নি। ... পরদিন মা আমগাছে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিলো। ('গুণবতীর স্বপ্ন', GKv‡ji cvš—fvewo, MímgM : ৪৫৭-৪৫৯)

মামাফ্রুর স্মৃতিতে এভাবেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে আদিবাসী জীবনের দুঃখগাথা ও বেঁচে থাকবার অবিরাম সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। নারীকে পর্যুদস্ত করবার হাতিয়ার হিসেবে পুরুষ বেছে নেয় নারীর শরীরকে। শরীরের ওপর স্বীয় দখল কায়েম করে পুরুষ তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কেবল তাই নয় : 'ধর্ষিতা নারী স্বামী, স্বামীর পরিবার, এমন কি পিতামাতার পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।'[৮৫] তাই দেখা যায় গল্পটিতে মামাফ্রুকে তার ধর্ষিতা মাকে স্পর্শ করতে দেয়া হয়নি। মাতৃত্বের এই চরম অমানবিক অবমাননায় মামাফ্রুর মা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সে এই অবহেলা-অপমানের জ্বালা সইতে পারেনি, কেননা : 'মা তার মেয়েকে ছোঁবে না? কেন ছোঁবে না? মামাফ্রু বুঝতে পারে সেদিন মার কি ভীষণ কষ্ট হয়েছিলো। ঐ পশুগুলো যে মাকে নির্যাতন করেছে তার চেয়েও বেশি কষ্ট।' ('গুণবতীর স্বপ্ন', GKv‡ji cvš—fvewo, MímgM : ৪৫৯) নারীর এ-ও এক মাত্রা। সে কেবল শারীরিক নির্যাতনের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হয় না, বরং : 'নারীর জীবনের আবহমানকালের দুঃখ-বঞ্চনার সঙ্গে সময়ের প্রেক্ষাপটে যোগ হয় অপমান, অবমাননা আর নির্যাতনের নিত্যনতুন পদ্ধতি।'[৮৬] ধর্ষণের শিকার নারী তাই সমাজের চোখে হয়ে পড়ে অপবিত্র, অশুচি। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরস্থ সামাজিক অনুশাসন বা সংস্কারের বেড়াজাল নারীর অসম সামাজিক অবস্থানটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলে। ফলশ্রুতিতে নারীর জীবন কেবল অবরুদ্ধই নয় বরং হয়ে পড়ে বিষণ্ন ও বিপন্ন। 'দুঃখ' গল্পের

পটভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির আত্মত্যাগ ও যুদ্ধে বিপর্যস্ত নারী-জীবনের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ও দুঃখগাথার ইতিবৃত্ত। গল্পটিতে দুই নারীর জীবনে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নেমে আসা কষ্ট-হাহাকার ও বঞ্চনার নির্মম রূপটি ইতিহাসের বাস্তবতায় শিল্পিত হয়েছে। মালিহা এমন একজন অসহায় নারী যার স্বামী মনসুরকে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দু'দিন পূর্বে আলবদর বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। এরপরে আর কোনো খোঁজ মেলেনি মনসুরের। এমনকি : 'কোন গণকবরে আছে মনসুরের লাশ তারও হদিস মেলেনি। বধ্যভূমিগুলোও তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ওর ভাইয়েরা। না, কোথাও মনসুর নেই। মিশে গেছে মাটির সঙ্গে।' ('দুঃখ', GKv‡ji cvš͂ÍweÜo, MímgM : ৪৮৪) স্বাধীন দেশে একবুক হাহাকার আর তীব্র দুঃখের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে মালিহা। গল্পের আরেক উল্লেখযোগ্য নারী হাসনা, যার দুঃখের পরিমাণ আরো গভীর ও বেদনাদায়ক। কেননা:

> বাবা-মায়ের সামনে থেকে হাসনাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো পাক সেনারা। যুদ্ধ শেষ হলে গর্ভবতী হয়ে ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে ফিরে আসে ও। পুনর্বাসন কেন্দ্রে বসে সমাজকর্মী মালিহার হাত ধরে ও বলেছিলো, বাবা-মায়ের কাছে তো ফিরে যেতে পারবো না। আপনি আমাকে বাঁচান আপা। আমাকে আশ্রয় দিন। লেখাপড়া জানি। কোনো কাজ দিলে কাজ করতে পারবো। ('দুঃখ', GKv‡ji cvš͂ÍweÜo, MímgM : ৪৮৫)

শুরু হয় হাসনার অন্যরকম এক যুদ্ধ। এ যুদ্ধ প্রতিকূল সমাজে টিকে থাকার যুদ্ধ, নিজের অস্তিত্বের এক অভিনব সংগ্রাম। পুনর্বাসন কেন্দ্রে একটি মেয়ের জন্ম দেয় হাসনা। মেয়েটিকেও দেখতে দেওয়া হয় না ওকে। সে সময়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে কাজ করতে আসা লেসলি যাওয়ার সময় মেয়েটিকে নিয়ে যায়। সময়ের স্রোতে হাসনার গর্ভে জন্ম নেওয়া যুদ্ধ-শিশু সুজানা নামে বড়ো হতে থাকে বিদেশে। মালিহা, হাসনা ও সুজানা– এই তিন নারীই হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা :

> স্বাধীনতার মূল্য মালিহা দিয়েছে একরকম করে, হাসনা দিয়েছে আর এক রকম করে এবং ওর যে মেয়েটি বিদেশে বড়ো হচ্ছে তার কাছেও এই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হচ্ছে আর এক রকম করে। ... মালিকা বলেছিলো, জন্মের পর ও মেয়েটির নাম রেখেছিলো মুক্তা। বলেছিলো, হাসনা তুই একটা ঝিনুক। আর ও তোর জঠরের মুক্তা। মুক্তা? মুক্তাই যদি হবে তবে ও মেয়েটিকে বুকে নিয়ে এই সমাজকে দেখাতে পারলো না কেন যে, মুক্তা ওর মেয়ে? ('দুঃখ', GKv‡ji cvš͂ÍweÜo, MímgM:৪৮৬)

যুদ্ধে নারী কেবল তার সম্ভ্রমই হারায়নি, হারিয়েছে সমাজে-পরিবারে মানুষ হিসেবে তার ন্যূনতম সম্মানের অধিকারটুকু। গভীর মর্মযাতনা ও দুঃখের সীমাহীন তীব্রতা বুকে ধারণ করে হাজারো নারী তাই নীরবে অশ্রুবিসর্জন করে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে তাই একথা মানতেই হবে যে : 'যুদ্ধের বিভীষিকা কতো ভয়ানক হতে পারে তা কেবল সম্মুখ রণাঙ্গন কিংবা অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা দিয়ে বিচার করলে চলবে না। মরণাস্ত্র সংকটের চেয়েও ভয়াবহরূপে দেখা দেয় মানবিকতার অবক্ষয়। যুদ্ধের অন্তরালে পচন ধরে যায় সমাজ দেহে। কখনো আবার সেই পচন মহামারীর আকার ধারণ করে।'[৮৭] আলোচ্য গল্পের শেষ পর্যায়ে এক হৃদয় বিদারক

দৃশ্যের অবতারণা হয়। হাসনা ও তার যুদ্ধ-শিশু সুজানা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়ে। একে অপরের এতো কাছের হওয়া সত্ত্বেও কেউই সহজ হতে পারে না। এক অজানা দ্বিধা, সংকোচে জর্জরিত হতে থাকে উভয়েই। মাতৃত্ব এবং যুদ্ধের নৃশংস বিভীষিকা– দু'য়ের মিলিত অনুভূতির তাড়নায় দংশিত হতে থাকে উভয়েই। যুদ্ধ এভাবেই নারীর জীবনকে ওলোট-পালোট করে দিয়েছে।এভাবেই: 'শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য যুদ্ধরত দেশে যুদ্ধ একদিন শেষ হয়ে যায় বটে, কিন্তু যুদ্ধাক্রান্ত নারীর যুদ্ধ কখনো শেষ হয় না, সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। এর ভয়াবহতা এত বেশি যে, ওই সব নারীর পরবর্তী জেনারেশনকেও তার ভুক্তভোগী হতে হয়।'[৮৮] আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'উপকথা', 'একালের পান্তাবুড়ি', এবং 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পগুলোর উপজীব্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে নারী-নিগ্রহের বিচিত্র পরিসর। সেলিনা হোসেনের গল্পে সমাজবাস্তবতার আলোকে নারীর অধস্তন অবস্থার কারণ ও স্বরূপ-সন্ধানের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের প্রতিফলন আলোচ্য গল্পগুলোর প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত হয়েছে অসাধারণ শিল্প-কুশলতায়। 'উপকথা' গল্পের ফুলরানীকে গাঁয়ের সকলেই ভীষণ ভালোবাসে। গাঁয়ের লোকের সুখেদুখে ফুলরানী সবার আগে এগিয়ে যায়। সকলেই চায় ফুলরানী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হোক। কিন্তু ফুলরানীর জীবন বদলে যেতে শুরু করে মানিকরাজের সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই। যদিও মানিকরাজ বিয়েতে কোনো যৌতুক নেয়নি, গ্রামের সকলেই তাকে 'সোনার ছেলে' হিসেবে জানে। কিন্তু ফুলরানী সম্পর্কে মানিকরাজের চিন্তা-চেতনার অবয়বে নিদারুণভাবে পুরুষতন্ত্রের প্রথাবদ্ধ চেহারাটিই প্রতিভাত হয়ে ওঠে এভাবে :

> আস্তে আস্তে ফুলরানী বুঝতে পারে ও মানিকরাজের সংসারে বন্দী। মানিকরাজ ওকে বলে দিয়েছে, তুমি আমার সম্পত্তি। আমার কথাই তোমার কথা।
>
> ফুলরানী দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলে, না তা হতে পারে না। তোমার কথা, আমার কথা না। আমার কথাই আমার কথা।
>
> চোপ! ... মানিকরাজ বলে মেয়েলোকের এতকিছুর দরকার নাই। মেয়েলোক ঘরে থাকবে। পুরুষের জন্য অপেক্ষা করে জীবন কাটিয়ে দেবে। ('উপকথা', GKv‡ji cvš—vweyo, MímgM : ৪৯১)

পুরুষতন্ত্রের চেহারা কতটা আগ্রাসী হতে পারে এ বিবরণ তার বাস্তব নিদর্শন। মানিকরাজের ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে সেই সমাজসত্য : 'পিতৃতন্ত্রের মূল মতাদর্শ এই যে, নারী পুরুষের পরে, পুরুষ থেকে এবং পুরুষের জন্য সৃষ্ট পুরুষের অধীন একটি নিকৃষ্ট জীব।'[৮৯] গল্পটিতে ফুলরানী চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার মধ্যে নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর, আত্মজাগরণের অভীপ্সাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এভাবে :

> ফুলরানী বিড়বিড় করে নিজেকে বলে, আমি ওর কথা শুনবো না। আমি আমার মতো করে জীবন সাজাবো। ... তখন ওর মনে হয় টিয়েটা বলছে, বোকা মেয়ে কাঁদিস কেন? ওরা তোকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। ওরা তোকে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বানাবে। তুইতো মানুষকে থালাভরা ভাত দিবি।
>
> তাইতো। আমিতো এসবই করবো। আমি কাঁদবো কেন? ('উপকথা', GKv‡ji cvš—vweyo, MímgM : ৪৯১)

ফুলরানীর এই দৃঢ় প্রত্যয়ে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি শিল্পিত হয়ে উঠেছে। নারীর নিজের অক্ষমতার বোধ সম্পর্কে নারীকেই সর্বাগ্রে জাগ্রত হতে হবে। জাগ্রত নারী এই মানবিক সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে : 'অংশগ্রহণে সমঅধিকার অর্জনের মাধ্যমেই নারী নিজ স্বার্থ তথা ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজের এবং সমাজের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও প্রভাবিত করার সামর্থ্য লাভ করবে।'[৯০] ক্ষমতার পরিবর্তন হয়, দেশে এক শাসকের পরিবর্তে নতুন শাসকের রাজত্ব শুরু হয়, ক্ষমতার পরিবর্তনের এই পালাবদলে স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালিপ্সু অনেকের ভাগ্যের চাকা গড়গড়িয়ে চলে– কেবল পরিবর্তন ঘটে না নারীর জীবনের। সব সময়ের জন্যই নারী ব্যবহৃত হয় ক্ষমতাধর শাসকতন্ত্রের যাঁতাকলে। নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচারের নগ্ন পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'একালের পান্তাবুড়ি' ও 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পদ্বয়ে। গল্পগুলোতে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে অসহায়-অবরুদ্ধ সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণার নির্মম চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। 'একালের পান্তাবুড়ি' গল্পে লক্ষণীয়, সন্ত্রাসীরা কেবল অসহায় বৃদ্ধার ছেলেকে মেরে তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় না বরং বৃদ্ধা বুড়ির বয়স্ক ভাতার ছয়শ টাকাও অস্ত্রের মুখে কেড়ে নিতে দ্বিধা করে না। অবরুদ্ধ এই অসহ সময়-প্রতিবেশে নারীর প্রতি পাশবিকতার নির্মম রূপায়ণ ঘটেছে এভাবে :

> শান্তির দম আটকে আসতে চায়। ও সবসময় ভয়ে থাকে। কখন যে কি হয়। কদিন আগে পাশের গাঁয়ের মনিজাকে সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে গণধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে। ধান ক্ষেতে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো মনিজা। মুখটা কাদায় এমন লেপ্টে ছিলো যে প্রতিদিনের চেনা মনিজাকে চিনতেই কষ্ট হচ্ছিলো। ... একদিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ছেলে আমাকে বললো, শান্তি আমি তোকে ভালোবাসি। ওর কথা শুনে আমার খুব হাসি পেলো। আমি হলাম স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। আমি কোনো বখাটে ছেলেকে ভালোবাসতে পারি না। ও চোখ গরম করে বললো, আজ থেকে তোর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। গেলে তুলে নিয়ে যাবো। গণধর্ষণ হবে তোর উপর। নইলে তোর মুখটা এসিড মেরে ঝলসে দেবো। ('একালের পান্তাবুড়ি', GKv‡ji cvš Íveyo, MímgM : ৪৯৩-৪৯৪)

'চার যুবকের বিলাপ' গল্পেও সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার বিপথগামী তারুণ্যের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অনুষঙ্গে সময় ও সমকালের স্থিতি ও স্বস্তিহীন পটভূমির স্বরূপটি বাস্তবতার আলোকে রূপায়িত হয়েছে। এ গল্পেও নারীর প্রতি নৃশংস-পাশবিকতার বিভীষিকা উন্মোচিত হয়েছে শৈল্পিক দক্ষতায় এভাবে :

> আমরা একজন দিলীপ বাবুর গলা চেপে ধরে থাকি। অন্য তিনজন মন্দিরাকে টেনে বের করে নিয়ে যায়। ও চিৎকার করে না, কাঁদে না। শুধু গায়ের জোর খাটায়। ছুটতে চায় আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু ও একা পারবে কেন? ওকে টানতে টানতে নিয়ে যায় অন্যরা। একটু পর আর একজন চলে আসে। খোলা দরজা পথে শুনতে পাই মন্দিরার মায়ের হাহাকার। দিলীপের তো ওঠারই সাধ্য নেই। আমরা মন্দিরাকে সুগন্ধা নদীর ধারে নিয়ে আসি।
>
> আমরা চারজন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। একসময় যখন টের পাই যে ও অজ্ঞান হয়ে গেছে তখন ওকে ছেড়ে দেই আমরা। ওর মায়ের হাহাকার তখনো আমাদের কানে বাজতে থাকে। আমাদের একবারও মনে হয় না যে এই হাহাকার আমাদের মায়েদেরও হতে পারতো। ('চার যুবকের বিলাপ', GKv‡ji cvš Íveyo, MímgM : ৫০৩)

নারীর প্রতি সহিংসতার এহেন দৃশ্যপট কেবল গল্পের পটভূমি বা উপজীব্য হয়েই থাকে না হয়ে ওঠে আমাদের জীবন-বাস্তবতার এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নারীর প্রতি পাশবিকতা ও বিকৃত অত্যাচারের কাহিনি আমাদের অজানা নয়। কিন্তু স্বাধীন দেশে নারীর প্রতি নির্যাতনের নির্মম রূপটি যেন মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই একথা স্বীকার করতেই হয় যে : ‘যুগে-যুগে, দেশে-দেশে যেখানেই কোনো যুদ্ধ হয়েছে, দমন কার্য পরিচালিত হয়েছে সেখানে সবচেয়ে জঘন্য বর্বরতার শিকার হয়েছে নারী। কেননা নারীর শত্রু কেবল প্রতিপক্ষের আঘাত নয় বরং তার শরীরকে কেন্দ্র করে তৈরি আতঙ্কও নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ।’[৯১] ফলে গল্পগুলো হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজবাস্তবতার প্রামাণ্য দলিল। এর মধ্য দিয়েই প্রতিভাত হয়েছে নারী-জীবনের বহুবিচিত্র অনুষঙ্গের নানামাত্রিক চিত্রায়ণ।

Z_¨wb‡`©k

১. Drm †_‡K wbiš[i গল্পগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৬৯ সাল। ওই বছরেরই জানুয়ারি মাসে গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেলিনা হোসেনের MímgM-এ (দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২) Drm †_‡K wbiš[i গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে Drm †_‡K wbiš[i গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ MímgM-র পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

২. আজহার ইসলাম, evsjv‡`‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯^i€c I wkígj¨ , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪২৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

৪. মাসুদুজ্জামান, ‘নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন’, nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ঢাকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, পৃ. ৪২৮

৫. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭

৬. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৭. মাহমুদা ইসলাম, bvixev`x wPšÍv I bvix-Rxeb , জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ.১১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৯. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

১০. মারুফ রায়হান, †jLv bq K_v , (১০ আলোচিত লেখকের সাক্ষাৎকার), সূচীপত্র প্রকাশনী, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৩৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১২. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯-১০

১৩. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

১৪. RjeZx †g‡Ni evZvm গল্পগ্রন্থেল রচনাকাল ১৯৭৫ সাল। ওই বছরেরই জুলাই মাসে গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেলিনা হোসেনের MímgM-এ (দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২) RjeZx †g‡Ni evZvm গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে RjeZx †g‡Ni evZvm গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ MímgM-এর পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

১৫. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

১৬. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), †jL‡Ki K_v , রাইটার্স. ইনক, ঢাকা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ২৫-২৬

১৭. মাহমুদ ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১৮. ‡Lvj KiZvj গল্পগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৮২ সাল। ওই বছরেরই জুলাই মাসে গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেলিনা হোসেনের MímgM-এ (দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২) †Lvj KiZvj গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে †Lvj KiZvj গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ MímgM-এর পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

১৯. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০

২০. রাশিদা আখতার খানম, bvixev‘ I ‘vkwbK †cÖ¶vcU , সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, কক্ষ নং ১১০৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৯

২১. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

২২. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

২৩. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

২৪. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, evsjv‡‘‡ki †QvUMí : ga¨weË Rxe‡bi iƒcvqY , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৯, পৃ. ১১১

২৫. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪

২৬. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

২৭. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

২৮. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

২৯. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡`‡ki mwnZ¨ , আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮৮-১৮৯

৩০. ciRb¨ গল্পগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৮৬ সাল। ওই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেলিনা হোসেনের MímgM-এ (দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২) ciRb¨ গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ciRb¨ গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ MímgM-এর পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৩১. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭

৩২. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৩৩. প্রাগুক্ত।

৩৪. রাশিদা আখতার খানম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩৮. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৩৯. gvblwU গল্পগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৯৩ সাল। ওই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেলিনা হোসেনের MímgM-এ (দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২), gvblwU গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে gvblwU গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ MímgM-এর পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

৪০. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬

৪২. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৪৩. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪৫. রাশিদা আখতার খানম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬

৪৬. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪৮. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

৪৯. রাশিদা আখতার খানম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৫০. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৫১. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪

৫২. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২

৫৩. gvZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৯৫ সাল। ওই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেলিনা হোসেনের MímgM-এ (দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২) gvZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে gvZRv‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ MímgM-এর পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৫৪. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১

৫৫. মারুফ রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৫৬. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

৫৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

৫৮. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৬২. মারুফ রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৬৩. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৬৪. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৬৫. প্রাগুক্ত।

৬৬. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

৬৭. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৬৮. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

৭০. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

৭২. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪

৭৪. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৭৫. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১

৭৬. Abpv cwYgv গল্পগ্রন্থের রচনাকাল ২০০১। ওই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেলিনা হোসেনের MímgM-এ (দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২) Abpv cwYgv গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে Abpv cwYgv গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ MímgM-এর পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৭৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

৭৮. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১

৭৯. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৮১. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৮২. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৮৪. GKv‡ji cvšÍweio গল্পগ্রন্থের রচনাকাল ২০০২ সাল। ওই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেলিনা হোসেনের MímgM-এ (দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন, MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২) GKv‡ji cvšÍweio গল্পগ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে GKv‡ji cvšÍweio গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ MímgM-এর পাঠ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

৮৫. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৮৬. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৮৭. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, evsjv‡`‡ki †QvUMí : Rxeb I mgvR, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯৬

৮৮. মারুফ রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

৮৯. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৯১. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡”Q`

bvmixb Rvnvb : Rxebcevn I wkí‡eva

নাসরীন জাহান অসামান্য ভাষাশৈলীর সৌকর্যে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের এক অনন্য কথাশিল্পী। কথাসাহিত্যে প্রচলিত ট্র্যাডিশনের বিপরীতে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বকীয় নিরীক্ষায় ইতোমধ্যে একটি স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর তৈরি করেছেন নাসরীন জাহান। নাসরীন জাহানের জন্ম ১৯৬৪ সালের ৫ মার্চ ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট গ্রামে। তাঁর বাবার নাম গোলাম আম্বিয়া ফকির, মা উম্মে সালমা— দুজনই মারা গেছেন। স্বামী আশরাফ আহমদ এবং কন্যা অর্চি অতন্দ্রিলাকে নিয়ে তাঁর একান্ত সংসার। নাসরীন জাহান ক্লাস ফোর আর ফাইভ থেকে মূলত ছড়াকার, এরপর গল্পের ব্যাপারে মনোযোগী হলেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের জবানীতে জানা যায় :

> হ্যাঁ, প্রথম আমি ছড়া লিখি। সাহিত্য বলতে এটাই বুঝতাম, ছন্দ-মন্দ মিলিয়ে করতাম। তখন আমাদের স্কুলে একটা নোটিশ এলো— বাংলাদেশ শিশু একাডেমী থেকে একটা পত্রিকা বের হবে— wkï। সারা বাংলাদেশে চিঠি দেওয়া হয়েছে লেখার জন্য। তখন ছড়া লিখে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছিলাম স্কুলে। আমাকে বলা হলো, তুমি একটা গল্প দাও। ক্লাস সিক্সে থাকা অবস্থায় লেখাটি ছাপা হয়। আমার খুবই ভালো লেগেছিল। গল্পটি পড়ে অনেকে বলেছিল, তুমি এত ছোট মেয়ে, এত কষ্টের গল্প লিখলে কীভাবে?[১]

কবি নাসির আহমেদ, যিনি নাসরীন জাহানের পারিবারিক বন্ধু, লেখালেখির ব্যাপারে তাঁকে খুব উৎসাহ দিতেন। নাসরীন জাহানের লেখা প্রথম বড়দের গল্প 'নবজাতক' নাসির আহমেদের প্রেরণার ফল। যদিও অনেকে তার প্রথম দিকের গল্পগুলো দুর্বল বলে ফেলে দেয় কিন্তু নাসরীন জাহান তাঁর নির্বাচিত গল্প বইয়ে সেই গল্পটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়াও বড়দের জন্য লেখা নাসরীন জাহানের গল্প 'জনক' ˆ`wbK evsjvর সাহিত্য পাতায় ছাপা হয়। এটিও তাঁকে অনেক প্রেরণা ও সাহস দিয়েছিল সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে নাসরীন জাহানের অভিমত স্মরণযোগ্য :

> কবি আহসান হাবীবের পাতায় লেখা ছাপা হওয়াটা ছিল বিরাট ব্যাপার। তিনি স্কুলপড়ুয়া কারো লেখা কখনও ছাপেননি। খুব মনে পড়ে, আমি যখন তাঁর অফিসে ঢুকলাম, আমাকে রয়্যালিটি দিচ্ছিলেন না তারা। তিনি বললেন, পেছনে সাতভাই চম্পা আছে, ওখানে যাও। বাচ্চাদের পাতায় আর কি। আমি বললাম, না, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তুমি কীসে পড়, আমার সঙ্গে কীসের দেখা? বললাম, আমি নাসরীন জাহান। তিনি বললেন, কোন নাসরীন জাহান? আমার মনটা তো তখন আনন্দময় অহঙ্কারে প্রায় ভরে গেছে। উনি তখন দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বললেন, তুমি জানো, স্কুলে পড়া কারো লেখা এই পাতায় ছাপা হয় না। আমি বললাম, এ রকম কোনো নোটিশ তো আপনারা

> দেননি। তখন তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, কোনো কিছুর বিনিময়ে লেখাটা ছাড়বে না। তাঁর সেই কথাটি ছিল সাঙ্ঘাতিক প্রেরণার।[২]

মূলত সাহিত্য করবেন এই ছিল নাসরীন জাহানের সারাজীবনের আরাধ্য। অনুবাদ সাহিত্যে পৃথিবীর আপসহীন শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই নিবেদিত সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে নিজেকে সেই পথে ধাবিত করার প্রয়াসেই তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ভুবনে বিচরণ। বিখ্যাত মানুষদের আত্মজীবনী নাসরীন জাহানকে প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণে তাঁর বক্তব্য এরকম :

> কাফকা, অ্যামানতো, দস্তয়ভস্কি, মার্কেজের লেখা আমার পছন্দ; বাংলা ভাষায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, সুধীনদত্ত ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা ভালো লাগে। উৎপল কুমার বসু, জয় গোস্বামীর কবিতা পছন্দ। শিল্পকলা নিয়ে লেখা এবং ভ্রমণ কাহিনি, যেগুলো রাস্তাঘাট ছাড়াও বিস্তারিত কথা থাকে সেসব ভালো লাগে।[৩]

তবে সমস্ত প্রভাবকে নাসরীন জাহান আয়ত্ত করে নিয়েছেন আপন প্রতিভার স্বকীয়তার সৌকর্যে। বিশ্বসাহিত্যের একটা গল্প পড়ে নাসরীন জাহান দশ বারোটি গল্পের আবহ গ্রহণ করতে পারেন। বেশ কিছু নানা ধাঁচের গল্প লিখতে পারেন। সেই গল্পের সঙ্গে হয়তো কোনো মিল নেই; কিন্তু আবহ এক। লিখতে গিয়ে যে বিষয়টি নাসরীন জাহান সবসময় বিবেচনায় রাখেন তা হলো, লেখায় লেখক যেন ঢুকে না পড়েন। লেখকের কণ্ঠ যেন সেভাবে ধরা না পড়ে যে, পাঠকের মনে হবে এখানে লেখক কথা বলে উঠলেন। নাসরীন জাহান তাঁর নিজের মতো করেই লিখেন। জটিল শব্দগুচ্ছ, অসমাপ্ত বাক্য, শব্দ তৈরি না-করার বা সমাসরীতি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা, গদ্য ও পদ্যের সমান্তরালহীন এক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ— এককথায় লেখার ব্যাপারে তিনি বলা যেতে পারে খানিক স্বেচ্ছাচারী। প্রথমদিকে সচেতনভাবে হলেও পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি ভাষার ব্যবহার করেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। নাসরীন জাহানের মতে, শিল্প কোনো রেসের মাধ্যম নয়। তাছাড়া তাঁর একটি লেখা থেকে আরেকটি লেখা অনেকটাই আলাদা। এ যেন একেবারে : 'হ্যাঁ, উল্লম্ফন। একটা গল্প থেকে হঠাৎ অন্যরকম নাসরীন জাহান। আর তার এ পথযাত্রার সঙ্গী বাক্যালঙ্কার তৈরির চমৎকার ক্ষমতা। দীপ্ত, কষা, আপসহীন বাকপ্রতিমাও তৈরি করেন তিনি। ... মানুষের অন্তরমহলে ঢুকতেও তার বেশ ভালো দক্ষতা।'[৪] আশির প্রারম্ভে তাঁর ছোটগল্পে অনুপ্রবেশ। নিরবিচ্ছিন্নভাবে গল্প লিখে গেছেন। পাঁচটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পর নাসরীন জাহান উপন্যাস রচনায় হাত দেন। সম্ভবত নাসরীন জাহান : 'বাংলা সাহিত্যে সেই দুর্লভ লেখকদের একজন, যিনি উপন্যাস এবং ছোটগল্প— এই দুটি ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতায় উৎকর্ষিত। একদিকে ধ্রুপদী কথাবস্তুর নৈপুণ্যে স্থৈর্য আবার অন্যদিকে নেরেটিভ-এন্টি নেরেটিভের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে নিজেকে তিনি ক্রমাগত উন্নীত করে নিয়েছেন সমকালীন বিশ্বমুখিনতায়।'[৫] শিল্পী নাসরীন জাহানের প্রবল সংবেদন তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

নান্দনিক নিরপেক্ষতাকে কখনো ব্যাহত করতে পারে নি, বরং সংহত রেখেছেন শিল্পিত সংবেদনশীলতায়। আশির দশকে আমরা যাঁদের কথাসাহিত্যিক হিসেবে পেয়েছি তাঁরা প্রায় সবাই শক্তিশালী লেখক; সে শক্তিমত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তাঁদের গল্পবলার ভঙ্গি, ভাষা-নির্বাচন, প্রেক্ষাপট ব্যবহারের কৌশল এবং গল্পের বিষয়বস্তু ব্যবহারের অভিনবত্ব। পারিপার্শ্বিকতা, ব্যক্তিজীবনের নির্বেদ, সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, অমানবিকতা, সামাজিক উত্থান-পতন, রাষ্ট্রযন্ত্রের কোলাহল, ষড়যন্ত্র, সামরিক ক্যু, সামরিক আগ্রাসন, অসহায় গণতন্ত্র এবং এসবের প্রতিক্রিয়ায় যুবক সমাজের হাহাকারময় পরিণতি এসব এ সময়কার গল্পে উঠে আসে ক্রমাগতভাবে এবং একসঙ্গে। কাজেই একক বিষয় পাওয়া বেশ কষ্টকর। আশির দশকের গল্পকারগণ সম্মিলিতভাবে যে কাজটি করেছেন তা হচ্ছে, মধ্যবিত্ত জীবনের হালকা কাহিনিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পণ্যে পরিণত করার বদলে তাঁরা জীবনমুখী গল্প রচনার চেষ্টা করেছেন। ষাটের দশকের গল্পের উত্তরাধিকারকে বহন বা পুনরুজ্জীবিত করেছেন। বলা যেতে পারে :

> স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বোধ করি এই যে, এ সময় আমাদের ছোটগাল্পিক-চেতনা হয়ে উঠে অনেক বেশি রাজনীতিসচেতন ও জনজীবনমূল-অন্বেষী। বস্তুত, আশির দশকের গল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা সমধিক প্রযোজ্য। যদিও স্বাধীনতাউত্তরকালে পাঠকপ্রিয়তার লোভে এবং বাণিজ্যলক্ষ্মীর আরাধনায় কয়েকজন শক্তিমান গল্পকার সৃষ্টি করেছেন একটা 'জলো, অসার, বারোয়ারি কেচ্ছা' লেখার ধারা, যা ক্রমশ স্ফীতোদর হচ্ছে, ধ্বংস করছে গল্পসাহিত্যের শিল্পিত বিকাশের যাত্রাপথ। ষাটের দশকে যে আঙ্গিক-সচেতনতার সূত্রপাত, আশিতে এসে তা ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন অনেকেই পাঠকরুচির কাছে বিসর্জন দিচ্ছেন শিল্পমানকে, সরস বক্তব্যভুক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যেই তাঁরা যেন সর্বদা সচেষ্ট।[৬]

এর বাইরেও কথা থেকে যায়। সত্তর দশকে আমাদের সাহিত্যে 'জনপ্রিয়' যে স্রোত প্রবাহিত হয়, পূর্বসূরিদের জনপ্রিয়তার টানে অস্থির হয়ে আশির দশকের অনেক গল্পকার নিজেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেননি। এক্ষেত্রে নাসরীন জাহানের নাম প্রণিধানযোগ্য। সমকালীন সংকট, চাপ, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অভিঘাত স্বীকার করেও নাসরীন জাহান ছোটগল্পের শরীর তৈরি করেছেন নিরাসক্ত বস্তু-বাস্তবতা দিয়ে। আশির দশকের গল্পকারদের প্রধান বৈশিষ্ট্য— এঁদের নিরীক্ষাপ্রবণতা। সম্ভবত নতুন কিছু সৃষ্টির নেশায় এ সময়ের গল্প-শিল্পিরা নিরীক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কি বিষয়ে, কি আঙ্গিকে, কি ভাষায় তাঁরা অচিরেই নির্মাণ করেছিলেন স্বতন্ত্র একটি গল্পের ভুবন— পূর্বের গল্প-ঐতিহ্য থেকে যা বেশ খানিকটা আলাদা। আশির দশকের ছোটগাল্পিকগণ নষ্ট সময়ের বিরুদ্ধ স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালেন তারুণ্যের দ্রোহ নিয়ে, প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে। দেশের দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী ও সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক ম্যাগাজিনগুলো যখন পাঠক-মনোরঞ্জনে ব্যস্ত, জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যকে যাবতীয় আশ্রয়-প্রশ্রয়-প্রেরণা দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, তখন অনেকটা নিঃশব্দেই লিটল ম্যাগাজিনগুলো আশ্রয় দিয়েছে তরুণ লেখকদের। সম্ভবত এ কারণেই ষাটের পর

আশিতে এসে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আশির দশকে লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা খুব সঙ্গত কারণেই সাধারণ পাঠকদের কাছে পৌঁছতে পারেননি যেমন, তেমনই নিয়মিত লেখালেখি থেকে দূরেও থেকেছেন কিছুদিন; হয়তো লিটল ম্যাগাজিনের স্বল্পতা এর একটি বড় কারণ। কোনো-এক অজ্ঞাত এবং অনির্ণেয় কারণে হাতে-গোনা কয়েকজন ছাড়া আশির দশকের অনেক লেখকই কেন তাঁদের লেখালেখিতে দীর্ঘ ছেদ টানলেন সেটা বোঝা মুশকিল। সেলিম মোরশেদ, শহীদুল আলম, পারভেজ হোসেন, মাখরাজ খান এঁরা সবাই দীর্ঘ বিরতি দিয়েছেন। সামসুল কবির নিষ্ক্রিয়, সঞ্জীব চৌধুরীও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গল্পে নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। এঁদের অসাধারণ সম্ভাবনা— অতি অল্প সময়ে যা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, এখন একেবারেই ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। তবে : 'নিষ্ক্রিয়তার উদাহরণ যেমন আছে, তেমনি তুমুল সক্রিয়তার উদাহরণও আছে এই সময়েই।'[৭] এই সময়ের সবচেয়ে বহুপ্রজ লেখক নাসরীন জাহান। বলা যেতে পারে তিনিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সক্রিয় রেখেছেন নিজেকে। নাসরীন জাহানের রয়েছে প্রচুর ও বহুমাত্রিক গল্প লেখার প্রবণতা। প্রতারক সময়ের সর্পিল চেহারা, বিশৃঙ্খল ও জটিল বহুমাত্রিক সংঘাত ও সংঘর্ষে ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায়, দেশ বিপন্ন; এই সমাজ, সময়ের সন্তান বলেই নাসরীন জাহান পরিহার করেছেন সরল প্লট, বর্ণনার বাহুল্য, ঘটনার ঘনঘাটা। সময় যেহেতু সর্পিল, সনাক্তহীন, তাই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো উদ্ভট, রহস্যময়, ঝাপসা, নাম পরিচয়হীন। নাসরীন জাহানের গল্পের বিষয় হিসেবে এসেছে ব্যক্তিমানুষের ক্ষয়, ক্লেদ, মনোবিকলন, নারীর নিজস্ব পৃথিবী, একই সমাজে বাস করা একজন পুরুষের আর একজন নারীর ভিন্ন— প্রায় বিপরীতধর্মী— বাস্তবতা, এই সমস্তকিছু। বলা যেতে পারে : 'নাসরীন জাহান ইতোমধ্যে তাঁর শিল্প-অন্বেষণার পথ খুঁজে নিয়েছেন। গল্প বা উপন্যাস কোথা থেকে শুরু করবেন, কোথায় গিয়ে শেষ করবেন, কিভাবে বিন্যাস করবেন, সেখানে বাস্তববোধ ও রূপক, প্রতীকের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি রচনাকে শিল্পময় করে তোলার কৌশল রপ্ত করেছেন।'[৮] নাসরীন জাহান সম্ভাবনাময়ী কথাশিল্পী। রহস্যপ্রবণতা তাঁর শিল্পচৈতন্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বলা যেতে পারে : 'বাস্তব জীবনকে তিনি তাঁর কল্পনার রসে জারিত না করে কিংবা রহস্যের স্পর্শ না এনে প্রকাশ করা থেকে প্রায়শ বিরত থাকেন। তবে তা কোনোক্রমেই কল্পনাসর্বস্ব বাস্তব-জীবন হয় না।'[৯] মানুষের মনের অন্ধগলিতে বিহার করে তাঁর চিন্তার বিচিত্র প্রকাশকে নাসরীন জাহান বেশ কুশলতার সঙ্গেই উপস্থাপিত করেছেন তাঁর গল্পের জমিনে। শিল্পচৈতন্যের এরূপ প্রকাশে বাস্তব কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজেকে জাহির করে না; পরাবাস্তব এরূপ ক্ষেত্রে তার রহস্যঘন প্রকাশে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নাসরীন জাহানের গল্পের বিচিত্র পরিসর ও পটভূমিতে তার পরিচয় আছে। নাসরীন জাহানের গল্পে রহস্যপ্রবণতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে : 'তিনি কোনো অবাস্তব কল্পনাকে সেখানে স্থান দেন নি; কল্পনার ফানুস নির্মিতিতে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই। অথচ বাস্তব বিষয়কে নিয়ে রহস্যের জাল বয়ন করে তিনি তাঁর কল্পনাকে রূপকধর্মী করে তোলেন।'[১০] আসলে

কিছুটা রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে নাসরীন জাহান বর্তমানের অসহিষ্ণু জীবনাচরণ, অস্থির সমাজ-ব্যবস্থা এবং দিন দিন বেড়ে ওঠা জন্ম-সমস্যার চাপে নুয়ে পড়া সমাজ-জীবনের নানামাত্রিক অনভিপ্রেত দিকগুলো জীবনঘনিষ্ঠতার আলোকে শিল্পিত করেছেন তাঁর গল্পের আখ্যানভাগে। নষ্ট সময়ের ভিটের উপর দাঁড়িয়ে নাসরীন জাহান তাঁর গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে সমাজ-সংসারের জীর্ণশীর্ণ চালচিত্র ও হতাশায় নিমজ্জিত মানুষের কুৎসিত দিকগুলো কার্যকারণের ন্যায়সঙ্গত সম্বন্ধ যোজনা করে তার সমাজবাস্তব চিত্রের উন্মোচন করেছেন। নাসরীন জাহান গল্পের মানুষ, উপন্যাসের মানুষ, এমনিক নাটক আর লিটলম্যাগেরও মানুষ। তাঁকে লেখালেখি দিয়ে এমনিতর নানাভাবে দেখা যায়। এবং সেটা কেবল দেখাদেখির ভেতর রাখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তাঁকে দিয়ে একটা সময়কে চিহ্নিত করা যায়। সময়টা আমাদের : 'মুক্তচৈতন্য চিহ্নিত করার সময়, একে বিকশিত করার সময়। এজন্য যত ধরনের অপশক্তি আছে, তাকে নাশ করারও সময়। স্বৈর শাসনকে মোকাবিলা করার সময়। তিনি সেই সময় লিটলম্যাগের সঙ্গে যুক্ত হন। সময়টাই যেন ছিল দ্রোহের, প্রতিবাদের, প্রতিষ্ঠানকে মোকাবিলা করার।'[১১] নাসরীন জাহান লিখে গেছেন সৃষ্টিশীল প্রেরণায়। পাঠক সৃষ্টির কোনো কৌশলে তিনি যাননি। পাঠককে তিনি পোষ মানাননি। এমনকি পাঠকের মায়ায়ও তিনি পড়েননি। সময়, সমাজ ও মানুষের জীবনবাস্তবতাকে নিজের অভিজ্ঞতা ও শিল্পচেতনার জারক রসে জারিত করে তাকে তিনি গল্পের উপজীব্য করে তুলেছেন। কেবল দায়বদ্ধতার তাগিদ থেকে নয় বরং নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবেই তিনি সাহিত্যকে অবলম্বন করেছেন। নাসরীন জাহানের :

> উপন্যাস যখন পাঠ করব, তখন মনে হবে এর ভাঁজে ভাঁজে, এমনকি বাক্যে, চরিত্রের বিন্যাসে অনেক অনেক গল্প আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি। আবার আমরা তাঁর গল্প পাঠ করলে মনে হতে পারে, এখানে উপন্যাসের বীজ একেবারে চকচক করছে। আবার সব কিছু মিলিয়ে যদি দেখি, তাহলে তাঁকে একজন সাহিত্যকাতরসত্তা বলেই মনে হবে। গল্পকার আর ঔপন্যাসিক যেন তাঁর অনুষঙ্গ। যা-ই হোক, এভাবে, নানাভাবে তাঁকে দেখার সুযোগ থেকেই যায়।[১২]

উল্লেখ্য, সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি Do° উপন্যাসের জন্যে পেয়েছেন ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, cvMj‡U GK MvQ e‡ov কিশোর উপন্যাসের জন্য আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, সীতাকুণ্ড সাহিত্য পুরস্কার, খুলনা রাইটার্স ক্লাব পুরস্কার, সমগ্র সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার। তিনি পাক্ষিক 'অন্যদিন' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। কথাসাহিত্যের পাশাপাশি তিনি এখন নাট্যসাহিত্যের সঙ্গেও গভীরভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। নাসরীন জাহানের গল্পভূমির বিচিত্র পরিসরে সামাজিক সঙ্কট, বিকার, অন্তঃসারশূন্যতা, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংশয়, ক্রন্দন, দ্বিধা, ক্লেদ, অস্থিরতা, জীবনযাপনের গ্লানি, মনোপীড়ন এসবের বিপুল উপস্থাপন লক্ষণীয়। তাঁর গল্পে প্রধানত দুটো ধারা প্রবাহিত। নাগরিক জীবনের নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্লান্তি-অবিশ্বাস-টানাপোড়েন-সন্দেহ-পুরুষাধিপত্যের ফল ইত্যাদি রয়েছে এক ধারায়। আর অন্য ধারাটি গ্রামীণ-জীবনের আর্থ-সাংস্কৃতিক বলয়ে নারীকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে খেতে চমৎকার স্রোতসৌন্দর্য নিয়ে

এগিয়েছে। গ্রামীণ পটভূমিতে বলতে নাসরীন জাহান এটা করতে চাননি যে : 'গ্রামের বিশাল ক্যানভাসে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের ডকুমেন্টশন।'[১৩] বরং উভয় ধারাতেই গল্পের অবয়বে কিছু সিম্বল, কিছু আলো-অন্ধকারের খেলার মধ্যে সে মানুষগুলোর ভেতরকার দ্বন্দ্ব এবং সত্যের রূপ চিনে নেয়া ও চেনানোর কাজটিই করেছেন নাসরীন জাহান তাঁর অসাধারণ শিল্প-কুশলতায়। তাছাড়া গল্পের অন্তে চমক তৈরির কায়দাটুকুও নাসরীন জাহানের খুব বড় গুণ বলা যেতে পারে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে : 'সেটা চমকের খাতিরে চমক নয়, বরং আখ্যানের একটা দর্শনায়ন ঘটান বলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।'[১৪] বাংলার নারীলেখকদের সমাজপিষ্ট মানসের উল্লম্ফনে যে পুরুষবিরোধী চিন্তার একরৈখিকতা আমরা দেখে থাকি বহুলখ্যাত নক্ষত্রউপম ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেখান থেকে নাসরীন জাহান এজন্য আলাদা, তিনি চরিত্র বা মানুষকে সমাজ-আর্থ-রাজনীতির বাইরে নিয়ে শূলে চড়াতে যান না। বরং সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখেন বলে তাঁর গল্পের জীবন হয়ে ওঠে বাস্তব জীবনেরই গল্প। বলা যেতে পারে তাঁর গল্প জীবনেরই শিল্পিত রূপায়ণ। বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের জটিলতা ও টানাপোড়েন এবং সেই সম্পর্কের ভেতরকার অসংগতিগুলো কী— পাঠকের দৃষ্টি, ভাবনা আর বোধের সীমায় এইসব প্রসঙ্গকে জান্তব করে তোলার কাজটিই করেছেন নাসরীন জাহান তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিসরে। শাদা চোখে কোনো কাহিনিকে সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখে, সেইভাবে দেখা নয়; গল্পের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে যে জীবন, সেই জীবনের প্রকৃত স্বরূপটিকে কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ করে গল্পের কাঠামোয় পাঠকের বোধের সীমায় নিয়ে আসেন নাসরীন জাহান অনবদ্য দক্ষতায়। সে কারণেই তাঁর গল্প কেবল নির্জলা কোনো গল্প হয়ে থাকে না, আমাদের বোধ আর আবেগের কাছে তীব্র আবেদন তৈরি করে। তাঁর গল্প হয়ে ওঠে সমগ্র জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারী-পুরুষের অসম আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক মূলত নারীর মানবিক সত্তার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। বিদগ্ধ সমাজের দৃশ্যমান জগতে নারী সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য; নারীকে যবনিকার অন্তরালে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে পুরুষ তার একাধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে জীবনের সর্বত্র। জীবনের সকল স্তরে পুরুষ সমাজ ও সভ্যতার ধারক ও বাহক; নারী অদৃশ্য ও অনুপস্থিত। নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়কে নিয়ে সমাজ গঠিত। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়-বিচার, সামাজিক সাম্য— এ সবের মূলে নারী-পুরুষ উভয়েই। অথচ জৈবিক পার্থক্যকে পুঁজি করে জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্টি করে সমাজ নারীকে পুরুষের পায়ের তলে দাবিয়ে রেখেছে, নারীর মানবিক অস্তিত্ব ও সত্তা অস্বীকার করে তার মেধা, মনন ও বুদ্ধির বিকাশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। অতএব, সমাজের বাস্তব চিত্রটি উন্মোচনের জন্যই সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানের স্বরূপ-সন্ধান জরুরি। এ নিরিখেই নাসরীন জাহানের গল্পে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তব চিত্রায়ণ ঘটেছে। নাসরীন জাহান নিজেই এ প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে :

> এটা স্পষ্টত যে, এই পৃথিবীটা পুরুষশাসিত। তুমি একটা অফিসে কাজ করো, তোমার বস যদি তোমাকে ডমিনেট করে, তোমার ভেতর থেকে প্রতিবাদ আসবে না? প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করলে হয়ত তোমার চাকরি চলে যাবে, কিন্তু প্রতিবাদ কিন্ত আসবেই— যদি তোমাকে অহেতুক ডমিনেট করে। এখন একটা ছেলে ও মেয়ে সমান কাজ করার পরেও যদি শোষিত হয় একটা মেয়ে, এটা বলা হয়— একজন শ্রমিক যেমন শ্রমিকবাদী তেমনভাবে একজন নারী নারীবাদী। ... নারীবাদী ভাবনার জন্য শুধু নারী হওয়ার দরকার নেই। আর আমাদের দেশে হয় কী— ছেলেমেয়ে কাজ করে ফেরে, বাবা-মা বলে— আহারে, আমার ছেলেটা সারাদিন খেটে আসল। পানি এগিয়ে দে ইত্যাদি। আর বউটা যখন একই কাজ করে, লোকে বলে, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন কত ভালো, তোমাকে কাজ করতে দেয়। তোমার হাজব্যান্ড কত ভালো, তোমাকে কাজ করতে দেয়। যেন মেয়েটা প্রমোদবিহার করতে গেছে, চাকরি করতে যাচ্ছে না। দুজনে একই কাজ করে। তবু মেয়েটা ঘরে ফিরে দৌড়ে রান্না করতে যায়, যাতে কথা শুনতে না হয়। এই দুটো বিষয় তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে কি তোমার মনে হয় না— নারীরা তাদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরবে না তাদের লেখায়? প্রতিবাদ করবে না?[১৫]

নারীও মানুষ, পুরুষও মানুষ। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো, সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষ প্রভুত্ব বিস্তার করে রেখেছে এবং নারীকে অধস্তন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছে। মানুষকে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা না দেওয়ার চেয়ে বড় নির্যাতন ও নিপীড়ন আর কিছুই হতে পারে না। নারীজীবনের যথার্থ স্বরূপটিকে বিশ্লেষণ করে প্রকারান্তরে সমাজের প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচনের সযত্ন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে। তাঁর গল্পের পরিসরে নারীচিত্রণ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নারী-চরিত্ররা খুবই বাস্তব এবং জীবনসংলগ্ন। আমাদের চেনাজানা পরিধির বহু নারী চরিত্র সব একটা বিশেষ আবেদনে বাস্তবতার অনুষঙ্গে পরিণতি বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছোটগল্পের পটভূমিতে। সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপটিকে অনুধাবন ও সংশোধনকল্পে নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের স্বরূপ-সন্ধান তাই প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মোট ছয়টি গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ছয়টি গল্পগ্রন্থ যথাক্রমে ¯^ei †hŠeb (১৯৮৪) wePY Qvqv (১৯৮৫), c_, †n c_ (১৯৮৯), KvV‡cPv (১৯৯৯), A¨v‡jb‡cvi weovj (২০০৬), এবং Avðh †'ewkï (২০০৯)। ছয়টি গল্পগ্রন্থে সব মিলিয়ে আটষট্টিটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলো নাসরীন জাহানের সমৃদ্ধ-অভিজ্ঞতা, প্রখর মেধা ও সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সার্থক চিত্রায়ণ। বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। অতএব, নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে নারী-জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর যে-সব ছোটগল্পে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবন অভিধার প্রতিফলন ও উন্মোচন ঘটেছে কেবল সে-সব ছোটগল্পই এখানে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Z_¨wb‡‘k

১. নাসরীন জাহান, 'অর্থহীনতা মানুষকে দ্রুত ব্যক্তিত্বহীন করতে পারে', Mícî (সম্পাদক: মাসউদ আহমাদ), বর্ষ ২ সংখ্যা ৪, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৪৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৪. শুভাশিস সিনহা, 'নাসরীন জাহানের গল্প : গ্লানিতে উত্থানে গড়া জীবনাখ্যান', nvjLvZv , (সম্পাদক: শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, পৃ. ৪৭১

৫. নাসরীন জাহান, ¯wei †hŠeb, অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা ১৯৮৪, পৃ. ২য় ফ্ল্যাপ

৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡‘‡ki mwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৯৪

৭. আহমাদ মোস্তফা কামাল, 'বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার', nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৮. আহমেদ মাওলা, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ও আঙ্গিকচেতনা', nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

৯. আজহার ইসলাম, evsjv‡‘‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯i¦c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৯৪

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫

১১. কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, 'উড়ুক্কু, নাসরীন জাহান এবং কিছু কথা', 'শিলালিপি' Kv‡ji KÉ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১

১২. প্রাগুক্ত

১৩. শুভাশিস সিনহা, nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭২

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩

১৫. নাসরীন জাহান, 'অর্থহীনতা মানুষকে দ্রুত ব্যক্তিত্বহীন করতে পারে', Mícî, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡”Q`

bvmwib Rvnv‡bi †QvUM‡í bvix-Rxeb

¯^ei †hŠeb

নাসরীন জাহানের প্রথম গল্পগ্রন্থ ¯^ei †hŠeb[1]। গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলো যথাক্রমে ‘দাহ’, ‘পরগাছা’, ‘জনক’, ‘বিকার’, ‘জঠরবন্দি’, এবং ‘আত্মসমর্পণ’। নাসরীন জাহানের প্রায় বিশটি গল্প থেকে বাছাইকৃত আলোচ্য গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে : ‘জীবনকে নিজের অভিজ্ঞতা ও ধারণার ভেতর দিয়ে যাচাই করে নেয়ার কিছু সাহসী প্রয়াস তার রচনাকে সীমাবদ্ধ না হওয়ার গর্বে আলোকিত করতে পেরেছে।’[২] কখনো ব্যক্তিক কখনো-বা সামষ্টিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গল্পগুলোর আখ্যানভাগ বিন্যস্ত হয়েছে অসাধারণ শিল্প কুশলতায়। আলোচ্য ¯^ei †hŠeb গল্পগ্রন্থটি শুরুতেই আলোর মুখ দেখেনি। লেখকের জবানীতে জানা যায় : ‘সবে তখন ‘চাররঙে’ প্রচ্ছদ শুরু হয়েছে। আমি প্রকাশককে নিজ টাকা দিয়ে উড়তে উড়তে যে-ই বইমেলায় কাঁপতে কাঁপতে বই হাতে নিলাম, কাঁচা ভেজা বই ভেঙে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেল। এ আমার প্রথম গল্পের বই। যে পৃথিবী দেখার আগেই ভেঙে বলা যায় দুমড়ে মুচড়ে তলিয়ে গেল।’[৩] পরবর্তীতে আলোচ্য গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো নাসরীন জাহান তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ wePY Qvqv থেকে শুরু করে অন্য আরও পাঁচটি বইয়ে দিয়েছিলেন। অনেকটা হারানো সন্তানকে ফিরে পাওয়ার মতো পুনরায় তলিয়ে যাওয়া আলোচ্য গল্পগ্রন্থটি অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়। বলা যেতে পারে আলোর মুখ দেখে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো লেখক তাঁর স্কুল-কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে লিখেছিলেন। অল্প বয়সের রচনা হলেও গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে নাসরীন জাহানের সম্ভাবনাময় শিল্পচৈতন্যের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বলা যেতে পারে : ‘বাস্তব জীবনকে তিনি তাঁর কল্পনার রসে জারিত না করে কিংবা রহস্যের স্পর্শ না এনে প্রকাশ করা থেকে প্রায়শ বিরত থাকেন। ... তবে তা কোনোক্রমেই কল্পনাসর্বস্ব বাস্তব-জীবন হয় না।’[৪] বরং রহস্য ও কল্পনার ঘেরাটোপে বাস্তব জীবনের নতুন অবয়ব নির্মাণ করেন নাসরীন জাহান তাঁর গল্পের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে। সেই অবয়বে সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচিত্র স্বরূপটি যেমন উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে তেমনি এরই মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তব ও জীবনঘনিষ্ঠ দিকেরও উন্মোচন ঘটে। নারীর হৃদয়ের গুহায়িত রহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে প্রতিফলিত হয় সময়, সমাজ ও পরিপার্শ্বের যথার্থ স্বরূপ।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের ‘পরগাছা’ গল্পের আখ্যানভাগ আবর্তিত হয়েছে অন্যের বাড়িতে আশ্রিত অসহায় নাদের আলী নামক চরিত্রকে কেন্দ্র করে। নাদের আলী যে বাড়িতে থাকে তার কর্তা থেকে শুরু করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে ভারবাহী পশু হিসেবেই বিবেচনা করে। পরিবারের সদস্যদের নানা ফুট-ফরমাশ

খেটেই দিন অতিবাহিত হয় নাদের আলীর। পরিবারের একমাত্র সদস্য গৃহকর্তার বড় মেয়ে নীলা এক্ষেত্রে আলাদা মেজাজের। নাদের আলীর প্রতি নীলার একরকম সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে নাদের আলীর স্মৃতিতে তার মৃত মেয়ের চেহারা ভেসে ওঠে। নীলাকে দেখে তার মৃত মেয়ের কথা মনে পড়ে। বুকের ভেতরটা একরাশ বিষাদে ছেয়ে যায়। কেননা :

> এদের বাড়িতেই কাজ করত তার মেয়ে। তারপর গৃহকর্তা একটু অসতর্ক হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বস্তির গুণ্ডারা হুমকি দিয়ে মেয়েটাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করে গৃহকর্তাকে। অনেক রকম লাঞ্ছনা সহ্য করেও এই বাড়িতে সেই যে পা রেখেছিল সে, এরপর হাজার ধাক্কায়ও এ বাড়ির মানুষগুলো সেই পা সরাতে পারে নি। প্রথম দিকে এ নিয়ে কম ধাক্কা সামলাতে হয় নি। সেই ধাক্কা খেতে খেতেই এক সময় নাদের আলীর সব ইন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে গেছে। ('পরগাছা', ¯^ei th‡eb : ২৩)

নাদের আলীর আত্মসম্মান বোধহীন অবয়ব, অকারণ হাসির মধ্যে এই পরিবারে মিলিয়ে যেতে শুরু করে একটি মেয়ের মৃত্যু দৃশ্য। মেয়েটি আর কেউ নয়, এ বাড়িতে কাজ করতে আসা গৃহকর্তার বিকৃত লালসার শিকার ভাগ্যাহত নাদের আলীর আত্মজা। স্বাভাবিকভাবেই তাই দেখা যায় : 'রাতে শুয়ে শুয়ে একটা ঘোরের ভেতর নাদের আলী ভাসতে থাকে। গলায় রশি দিয়ে নীল হয়ে যাওয়া মেয়েটা নাদের আলীর সত্তায় টোকা দেয় বারবার। নাদের আলী কাঁপতে থাকে।' ('পরগাছা', ¯^ei th‡eb, : ২৮) নাদের আলীর অবলম্বনহীন পরগাছার মতো জীবনের অন্তরালে নারী-জীবনের এক বিশেষ মাত্রা রূপায়িত হয়েছে। নিছক জীবিকার প্রয়োজনে কাজ করতে আসা অসহায় নারী রক্ষা পায় না গৃহকর্তা নামক নরপশুর আক্রমণ থেকে। নারী দেহকে কেন্দ্র করে ঘনিয়ে আসা সঙ্কট কেবল নারীর উপায়হীনতা ও অসহায়ত্বকেই মূর্ত করে না বরং সমাজের বিকৃত অসারতার নগ্ন রূপটিকেও বিচিত্র করে তোলে। কেবল ঘরের বাইরে নয় বরং ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থেকেও নারী সর্বদা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। গৃহকর্মী নারীকে ভোগের এহেন সহজতা পুরুষ সমাজব্যবস্থা থেকেই পেয়েছে। কেননা : 'ধর্ষণের আসল উদ্দেশ্য যৌন বাসনার চরিতার্থতা নয়; সমাজ পুরুষের মধ্যে যে পৌরুষের প্রতিচ্ছবি এবং নারীর মধ্যে যে নারীত্বের প্রতিচ্ছবি অংকন করে দিয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ ধর্ষণ।'[৫] কেবল তাই নয় সমাজ এ বিষয়ে নির্যাতিত নারীর জন্য বরাদ্দ রাখে গ্লানি ও কলঙ্কজনক জীবন। অথচ ঘটনার আসল হোতা যে পুরুষ সে দিব্যি বহাল তবিয়তে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে চলে। কলঙ্কের ছিটেফোটা পুরুষকে স্পর্শমাত্র করে না। নারী নীরবে অপবাদের বোঝা বয়ে চলে এবং উপায়হীনভাবে নিরবতা পালন করে। যতটা সম্ভব ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে নারী। কেননা : 'ধর্ষিতা রমণী সমাজে পতিতা; ধর্ষণের কথা জানাজানি হলে তার স্থান হয় পতিতালয়ে যেখানে তাকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। কাজেই ধর্ষিতা নারীর আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা ঘটনা চাপা দেন। ধর্ষিতা নারী নিজেও ঘটনা গোপন করতে চায়।'[৬] এহেন ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়লে নারী সামাজিকভাবে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। লাঞ্ছনার

অমানবিক গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করতে অপারগ নারী আত্মহননের মাধ্যমে যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে বাধ্য হয়। নাদের আলীর কন্যার রশিতে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা কেবলমাত্র গল্পের বিষয় হয়ে থাকে না বরং এর মধ্য দিয়ে সমাজের অগণিত অসহায়-বঞ্চিত নারীর উপায়হীনতা ও সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থান ও নিগ্রহের নির্মম সমাজচিত্রটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'জনক' গল্পে নারী-জীবনের এক বিশেষ মাত্রা মাতৃত্ব, মাতৃত্বের সঙ্কট ও গৌরব প্রসঙ্গটি সমাজবাস্তবতার আলোকে শিল্পিত হয়েছে। গল্পের কথক নারী ও তার জীবনের অব্যক্ত সঙ্কটকে আবর্তন করে গল্পের কাঠামো বিস্তৃত হয়েছে। সন্তানসম্ভবা এই নারী হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে নানা ভাবনার আবর্তে তলিয়ে যেতে থাকে। গর্ভের সন্তান ও তার পিতৃত্বের পরিচয়ের সঙ্কট তার যাবতীয় ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। নিজ দেহে বেড়ে ওঠা শিশুটির প্রকৃত জনক তার স্বামী রায়হান নাকি কথকের একসময়ের ভালোবাসার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ জিতুর — এসব নিয়ে গল্পের কথক নারীর আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত চিত্তের বিচিত্র টানাপোড়েন গল্পটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। কেননা :

> সন্তান! কী আজব শব্দ! কী মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর শব্দ! ... নিয়ম মতো লাল স্রোতের আগমনের পর এগারো, বারোদিনের ডগায় জিতু নামের এক মহাশক্তির দিকে আমি তর্জনীর ডগায় করে আমার দেহটি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিজ্ঞানের হিসেবে সন্তান আসার সেটাই একজন নারীর বিপদজনক সময়। বরফের হিম নিয়ে দিন পেরোচ্ছিল। মাসের শেষে যেদিন আমার পুনরায় রঙিন পিরিয়ডের সময়, তার একদিন আগে বিয়েতে রাতে প্রবল কান্নার মধ্য দিয়ে আমি রায়হানের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। পরদিন নিশ্চিত আমার ঋতুবতী হওয়ার কথা। কোনোদিন এই নিয়মের বাইরে যায় নি ... হলো না। সায়েন্স কি বলে ওই রকম সেইফ পিরিয়ডের দিনে রায়হানের উষ্ণতায় নিমজ্জিত হওয়া সন্তানটি রায়হানের? কী ভীষণ দমবন্ধ দিন কেটেছে! পরদিন অসুস্থ হওয়ার ব্যাপারটি চেপে গিয়ে রায়হানকে আমি আমার ডেট বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। পরবর্তী এক সপ্তাহ অব্দি। এক সপ্তাহ পেরুলে তখনো যখন স্রোতের কোনো সন্ধান নেই, রায়হান আপ্লুত। আর আমার 'ভীত প্রেম বুকে জড়ো, কোলাহল উঠে নখ থেকে।' জঙ্গলের গহীন থেকে জুজু বুড়ি ডাকে ... আয় সোনা আয়। ('জনক', ¯^ei th¨eb : ৩৪)

এভাবেই নারী দীর্ণ-বিদীর্ণ হয় নিজেকে গোপন রাখার অভিপ্রায়ে। বহু আকাঙ্ক্ষার যে সন্তান — তাই শেষপর্যন্ত তার অস্তিত্বের সঙ্কটকে ঘণীভূত করে তোলে। নিজেকে প্রকাশ করতে না-পারার ব্যর্থতায় দংশিত হতে থাকে গল্পের কথক এই সঙ্কটাপন্ন নারীর হৃদয়। নারী নিজেকে এহেন পরিস্থিতিতে অপরাধী ভাবতে শেখে। সমাজ সুকৌশলে নারীর চেতনায় প্রবিষ্ট করিয়ে দেয় যাবতীয় দ্বিধা ও সংকোচের সন্দেহপ্রবণ ও ধ্বংসাত্মক ভাবনার বীজ। কেননা :

> 'ভালবাসা' নিঃসন্দেহে একটি সদগুণ; কিন্তু পিতৃতন্ত্রে নারীর ভালবাসা বলতে পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন বা বলিদান বুঝানো হয়। নারী ভালবাসবে নিজেকে এবং নিজের সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে, ভালবাসার জন্য নারী চরম বলিদান দিতে পিছ পা হবে না— সমাজ নারীর কাছে এটাই আশা করে, এটাই সমাজের দৃষ্টিতে নারীর ভালবাসার অর্থ।[৭]

নারীর ভাবনায় জারিত সমাজ-প্রসূত দ্বিধা-সংকোচ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত চিত্তের টানাপোড়েনের বাস্তব সমাজচিত্রটি অনুধাবনের প্রয়োজনে আলোচ্য গল্পের কথকের ভাবনার কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য:

ক. যাকগে, আমাকে জিতু প্রতারিত করেছে ... তেমন বিরহে আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না, বিয়েটা ভালোবাসার উৎকৃষ্ট পরিণতি। কিন্তু সব কিছুর পরেও আমি শেকড়ের মধ্যে লালন করি এমন কিছু গতানুগতিকতা, ঝেড়ে কাশলেও যা খসতে চায় না। আমার বিবেকের মর্মমূল পর্যন্ত এই বিশ্বাস পৌঁছে গেছে ... রায়হানকে আমি ঠকাচ্ছি এবং নৈতিকভাবেই সেই অধিকার আমার নেই। ব্যাপারটা তার কাছে প্রকাশ করার মতো সাহস, যোগ্যতা কোনোটাই আমার নেই। ('জনক', ¯wei †hŠeb : ৩৫)

খ. ওহ্ রায়হান, আমার স্বামী রায়হান ... এরকম বিড়বিড় করে জোরালোভাবে অর্ধাঙ্গনকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকি আমি। যদি সব জানো তুমি, ঘৃণার ফেনায় কতটুকু কুৎসিত, অস্পষ্ট হবে তুমি? দ্বিচারিণী ... অসতী ... এমন কত শব্দ তুলে আনবে অভিধানের অসংখ্য শব্দ খুঁড়ে ... ? ('জনক', ¯wei †hŠeb : ৩৫)

গ. কী চমৎকার হৃদয়ের বিশালতা, বিশ্বাসের বড়ত্ব, নিজের ভ্রূণের প্রতিপালন করবে অন্য মানুষ, তবুও ভ্রূণ দেয়া চাই, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কী লোভী, ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা! এইসব ভেবে ভেবে ন'মাসে নিজেকে আমি শূন্যে নামিয়ে এনেছি। আমার সন্তানের কোনো যথার্থ বাবা নেই, এই শূন্যতা আমি কোথায় লুকাই? ('জনক', স্থবির যৌবন : ৩৭)

ঘ. আমার পুরোটা জীবন কি এইভাবে যাবে? সন্তানের ভেতর জিতুকে আবিষ্কার করে, ওকে কেন্দ্র করে ডালপালা মেলতে থাকা রায়হানের স্বপ্নে ... দ্বন্দ্বে, কষ্টে ... এই রকম অর্থহীন অস্থির জীবন যাবে? আমি কি কোনোদিন সুস্থ গাছ হতে পারব না? আমার চুড়ো কি স্পর্শ করবে না আকাশ? এই রকম রক্তপাত, এইরকম সিদ্ধান্তহীনতা, বিবেকের পচা কামড় ... এক জীবন? ('জনক', ¯wei †hŠeb : ৩৮)

সমাজ এভাবেই নিজস্ব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, মেনে নিতে বাধ্য করে নারীকে যাবতীয় সংস্কারের ঠুনকো অজুহাতে। এই অচলায়তন ভেঙে নারীকেই বের হয়ে আসতে হবে। আদায় করে নিতে হবে আপন অধিকারের যথার্থ গৌরব। এজন্য সবার আগে নিজেকে সম্মান করতে পারা শিখতে হবে নারীকে। জাগ্রত হতে হবে নিজের একান্ত সত্তার প্রয়োজনে। কেননা : 'নারী যদি মুক্তি চায়, তবে তাকে তথাকথিত 'নারীত্বের' কৃত্রিম খোলস মোচন করতে হবে। ... নারীকে নিজ শক্তি বুঝে নিতে হবে। পুরুষের সৃষ্ট ভ্রান্ত নারীত্বের ফাঁদ থেকে দূরে থাকতে হবে।'[৮] নারীকে জানতে হবে এই প্রকৃত বাস্তবতা যেখানে : 'নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ সে সন্তান ধারণ ও জন্ম দিতে পারে। তার গর্ভ আর শরীরকে ঘিরেই মানবপ্রজন্মের বেড়ে ওঠা এবং বংশরক্ষা।'[৯] নারী নিজের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে আত্মসচেতন হলেই কেবল আলোচ্য গল্পের কথকের মতো দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করতে সক্ষম হবে :

আমার শেষ আর্ত চিৎকারের মধ্যে, আমাকে ফুঁটো মাছ নির্ভার করে দিয়ে বেরিয়ে আসে একটি শিশু। ... হাত-পা নাড়ছে। হঠাৎ কী এক আবিষ্কারে আমি উদ্ভাসিত হয়ে জেগে উঠতে থাকি। এত অপাঙ্‌ক্তেয়, এত ক্ষুদ্র করছি নিজেকে

নিজে! নিশ্চয়ই পরিচয় তার আছে। কুয়াশার জট থেকে বেরোতে বেরোতে রোদের আলোয় শিশুটিকে উল্টেপাল্টে দেখি। বিচিত্র আনন্দের মধ্যে জিতু নয়, রায়হান নয়, শিশুটির একমাত্র জনক হিসেবে এক সময় আমি নিজেকে চিহ্নিত করি। ('জনক', ¯^ei thŠeb : ৪১)

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'বিকার' গল্পে মতি নামক চরিত্রটির আচরণের বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে অবক্ষয়পীড়িত সমাজবাস্তবতায় ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের সীমাবদ্ধ জীবন, ব্যর্থতা ও আকস্মিকতাকে শিল্পিত করে তোলার প্রয়াস লক্ষণীয়। মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে কাঁপতে থাকে মতি। এটা তার বিকার। মতি তার শ্রেণির ভেতর থেকে এই বিকারের বীজ ধীরে ধীরে ধারণ করে। একটি নির্মম খুন তাকে ভীত করে, আর বউকে কিছু দিতে না-পারার ব্যর্থতা। আবার নিজের সাইকেলের তলায় চাপা পড়ে যাওয়া এক বুড়ির মৃত্যুদৃশ্য। এসব মতিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথ জানা নেই মতির। সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তার ভাগ্যের সঙ্গে। যাওয়ার কোন উপায় নেই। মতি তার শ্রেণিগত দেয়ালকে ভাঙার স্বপ্নও দেখে। তার শহরে পড়ুয়া ভাইকে নিয়ে। সেটাও হয় না। গল্পে মতির ভাবনায় ছোট ভাইকে কেন্দ্র করে তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে এভাবে :

মতির বড় আশা ছিল শহরে থেকে ভাইটি স্মার্ট হবে। চেয়ারম্যানের ছেলের সামনে গড়গড় করে বিলেতি কায়দায় কথা বলবে। এবং তা দেখে হাঁ হয়ে থাকা মতির বুক গর্বে ভরে উঠবে। কিন্তু ছেলেটা শহুরে হতে পারল না কোনোকালে। যতবারই সে গাঁয়ে এসেছে, মতি তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে তার ভেতর। বারবারই ছেলেটি মতিকে নিভিয়ে দিয়ে সেই পুরনো কায়দায় কাপড় পড়ে মতির সামনে কাঁচুমাচু হয়ে বলেছে — ভালো আছেন ভাইজান? কলেজে পড়েও সে চেয়ারম্যানের মেট্রিক ফেল ছেলেটার সামনে গিয়ে মতির মতোই কুঁকড়ে থাকে। আরে। এই যদি তোর উন্নতি হইবো তো শহরে গিয়া কি বাল ফালাইবার লাইগা ভর্তি হইছস? মতির মতো দফতরি নয় চাষাগিরি করলেই তো হইতো। ('বিকার', ¯^ei thŠeb : ৪৯)

মতির জীবনে কোনো রেভুলিউশন নেই। শুধু ভয়। এটাই তার বিকার। তার বিকল্প আর কী-বা থাকতে পারে এহেন নিম্নবর্গের বঞ্চিত-অসহায় মানুষের সামনে। মতির এই বিকার বা তার স্বরূপ-সন্ধান আমাদের আলোচনার মূল বিবেচনা নয়। এই অসহায়-বঞ্চিত নিম্নবর্গের হতভাগ্য মানুষদের মধ্যে নারী যে আরো বেশিমাত্রায় অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ— এই সমাজসত্যটি আলোচ্য গল্পে মতির স্ত্রীর প্রতি আচরণ ও ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবনঘনিষ্ঠতার আলোকে রূপায়িত হয়েছে। গল্পটিতে মতির ভাবনার টুকরো টুকরো দৃশ্যচিত্রের অবয়বে ধরা পড়েছে নারী-জীবনের বঞ্চনা ও অধস্তন অবস্থার করুণ ভাবকল্প :

ক. অবশ্য ওর সাহসের প্রতি ওর বউয়ের আস্থা কমতে কমতে শেষাবধি শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। ঘুমোবার আগে সে নির্লিপ্তভাবে মতিকে বলে শোয়— রাইতে প্রস্রাব ধরলে আমারে ডাইক্যা তুইলেন। মতির পৌরুষের কোথায় যেন খট করে লেগে যায় কথাটায়। ('বিকার', ¯^ei thŠeb : ৪২)

Dhaka University Institutional Repository

খ. তাহেরার পা-টা প্রাণপণে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠে মতি। তাহেরা ধড়ফড় করে ওঠে। বাচ্চাটা কান্না শুরু করে দেয়। অন্ধকারে তাহেরার ভয়ার্ত গলা কেঁপে ওঠে, কী? কী হইছে? পা থেকে হাত সরিয়ে তাহেরার পাশে শুয়ে পড়ে মতি। না, খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম।

অ...। চরম অবজ্ঞা ভরা শব্দটা বেরিয়ে আসে তাহেরার গলা থেকে। সে বাচ্চার মুতের কাঁথা সরাতে ব্যস্ত হয়। তারপর বাচ্চার কান্না থামাতে থামাতে বলে, আল্লায় একখান মরদ বানাইছিল।

চুপ কর হারামজাদি। হঠাৎ মিশ্র অনুভূতির ধাক্কায় ক্ষেপে ওঠে মতি। বেশি লাই পাইয়া গেছস। এই মরদের পা চাইট্যাইতো খাইতাছস। (‘বিকার’, ¯wei thŠeb : ৪৬-৪৭)

গ. মতি হাঁসফাঁস করে ওঠে। মেঘের আড়ালে ঢেকে গেছে চাঁদ। আবার অন্ধকার গ্রাস করতে থাকে প্রকৃতি। একটু আলো চাই। ... কুপির মুখ খুলে সেখানে সরষের তেল ঢেলে দেশলাই খোঁজে। পায় না। ধুর! বউকে জিজ্ঞেস করলেই হতো। শালি উঠেই তো মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে। ... সে প্রাণপণে সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে চায়। ধুর! বউটা তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। একটু ঝগড়াঝাঁটি করতে পারলেও রাতটাকে অত ভয়াবহ লাগত না। শালি অত আপোসের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে কে জানত। (‘বিকার’, ¯wei thŠeb : ৪৭-৪৮)

মতির ভাবনার অবয়বে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজ-বাস্তবতায় নারীর উপায়হীন, অবলম্বনহীন, প্রতিবাদহীন অধস্তন অবস্থার প্রকৃত চিত্র। সারাক্ষণ নানা দুশ্চিন্তার ভয়ে ভীত, নিম্নবর্গের অসহায়-অক্ষম এক পুরুষ মতিও তার পৌরুষশক্তির প্রাবল্য অনুভব করে একমাত্র স্ত্রীর সম্মুখে এলেই। বাইরে না-পারলেও পুরুষের বীরত্ব ঘরের চারদেয়ালের অভ্যন্তরে কী-রকম প্রবল হয়ে উঠতে পারে— তা-ই বউয়ের প্রতি মতির ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। মতির এহেন ভাবনায় জারিত হয় সেই সমাজসত্য যেখানে : ‘নারী ও পুরুষকে পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, অনুশাসন একদৃষ্টিতে দেখে না। নারীর জীবন পুরুষের তুলনায় তাই অধস্তন। নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাই অসম, সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এসব কারণেই পুরুষের দ্বারা সামাজিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় নারী।’[১০] আলোচ্য গল্পগ্রন্থের ‘জঠরবন্দি’ গল্পটির পটভূমি অভাব ও দারিদ্র্যের নির্মম যাঁতাকলে পিষ্ট সমাজের নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্যাহত-বঞ্চিত জীবনের নিদারুণ অসহায়ত্ব। ন’মাসের গর্ভবতী আঙ্গুরীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে তার চিররুগ্ন স্বামী ঘর থেকে বের হয়ে আর ফেরে নি। যদিও আঙ্গুরীর স্বামীর ঘরে থাকা বা না-থাকাতে তার জীবনের নির্মম অসহায় অবস্থার কোনো হেরফের হয় না। কেননা অন্যের বাড়িতে ঠিকে ঝি-এর কাজ করে তার চিররুগ্ন স্বামীর জন্য খাদ্য ও ওষুধ-পত্র আঙ্গুরীকেই জোগাড় করতে হতো। তবুও সন্তানসম্ভবা নারীর পাশে বা ঘরে স্বামী হোক-না চিররুগ্ন, বর্তমান থাকাটাই যেন একটা শক্ত অবলম্বন। স্বামী-পরিত্যক্তা বা একাকী বসবাসরত নারীর জন্য আমাদের সমাজে নিজ বাসগৃহও অনেক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে বিপদসংকুল, সমাজের নানা ক্ষেত্রে নারীকে প্রতি পদে পদে অপদস্ত হতে হয়, এককথায় স্বামীহীনা নারী সমাজে অনিরাপদ— এ সমাজসত্যটিই আলোচ্য গল্পের অসহায় আঙ্গুরীর অবয়বে শিল্পিত হয়েছে। একইসঙ্গে সন্তান জন্মদানে নারীর ভূমিকা মুখ্য হলেও এ-বিষয়ে

সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার প্রায়শই নারীর থাকে না। নারীর কতটি সন্তান হবে, আদৌ নারী সন্তান ধারণক্ষম ও সুস্থ আছে কীনা— তাও অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারণের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় পরিবারের কর্তা তথা পুরুষ কর্তৃক। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে ন্যূনতম মনোযোগ দাবী করাও যেন নারীর ভাগ্যে জোটে না। ফলে অন্তর্গত বিষাদে নারীর জীবন হয়ে পড়ে অপাঙ্‌ক্তেয়। আলোচ্য গল্পের মধ্যে বিষয়টি এভাবে উঠে এসেছে : 'এমনিতেই চাপা স্বভাবের আঙ্গুরী। অপুষ্টিজনিত রোগে দুই ছেলের মৃত্যুর পর আরেকটি সন্তান গর্ভে — মোটামুটি দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অনেক সময়ই দু'জন অনেক জঘন্য কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। আঙ্গুরী তাকে বলেছে কুত্তার ছাও, স্বামী বলেছে বেশ্যামাগি।' ('জঠরবন্দি', ¯^ei thˇeb : ৫২) এহেন দাম্পত্যজীবনে কোনো আবেগ, ভালোবাসার সন্ধান পাওয়া যায় না। এ যেন কেবল অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই স্বামীকে সহ্য করে যাওয়া বা মানিয়ে নেয়ার সংগ্রাম। নারীর এ-ও একরকমের জীবনযুদ্ধ। অথর্ব, চিররুগ্ন ও ভালোবাসাহীন এহেন সম্পর্কের মধ্যেও নারী খুঁজে নেয় একরকমের নির্ভরতার আশ্বাস। যদিও এই আশ্বাস প্রকারান্তরে নারীর জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। তবুও এর বাইরে যাবার বা প্রথাবদ্ধ সমাজরীতিকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা নারী করতে পারে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। কেননা, এর বিরুদ্ধে যেতে চাইলেই : 'তখন বাধার প্রাচীর বানায় সমাজ-পরিবার-প্রতিষ্ঠান।'[১১] অথচ অসহায় অবস্থায় স্বামী না-ফেরা আঙ্গুরীকে সাহায্য করার লোকের অভাব সমাজে থাকলেও তার দেহকে ভোগ করার উদগ্র ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন লোকের অভাব থাকে না। তাই লক্ষণীয় :

> ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে শুয়ে ঝিম ধরে যায়। ফোলা পায়ের ধাক্কায় তিনটি হাঁড়ি ধুপ ধুপ মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায় আঙ্গুরী। বেলা পড়লে কাক আসে তির তির লাফিয়ে। ... আঙ্গুরীর পেটে হাঁ হাঁ ক্ষুধা। নেতিয়ে পড়া স্তনের হুকে হাত রাখতেই চোখে পড়ে ছায়া। চোখের মধ্যে ধাঁধা লেগে যায়। ঘোর ছায়া ছিন্ন করে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড এক কাক। কাকটির ঠোঁটে একটি কাঁঠালের টুকরা। ... এরপর যখন সন্তানের কাঁঠালের তৃষ্ণা আরো প্রবল হয়, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীর মাটির মধ্যে মিশে পড়তে চায়, তখন ঘোরে পড়া মানুষের মতো আঙ্গুরী কাতর হাত বাড়ায়— কাক ও কাক। কাকটি এসে গর্ভবতী আঙ্গুরীর পেটে তিড়িৎ লাফাতে থাকে। ('জঠরবন্দি', ¯^ei thˇeb : ৫৪-৫৫)

এভাবেই নারীকে নানাভাবে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে পুরুষ। গর্ভবতী আঙ্গুরী জঠর-যন্ত্রণায় ও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপমৃত্যু ঘটাতে। গল্পে কাকের প্রতিকল্পে যেন সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী সেইসব হীন চরিত্রের পুরুষদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের কাছে নারীর মূল্য কেবল ভোগের আত্মতৃপ্তিতে পর্যবসিত। বলা যেতে পারে যে, আসলে পুরুষ নয় বরং : 'পিতৃতন্ত্র এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীর উপর প্রভুত্ব করে, নারীর উপর নির্যাতন চালায় এবং নারীকে শোষণ করে।'[১২] আলোচ্য গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'আত্মসমর্পণ' যেখানে নেশার কাছে নতজানু হতে দেখা যায় দুই বন্ধু জাহিদ ও

প্রণবকে। নেশার ঘোর এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে এর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় ব্যক্তিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পরিবারের সুস্থিরতা সর্বোপরি মানবিক বোধের চেতনা। জাহিদের স্ত্রী রিনু সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। তবুও জাহিদ নিয়মিত প্রণবের মেসে গিয়ে গাঁজার নেশায় পড়ে থাকে। তারা ভুলে যায় চারপাশের মানুষের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে— যা তাদেরকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিলো। এরকম একটি পরিস্থিতিতে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে জাহিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে তার এতদিনকার বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী স্ত্রী রিনু। জাহিদের ভাবনা টালমাটাল হয়ে পড়ে। বিপর্যস্ত বোধ করতে থাকে সে। কেননা :

> যে রিনু তার নরম হাত দিয়ে জাহিদের গাল স্পর্শ করে, জাহিদের সঙ্গে একই খাটে শোয়, জাহিদের গলা জড়িয়ে ভালোবাসার কথা বলে, বিয়ের এক বছর না যেতেই সেই রিনু ঠিক একইভাবে সমর্পিত হচ্ছে প্রণবের কাছে? ... কেন আজ প্রণব স্বীকার করলো? নেশার ছুতোয় বিষয়টা সে কাটিয়ে যেতে পারত। তবে কি দু'জন সমঝোতায় এসে গেছে? পরিকল্পনা করেই রিনু বাপের বাড়ি গেছে?
>
> ভাবতে পারে না জাহিদ। ওর ইচ্ছে হয় থাপ্পড়ে লাল করে দেয় রিনুর গাল। রেললাইন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিশপিশ করা হাতকে অনেক কষ্টে সামলায়। ... অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে জাহিদের ভেতরটা। রিনু যদি কিশোরগঞ্জ চলে না যেত তাহলে এক হাত দেখে নিত জাহিদ। ('আত্মসমর্পণ', ¯ei thšeb : ৬১)

প্রণবের প্রতিও জাহিদের বন্ধুত্বের বিশ্বাসে ফাটল সৃষ্টি হয়। তবুও দেখা যায় একরকম আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতেই আবারো জাহিদ ও প্রণব — উভয়েই নেশার ঘোরের কাছে নিজেদের সঁপে দেয় অবলীলায়। জাহিদের ভাবনার বিচ্ছুরণে উচ্চকিত হয়ে পড়ে নারীকে অবদমনের সমাজবাস্তবতা। লক্ষণীয় যে, রিনুর প্রতি জাহিদও কম অবজ্ঞা ও অবিচার করে নি। কোনোদিন রাতে একটা দু'টোর আগে ঘরে ফিরতে পারে নি সে। হাজার কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি করেও জিততে পারে নি রিনু। পারে নি জাহিদকে নেশার ঘোর থেকে বের করে আনতে। অবজ্ঞায়-অবহেলায় রিনু যখন আপন আনন্দের জগৎ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়, জীবনকে একান্ত নিজের করে উপভোগ করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে তখনই জাহিদের পৌরুষ প্রবলভাবে ধাক্কা খায়, ফুসে উঠে এবং রিনুকে অবদমনের নিমিত্তে তার হাত নিশপিশ করতে থাকে। রিনুর গালে থাপ্পড়ে লাল করে দেবার জাহিদের উদগ্র বাসনার অবয়বে প্রতিফলিত হয়েছে এহেন সমাজসত্য যেখানে প্রথাবদ্ধ বিশ্বাস এই যে :

> অবিবেচক, হঠকারী, বিচারবুদ্ধি বিবর্জিত, ভাবাবেগ তাড়িত, অস্থিরচিত্ত নারীকে নিজ ইচ্ছায় চলতে দিলে সমাজে বিপর্যয় ঘটে যাবে। কাজেই সমাজের প্রয়োজনে নারীকে বশে রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নারীকে বশে রাখতে, নিয়ন্ত্রণে রাখতে যদি নির্যাতনের প্রয়োজন পড়ে, তবে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে, সমাজের সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনে নির্যাতন অপরিহার্য।[১৩]

জাহিদের প্রতিশোধস্পৃহা পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত এহেন সমাজবাস্তবতাকেই প্রকারান্তরে প্রমূর্ত করে তুলেছে। রিনু চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে নারীর নিজের শক্তিকে, ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নে নারীর নিজেকেই এগিয়ে

আসার অভিপ্রায়। নারীকেই সর্বাগ্রে তার অবস্থান ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সজাগ থাকতে হবে। কেননা : 'নারী যদি পুরুষের 'নৈতিকতার শিকার' হয়ে নিজ স্বাভাবিক অস্তিত্বকে হেয় করে, বিসর্জন দিয়ে থাকতে চায় তবে তার মুক্তি অসম্ভব। নারী যদি মুক্তি চায়, তবে তাকে তথাকথিত 'নারীত্বের' কৃত্রিম খোলস মোচন করতে হবে। ... একমাত্র বাস্তব, স্বাভাবিক, প্রকৃত নারী পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে যুঝে বাঁচতে পারবে।'[১৪] সচেতন ভাবনা থেকে রিনু যে প্রণবের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো তা নয়, যা কিছু ঘটেছিলো তা ঘটেছিলো স্বাভাবিকতার পথ ধরে— স্বামীর অবহেলা পেয়ে। রিনু পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য করে আত্মমুক্তির আর আনন্দের পথ নিজে নিজেই খুঁজে নিয়েছে। রিনুর অবয়বে প্রতিফলিত হয়েছে নারীর আত্মজাগরণের অভীপ্সা।

wePY Qvqv

নাসরীন জাহানের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ wePY Qvqv[১৫]— মানুষের চূর্ণ-বিচূর্ণের বৃত্তান্ত যা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উড়ুক্কু'র বহু আগেই তিনি লিখেছিলেন। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পসমূহ যথাক্রমে 'পুরুষ', 'অভ্যাস', 'সুন্দর লাশ', 'ইচ্ছাশক্তি', 'বিবসনা', 'রজ্জু', গরঠিকানিয়া', এবং 'কুকুর'। গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে : 'কিছু সিম্বল, কিছু আলো-অন্ধকারের খেলার মধ্যে মানুষের ভেতরের দ্বন্দ্ব এবং সত্যের রূপ চিনে নেয়া ও চেনানোর প্রবণতা লক্ষণীয়।'[১৬] এরই সমান্তরালে উন্মোচিত হয়েছে নারীর সামাজিক অবস্থান, নারী-পুরুষের অসম সম্পর্ক, সম্পর্কের জটিলতার নানামাত্রিক পটভূমি। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'অভ্যাস' গল্পে মানব-চরিত্রের এক বিশেষ রূপের প্রকাশ ঘটেছে। গফুর আলী তার হাঁপানি রোগে আক্রান্ত সহধর্মিণী রাবেয়াকে নিয়ে অশান্তি ও যন্ত্রণাদায়ক দাম্পত্যে রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। কোনোরকমে দিনযাপনের গ্লানি বহন করে তার সময় অতিবাহিত হচ্ছিলো। এরকম অস্বস্তিকর, অসহনীয় দাম্পত্য-সম্পর্কের জাল ছিন্ন করে জীবনে নিজ ইচ্ছা ও আনন্দের সন্ধানে একপর্যায়ে গফুর আলী রাবেয়াকে তার ভাইয়ের বাসায় পাঠিয়ে দেন। কেবল তাই নয়, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে গফুর আলী নতুন স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় দাম্পত্য-জীবন শুরু করেন। ভাবেন, এইবার তার একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি ও হতাশার অবসান ঘটবে। কিন্তু দেখা গেল একেবারে বিপরীত চিত্র। নতুন স্ত্রী সংসারের হাল ধরার পর থেকেই গফুর আলী আরো তীব্রভাবে তার প্রথম অসুস্থ ও অসহ্য স্ত্রী রাবেয়ার অনুপস্থিতি অনুভব করতে থাকেন। নতুন স্ত্রীর প্রায় প্রতিটি আচরণ ও কাজের সঙ্গে গফুর আলী রাবেয়ার তুলনা করতে থাকেন এবং আশ্চর্য যে রাবেয়ার প্রতি আনীত এতদিনকার যাবতীয় আচরণগত ত্রুটি ও অভিযোগ একপর্যায়ে তার গুণাবলি হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। গফুর আলী আত্মদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়ে অবচেতনেই পুনরায় রাবেয়ার ভাইয়ের বাসার দিকে এগিয়ে যায় এবং খুব সচেতন হাতে তার সমস্ত অপরাধবোধের পাশে শেকল দিয়ে টিনের দরজায় টোকা দিতে থাকেন। এখানেই গল্পের আখ্যানভাগের সমাপ্তি

ঘটে। তবে এরই মধ্য দিয়ে গফুর আলীর ভাবনার অবয়বে একদিকে যেমন মানব-চরিত্রের বিচিত্র স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে তেমনি নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বাস্তব চিত্রায়ণ ঘটে শৈল্পিক দক্ষতায়। গফুর আলীর ভাবনায় জারিত কতিপয় দৃশ্যপট নারী-জীবনের বহুমাত্রিক অভিধাটিকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> ক. দীর্ঘদিন রাবেয়ার সাথে সংসার করে করে নিজের আলাদা একটা জীবন, আলাদা জীবনের সুখশান্তি সম্পর্কে পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এই মোশাররফ সাহেবই তর্জনী তুলে প্রায়ই তার মিনমিনে জীবনকে খুঁচিয়ে দেখাতেন। বোঝাতেন, সামনে সমস্তটা জীবন পড়ে রয়েছে। গফুর আলীর মূল্যবান জীবনটা। এরপর থেকেই ক্রমে গফুর আলী সমস্ত রাত রাবেয়ার হাঁপানির শব্দ, রাবেয়ার বিছানায় পড়ে থাকা, মেঝেতে কলার খোসা পচতে থাকার প্রতি সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। শেষ পর্যায়ে তার নিজের মূল্যবান জীবন সম্পর্কে চরম সচেতনতাই রাবেয়াকে এই বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করল। ('অভ্যাস', ‖ePY Q¨vq : ১৭)

> খ. এর মধ্যে একদিন রাবেয়ার বৃদ্ধ বড়ভাই এসে গফুর আলীকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেললেন। বোঝালেন— বিয়ের এতবছর পর এমন একটা অন্যায় কাজ গফুর আলীর করা সাজে কিনা। তার নিজের সংসারই চলে না। এর মধ্যে অসুস্থ বোনের দায়িত্ব নেয়া কতটা কঠিন তার পক্ষে।
>
> গফুর আলী নিজেকে শক্ত করেন— আমার একটা জীবন নাই ? আমি কি তার চিকিৎসার পেছনেই আমার সর্বস্ব ঢালব? একটা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা আমার হয় না? ('অভ্যাস', ‖ePY Q¨vq : ১৮)

> গ. হঠাৎ ফোঁপানো কান্না শুনে ঘাড় উঠালেন তিনি। — আরে কী মুছিবত! কাঁদতে লেগেছে বউটি। এ রকম পরিস্থিতিতে কী করতে হয় জানেন না তিনি। রীতিমতো সমস্যাই হলো। রাবেয়ার পাশাপাশি থেকে এ ধরনের দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হয় নি তাকে। তাকে চুলে ধরে চড়-লাথি দিলেও সে পাথরের মতো থেকেছে। ঘণ্টাখানেক পরে তার চোখ ফোলা দেখলে তবে তিনি বুঝতে পারতেন মহিলাটি কেঁদেছে। গফুর আলী সেসব চোখ ফোলাকে আমল দেন নি কখনো। রাবেয়াও সেসব আমলের ধার না ধেরে সহজভাবে কথা বলেছে গফুর আলীর সাথে। এসবও যে একজন মহিলার গুণ হতে পারে, এদ্দিনে যেন বুঝতে পারলেন তিনি। ('অভ্যাস', ‖ePY Q¨vq : ২১-২২)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে নারীর সামাজিক অধস্তন অবস্থা, নারীর প্রতি সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীকে অবদমনের প্রথাবদ্ধ সামাজিকীকরণের প্রাহসনিক স্বরূপটি সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গে শিল্পিত হয়েছে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টিকে অতি সাধারণ ব্যাপার হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সেখানে ঘরে অসুস্থ স্ত্রী থাকা তাই পুরুষের দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণের জন্য একটি যুৎসই যৌক্তিক কারণ হিসেবেই পরিগণিত হবে, এতে বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। এভাবেই নারীর মানবিক সত্তার অমর্যাদা ও অবমূল্যায়ন ঘটে চলেছে। তাছাড়া সমাজে নারীর নিজস্ব কোনো ভুবন নেই। কেননা রাবেয়ার বৃদ্ধ ভাই ও স্বামী— উভয়ের সংসারেই সে রীতিমতো বোঝা হিসেবে বিবেচিত। রাবেয়ার পৃথক মানবিক সত্তা উভয় ক্ষেত্রেই অস্বীকৃত ও উপেক্ষিত। কেননা : 'যদিও নারীর দৈহিক মেহনতের পরিমাণ পুরুষ অপেক্ষা বেশি; কিন্তু তবু নারীকে নিষ্কর্মা, পরগাছা মনে করা হয়। তাকে সর্বতোভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল মনে করা হয় এবং তার পৃথক অস্তিত্ব

স্বীকার করা হয় না।'[১৭] নারী নিজের জন্য কাজ করে না; সে কাজ করে স্বামী, সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্য। এমনকি নারীর মধ্যে সমাজ প্রত্যাশা করে সবকিছু মেনে নেয়ার ও মানিয়ে চলার অধস্তন মানসিকতা। আলোচ্য গল্পের রাবেয়াও তাই স্বামী গফুর আলীর নির্যাতনকে অবলীলায় মেনে নিয়েছে। কেননা : 'ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও সংস্কার নারীর মধ্যে হীনমন্যতা সঞ্চার করেছে, সে নির্যাতনকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। নারী মনে করে যে, স্বামীর কাছ থেকে প্রহার তার প্রাপ্য।'[১৮] তাছাড়া রাবেয়াকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করার পেছনে গফুর আলীর সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাও অন্যতম যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গল্পটিতে। নারী কেবল বংশরক্ষার বাহন হিসেবেই মূল্যায়িত হয় পরিবারে, সমাজে— এ সমাজসত্যটিও এখানে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। নারীর গুরুত্ব সংসারে এতটুকুই যে সে সন্তান জন্ম দিবে, বংশরক্ষা করবে আর আজ্ঞাবহ হবে পুরুষের যাবতীয় ইচ্ছার বাহন হিসেবে। এভাবেই আমাদের সমাজবাস্তবতায় : 'পুরুষ নারীকে শুধু সন্তান জন্মদানের যন্ত্র মনে করেই শারীরিক আনন্দ পেয়ে তৃপ্ত হয়, নারী আনন্দ পেল কী পেল না তা লক্ষ করে না।'[১৯] আলোচ্য গল্পের রাবেয়া চরিত্রের অবয়বে এভাবেই বিধৃত হয়েছে সমাজে নারীর নানামাত্রিক জীবন-যন্ত্রণার বাস্তবচিত্র। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'সুন্দর লাশ' এবং 'ইচ্ছাশক্তি' গল্পদ্বয়ে নাসরীন জাহান মানবচিত্তের গহীনে আলো ফেলে তার বিচিত্র পরিসর ও এর কার্যকারণ সম্বন্ধকে প্রাত্যহিকতার নানা অনুষঙ্গে রূপায়িত করেছেন। আমাদের যাপিত জীবনের মধ্যেই যে : 'আরও নানান দেখবার ও বুঝবার দিক আছে তা নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি'[২০] আলোচ্য গল্পগুলোর পটভূমিতে। 'সুন্দর লাশ' গল্পে সুশান্ত এবং জিনাতের দাম্পত্য-জীবনের বিচিত্র টানাপোড়েনের অবয়বে নারী-জীবনের নানামাত্রিক প্রকাশ লক্ষণীয়। একদিন ঘরের সামনে পড়ে থাকা একটি সুদর্শন যুবকের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে সুশান্ত ও জিনাতের বহুমাত্রিক চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে তাদের অসুখী দাম্পত্যের চিত্রটি বিধৃত হয়ে পড়ে। একসময়ে জিনাতের অদম্য সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো সুশান্ত। কিন্তু একপর্যায়ে জিনাতের এই সাহসের আধিক্য তাদের দাম্পত্য-সম্পর্ককে নড়বড়ে করে সুশান্তকে রীতিমতো হাঁপিয়ে তোলে। অন্যদিকে বিরূপ প্রতিবেশে বেড়ে ওঠা জিনাতও পুরুষদের, মানুষদের কঠিনভাবে চিনতে চিনতে এমন হয়ে ওঠে যে কোনো পাখি, কোনো জ্যোৎস্না রাত তাকে এক মুহূর্তের জন্য আর স্পর্শ করতে পারে না। সুশান্তর মধ্যে সাহসী পুরুষের যে অস্তিত্ব জিনাতকে পুরুষ সম্পর্কে নতুন ধারণা দেয় এক পর্যায়ে বিয়ে পরবর্তী জীবনে সেই সুশান্তর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন জিনাতকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে দেয়। কেননা :

> আমি কাপের চায়ে চিনি নাড়তে নাড়তে ওসমানের কথা ভাবি। সুশান্তর আরেকটি অস্তিত্ব। ওসমান বিদেশ চলে গেলে সুশান্ত পাগলের মতো হয়ে ওঠে। ওর সেই বিপর্যয়ের সময় আমি এগিয়ে যাই। ও বললো, তোমার ভেতর একটা পুরুষালী বলিষ্ঠতা আছে বলেই আমি তোমাকে বিয়ের কথা ভাবছি।

> তারপর যতই আমি ওর ঘনিষ্ঠ হই ততই চমকে উঠি। ওসমান নামের অদৃশ্য পুরুষ আমাদের দেয়াল হয়ে যায়। আমি ধীরে ধীরে জানি, একজন মহিলার চেয়ে একটা সুন্দর পুরুষের সান্নিধ্য ওকে অনেক বেশি আন্দোলিত করে। ... প্রতিদিন নতুন করে ওর পৌরুষের আড়ালে কাপুরুষতা দেখে দেখে ঘেন্নায় দমবন্ধ হয়ে এসেছে আমার। তার যা পৌরুষ ছিল, তা ওসমানকে কেন্দ্র করেই। ... তার পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আমি হাজার নদী আগুনের মধ্যে নিজেকে প্রায়ই সমর্পণ করি। ('সুন্দর লাশ', ‡ePY Qvqv : ৩০)

পাঠকের বুঝতে কষ্টকল্পনা করতে হয় না যে সুশান্ত নামের এক সাহসী পুরুষ, যে আসলে প্রকৃতপক্ষে সমকামী, তার সঙ্গে জিনাত নামের নারীটি এক অব্যক্ত গ্লানি নিয়ে দাম্পত্যজীবনের বোঝা বয়ে ক্রমাগত নিজেকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। ঘরের সামনে পড়ে থাকা সুন্দর যুবকের লাশ তাই সুশান্তকে পুনরায় ওসমানের স্মৃতিকাতরতায় আক্রান্ত করে এবং নিজের বিকৃত পৌরুষশক্তির কাছে তার পরাজয় ঘটে। পরাজয় ঘটে জিনাত নামক মেয়েটিরও। যে দিনের পর দিন এহেন দাম্পত্যকে টেনে নিয়ে ক্রমাগত নিজের মানবিক সত্তাকে অবমুল্যায়ন করেছে। বলা যেতে পারে নারী এভাবেই : 'অধিকারবোধের চাইতে কর্তব্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেকে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট করে। ... নৈতিক সঙ্কটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী যে দিকটিকে বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেয় পুরুষ তা বিবেচনা করে না কারণ নারীর অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষিত পুরুষের চাইতে ভিন্ন।'[২১] নারী-পুরুষের বিষম সম্পর্ক মূলত কীভাবে নারীর জীবনকে বিপন্ন করে তোলে, সঙ্কটের সেই প্রসঙ্গই আলোচ্য গল্পে জিনাতের বঞ্চিত জীবনের অবয়বে জীবনঘনিষ্ঠভাবে শিল্পিত হয়েছে। আমাদের চারপাশে এমন হাজারো জিনাত নিজ জীবনের তিক্ততাকে সম্বল করে অসহনীয় দিনযাপনের গ্লানিকর দাম্পত্য-সম্পর্কের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে নীরবে, নিভৃতে। 'ইচ্ছাশক্তি' গল্পের পটভূমি ইসকান্দার আলী নামক এক বৃদ্ধের অমিত জীবনীশক্তি যা বার বার তাকে প্রায় মৃত্যুর দরজা থেকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এই বৃদ্ধ ফুটো পয়সা দিয়ে জীবন শুরু করে জমির পর জমি বাড়িয়েছেন। এই বিশাল জীবনে বহুবারই তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রবল ঝড়ের মধ্যে লঞ্চডুবি হয়ে প্রায় মরতে বসেছিলেন, কিন্তু মরেন নি। বহুবার প্রাণ যায় যায় অবস্থা, বাড়ি ভরে গেছে লোকজনে, তার অশিক্ষিতা মেয়ের বিলাপে বহুবার এই বাড়ির বাতাস ভারি হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে শব্দ করে ইসকান্দার আলী তার বেঁচে ওঠার বার্তা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেই মানুষই কোনো এক বৃহস্পতিবার রাতে কী এক স্বপ্ন দেখে বাঁচার আশা ত্যাগ করেছেন। তাকে শেষবার এক নজর দেখার অভিপ্রায়ে পুরো বাড়িতে লোকজনে সরগরম হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পে এরকম একটি আবহে দৈনন্দিন জীবনের নানা টুকিটাকি চিত্র, স্বার্থপরতা, সম্পর্কের জটিলতা প্রভৃতি অনুষঙ্গ বাস্তবতার নিরিখে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। এরই সমান্তরালে গল্পে ইসকান্দার আলীর ছেলে মেয়েদের নানামুখী আচরণে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে সমাজে নারীর প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতার অবয়বটি। গল্পের মধ্য থেকে দুটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

ক. মেয়ে তিসির তেল দিয়ে খামোকা মালিশ করে। এতে ইসকান্দার আলীর কষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়। মেয়েটি দরিদ্র। জমিজমাসহই বিয়ে দিয়েছিলেন। জামাই বেচে খেয়ে ফেলেছে। এখন পিতাই তার ভরসা। মুখের কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। কাজে-অকাজে পিতার কাছে মতিকে বসিয়ে রাখে। ওইটুকুন পুঁচকে ছেলেকে দিয়ে নানার হাত-পা টেপায়। ('ইচ্ছাশক্তি', ‖ePY Q√q√ : ৩৭)

খ. ইসকান্দার আলী ঝাপসা আলো-আঁধারি ঘরে, ভয়ানক ভগ্ন কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলেন, আমি সব আছিয়ারে লেইখ্যা দিমু। বিদ্যুতের মতো খাড়া হয় স্ত্রী। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে বৃদ্ধের দিকে। নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগে। দীর্ঘ সময় কেটে গেলে সে বৃদ্ধকে চাপা কণ্ঠে জানায়, নিজের সম্পত্তি অন্যের হাতে তুইল্যা দেবেন? আছিয়া কি এই বাড়ির সন্তান? দুই দিন পরে সে অন্য বাড়ির হইব না? বুড়াকালে ভীমরতি ধরছে? ('ইচ্ছাশক্তি', ‖ePY Q√q√ : ৪১)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে উন্মোচিত হয়েছে নারী-জীবনের বঞ্চনার এক বিশেষ মাত্রা। নারীর কোনো নিজস্ব বাড়ি বা গৃহ তথা আশ্রয় নেই। পিতা, স্বামী বা পুত্রের পরিচয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হয়। তাই দেখা যায় ইসকান্দার আলীর মেয়ে স্বামীর অন্যায় আচরণের বিরোধিতা করা দূরে থাক বরং পিতার কাছে সহায়তা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার মধ্য দিয়ে নিজের অসহায়ত্বকেই মূর্ত করে তুলেছে। পিতার কাছ থেকে বিয়ের সময়ে প্রাপ্ত জমিজমার উপর তাই ইসকান্দার আলীর মেয়ের কোনো অধিকার থাকে না। এমনকি স্বামী সব বেচে খেয়ে শেষ করে ফেললেও তাকে পুনরায় পিতার গৃহেই ভরসার সন্ধানে আসতে বাধ্য হতে হয়। এভাবেই পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজবাস্তবতায় : 'সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি মানবজীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে নারী অদৃশ্য ও নির্বাসিত।'[২২] আবার ইসকান্দার আলী তার শেষ বয়সের সন্তান, শিশু কন্যা আছিয়া, যার জন্ম ইসকান্দার আলীর শেষ পুত্রের জন্মের দীর্ঘ আঠারো বছর পর এবং যার কারণে অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে ইসকান্দার আলীর এক ধরনের তিক্ততা তৈরি হয়েছে, সেই শিশু কন্যা আছিয়াকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেবার প্রস্তাব শুনে ইসকান্দার আলীর স্ত্রী হতচকিত হয়ে পড়ে। কারণ একটাই যে, আছিয়া কন্যা শিশু, একপর্যায়ে বিয়ের পরে অন্যের দখলে চলে যাবে। তাই শিশুটির জন্মদাত্রী মা-ও এর বিরোধিতা করে। আসলে :

নারী পুরুষতন্ত্রের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে নারীর দ্বারা নারী নির্যাতিত হয়। পুরুষতন্ত্রের কারণে নারীর ভাবনা মূলত হয়ে পড়ে পুরুষেরই ভাবনা। পুরুষের ভাবনার ছকেই তখন নারীর জীবন আবর্তিত হয়। বিশেষ করে আধুনিক চিন্তাচেতনার দ্বারা দীক্ষিত নয় যে নারী, তার পক্ষে কখনই বিকল্প কিছু ভাবা সম্ভব নয়।[২৩]

স্বাভাবিকভাবেই তাই আছিয়া নামক শিশুকন্যার প্রতিপক্ষে তার আপন জননী ইসকান্দার আলীর স্ত্রীর ভূমিকাটি প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতায় নারীর বিড়ম্বিত জীবনের ইতিবৃত্তকেই প্রতিবিম্বিত করে তোলে। আলোচ্য গ্রন্থের 'বিবসনা' এবং 'রজ্জু' গল্পদ্বয়ের পটভূমি অনেকটা প্রায় একই বিষয়কে উপজীব্য করে বিবৃত হয়েছে। অসহ সময়-প্রতিবেশে ব্যক্তিমানুষের ভেতরকার দ্বন্দ্ব-সঙ্কটের বিচিত্র টানাপোড়েনের শিল্পভাষ্য যেন গল্পগুলো। সমাজ, তার বিচিত্র প্রথাবদ্ধ জীবনাচরণ, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ধর্মবোধ ও ধর্ম সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণার

জটিলতা ব্যক্তিজীবনকে কীভাবে দুমড়ে মুচড়ে অন্তঃসারশূন্য করে তার মানবিক সত্তার অবমূল্যায়ন করে— তারই বাস্তবচিত্র গল্পের অবয়বে উন্মোচিত হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে অবহেলিত, নিষিদ্ধ অথচ সমাজস্বার্থে ব্যবহৃত নারী-জীবনের এক করুণ-বিবর্ণ ও অব্যক্ত ব্যর্থতার জীবনঘনিষ্ঠ রূপটি উন্মোচিত হয়েছে সমাজসত্যের অনুষঙ্গে। উভয় গল্পেই নিষিদ্ধ জগতের রমণী যাদের সমাজ মানবিক অধিকার দিতে তৈরি নয় অথচ নিজ প্রয়োজনে সেই সমাজগর্হিত নারীকেই স্বার্থসিদ্ধির উপায় গণ্য করে তেমনই দুই রমণীর পরিচয় শিল্পিত হয়েছে। 'বিবসনা' গল্পে হোসেন আলী, মাত্র বাইশ কী তেইশ বছর বয়সেই যাকে গ্রামের মানুষের প্রত্যেকটা মিলাদে ডাকা অপরিহার্য ব্যাপার, অতি ধর্মপরায়ণ এক যুবক কীভাবে ধর্মের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অতিক্রম করে সমস্ত সংস্কার-দ্বন্দ্বের পাশ কাটিয়ে জৈবিক তাড়নায় নিজের সুতীব্র কামের নিবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে গ্রামের সকলের দৃষ্টিতে নষ্টা ও খারাপ মেয়ে হিসেবে পরিচিত তৃষ্ণা বেশ্যার দ্বারস্থ হয়েছে— তারই চালচিত্র রূপায়িত হয়েছে। অন্যদিকে 'রজ্জু' গল্পেও চাঁদউদ্দিন নামে সাতচল্লিশ বছর বয়সের এক ব্যক্তি, যিনি নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতার পায়ে রশি পড়াবেন না এই প্রত্যয়ে বিয়ে থা পর্যন্ত করেন নি এমনকি নারীবিষয়ক ভাবনা যাকে বিচলিত করতে পারে না, তিনিই কীভাবে শেষপর্যন্ত জনৈক পতিতার কাছে, নিজের কামনার কাছে নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন— তারই আদ্যোপান্ত কাহিনির অবয়বে বিধৃত হয়েছে। উভয় গল্পেই হোসেন আলী এবং চাঁদউদ্দিন নামক ব্যক্তিদ্বয়ের চিত্তের সঙ্কট, দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনের পশ্চাতে কাজ করেছে তথাকথিত সামাজিকীকরণ, প্রথাবদ্ধ সংস্কারের দেয়াল। ধর্মবোধ, সমাজ, সংস্কার এগুলো যথার্থভাবে অনুধাবনের যৌক্তিক বিবেচনা করতে না-পারার অজ্ঞতাই ব্যক্তির মনে সৃষ্টি করে নৈতিকতা-অনৈতিকতা দ্বন্দ্ব-সঙ্কট। প্রচ্ছন্ন বোধের দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিচেতনা সময় ও সুযোগ বিশেষে নিজের অসারতার উন্মোচন ঘটায়। ফলে হোসেন আলী ও চাঁদউদ্দিন উভয় পুরুষই সমস্ত প্রথাবদ্ধ সংস্কারের অবদমিত অবস্থা থেকে ঘটনাক্রমে ছিটকে বেড়িয়ে নিপতিত হয়েছে নিষিদ্ধ রমণীর সান্নিধ্যে। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচিত্তের সংকট, অন্তঃসারশূন্য সংস্কার-প্রবণতা তথা অসহ সময়ের সমান্তরালে উন্মোচিত হয়েছে এক সামাজবাস্তবতা— যেখানে নারী পতিতা হয়ে যায়। বেশ্যা পরিচয় ধারণ করে সমাজে নিগৃহীত ও ঘৃণিত জীবনযাপনের গ্লানিকে আত্মস্থ করে নিতে বাধ্য হয়। সমাজে সেইসব নারীর জন্য কোনো সম্মান বা আশ্রয় থাকে না এমন কি সমাজের সকল স্তরেই পতিতা নারীর অনুপ্রবেশ সঙ্কুচিত করা হয়। সমাজ থেকে পতিতা নারীর মানবিক অবস্থান যোজন যোজন দূরত্বে থাকলেও :

> সমাজ ঠিকই থাবা বাড়ায়। তারা পলাতক নয় পরিত্যক্ত। তবু ব্যবহার্য। তারা সমাজে না থাকলেও সমাজ তাদের কাছে আসে, কখনো সন্ধ্যার অন্ধকারে, কখনো দিনের আলোয়। হয় তাদের ধর্ষণ করতে নয় শাসন করতে। যতই অপাঙ্‌ক্তেয় ও অশুচি হোক না কেন বিশেষ স্বার্থে সমাজ তাদের ব্যবহার করে, কোনোভাবেই সমাজ তার শাসনের অধিকার ছাড়তে চায় না।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

গল্পদ্বয়ের কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য :

> ক. হোসেন আলী ছুটতে ছুটতে কোনোকিছু চিন্তা না করেই একটা বেড়ার ছোট খুপড়িতে উপস্থিত হয়। তারপর সেই ছায়া অন্ধকার দরজায় শরীরের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আঘাত করে। দরজা খুলে দিয়ে তৃষ্ণার চোখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আসে। বিস্ময় কেটে যাওয়ার পর সহজ রমণীটি হোসেন আলীর চোখ থেকে পাঠশোলার বেড়াটি সরিয়ে নেয়। সরিয়ে নেয় ত্যানার মতো ল্যাপটে থাকা পাতলা আবরণটিও। বেড়াটি, আবরণটি অন্তর্হিত হওয়ার পর পরই হোসেন আলী আশ্চর্যজনকভাবে উপলব্ধি করে— তার এতদিনকার দ্বন্দ্ব, কৌতূহল, মানসিক যন্ত্রণা কর্পূরের মতো হওয়ায় উবে যাচ্ছে। মৃত্যুর মতো চেপে বসা দেহের এক অলৌকিক ভার এক গভীর গহ্বরে ঢেলে অন্য এক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে হোসেন আলী নিঃসাড় হয়ে ওঠে। ('বিবসনা', wePY Qvqv : ৫০)

> খ. উঠে বসে চাঁদউদ্দিন। এমন লাগছে কেন? নিজের শরীরের ভার নিজের কাছে এত প্রচণ্ড হয়ে উঠছে কেন? ... সিঁড়ির নিচে রমণীর ছায়া। কেঁপে ওঠে চাঁদউদ্দিন। মেয়েটা ঘরে এলে চাঁদউদ্দিন পুনরায় কেঁপে ওঠে। পৃথিবীর সমস্ত কুৎসিত রূপ এখানে এসে থেমে গেছে। ... ওকে হাঁ হতে দেখে সতীনাথ সহজ কণ্ঠে বলে ওঠে — হাঁ হয়ে গেলি যে? আরে অন্ধকারে অত রূপ-টোপের প্রয়োজন পড়ে না। সব এক। ... কথা না বলে চাঁদউদ্দিন দ্রুত ঘরে ঢুকে সুইচ অফ করে দেয়। সতীনাথ বলেছিল, অন্ধকারে সব এক। কী এক ক্রোধ এবং ঘোরের মধ্যে পড়ে মেয়েটিকে আক্রমণ করে সে। ('রজ্জু', wePY Qvqv : ৫৭-৬০)

পুরুষ এভাবেই নারীর শরীরকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে, সমাজে নারীর মূল্য ও অবস্থান নির্ণিত হয় পুরুষের মর্জি ও চাহিদার অনুপাতে। নারীর মানবিক সত্তাকে ভূলুণ্ঠিত করে সমাজ : 'নারীর জীবনকে এমন একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে দেয় যে নারী সেই বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে। নারীর আর্থ-সামাজিক জীবন সীমাবদ্ধ বা শূন্য হয়ে পড়ে, পরিসর যায় সংকুচিত হয়ে।'[২৫] আলোচ্য গল্পদ্বয়ে নারীর ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের সেই তিক্ততম অধ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। মানবজীবনের এক বিশেষ প্রবণতা এই যে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদার মাপ মতো কোনো কিছু পেয়ে যাওয়ার পরে প্রাপ্তির আগেকার দুর্বার কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষার অনেকটাই কখনো কখনো উবে যায় কর্পূরের মতো। এ যেন অনেকটা এরকম : 'স্বপ্নে দেখার সময়টাতে যে সুখ ছিলো, কাজে খেটে গেলেও সেই স্বপ্ন আর সুখের কাঙ্ক্ষিত সন্ধান দিতে পারে না।'[২৬] আবার অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ধর্মবোধের যথার্থ স্বরূপটি অনুধাবনে অসমর্থ মানবহৃদয় ধর্মবোধের ভ্রান্ত ধারণায় মানবতাবোধের চরম অবমূল্যায়ন করে থাকে। ধর্ম মানুষকে প্রেমের পথে, শান্তি ও শৃঙ্খলার পথে, সর্বোপরি মানবতার মহানুভবতার দিকে চালিত করে। কিন্তু তথাকথিত সামাজিকীকরণের অজুহাতে ব্যবহৃত ধর্মবোধ কখনো কখনো মানবতার চরম বিপর্যয় ঘটিয়ে থাকে— এরকম একটি ভাবকল্প আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'গরঠিকানিয়া' গল্পের উপজীব্য। গল্পটি কাদের আলি ও পদ্মিনীর প্রেম ও পরিণয়ের আখ্যান, পদ্মিনী কীভাবে আয়েশা হয়ে উঠলো তার বৃত্তান্ত, পদ্মিনীর প্রতি কাদের আলির হৃদয়ে প্রেমের স্থলে সহিংসতার আগুন জ্বলে উঠবার ইতিবৃত্ত এবং পদ্মিনী তথা

আয়েশাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ভুলক্রমে নিজ সন্তান আকবর আলির মর্মান্তিক মৃত্যুর করুণ অবয়বে শিল্পিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই নারীর হৃদয়বৃত্তির এক বিশেষ মাত্রার উন্মোচন লক্ষণীয়। যে পদ্মিনীর অসাধারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজের ধর্ম ও ধর্মবোধকে উপেক্ষা করে ভালোবাসার প্রবলতায় কাদের আলি হিন্দু মেয়ে পদ্মিনীকে পরিবার, সমাজ সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে স্ত্রী করে এনেছিলো, ঘটনাক্রমে সেই পদ্মিনী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আয়েশা হয়ে উঠবার পরে এই আকবর আলিই ধর্মবোধকে মানবতার চেয়েও অনেক বড় করে দেখতে শুরু করে। গল্পে বিষয়টি বিধৃত হয়েছে এভাবে :

> মুহূর্তের মধ্যে বেহেশতের হুরির লোভ, দোযখের ভয় সব সরে গিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব অসাড় করে রেখেছিল একটাই অনুভব— এই নারীকে তার চাই। এ না হলে জীবনের সবকিছু অর্থহীন। ... এক সন্ধ্যায় কাদের আলি পদ্মিনীকে বিয়ে করে এই বাড়ির দরজায় পা রাখল। ... একসময় পদ্মিনীকে নিজের কব্জায় পাওয়ার উত্তেজনায় কাদের আলির সর্বাঙ্গের আগুনে ঝিম ধরে, এই স্বপ্নের পরী তার আয়ত্বে, কোনো রাজপুত্রের সাথে এজন্যে তাকে যুদ্ধ করতে হয় নি, প্রচুর অর্থ খরচ হয় নি, ধানচালের কারবারি তাগড়া দেহের অধিকারী সে, যথেষ্ট যৌতুক সহকারে বিবাহ করতে পারত, আফসোস এইটুকুই। ... একটা হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করে সে বেহেশতের একটা শেয়ার কিনেছে। ... রক্ত মাংসে আয়েশা হয়ে উঠতে থাকা এই নারীকে কাদের আলী নতুন সৌন্দর্যে আবিষ্কার করতে শুরু করে। (‘গরঠিকানিয়া’ ׀׀ePY Q¨q¨ : ৬৩-৬৪)

কাদের আলির মনে আয়েশাকে নিয়ে সমস্ত উত্তেজনা, আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটলেও পদ্মিনী তথা আয়েশার চিত্তের সঙ্কটের কালো মেঘ তখনোও কেটে যায় নি। কেননা :

> অল্প পুণ্যে কত বড় প্রাপ্তি বেহেশতে ঘটবে। অল্প পাপে কী ভয়ানক দোযখ...। এইসব বলে বলে যখন মেয়েটাকে প্রাণের মধ্যে চেপে ধরেছে, একদিন সেই মেয়ে বড় আজব প্রশ্ন করে, আমি মুসলমান না হইলে আপনি আমারে বিয়া করতেন? কী? কী কইলা তুমি? দুইজন দুই ধর্ম নিয়া এক সংসারে? কী কইলা তুমি? তুমি হিন্দু হইলে ... হেঃ হেঃ তাইলে তো বিয়াই জায়েজ হইতো না, কাজি বিয়া পড়াইতো না। কী এক গভীর নিঃসীমে তলিয়ে গিয়েছিল পদ্মিনী। (‘গরঠিকানিয়া’ ׀׀ePY Q¨q¨ : ৬৪)

পদ্মিনী যদিও কোনদিন তার অতীত জীবন, তার ধর্ম নিয়ে কোনো রকমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি কিংবা তাকে কাদের আলী কখনো এসব নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে নি। কেননা পদ্মিনীর কাছে ইহকাল, পরকাল— সবকিছুই কাদের আলি। ধর্মবোধ পদ্মিনীর মানবতাবোধকে প্রচ্ছন্ন করতে পারে নি। কিন্তু কাদের আলির ধর্মবোধের স্বার্থান্বেষী অনুভব পদ্মিনীকে একেবারে ভেঙেচুড়ে বিদীর্ণ করে তোলে। ভেতরে ভেতরে দমে যায় সে। এক অব্যক্ত বেদনায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে তাকে অনুভূতিহীন করে তোলে। তার চিত্ত দ্বন্দ-সঙ্কটে আকীর্ণ হয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। শেষ পর্যায়ে কাদের আলির সহিংস উন্মত্ততার নিকট মানবতার পরাজয় ঘটে। পরিণামে কাদের আলি ও পদ্মিনীর ভালোবাসার প্রতীক একমাত্র সন্তান আকবর আলির

হত্যাকাণ্ড তার জন্মদাতার হাতেই সংঘটিত হয়। পদ্মিনী এক অসহায় মা, বিপর্যস্ত নারী— যে মানবতার কাছে ধর্মবোধকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলো, সে-ই ধর্মবোধের ভ্রান্ত জিঘাংসার বলি হয়ে পড়ে। সন্তান হারিয়ে, মানবতার অপমৃত্যুতে পদ্মিনী যেন স্বার্থবাদী ধর্মবোধের যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া এক ক্ষত-বিক্ষত চিত্তের প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'কুকুর'। গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র জনৈক 'মেয়েটি'র অবয়বে অভাব-দারিদ্র্যের নির্মম যাঁতাকলে পিষ্ট নারীর বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে নিজের দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া, রাতের নির্জনতায় অনিরাপদ রাস্তাঘাট এবং ঘরে-বাইরে নারীদেহ লোভী সুযোগ-সন্ধানী কুকুররূপী মানুষের পাশবিকতার শিকারে বিপর্যস্ত নারী-জীবনের করুণ ইতিবৃত্তটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই নারীর উপায়হীন অসহায়ত্বের চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

> মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তীব্রতায়ই সে নিঃশব্দে অথচ দ্রুত পথ চলছে। ... প্রয়োজনের তীব্রতায়ই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। যখন বেরিয়েছিল, তখন চারপাশের প্রকৃতি আলোকোজ্জ্বল কী অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। এতক্ষণ শুধু কুকুরকে ভয় করছিল। রাত্রির ভয়টা তীব্র ছিল না। এখন ভয় করছে রাত্রিকে। ... কৈশোরে একবার কুকুরের পাল্লায় পড়েছিল সে। শরীরে এখনো গভীর ক্ষত রয়েছে। মেয়েটি কাঁপতে থাকে। ... বড় রাস্তায় শূন্যতার দিকে চেয়ে মেয়েটির নিজের বুকের শূন্যতার কথা মনে পড়ে। ... ক্ষতের তীব্র যন্ত্রণায় কত দুঃসহ সময় অতিবাহিত হয়েছে মেয়েটির। একটি ডালপালা মেলে বাড়তে থাকা কিশোরী সেই ক্ষতের মর্মান্তিক গভীরতার জন্য কতদিন উবু হয়ে পথ চলেছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এখনো কি সে পুরোপুরি সোজা হয়ে হাঁটতে পারে? চোখ উপচে জল আসার উপক্রম হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তীব্রতার কাছে আবারো তার ভয়ার্ত অনুভূতি পরাজিত হয়। মেয়েটি প্রায় দৌড়তে থাকে। ('কুকুর', wePY Qvqv : ৬৭-৭০)

ক্ষুধার কারণে জঠর যন্ত্রণায় কাতর মেয়েটিকে তাই পথে নামতেই হয় নিজ দেহকে পুঁজি করে। মধ্যরাতের নির্জন ভয়াবহতার মধ্যে কুকুরের ভয়কে স্বীকার করেই মেয়েটির বেঁচে থাকার তথা টিকে থাকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। সমাজ নারীর সামনে আর কোনো পথই উন্মুক্ত রাখে নি। নারী নিয়ে রং তামাসা করা, নারীদেহ লোভী কুকুররূপী পুরুষের বিকৃত বীভৎসতার বলি হয় নারী । ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতির বিনিময়ে বাংলাদেশের জন্য অর্জিত স্বাধীনতার অর্থহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রাহসনিক দিকটিও আলোচ্য গল্পের মেয়েটির উপায়হীনতার অবয়বে মূর্ত হয়েছে জীবনঘনিষ্ঠতার আলোকে। মেয়েটির উপায়হীন অসহায়ত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই চরম সমাজবাস্তবতা : 'টাকাওয়ালা মানুষের জন্য শহর-নগর হচ্ছে অভীষ্টিত সেই স্বর্গ যেখানে পয়সার বিনিময়ে নারীকে পণ্যের মতোই খুব সহজে বেচা-কেনা যায়।'[২৭] সমাজ ব্যবস্থার অসম ভঙ্গুর পথে চলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নারী হারিয়ে ফেলে তার মানবিক সত্তার ন্যূনতম অধিকার। লক্ষণীয় :

> মেয়েটি আর হাঁটতে পারে না। কেননা কুকুরের পাশাপাশি রাতও তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। মেয়েটি দু'হাত ওপরে তুলে রাতকে, কুকুরকে প্রতিহত করার নিষ্ফল চেষ্টা করে। মেয়েটি আর হাঁটতে পারে না। তার গলা অব্দি রাস্তার ক্ষতের মধ্যে ঢুকে যায়।
>
> মেয়েটি ধূসর চোখে দেখে— সুন্দর ফুলগুলো, এতক্ষণ যারা নৃত্য করছিল, বিস্ময়ে চেয়ে আছে। এবং স্বপ্নের পায়রা-বাড়িটি শুভ্র ডানা মেলে শূন্যের ওপর উঠে পড়েছে। মেয়েটি ধূসর চোখে দেখে— অসংখ্য কুকুরের ঘেউঘেউ, অসংখ্য রাত্রির অন্ধকার আক্রমণ এবং অসংখ্য মশার গুনগুনের মধ্য দিয়ে তার কোঁকড়ানো চুলও ক্ষতের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। মেয়েটির শেষ চুল বিন্দু একসময় নগরের সেই ভয়ঙ্কর চোরাবালির মধ্যে ডুবে যায়। ('কুকুর', wePY Qvqv :৭১)

মেয়েটির অসহায়ত্ব ও উপায়হীনতার সুযোগ নেয়া তথাকথিত এইসব কুকুররূপী পুরুষের নির্মম পাশবিকতার চিত্রটি পাঠককে এই সমাজসত্যের মুখোমুখি করে তোলে যেখানে : 'আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ও বহুবিচিত্র মনে হলেও তা নারীর উপর পুরুষের নির্যাতনের একটি কাঠামো মাত্র।'[২৮]

c_, †n c_

নাসরীন জাহানের সারাজীবনের আরাধ্য সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন থাকা। সৃষ্টির অদম্য অনুপ্রেরণায় নাসরীন জাহান : 'অনুবাদ সাহিত্যে পৃথিবীর আপসহীন শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই নিবেদিত সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে নিজেকে সেই পথে ধাবিত করতে কয়েকশ গল্প থেকে বাছাই করে লিখলেন, পাঁচটি গল্পগ্রন্থ।'[২৯] যার মধ্যে একটির নাম c_, †n c_[৩০]। গল্পগ্রন্থটি পড়ে শুভার্থীরা বলেছিলেন : 'এটা উপন্যাস-এর বীজ।'[৩১] জীবনে আর যাই করুন নাসরীন জাহান কোনদিন শিল্প আর একটি শব্দের সঙ্গে আপস করেন নি। তারই প্রমাণ গল্পগুলোর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলো যথাক্রমে 'অনুসরণ', 'শিব মন্দির', 'জঠরবন্দি', 'মাটির আদম', 'একটি অসীম মুহূর্ত', 'পাখিওয়ালা' এবং 'c_, †n c_'। 'অনুসরণ' গল্পে : 'পারিপার্শ্বিকতা, ব্যক্তিজীবনের নির্বেদ, সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, অমানবিকতা, সামাজিক উত্থান-পতন, রাষ্ট্রযন্ত্রের কোলাহল, ষড়যন্ত্র, সামরিক ক্যু, সামরিক আগ্রাসন, অসহায় গণতন্ত্র'[৩২] এবং এসবের প্রতিক্রিয়ায় যুবক সমাজের হাহাকারময় পরিণতি, অন্তঃসারশূন্যতা সর্বোপরি সার্বিক অবক্ষয়জনিত স্থিতিহীন সময়-প্রতিবেশের বিরূপ প্রভাব থেকে সন্তর্পণে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার যথার্থ সমাজচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে। গল্পে বর্ণিত যুবকটির মনে হয় সারাক্ষণ একটি ছায়া যেন তাকে অনুসরণ করছে, যার আতঙ্কে স্বাভাবিক কাজকর্ম করাও তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে— এরূপ বর্ণনায় ব্যক্তিমানুষের অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজের ভেতরে ক্রমাগত গুটিয়ে যেতে থাকা যুবকটির কেবল মনে হয় :

> তার ভঙ্গিতে হেঁটে, হাত-পা হুবহু নেড়ে ছায়াটি তার সাথে এক নির্মম ঠাট্টায় মেতে উঠেছে। এই ছায়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে নিজের মধ্যে সাহস তৈরি করতে চায়। এর জন্য সে চিন্তার মধ্যে নির্মাণ করে সিঁড়িহীন চৌদ্দতলা

> বিল্ডিং। সেই বিল্ডিংয়ের চেহারা আবার অভিনব। দূর থেকে দেখলে মনে হবে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি একটি লম্বা গাছ। ... সে মনে মনে প্রায়ই সেই বিল্ডিংয়ের চূড়োয় দাঁড়ায়। 'সবার ওপর আমিই সত্য' এরকম একটা অনুভূতি বুকে ভিন্ন কম্পন তোলে। এই বোধ এক মুহূর্ত স্থায়ী হয়। পর মুহূর্তেই খাই খাই ভয়ে বুক জমে যায়। ('অনুসরণ', c_, †n c_ : ৯)

এরকম অসহ-সময়ের দুঃসহ পটভূমিতে নারীর জীবন আরো বেশি মাত্রায় গণ্ডিবদ্ধ ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে— এটাই যথার্থ বাস্তবতা। গল্পে বিধৃত যুবকটির মামির অবয়বে অবরুদ্ধ সমাজবাস্তবতায় গুটিয়ে থাকা, আত্মনিমগ্ন ব্যক্তিমানুষের অন্তঃসারশূন্যতার চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

> কারুকার্যময় সোফা, স্ট্যান্ডে ঝুলানো কাঠ পাখি, পুরো কার্পেট, নরম শয্যা, বোম্বের ছবির নৃত্য, হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া মোটকথা আকাশি বাড়িটার ভেতর ডুবে থেকেই মহিলাটির সুখ।... মহিলাটি তার স্মৃতির উঠানের কাদা, ইটের মেঝে, মার চুলোতে ফুঁ দেয়ার গল্প এমন ভঙ্গিতে করে যেন এই বাড়ির অধিকর্তা তাকে সেই জীর্ণতা থেকে টেনে এনে তাকে খরিদ করে ফেলেছে। তাকে সেই মৃতের মত পরিবেশ থেকে রক্ষা করার মতো দুরন্ত শক্তি আছে বলেই তো সে ওই বয়স্ক লোকটির পৌরুষে মুগ্ধ। ('অনুসরণ', c_, †n c_ : ১৪)

আলোচ্য গল্পে বর্ণিত যুবকটির মামির অবয়বে নারী-জীবনের বঞ্চনার এক বিশেষ মাত্রা বিম্বিত হয়েছে। নিজের দুর্মর জৈবিক বাসনার স্বাভাবিক মানবিক চাহিদার ঘাটতিটুকু কখনো কখনো বাহ্যিক বিলাসিতার মধ্যেই নারীকে পুষিয়ে নিতে বাধ্য হতে হয়। অসহায়ত্ব, উপায়হীনতা নারীর সম্মুখে এমন এক অদৃশ্য অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তৈরি করে দেয় যেখানে নিজ ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে পযর্ন্ত নারী অস্বীকার করে নিজেকে অন্যের ইচ্ছের পুতুল হিসেবে পরিগণিত করে। নিজের জন্য নয়, পরিবার, সমাজের চাহিদা মাফিক নারীর চলাচল নির্ণিত হয়ে থাকে। ফলে : 'সে সর্বতোভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, পুরুষের অধীন হয়ে পড়ে এবং আত্মপ্রত্যয় এবং নিজের সামর্থ ও নৈপুণ্যে আস্থা হারিয়ে বসে।'[৩৩] অবলম্বনহীন, উপায়হীন নারী তথা ব্যক্তিচেতনাকে অসহ সময়-প্রতিবেশের অবরুদ্ধতা বিকারগ্রস্ত করে তোলে। আলোচ্যে গল্পে বর্ণিত ভীত-সন্ত্রস্ত যুবকটির সঙ্গে তার মামির আচরণে প্রকটিত হয়েছে নারীর সেই অবদমিত অচরিতার্থতাজনিত কামনা-বাসনার উদগ্র প্রকাশ–– যা গল্পে প্রকারান্তরে রূপ পেয়েছে এভাবে :

> আরে! এখনো মামা আসে নি? যেন জানে না সে মামা কখন ফেরে, এমন একটি ভণিতামূলক প্রশ্ন তুলে পাশের সোফায় বসে। কী বুঝে অনেকটা শিথিল কণ্ঠেই বলে ওঠে মামি, হঠাৎ পিঠের একটি জায়গা ফুলে গিয়ে ভীষণ ব্যথা করছে, ব্যাপারটা কী ধরতেই পারছি না, একটু দেখে দাওতো তুমি। বলে কী মেয়ে! ভেতরে ভেতরে ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করে সে।... কোথায়? কামিজ পরিহিতা মামি উঠে বসে। এইতো পিঠটায়। নিজেকে শক্ত করে দাঁড়িয়ে সে মহিলাটির চুল সরানো দুর্লভ ঘাড় প্রত্যক্ষ করে বোকার মতো হয়ে যায়। সে বিমূঢ় কণ্ঠে বলে, কই দেখছি না তো। মামি দুহাত উপরে তুলে ঘাড়ের কাছের চেইনে টান দেয়। এতে ঘাড়ের পাশাপশি আরো অনেকটা ফর্সা উপত্যকার উন্মুক্ততা ঘটে। সে দেখবে কী। হাত এবং পায়ের কম্পনে নিজেকে স্বাভাবিক রাখাই একটা ব্যাপার হয়ে

> দাঁড়িয়েছে।... মামি আজ তার সাথে একি রসিকতায় মেতে উঠেছে? পোকাটা জোরে কামড় বসায় মগজে। পুরো অস্তিত্বের মধ্যে এমন টাল-মাটাল অবস্থা শুরু হয়। সে ভীষণ বিপন্ন বোধ করে। ('অনুসরণ', c_, †n c_ :১৬-১৭)

এ গল্পে অবক্ষয় আছে, আছে অবক্ষয়কেন্দ্রিক নতুন মাত্রা। গল্পে চরিত্রগুলোর জীবনে যেন কোনো স্বপ্ন নেই, লক্ষ্য নেই, প্রত্যাশা নেই— তারা শুধু দারুণ অবক্ষয়ের গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান। অলস-অবশ ও লক্ষ্যহীন জীবনে তাই : 'অনিবার্যভাবেই কখনো উদগ্র হয়ে ওঠে কামুকতা, কখনো বা অচরিতার্থ কামনা-বাসনার অন্তঃসারশূন্য দিকভ্রষ্টতা এবং আত্ম-সংকটের তীব্রতা।'[৩৪] আলোচ্য গল্পের বর্ণিত যুবকের মামি চরিত্রের অবয়বে নারীর এহেন : 'যৌনকাতরতা, বিকৃতি কেবল শরীর সম্পর্কে যুক্ত নয়। সেটা আর্থ-সংস্কৃতির ভেতর থেকে সমমাথা তোলা।'[৩৫] এভাবেই নারীর অবয়বে নাসরীন জাহান তাঁর গল্পভূমিতে যৌনতাকে সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে শিল্পিত করেছেন আপন প্রতিভার সৌকর্যে। 'শিব মন্দির' গল্পে অসাধারণ ভঙ্গিমায় বিধৃত হয়েছে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনধারণের গ্লানি, হতাশা, দারিদ্র্যের নির্মম উপায়হীনতা। গ্রামের কিছুটা দূরেই শিবমন্দিরের অবস্থান। একটি ভৌতিকময় চেহারার এই পুরনো শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে গ্রামে রহস্যময় সব গল্প চালু আছে। মন্দিরের মাঝখানে একটি সোনার পাত্র। পাহারায় নিয়োজিত সর্প যুগল। এই কাহিনি যুগ যুগ ধরে কিংবদন্তির মতো গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। গল্পে বর্ণিত হয়েছে : 'শুধু বিষাক্ত সর্পদ্বয়ের ভয়ে প্রাণটা মুঠোয় নিয়ে সেদিকে কেউ এগোয় না। কিন্তু গ্রামের হা-ভাতে মানুষগুলো এবং যাদের প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও অর্থ তৃষ্ণার বাতিক, তারা কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে মন্দিরটার দিকে তাকায়।' ('শিব মন্দির' c_, †n c_ : ১৯) গ্রামের দরিদ্র অসহায় শ্রেণির প্রতিনিধি কাদের আলীর কাছেও শিব মন্দিরটির আকর্ষণ সুতীব্র। বলা যেতে পারে :

> আশৈশব এই মন্দিরটি, মন্দিরের রহস্য, সর্পযুগল, সর্বোপরি সেই সোনার হাঁড়িটির স্বপ্ন কাদের আলীর হাড্ডি, মজ্জা, রক্তস্রোতের মঝে মিশে আছে। যখনই স্ত্রীর শরীরে ঘিন ঘিনে ঘামের পুরুষালী গন্ধ অথবা তার শুকনো স্তন নিয়ে গুতোগুতি করছে হাড্ডিসার সন্তান, প্রতিনিয়ত তাকে এইসব দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হতো, তার কোমল স্নিগ্ধ স্ত্রীকে সংসারের নিষ্ঠুর পেষণে হয়ে উঠতে দেখত খনখনে, কর্কশ। তখনই তাঁর বাঁচার স্পৃহা ফুরিয়ে যেত। ... সেসব মুহূর্তে বাঁচার কথা ভাবতে গেলে কাদের আলীর চোখে ঘাই দিয়ে উঠেছে এই মন্দিরটির দৃশ্য। ('শিব মন্দির', c_, †n c_ : ১৯-২০)

শিব মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে কাদের আলীর স্বপ্ন ও ভাবনার অবয়বে প্রকারান্তরে দারিদ্র্যের নির্মম ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত অসহায় নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনালেখ্যটি উন্মোচিত হয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায়, বেঁচে থাকার উদগ্র বাসনায় মৃত্যুকে পরোয়া না করে কাদের আলী রাতের অন্ধকারে একদিন শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র তার এতদিনকার স্বপ্নের পতন ঘটে। মন্দিরে সাপও নেই, সোনার পাত্রেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভগ্ন-হৃদয়ে কাদের আলী মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ও

নির্মম জীবনের পথে পা বাড়ায়। গল্পের কাহিনি এটুকুই। এরই মধ্য দিয়ে কাদের আলীর ভাবনায় তার স্ত্রীর যে প্রতিমূর্তি ভেসে উঠেছে তাতে উন্মোচিত হয়েছে নারী-জীবনের এক বিশেষ প্রত্যয়। নিম্নবর্গের অসহায় মানুষের মধ্যে নারীর অবস্থান যে আরো নিম্নে— সে ভাবকল্পটি আলোচ্য গল্পে বিধৃত হয়েছে এভাবে :

> মন্দিরের সামনে শিমূল গাছ। অকারণেই বুকটা খালি হয়ে আসে। হঠাৎ সে জীবন মৃত্যুর উর্ধ্বে চলে যায়। ... শ্বেত করবী গাছটা পেরোনোর সময়ই আশঙ্কিত বাদুর ডানা ঝাপটে শূন্যে উড়াল দেয়। ধড়ফড় করে উঠে কাদের আলী। ... তীব্র বেগে দাঁড়িয়ে বোকার মতো নিজের কৃতকর্ম নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ভাবিত হয়। এক ভয়াল ভীতি দ্বারা শরীর, মন, সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। ভাবে উল্টোমুখী দৌড় দেবে। কিন্তু উল্টোপার্শ্বে তখন মাদি কুকুরের মতো ফি বছর বিয়োতে থাকা হাড্ডিসার স্ত্রী তার চির ক্ষুধার্ত কিলবিল করা সন্তানেরা। ('শিব মন্দির', c_, †n c_ : ২০)

ভাবকল্পের অনুষঙ্গে নারীর প্রতিবছর সন্তান জন্মদান, নারীর স্বাস্থ্যহীনতা সর্বোপরি এ বিষয়ে নারীর নিজস্ব মতামতের গুরুত্বহীনতা প্রকারান্তরে পরিবার ও সমাজে নারীর পশ্চাৎপদ অধস্তন অবস্থাটিকেই মূর্ত করে তুলেছে। অপুষ্টির শিকার প্রতিবছর সন্তান জন্মদানে উপায়হীন নারী তাই স্বাভাবিক প্রবণতায় তুলনীয় হয়েছে 'মাদি কুকুরের' প্রতিকল্পে। আর এভাবেই সমাজে নারীর মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। প্রজননে নারীর ভূমিকা মুখ্য, তাছাড়া নারীর শরীর তার নিজস্ব এবং এই দেহের উপর সবার আগে তার অধিকারই সর্বাধিক— এই বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে পুরুষ প্রভাবিত সমাজ নারীকে একরকম বাধ্য করে একাধিক সন্তানের জন্ম দিতে। নারী এক্ষেত্রে আদৌ শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রস্তুত কীনা তা বিবেচনা করাটাকে সমাজ আমলেই আনে না। এভাবেই : 'নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে পুরুষ তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। অপরপক্ষে পিতৃতন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার সামর্থ্য নারীর নেই।'[৩৬] এই সমাজচিত্রটিও আলোচ্য গল্পে কাদের আলীর ভাবনার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। 'c_, †n c_' গল্পের মধ্যে নাসরীন জাহানের শিল্প কুশলতার অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটির সমালোচনা করতে গিয়ে এ অভিমত দিয়েছেন কেউ কেউ যে : 'গল্পটির মধ্যে সাইকিক অটোবায়োগ্রাফির যে ডালপালা ছড়ানো সেগুলোকে আরও ফুলফল পল্লবিত করা যেত। একটা ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাসের বীজও লুকিয়ে ছিল সেখানে।'[৩৭] তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, গল্পের নির্মাণে বেশ কিছুটা নতুনত্বের ছাপ লক্ষ করা যায়। গাণিতিক ক্রমের মধ্য দিয়ে এক একটা পরিচ্ছেদ দেখানোর যে প্রবণতা— তা গল্পটিতে ভিন্ন মাত্রার আমেজ সৃষ্টি করেছে। আর : 'সেসবের মধ্যে ৫-চিহ্নিত পরিচ্ছেদটি অন্যরকম। কাঙাল চোখ, কঠিন চোখ, নিষ্পাপ চোখ, এসে ঠেকে তখন ডাইভারসিটির মহত্ত্ব আঁচ করা যায়।'[৩৮] গল্পটিতে অনেকটা আত্মকথন-সূত্রে সমাজবাস্তবতার নিরিখে নারী-পুরুষের বিশেষ একটা সীমার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সঙ্কটের টানাপোড়েনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের রূপায়ণ ঘটেছে। নাগরিক জীবনের ক্লেদ, একঘেয়ে অপ্রেম সংসারে টবপ্রতীম জীবনের সজ্জায় কৃত্রিমতায় হাঁসফাস করা ব্যক্তি-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত চিত্তের অবয়বে উন্মোচিত হয়েছে সমকালীন সংকট, চাপ বিশৃঙ্খল ও জটিল

বহুমাত্রিক সংঘাত ও সংঘর্ষে বিপন্ন সময়ের সর্পিল চেহারা। গল্পটি পাঠককে মনে করিয়ে দেয় যে : 'আলো-অন্ধকারের মধ্যে মানুষের রূপকে আবছা করে দেখার খেলাটা নাসরীন শিখেছেন, রপ্ত করেছেন, নিজের মতো বিন্যস্ত করেছেন।'[৩৯] গল্পটিতে মইন ও খুকির অপ্রেম সংসারের একঘেয়ে যাপিত-জীবনের নানামুখী ভাবনার অবয়বে ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্গত জটিলতার দ্বান্দ্বিক স্বরূপটি সময়-প্রতিবেশের বাস্তবতাকে যেমন প্রতিবিম্বিত করেছে তেমনি এরই মধ্যে দিয়ে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক ছবিও উন্মোচিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য :

ক. আমার যদি আলাদা একটি গোপন ঘর থাকত, এই স্বপ্নটি আমি প্রায়ই দেখি।... সে ঘরে কোনো আসবাবই নেই। সেই শূন্য নির্জন ঘরে থাকবে শুধু থোকা থোকা বাতাস। আমি ভীষণ বিচিত্র মনের মেয়ে। মুশকিল হয় মইনকে নিয়ে।... রীতিমতো শিক্ষিত একজন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, যে দিব্বি আমাকে বাঁ ঠ্যাং দেখিয়ে খুঁটিনাটি আমার অনেক অপছন্দের কাজ নাকের ডগায় সেরে ফেলে। ... মোটকথা সে নিজের অনুভবকেই সর্বাগ্রে মূল্য দিতে জানে। মইনের কারণেই আসলে ধীরে ধীরে আমার ভেতর আলাদা ঘরের স্বপ্ন আসন গেড়ে বসেছে। ... সময় কাটানোর জন্য অথবা ড্রেসিং টেবিল হাতড়ে পুরনো টাই ক্লিপ খোঁজাখুঁজি করা কেন? নির্দিষ্ট ম্যাগাজিনের খোঁজে তোষক উল্টে-পাল্টে ছোট্ট দুই রুমের কোথায় আমার গোপন জিনিসগুলো রাখি? ওগুলোর একটি কণাও যদি মইনের চোখে পড়ে। আমি কি ওর ক্রোধকে কম চিনি? ('পথ, হে পথ', c_, †n c_ : ৫৪-৫৬)

খ. আমার একটি আলাদা ঘর দরকার। সেই শূন্য ঘরে থাকবে একটিই মাত্র চেস্ট অব ড্রয়ার, যেখানে আমি আমার পুরনো প্রেমিকদের দেয়া চিঠি, ডায়েরি, চমৎকার ভাষায় প্রেজেন্ট করা বই, ওদের সাথে তোলা আমার কিছু ছবি, এখনকার লেখা প্রাণপণে লুকিয়ে রাখা ডায়েরি সব সযত্নে রাখতে পারি। এই জিনিসগুলোই আমি আমার এক ব্যাচেলর বান্ধবীর কাছে রেখেছি, যদিও সে বলেছিল, এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে, সংসারের জন্য এইসব বিষয় অত্যন্ত বিপদজনক। ('পথ, হে পথ', c_, †n c_ : ৫৬)

গ. যখন কোনো স্ত্রী অন্যের হাত ধরে পালিয়ে গেছে শুনে সমস্ত পাড়ায় ছি ছি চলছে তখন আমি খুঁজে খুঁজে বের করতাম এর পক্ষের কোনো যুক্তি। এক সময় স্থির হতাম এই ভেবে। যদি হাজব্যান্ডের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং না-ই হবে, তবে আর সমস্ত জীবন ধরে তার সংসার টেনে লাভ কী? গেছে, ভালোই করেছে। ... মনে হলো আমার কোনো ব্যক্তি সত্তা নেই। আমার নিজস্ব কোনো জিনিস থাকতে নেই। এইসব বিষয় থেকেই সেই হাওয়া ঘর আমাকে আকড়ে ধরেছে। সেই ঘরে শুধু একটিই চেস্ট অব ড্রয়ার থাকবে এবং তার শুধু একটিই চাবি থাকবে। ('পথ, হে পথ', c_, †n c_ : ৫৭)

ঘ. এটা ঠিক না খুকি, রিকশা ভাড়ার ভয়ে তোমরা হলিডেগুলোতেও অন্তত কোথাও তেমন বেড়াতে যাও না, এরকম একঘেয়ে জীবনে কেউ বাঁচতে পারে? তুমি রীতিমত অনার্স গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, শ্বশুর শাশুড়ি চায় না বলেই চাকরি করবে না, মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, মইন এটা খুব অন্যায় করছে। ('পথ, হে পথ', c_, †n c_ : ৫৯)

ঙ. ফোমের শয্যায় গোলাপি শাড়ির পুতুল আলতো ভঙ্গিতে শুয়েছিল। পুতুলকে এই অবস্থায় দেখে মুহূর্তেই নিজের ঘরের মলিন, দরিদ্র চ্যাতলা পড়া ঘরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল মইনের। নিজের ঘরে এতদিন কড়কড়ে সুতির শাড়ি পরিহিতা খুকিকে বেশ টিপটপ লাগত। গোলাপি শয্যার গোলাপি পুতুলকে দেখে মনে হয় কী শিশু ছিলাম এতদিন! এতদিন কি সে শুধু খুকির রক্তমাংস স্পর্শ করার বদলে একদলা ফোম ঘেটেছে? ... খুকির বিরক্তিকর চেহারার দিকে চেয়ে কখনো কি তার মনে হয়েছে খুকি ওর প্রেমিকা, স্ত্রী? ... খুকিকে সবসময়েই ওর মা অথবা বড় আপা গোছের গার্জিয়ান মনে হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে শিশু। গার্জিয়ান বা শিশুর সামনে অত ফর্মাল থাকার দরকার কি? ('পথ, হে পথ', c_, †n c_ : ৫৭-৬০)

চ. আমার নাম ভাবনা হলে বেশ ভালো হতো। আমি সারাদিন ভাবি। ভাবি, মইন ঘর থেকে বেরিয়ে যদি আর না ফেরে? এক সময় এই ভাবনাও আমাকে রোমাঞ্চিত করে। তাহলে সারাজীবন একজনের সাথে একঘেয়ে জীবন যাপনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি! কেউ কোনো দোষ দেবে না, উল্টো সহানুভূতি। কিছুক্ষণ পরই অস্তিত্ব সংকটে শিউরে উঠি, এসব কি ভাবছি আমি? ... বিবেক সংস্কার যেটা আমাকে কিছুদূর সামনে এগোতে দিয়ে টান দিয়ে পেছনে নিয়ে যায়। ('পথ, হে পথ', c_, †n c_ : ৬১-৬৩)

ছ. বড় ক্লান্তি লাগে। বিচ্ছিরি লাগে। অবসন্ন লাগে। আমার ফের শীতল হয়ে উঠতে থাকা শরীরে মইন যদি আবার ক্রুদ্ধ হয়? বিরক্তি প্রদর্শন করে? একসময় অন্য নারীর কাছে ...? কোনোই প্রয়োজন নেই জটিলতার। তারচেয়ে এই ভালো, এবার আমি নেব। আমার কল্পনার সার্বিক সুন্দর পুরুষকে, কখনো মহেন্দ্রকে, কখনো ইরফানকে, রাস্তায় একবার দেখা কোনো লোককে। ... আমি জানি, আমাকে স্পর্শ করলেই তুমি জেগে উঠো না। তোমার স্পর্শে আমিও না। তবুও অন্য স্পর্শে তুমি জাগো, অন্য কোনো স্পর্শে আমি জেগে উঠি, প্রকাশ্যে আমরা কেউই তা মেনে নিতে পারি না। সহ্য করতে পারি না। এজন্য আমরা দুজনই সমান অসহায়। ('পথ, হে পথ', c_, †n c_ : ৬৭)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমাদের যাপিত-জীবনের ভেতরেই যে আরও নানান দেখবার ও বুঝবার দিক আছে— সেই বাস্তব সত্যটি যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি সমাজসত্যের আলোকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে নারী-জীবনের নানামাত্রিক চালচিত্র। আমাদের সমাজে কীভাবে : 'জৈবিক পার্থক্যকে পুঁজি করে জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্টি করে সমাজ নারীকে পুরুষের পায়ের তলে দাবিয়ে রেখেছে, নারীর মানবিক অস্তিত্ব ও সত্তা অস্বীকার করে তার মেধা, মনন ও বুদ্ধির বিকাশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।'[৪০] তারও জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পের খুকির ভাবনার স্রোতে। নিজের অস্তিত্বের সংকটের বিপন্নতায় নারীর নিজস্ব একটি ঘরের প্রয়োজনীয়তা প্রকারান্তরে গল্পটিতে নারীর সামাজিক অসম-অবস্থানের বিভাজনকেই স্পষ্ট করে তোলে। নারীর মানবিক সত্তার পরিসরকে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত তথাকথিত সামাজিকীকরণ নারীকে গণ্ডিবদ্ধ ও বোধহীন করে তোলে। আলোচ্য গল্পের খুকিও তাই শিক্ষিত হওয়ার পরেও কেবল শ্বশুর শাশুড়ির মতামত বা ইচ্ছাকে মূল্য দিতে গিয়ে চাকরি করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছে। আচার বা সংস্কারের অজুহাতে এভাবেই : 'শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আরও দুটি প্রতিষ্ঠান— ধর্ম ও পরিবার— পিতৃতন্ত্রকে নির্বিচার সমর্থন

দিয়েছে। ত্রিমুখী সাঁড়াশী আক্রমণে নারী পুরুষের তুলনায় নিজেকে হীন ভাবতে এবং হীনমন্য আচরণ করতে বাধ্য হয়।'[৪১] প্রথাবদ্ধ ধ্যানধারণা ও সামাজিক অচলায়তন এভাবেই নারীকে হীন সাব্যস্ত করে পুরুষের অধীনে অধস্তন করে রাখার জন্য নারীর চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নারীর গতিবিধি গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নারীর মানবিক সত্তার অবমূল্যায়ন করে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকেই নারীকে নির্বাসিত করার মধ্য দিয়ে জীবনের স্বাধীন অস্তিত্বকে হেয় জ্ঞান করেছে। ঘরের বাইরে, জন জগতে যেন নারীর মানবিক সত্তা অদৃশ্য, নির্বাপিত, অবরুদ্ধ ও বিভ্রান্ত-- গল্পটি এহেন সমাজবাস্তবতারই স্মারক।

KvV‡cPv

বাস্তববোধ ও রূপক, প্রতীকের ইঙ্গিতময়তায় নাসরীন জাহান তাঁর রচনাকে শিল্পময় করে তোলার যে অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন তারই অসাধারণ শিল্পভাষ্য KvV‡cPv[৪২] গল্পগ্রন্থ। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পসমূহ যথাক্রমে 'এলেনপোর বিড়াল', 'শূন্য পতন', 'দু'জন এক পথে, দু'পথে', 'পাপবোধ', 'কুম্ভীপাক', 'গরঠিকানিয়া', 'ছেলেটি, শিশুটি, তার অনুভব', 'সে ঘরে ফেরার পর, রাত্তিরে', 'স্নায়ু দিয়ে চেনা', 'যুদ্ধে যে মেয়ে প্রতারিত হয়েছিল', 'সন্দংশ', 'পদ্ম কন্যা', 'যে অন্ধলোকটি রঙ দেখতে জানতো', 'নৈঃসঙ্গ্যের ছায়াপাঠ', 'মেয়েটা খারাপ' এবং 'কাঠপেঁচা'। গল্পগ্রন্থের 'এলেনপোর বিড়াল' গল্পটি বলবার অভিনবত্বে, ভাবনার গভীরতায় এবং বিন্যাসের কৌশলে অনবদ্য। গল্পটি যেন : 'আধুনিক গল্পকারের স্টাইল। ফ্যাশন নয়।'[৪৩] নারীর অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর শিকড় বহুধা বিস্তৃত ও দৃঢ়মূল; তাদের সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে নারীর মানবিক সত্তার মূল্যায়ন কখনোই সম্ভব হবে না। নারী কেবল : 'উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নয়; প্রত্যেক নারীর জীবনে নিজ নিজ উদ্দেশ্য আছে; নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার মধ্যে তার মানবিক মর্যাদা নিহিত।'[৪৪] অথচ আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অবদমিত হয়ে থাকে। নারীর নিজস্বতা, তার ব্যক্তিসত্তার বিলোপ ঘটে এহেন অবদমনের কৌশলে। এরকম একটি ভাবানুষঙ্গকে অবলম্বন করে আলোচ্য গল্পের পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে। গল্পের মেয়েটি স্বামীর পেষণে হারিয়েছে তার স্বাধীন সত্তার অনুভব। তাই লক্ষণীয় :

> রাত্তির রাত্তির মেয়েটির কাটে চাদর খামচে, তুলোয় আঙুল আঁকড়ে, ছায়াছাদে নির্ণিমেষ চোখ মেলে মেলে। মেয়েটি দেখে রাত বাড়তে থাকলে দেয়ালে যে কত ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় মূর্ত হয় কখনো মানুষ কখনো জন্তু, কখনো গাছপালা-- দেখতে দেখতে সে দু চোখের দুই পাপড়ি, যে একে অন্যের শত্রু, কষে বেঁধে এক করতে চায়, ঘণ্টা ঘণ্টা পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাসের তলায় তার ছায়া শরীর ঢেউ খায়। ঘুম আসে না। ... আধো বাতির তলায় দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে ছিটকিনিতে হাত রাখতেই হুঁশ হয়, দরজা খোলার শব্দে যদি কারও ঘুম ভেঙ্গে যায়? এ নিয়ে রাত রাত ভোগে সে। যেহেতু নিদ্রাহীনতার রোগ, হা হা রাত্তির খামচে খামচে রক্ত ভেঙ্গে ঢোকে। ... নিজের বিপন্নতা নিয়ে যে কাউকে ভোগানোর বিষয়টি মেয়েটির কাছে এমনই মর্মান্তিক এক অস্বস্তির, সে রাতের অবদমনের ভারে দিনে ভুগতে থাকে,

> দিনের ভোগান্তি তরঙ্গিত হাসির তলায় লুকিয়ে যখন দম টানতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়— বাতাস আসে না। ('এলেনপোর বিড়াল', KW‡cP : ০৯)

এভাবেই পরিবার, সমাজ তথা অন্য সবার চাহিদা ও ইচ্ছানুযায়ী চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা নারীর নিজস্ব জগতটি একসময় অন্তর্হিত হয়ে যায়। ঘর-সংসারে পরিবার-পরিজনদের জন্য নারীর ত্যাগ ও অবদানকে স্বীকার বা মূল্যায়ন করতেও এই সমাজ অনিচ্ছুক, অপারগ। এভাবেই প্রকারান্তরে : 'পুরুষ তার স্বার্থে নারীর জীবনকে এরকম করে তুলেছে। নারীর জীবন তাই ব্যক্তিগত নয়, পুরোপুরি রাজনৈতিক।'[৪৫] আত্মপ্রবঞ্চিত নারী এভাবেই শঠতার মুখোমুখি হয়ে, ক্রমাগত নিজেকে নিঃস্ব করে একসময়ে উপলব্ধি করতে থাকে :

> তাইতো, কাউকে সে কিচ্ছু দেয়নি, দিনের পর দিন সে নিজের হৃদপিণ্ড কেটে কেটে অন্যকে সুখি করতে চেয়েছে। সে নিজের রক্ত খুলে দেয়নি, মাংস কাটেনি— হৃদপিণ্ডের মৃত্যুতে কার এমন কী প্রাপ্তি হয়? কার কী জাগতিক চাহিদা মেটে? বরং এই করে করে সে নিজেকে ভয়ানক বিপন্ন আর শূন্য করে ফেলতে ফেলতে অনুভব করছে, সবচাইতে বড়ো অপরাধ যা সে করেছে, সে নিজেকেও ঠকিয়েছে। ('এলেনপোর বিড়াল', KW‡cP : ১১-১২)

মেয়েটির এই আত্মপোলব্ধিতে নারীর আত্মজাগরণের অভীপ্সাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা : 'নারী যদি নিজ স্বার্থে সচেতন হয়ে পুরুষ সৃষ্ট কৃত্রিম পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে, কোন পিতৃতান্ত্রিক নৈতিকতা বা অনুশাসন নারীর অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না।'[৪৬] জাগ্রত নারীই পারে এহেন অমানবিক অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন করতে। গল্পের মেয়েটির মধ্যে সেই ভাবসত্যটি দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে এভাবে :

> মেয়েটি তার তিক্ষ্ণ নখ দিয়ে ইট খোলার জন্য তীব্রভাবে দেয়ালের মধ্যে আঁচড় কাটতে থাকে, এত করে তার ভেঙে পড়তে থাকা নখ বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে, হায়! ... মেয়েটি কাঁপতে থাকে— আমার হৃদপিণ্ডের শেষ ফালির উত্তাপ দিয়ে যদি ওকে বাঁচানো যায়? মেয়েটি বিড়ালের শেষ শীততম মুমূর্ষু আর্তনাদ শুনতে শুনতে টের পায়, আজ স্বামীর পাশে শুয়ে সে সশব্দে চিৎকার করে উঠতে পারছে। ('এলেনপোর বিড়াল', KW‡cP : ১৩)

এভাবেই গল্পের অবয়বে : 'স্বামী নামক জলজ্যান্ত প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে স্ত্রী নামক দলিতের আলোড়ন বা দ্রোহকে'[৪৭] শিল্পিত করে তুলেছেন নাসরীন জাহান সমাজ-বাস্তবতার অনুষঙ্গে। ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন পিতৃতন্ত্রের আবশ্যক বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি নারী সহজেই উপলব্ধি করে যে : 'বেঁচে থাকতে হলে তাকে সমাজনির্দিষ্ট 'নারীসুলভ' আচরণ করতে হবে, নতুন নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার শিকার হতে হবে।'[৪৮] নির্যাতন দৈহিক হতে পারে, মানসিক হতে পারে। কাউকে দৈহিক কষ্ট দেওয়া— কাউকে প্রহার করা-- কিংবা কাউকে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া, কাউকে পদে পদে খোঁটা দেওয়া-- উভয়ই নির্যাতন। এক কথায়, নির্যাতন অর্থ দৈহিক ও মানসিক লাঞ্ছনা। নির্যাতনের পরিধি বহু ব্যাপক। নির্যাতনের নানা রূপ। পিতৃতন্ত্র ও নারী নির্যাতন

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'শূন্য পতন', দু'জন এক পথে, দু'পথে' এবং 'ছেলেটি, শিশুটি, তার অনুভব' গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে বিস্তৃত হয়েছে নারীর প্রতি নির্যাতনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বাস্তবচিত্র। নারীকে যৌন হয়রানি করা, প্রেমে নারীকে প্রবঞ্চিত করা সর্বোপরি ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ নারীকে অবদমিত রাখার মানসে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা— এহেন বর্বরোচিত অমানবিক পাশবিকতার চালচিত্র আলোচ্য গল্পগুলোর পটভূমে বিন্যাস্ত হয়ে সমাজ বাস্তবতার প্রকৃত চিত্রটিকে উন্মোচিত করেছে। নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে যৌন হয়রানি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। কারণ ইদানিংকালে নারীরা অধিক সংখ্যায় কর্মগ্রহণ করায়, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসায়, যৌন হয়রানি কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে ছাত্রী মেধাসম্পন্ন ও শিক্ষায় মনোযোগী তার জন্য শিক্ষকের সহায়তা ও অনুপ্রেরণা আবশ্যক। কিন্তু অশিক্ষক সুলভ আচরণকারী শিক্ষকের বিকৃত মানসিকতার শিকার শিক্ষার্থী মানসিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষায় আশানুরূপ ও যথাযোগ্য ফল লাভ করতে পারে না। 'শূন্যপতন' গল্পে সুলেখার মতো একজন মেধাবী ছাত্রী কলেজে আসা ছেড়ে দিলো কেননা এতোদিন বিষয়টা গুনগুন ফিসফাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমেই তা চারদিকে বিচ্ছিরিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, অধ্যাপক সুলেখার গায়ে হাত দিয়েছেন। সমস্ত কলেজে বছরের পর বছর ধরে কঠিন ব্যক্তিত্ববান, নীতিপরায়ণ শিক্ষক হিসাবে পরিচিত জনৈক অধ্যাপক কর্তৃক মেধাবী ছাত্রী সুলেখার প্রতি যৌন হয়রানির মর্মান্তিক পরিণতিতে তার বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার করুণ চিত্রটি আলোচ্য 'শূন্যপতন' গল্পের মৌল উপজীব্য। এহেন তথাকথিত ভালোমানুষের মুখোশ পড়া নীতিহীন শিক্ষকদের স্বরূপটিও গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজবাস্তবতার নিরিখে। সমাজ নির্যাতনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ নীতি বিবর্জিত অধ্যাপককে বিচারের কাঠগড়া থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাইয়ে দিলেও মুক্তি মেলে না সুলেখার। সামাজিক, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে অবরুদ্ধ জীবনের গ্লানি বয়ে বেড়ায় এহেন মেধাবী ছাত্রী সুলেখা। লজ্জায়, অপমানের তীব্রতা তাকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেয়— যার ভয়াবহতা আজীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হয়। 'দু'জন একপথে, দু'পথে' গল্পের মেয়েটি বারবার ছেলেটির ব্যক্তিত্বের কাছে, ভালোবাসার প্রগাঢ় আহ্বানে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলো উজার করে। মেয়েটি ছেলেটিকে ভালোবেসেছিলো নিঃস্বার্থ অনুভব দিয়ে। ছেলেটির ভালোবাসার পশ্চাতের প্রবঞ্চনাটুকু বুঝে উঠবার ক্ষমতা ছিলো না মেয়েটির। কোনো এক গ্রীষ্মের লম্বা ছুটির পড়ে দুজনের এক পথে একই সময়ে মিলিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছেলেটি আর আসে না। প্রতীক্ষারত মেয়েটি ছেলেটির প্রবঞ্চনায় হাসতে ভুলে গেছে, এমনকি ওর প্রতিশোধ নিতেও ইচ্ছে হয় নি। ছেলেটির মতো সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবনের ডালা সাজাতে পারে নি প্রেমে প্রতারিত মেয়েটি। 'ছেলেটি, শিশুটি, তার অনুভব' গল্পের ছেলেটি এখন জানে, কী করে গভীর নিঃশব্দে একজনকে হত্যা করা যায়। ছেলেটি তার বাবাকে গৃহ পরিচারিকার সঙ্গে মায়ের অনুপস্থিতিতে অনৈতিক আচরণ করতে দেখেছে। দেখেছে এ নিয়ে মায়ের মুখের আলো নিভে যেতে এবং বাবার থমথমে গম্ভীর চেহারা কীভাবে সারা

ঘরে ভয়ানক নিস্তব্ধতার জন্ম দেয় এবং অশরীরী এক বোধ ছেলেটির স্নায়ুতন্ত্রকে কীভাবে অসাড় করে তোলে— তার সবই ছেলেটি প্রত্যক্ষ করেছে, অনুভব করেছে তার নিজ বাসভূমে। ছেলেটির অনুভবের দ্যোতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার বর্বরোচিত আখ্যান। নারীর প্রতি নির্যাতনের নানামাত্রিক স্বরূপটিকে উন্মোচনের ক্ষেত্রে আলোচ্য গল্পগুলোর কতিপয় উদাহরণ অনুধাবনযোগ্য :

ক. সুলেখার মতো একজন মেধাবী ছাত্রী কলেজে আসা ছেড়ে দিলে, সারা কলেজ ক্রমশ শ্লোগান এবং পোস্টারে ছেয়ে যেতে থাকলে শিক্ষকদের টনক নড়ে। প্রিন্সিপাল এক রাতে সুলেখার বাড়ি গেলে সুলেখা তাঁর সামনে আসেনি। তার অভিভাবকরা মহাক্ষিপ্ত ... একজন অধ্যাপক যদি এরকম চরিত্রহীন হয়, জাতির দায়িত্ব কে নেবে? বিষয়টায় সুলেখা এমনই মুষড়ে পড়েছে, সে বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারছে না। এই ছোট মফস্বল শহরে মেয়েটার জীবনে এই যে অপমানকর ঘটনাটা ঘটলো, এখন মেয়েটার ভবিষ্যতের কী হবে? ('শূন্যপতন', KW‡cP\ : ১৪)

খ. মধ্যরাতে অধ্যাপক একাকী পথে হাঁটতে হাঁটতে সান বাঁধানো পুকুর ঘাটে এসে বসেন। জলের ওপরটা আঁধারে ঢেকে গেছে। ... সিগ্রেট ধরাতে দেশলাই বের করেন, ড্যাম্প হয়ে গেছে। দশবারের চেষ্টার পর একটা কাঠি জ্বলে। জলের ওপর ধোঁয়া ছুঁড়ে তিনি দেখেন সুলেখার মাথা থেকে পিঠের দিকে যেতে থাকা তাঁর সেই তরঙ্গিত হাত— জীবনের প্রথম এক মুহূর্তের জন্য এক বেহিসেবী অনুভব। শরীরের মধ্যে এমন একটা আগুন জ্বলছে, যা তিনি নিজে জ্বালাননি ... মেয়েটা এরপর ছিটকে বেরিয়ে গেলো। ... অধ্যাপক বিচলিত অস্থির হয়ে ছটফট করে ওঠেন, জীবনে একবারও একটা বিচ্যুতিও ঘটবে না? আশ্চর্য! ওরা কি আমাকে মানুষ মনে করেনি? ('শূন্যপতন', KW‡cP\ : ১৬)

গ. সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। ছেলেটি আসে না। এরকম আরো অনেক সন্ধ্যা, অনেক প্রভাত, অনেক মুহূর্ত ... মেয়েটি মিলিয়ে যেতে থাকা রোদের দিকে তাকিয়ে শোনে ছেলেটির কিছু করার ছিলো না, মৃত্যু পথযাত্রী মায়ের দিব্যি ... যাকে বিয়ে করেছে সে খুব রূপবতী। রাতের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটির নিজেকে খুব কুশ্রী মনে হয়। সে নিস্তরঙ্গ হাতে সিগ্রেট দিয়ে মুখে বসন্তের মতোন দাগ বসায়, এরপর ঘরের পোশাক পরে উদোম রাস্তায় নেমে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে থাকে। এরপর কতদিন! মেয়েটি হাসতে ভুলে গেছে। ওর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়নি। ছেলেটি যা করেছে তা করতে ইচ্ছে হয়নি। ('দু'জন একপথে, দু'পথে', KW‡cP\ : ১৮-১৯)

ঘ. এখনও সে একটি ক্ষুদে শিশু বৈকি। সেদিন মা বাসায় ছিলো না। সে ছিলো ঘুমিয়ে। ঘুম থেকে জেগে সে দ্যাখে সারা বাড়িতে অপাড় নৈঃশব্দ। মিহিপায়ে হেঁটে বাড়ির কোণার ক্ষুদে রুমটায় গিয়ে দেখে বাবা কী রকম অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। তার ছায়া আড়াল করে আছে পরিচারিকাটির দেহ। সে ফিরে এসে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। ... অজানা স্নায়ুর ভাষা তাকে বলে দিয়েছে এই দৃশ্যের কথা ঠিক মা কে বলা যাবে না। ('ছেলেটি, শিশুটি, তার অনুভব', KW‡cP\ : ৩৫)

ঙ. মার হাতটা অন্ধকারে পুরুষটি কেমন মুচড়ে দিচ্ছে। ... এইবার বাবার মুখটি স্পষ্ট হচ্ছে। বিশাল বাড়ির স্তব্ধতা ভর করে ছেলেটির করোটিতে। ... সে কোনো শব্দ করে না, সে গবাক্ষের মধ্যে দিয়ে দেখে, কী আশ্চর্য দক্ষতায় একজন পুরুষ একজন নারীর প্রাণ উৎসারিত চিৎকারকে প্রতিনিয়ত থামিয়ে রাখছে। দেখে, সেই নিষ্ঠুর হাত কী প্রচণ্ড ক্রোধে সেই কণ্ঠনালী চেপে তাকে এক সময় নিঃসাড় করে তুলেছে।

বিছানায় অচেতন নারীদেহ।

এই মর্মান্তিক দৃশ্যের মধ্যে নারীটিকে আর জননী বলে চিহ্নিত করা যায় না। ('ছেলেটি, শিশুটি, তার অনুভব', KW‡cP : ৩৭)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে এই সামাজিক সত্যটি উচ্চকিত হয়ে উঠে যে, বয়স, স্থান, কাল নির্বিশেষে সকল নারী বস্তুত নির্যাতনের সম্ভাব্য লক্ষ্য। শত শত বছর এ ধারণা লালন করা হয়েছে যে : 'দৈহিক শক্তিবলে স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়ার বা তাকে নিয়মানুবর্তী করার অধিকার স্বামীর আছে। ... পুরুষ-প্রধান সমাজ নারী নির্যাতনে যে খারাপ কিছু আছে তা মনে করে না। স্ত্রীকে প্রহার মানবতা বিরোধী, এমন অপরাধবোধ স্বামীর কদাচিৎ থাকে।'[৪৯] তাই স্বামীর অনৈতিক আচরণের প্রতিবাদ করাকে নারীর অশোভনীয় আচরণ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। বিরোধিতা করতে প্রবৃত্ত নারীর জীবননাশের মতো ঘটনাও আমাদের সমাজে বিরল নয় বরং এটিই প্রকৃত বাস্তবতা। পুরুষ-বান্ধব এহেন সমাজ-ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিকভাবেই নারী প্রতারিত হবে তার প্রেমিক-পুরুষ কর্তৃক— এটিই যেন নারীর প্রকৃত নিয়তি। কেবল গৃহের চারদেয়ালেই নারীর প্রতি অমানবিক বর্বরতা সংঘটিত হয় না বরং ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারী মুখোমুখি হয় নির্মম নির্যাতনের। পুরুষের মনে সমাজ এহেন ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, নারীর সঠিক স্থান গৃহ; কর্মস্থলে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার প্রবেশ জেন্ডার কর্ম বিভাজনে নির্দিষ্ট পুরুষের ক্ষমতার হস্তক্ষেপ। ফলে : 'পুরুষ নারীর অর্থকরী কর্মে নিয়োগ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী গ্রহণকে পুরুষের চিরাচরিত কর্ম পরিধিতে হামলা মনে করে। নারীকে পুরুষের জগতে যোগ্যতা প্রদর্শন থেকে বিরত রাখতে, এমন কি, তাকে চাকরি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যেতে বাধ্য করার জন্য যৌন হয়রানির আশ্রয় নেওয়া হয়।'[৫০] আলোচ্য গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে নাসরীন জাহান অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় সমাজ মনস্ক চেতনার আলোকে সমাজবাস্তবতার নির্মম যূপকাষ্ঠে নির্যাতিত নারীর অবদমিত হাহাকারকেই প্রতিবিম্বিত করে তুলেছেন। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের পরবর্তী গল্প 'সে ঘরে ফেরার পর, রাত্তিরে'-র বিষয়বস্তু আবুল হক ও তার সতেরো বছর বয়সী তরুণী স্ত্রী রাহেলার অপ্রেম দাম্পত্য-জীবনের কৃত্রিমতায় হাঁসফাস করা টানাপোড়েনের বাস্তব সমাজচিত্র। বিয়াল্লিশ বছর বয়সের আবুল হকের সঙ্গে রাহেলার কেবল বয়সের ব্যবধানই প্রকট নয় বরং বয়সি স্বামীর সঙ্গে তার বোঝাপড়ায় রয়েছে বিষম দূরত্ব। দাম্পত্য-জীবনে অপ্রাপ্তি ও অচরিতার্থতাজনিত হতাশাবোধের গভীরতায় আক্রান্ত রাহেলার বঞ্চনার চিত্রটি গল্পে প্রতিভাত হয়েছে এভাবে : 'বেচারি গ্রামের মেয়ে। দিনের পর দিন নাগরিক বদ্ধতায় অভ্যস্ত হতে হতে তার অবস্থা হয়েছে টবের অশ্বত্থের মতো। ... বন্ধ আলমিরার মূল্যবান কাপড়গুলি মাঝেমধ্যে রোদে মেলে দেয়ার মতো রাহেলাকেও মাঝেমধ্যে বাতাস থেকে রোদ থেকে তাতিতে আনলে ভালো হয়।' ('সে ঘরে ফেরার পর, রাত্তিরে', KW‡cP : ৩৮) যদিও ইটের নিচে চাপা পড়া হলুদ ঘাসের মতোই রাহেলার ফ্যাকাশে জীবনের

রঙ; তবুও এহেন জীবনের অপ্রেম-গ্লানি থেকে মুক্তির উপায় তার নেই। এমনকি মুক্তির প্রত্যাশাটুকুও কেমন যেন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে রাহেলার এহেন বঞ্চিত জীবনে। সে-কারণেই দেখা যায় :

> রাহেলার ভয়ার্ত চোখ, লাজুক ভঙ্গি, নিঃশব্দে মাথা নিচু করে বসে থাকা— এই সবই ছুরির মতো বিঁধতে থাকে আবুল হককে। তখন তার এমনও মনে হয়, ডিভোর্স দিয়ে তার মতোন রাক্ষসের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়াটাই রাহেলার জন্য সবচেয়ে পুণ্যের কাজ হবে তার। একদিন রাত্তিরে ফিরে সে রাহেলাকে আভাসে ইঙ্গিতে এই কথা বলেছেও। তাতেই নির্জীব পাথরের মধ্যে প্রচণ্ড ভাঙ্গন ধরেছিলো, বিকট আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠেছিলো রাহেলার মুখ। স্বভাবের সঙ্কোচ কাটিয়ে সে আবুল হকের মুখ চেপে ধরেছিলো— তওবা বলেন। ('সে ঘরে ফেরার পর, রাত্তিরে', KvW‡cPv : ৩৯)

কেবল তাই নয়, রাহেলার একঘেয়েমি কাটাতে আবুল হক তাকে বাবার বাড়ি থেকে কয়েকদিন ঘুরে আসার কথা প্রসঙ্গে রাহেলার উচ্চারণ ছিলো লক্ষণীয় : 'আবুল হক জিজ্ঞেস করে, গ্রামে যাবে তুমি? তোমাদের বাড়িতে? রাহেলা ম্লান মুখে বলে, ওইডা তো এহন আর আমার বাড়ি না।' ('সে ঘরে ফেরার পর, রাত্তিরে', KvW‡cPv : ৪০) রাহেলার স্বভাবগত লজ্জা-সঙ্কোচ, তার আতঙ্ক এবং সর্বোপরি তার অস্তিত্বহীনতার অনুভব পাঠককে মনে করিয়ে দেয় যে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, কিন্তু নারী-পুরুষের মানবিক অধিকারবোধের ক্ষেত্রে সমতার বাস্তবায়ন ঘটেছে এ কথা সঠিকভাবে বলা যাবে না। কেননা : 'সমাজের কোন স্তরেই নারী পুরুষের সাথে সমান অধিকার পায়নি। ... নারী সব কালে সব সমাজে প্রথমে তাদের পিতার ও পরে তাদের স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে।'[৫১] রাহেলার চারিত্রিক অবয়বে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজবাস্তবতায় নারীর অসম-অবস্থান ও অবদমিত চিত্তের করুণ হাহাকার। আবুল হক সে-কারণেই অফিসের যাবতীয় ঝামেলার ফলে সৃষ্ট রাগ ও বড়-কর্তার গালাগাল নীরবে হজম করতে বাধ্য হলেও বাসায় ফিরে স্ত্রী রাহেলার উপর হম্বিতম্বির মধ্য দিয়ে নিজের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। সমাজ-প্রসূত অসার পৌরুষ-শক্তির দাপটে সে-কারণেই : 'ভয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আবুল হকের প্রবল প্রেমের থাবা থেকে রাহেলা সজোরে নিজেকে ছুটিয়ে নিতে চাইলে আবুল হক টানটান দাঁড়িয়ে তার হিংস্র পা দিয়ে কষে রাহেলার নিতম্বে লাথি বসায়, যা হারামজাদী।' ('সে ঘরে ফেরার পর, রাত্তিরে', KvW‡cPv : ৪২) এভাবেই গল্পটিতে আবুল হকের চরিত্রবিম্বে সৃষ্টিশীল সৌকর্যে নাসরীন জাহান : 'পুরুষতন্ত্রের চেহারা কতটা আগ্রাসী হতে পারে'[৫২] তারই বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন। 'স্নায়ু দিয়ে চেনা' গল্পটিতে নারী-জীবনের এক বিশেষ মাত্রার প্রকাশ ঘটেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ : 'নারীকে স্ত্রী, মা ও যৌন ক্রীড়নক হিসেবে দেখতে শেখায়; পুরুষ নারীর সমাজ বিনির্মিত সেক্স ভূমিকা কর্মস্থলে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেনে নিয়ে যায় এবং নারীর সঙ্গে গৃহে যেমন কর্মস্থল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তেমন আচরণ করতে প্রবৃত্ত হয়।'[৫৩] এরকম সমাজবাস্তবতাকে উপজীব্য করে 'স্নায়ু দিয়ে চেনা' গল্পের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে। সবে

ইন্টারমিডিয়েট করে ফার্স্ট ইয়ারে অনার্স পড়ুয়া মেয়ে সোনালি, যে এরই মধ্যে সম্পাদকের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র ধরে একটা সাপ্তাহিকে পার্ট টাইম কাজ নিয়েছে। যদিও সোনালির বাসার সবাই বলেছে যে, এ কাজ সোনালির মতো রেশমগুটির ভেতরে নিজেকে আবৃত রাখা মেয়ের পক্ষে করা কঠিন। এমন কি সম্পাদক আত্মীয় স্বয়ং প্রথম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন এই বলে যে : 'এদেশের জাঁহাবাজ রাজনীতিক প্লাস কবি খান মুনতাসীরের সাক্ষাৎকারের বিষয়ে সোনালি যদি তাকে রাজি করাতে পারে, তবে চাকরির ক্ষেত্রে সোনালির স্থায়িত্বের বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন তোলা হবে না। ভদ্রলোক এককালে প্রচণ্ড সরব ছিলেন। এখন নিভৃতচারী হয়ে উঠেছেন-- কাউকে সাক্ষাৎকার দিতে চান না।' ('স্নায়ু দিয়ে চেনা', KvV‡cPv : ৪৩) সোনালি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে সে সুযোগটি পেয়ে যায়। খান মুনতাসীর প্রথমে তীব্র আপত্তি করলেও পরে সোনালির অনুরোধে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু সাক্ষাৎকার নিতে সোনালি খান মুনতাসীরের বাসায় গিয়ে বিব্রতকর সমাজবাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। বিষয়টি আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে এভাবে :

> পাইপে টান দিয়ে দীর্ঘ নীরবতা টেনে তিনি সোনালিকে বলেন, তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তোমার সরলতা ... এযুগে অকল্পনীয়, ফোনে মনে হচ্ছিলো কানের পাশ দিয়ে মিহি সুন্দর বাতাস বইছে। ... আচ্ছা, তোমাকে কেউ বলেনি— তোমার চোখ খুব দুর্দান্ত? সোনালি রক্তিম হয়ে ওঠে। ... বুঝলে, আমি খুব নিঃসঙ্গ, আমি তোমাকে কথা বলার পর থেকেই অনুভব করছি ...। বুঝেছো সোনালি, তোমাকেই। আরষ্ট সোনালি স্তব্ধ স্বরে বলে, ধন্যবাদ। না সোনালি, এ ভদ্রতার বিষয় নয়, তুমি বুঝতে চেষ্টা করো— আমি প্ল্যটোনিক অর্থে কিছু মিন করিনি ...। এক আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর...। কিছু বুঝে, না বুঝেও সোনালির মনে হয় তার সারা গায়ে কে যেন নোংরা ছিটিয়ে দিয়েছে। সে হাজার ঘেঁটেও এই বোধের অর্থ খুঁজে পায় না। কেবল অনুভব করে ভেতর থেকে ঠেলে কান্না উঠছে। এবং তার হিসেবের বাইরেই বিষয়টি তাকে এতো যন্ত্রণাকাতর করে তোলে— শূন্য রাস্তায় হু হু করে কাঁদতে থাকে সে। ('স্নায়ু দিয়ে চেনা', KvV‡cPv : ৪৬-৪৭)

যদিও গল্পটিতে খান মুনতাসীর সরাসরি সোনালির সঙ্গে অনৈতিক ও অশোভন আচরণ করেছেন— এহেন কোনো দৃশ্য নেই, তবুও একজন নারীর আত্মগত সামাজিক অভিজ্ঞতা ও অনুভবের তীব্রতায় সোনালি তার স্নায়ু দিয়ে ঠিকই খান মুনতাসীরের ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যের কদর্যতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। চিনতে পেরেছে পুরুষতন্ত্রের বিকৃত মানসিকতাকে। যদিও এহেন : 'হয়রানির ক্ষেত্রে নারীর কিছু করার থাকে না; কিন্তু তার কাজের পরিবেশ খুব অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। ... কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার চাকরিজীবী মহিলা দোটানায় ভোগেন— অভিযোগ করলে চাকরি হারানোর ভয়, চেপে গেলে মানসিক অশান্তি।'[৫৪] আলোচ্য গল্পের সোনালির চরিত্রবিম্বে নারী-জীবনের এহেন বিড়ম্বনার সমাজচিত্রটি যথার্থভাবে শিল্পিত হয়েছে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি অনন্য সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এই ঘটনার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ নামক স্বাধীন একটি দেশের জন্ম হয়। এই মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও তাৎপর্যপূর্ণ

ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারীর ভূমিকা ছিলো বহুমাত্রিক। যদিও নারীর এই ত্যাগ, সাহস, বীরত্ব ও সংগ্রামের কথা আজও রয়েছে উহ্য। সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে, আশ্রয়দাত্রী এবং অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারিণীরূপে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নাবান্না, খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহকারিণী হিসেবে, সেবা-শুশ্রূষাকারিণী হিসেবে, তথ্য সরবরাহকারিণী হিসেবে, অর্থ-বস্ত্র-খাদ্য ও ঔষধ সংগ্রহকারী ও সরবরাহকারিণী হিসেবে, জনমত সংগঠন কারিণীরূপে, অনুপ্রেরণা দানকারিণীরূপে— এমনতর আরও বহুবিধ উপায়ে মুক্তিযুদ্ধে নারীর গৌরবময় অংশগ্রহণ ইতিহাসের এক উজ্জল অধ্যায়। যুদ্ধকালীন সময়ে : 'কত বীভৎস ও বিকৃতভাবে যে বাঙালি নারীদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, কত অসংখ্য নারী যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেদের মান-সম্মান, ইজ্জত এবং সর্বোপরি জীবন হারিয়েছেন'[৫৫] তার মর্মান্তিক বাস্তবচিত্র আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'যুদ্ধে যে মেয়ে প্রতারিত হয়েছিলো' গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে। গল্পে নীলু নামের মেয়েটি প্রবল বিশ্বাসে যে ওসমানের উপর নির্ভর করেছে, যুদ্ধের বীভৎস পাশাবিকতা ও মর্মান্তিক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও যার চোখে নীলু ভরসার শক্তিটুকু অবলম্বন করে বাঁচার পথ খোঁজার প্রেরণা পেয়েছে— সেই প্রেমিক পুরুষ, বিশ্বস্ত স্বামী-ই শেষ পর্যন্ত তাকে তুলে দেয় হানাদার বাহিনীর হাতে। সমস্ত মানবিক বোধ, বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটিয়ে ওসমান নামক যুবকটি, ছেলেবেলা থেকেই যাকে ছাড়া বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন, হাস্যকর মনে হতো নীলুর— সেই মানুষই শেষ পর্যন্ত প্রতারক, প্রবঞ্চকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বৃদ্ধ বাবা-মার সামনে সুরা পাঠ করে নীলুকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ওসমান। জোয়ান মেয়েকে নিয়ে বাবা-মার দুশ্চিন্তা কমে আসে। শহর থেকে নদী পেরিয়ে দূরের গ্রামে ওসমানের বন্ধুর বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ের কথা বলে ওসমান নীলুকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে। নীলুর মনে হয় :

> যেন ওসমান নয় সে কোনো অশরীরী ছায়ার টানে হাঁটছে। রাতের আঁধার গিলে খেয়েছে লেলিহান আগুন। নীলু বিমূঢ় হয়ে সে আগুনের উচ্চ রূপ দেখে। হাঁটতে হাঁটতে স্পন্দনহীন পা হঠাৎ এক জায়গায় থুবড়ে পড়ে। ছায়া ভেদ করে নীলু দেখে সামনে গোল টেবিল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে খাকী পোশাক পরা কিছু লোক। ওরা মদ খাচ্ছে। রক্তস্পন্দন থেমে গেলে নীলু ওসমানকে খোঁজে। নীলু সেই আঁধার মুখগুলো দেখে থমকে ওঠে। ছটফট করে দাঁড়াতেই সেই লোকগুলো যেন হাত দিয়ে জলের মাছ ধরতে চাইছে এইভাবে এগিয়ে আসে। ('যুদ্ধে যে মেয়ে প্রতারিত হয়েছিলো', KW‡cP : ৫১)

নারীর এ-ও এক মাত্রা। প্রেমিক পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতারিত হওয়ার বিষয় আলোচ্য গল্পে যুদ্ধকালীন পটভূমিতে নীলুর নারকীয় পাশবিকতার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনার আবর্তে রূপায়িত হয়েছে। নারীর এ-ও এক রকমের যুদ্ধ। কেবল শারীরিকভাবেই নারী নির্যাতিত হয় নি বরং মানসিকভাবেও নারীকে পঙ্গু করে তুলেছে এহেন বিশ্বাসহীনতা। সমাজবাস্তবতায় : 'পুরুষ এভাবেই নারীর শরীরকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে। নারী কেবলই পণ্যপাত্র, পুরুষের স্বার্থ সিদ্ধির মাধ্যম।'[৫৬] এই ভাবসত্যটিও আলোচ্য গল্পের নীলুর জীবনে ঘটে

যাওয়া ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজসত্যের আলোকে শিল্পিত করেছেন নাসরীন জাহান তাঁর অসাধারণ শিল্প দক্ষতায়। 'সন্দংশ' গল্পের উপজীব্য নারীর পতিতা জীবন, সেই অবাঞ্ছিত জীবনের পঙ্কিলতা, বিবর্ণতা-- সর্বোপরি সেই জীবনের উপায়হীন অসহায়ত্বের মর্মন্তুদ জীবনালেখ্য। পতিতা জীবনের অসহায়ত্বের চিত্রটি গল্পে কুসুম নামক এক নারী যে সদ্য এক সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সন্তান জন্মদানের সময়কালে সংঘটিত শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ যার দেহে এখনও বর্তমান, সেই নারী কেবল উদরপূর্তির ব্যাকুলতায় তার জীর্ণ ঘরের দরজায় খরিদ্দারের আগমনের উৎকণ্ঠায় কীভাবে প্রতীক্ষারত থাকে তারই জীবনঘনিষ্ঠ স্বরূপটি গল্পকাঠামোয় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গল্পে বিষয়টি উঠে এসেছে এভাবে :

> এতো রাত্তিরে টিনের চালের ওপর হঠাৎ ডেকে ওঠে দাঁড়কাক। তবে কি তার ঘরে কেউ এলো? শুয়ে আছে মেয়ে। তার কম্পিত ঠোঁট, তার শুষ্ক নিঃশ্বাস, তৃষ্ণা, কালোরাত্রি, আলুলায়িত চুল, তার শিথিল হাত, অনড় সময়, বিন্দুঘাম সব এক জায়গায় স্থির। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকা ধাতুরঙ প্রহরের দিকে। তার প্রতিটি মুহূর্ত স্রেফ অপেক্ষায়রত ... কেউ কি আসবে না তার ঘরে? ('সন্দংশ', KW‡cP : ৫২)

কুসুমের আতঙ্ক কাটে না, দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে না। কেননা :

> একজন পুরুষ এলে দশজনে টানাটানি ... পুরুষটিকে তারা ভাঙে, আছড়ায়, পয়সা ফেলে দিয়ে খুব ভোরে পুনরায় আস্ত মানুষ আলোপথে বেরিয়ে যায়। ... ওরা আসে নিঃশব্দে, মাংস দরদাম করে, কচি কিন্তু রসহীন নয়, কচি রসের মাঝামাঝি, সুস্থ নিটোল, কারও আবার বিকট কালো পছন্দ— ঘরের শাদা স্ত্রী ক্লান্তিকর— এইসব ফাঁকের পথেই ইঁদুরের ফাঁদ পেতে রাখে কুসুম, ওরা আসে; দাঁত চামড়া, হাত-পা সব দেখে, শিশুর চিৎকারের জল শরীরের সবখানে ছড়িয়ে আছে দেখে— পালিয়ে যায়। ('সন্দংশ', KW‡cP : ৫৩)

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের এক অলিখিত অন্ধকার জগতের ক্ষুধা-কাতরতা ও টিকে থাকার মর্মন্তুদ সমাজবাস্তবতার উন্মোচন ঘটেছে। নারীর এহেন অন্ধকার জগতের নিয়মিত খদ্দের তথাকথিত পুরুষরূপী নরখাদকের দল রাতের অন্ধকারে স্বীয় কামনার বিকৃত লালসা চরিতার্থ করে পুনরায় দিনের আলোয় তথাকথিত ভালো 'বাবা', 'স্বামী' ও 'পুত্র' হিসেবে স্বাভাবিক জীবনে সদম্ভে বিচরণ করে বেড়ায়। অথচ এইসব ভালোমানুষ পুরুষ কর্তৃক নারী পতিতাবৃত্তির মতো অমানবিক পন্থায় জীবনে বেঁচে থাকার তথা টিকে থাকার ভয়াবহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। নারী-জীবনের কঠোর বাস্তবতা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে গল্পটিতে প্রকারান্তরে : 'সমাজ জীবনের কুৎসিত ও গলিত-নোংরা চেহারাটাকে শাসরুদ্ধকর একটি পরিবেশের মধ্যে টেনে এনেছেন'[৫৭] নাসরীন জাহান অসামান্য শিল্প কুশলতায়। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের পরবর্তী গল্প 'পদ্ম কন্যা'। পদ্ম নামের মেয়েটির বাবা এক অলৌকিক স্বপ্ন দেখে সপরিবারে মুসলমান হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সমস্ত হিন্দুত্বের চিহ্ন মুছে এপারে এসে আবাস গড়েন। টাকাকড়ি ভালই ছিল, ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল টনটনে। ফলে এপারে এসে সৌভাগ্যের সঙ্গে বুদ্ধির সমন্বয় হয়ে গেলে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। ওপারে দীক্ষাগুরু সৈয়দ সাহবের উপাধি আর

নাম নিয়ে সৈয়দ নাজিম হোসেন এপারে এসে তিন সন্তানসহ খাঁটি মুসলিম পরিবারের এক মেয়েকে বিয়ে করলেন। পদ্ম নামের মেয়েটি বড় হতে হতে সেইসব ইতিহাসে ধুলো জমে গেছে, কেবল ঠাকুরমার দেয়া নামটি রয়ে গেছে তার পূর্ব-ইতিহাসের চিহ্নস্বরূপ। সৈয়দ নাজিম হোসেনের আচার-আচরণ থেকে কারও একবিন্দু সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না, তার চৌদ্দ পুরুষের কেউ কোনোদিন অন্য ধর্মের লোক ছিলো। পদ্ম সুন্দরী, গুণবতী মেয়ে। তাই দশ গ্রাম থেকে মেয়ের জন্য আসা বিবাহের প্রস্তাবে সৈয়দ নাজিম হোসেন হিমশিম খেতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে পদ্মর বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে এক রোমাঞ্চকর ভাবনার জগতে পদ্ম আবর্তিত হতে থাকে। কেননা : 'পানচিনির পর বিশাল প্রাচীর টপকে দীঘির কাছ ঘেঁষে পদ্মর বর অচিন রাতে রাজপুত্রের মতো জানালার কাছে এসে ডাকতো, পদ্ম ... পদ্ম। ... ওর স্পর্শে ছিলো এমনই উত্তাপ, এমনই প্রাণের গুঞ্জরণ, স্তব্ধ চাঁদ চেয়ে থাকতো, বিকট গাছগুলো হয়ে উঠতো আশ্চর্য মায়াবী, আর বাতাস, তার ঘ্রাণ থেকে শীত তুলে নিতো।' ('পদ্ম কন্যা', KvV‡cPv : ৫৭) পদ্মর যখন এরকমভাবে রোমান্টিক ভাবনায় সুখের সময় কাটছিলো তখনই ওদের গুদাম ঘরে আগুন লেগে সব মাল পুড়ে গেলো। সেই আগুন পুড়িয়ে দিলো পদ্মর সমস্ত সুখ স্বপ্নকে। কেননা : 'দুইভাই কষে ব্যবসার হাল ধরছে। ছেলেপক্ষ সন্তর্পণে নেমে পড়েছে দর কষাকষিতে— অগ্নিকাণ্ডের ফলে পাত্র তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না তো? এইসব কথাই নানান প্যাঁচে, নানান মুখোশের আড়ালে ছেলেপক্ষ সৈয়দ নাজিম হোসেনের কাছে পাড়ে।' ('পদ্ম কন্যা', KvV‡cPv : ৫৮) এর মধ্য দিয়েই প্রতিবিম্বিত হয়ে পড়ে পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানের বাস্তব সমাজচিত্রটি। যৌতুক প্রথার ভয়াবহতায় সমাজে বহু নারী তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন ও প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান ও অধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হয়ে চলেছে। এমনকি যৌতুকের ভয়াল থাবায় নারীর প্রতি সহিংসতার বীভৎসতা ও নারী-হত্যার জঘন্য নারকীয় ঘটনাবলি আমাদের সমাজবাস্তবতার একটি সাধারণ দৃশ্যপট। নারীর মূল্য সমাজে যৌতুকের পরিমানের উপর ভিত্তি করে উঠানামা করে— এহেন দেশচিত্রটি আলোচ্য গল্পে পদ্মর জীবনের অবয়বে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত পদ্মর বাবা তার সর্বস্বের বিনিময়ে পদ্মর বিয়ে ভাঙতে দেননি কিন্তু তারপরেও শেষ রক্ষা হয় না। কেননা : 'বিয়ের আসরে কে যেন ছেলেপক্ষকে বলে দিয়েছে, পদ্মরা সৈয়দ নয়। এক পুরুষ আগে পদ্মরা হিন্দু ছিলো।' ('পদ্ম কন্যা', KvV‡cPv : ৫৯) পদ্মর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙেচুরে খান খান হয়ে যায়। তার মানবিক সত্তা ধর্মবোধের যূপকাষ্ঠে অবমূল্যায়িত হয়ে তার জীবনকে রিক্ত, নিঃস্ব করে তোলে। বিপন্ন, অসহায় নারী পদ্ম ভাবতে থাকে : 'সেই কারুকার্যময় মানুষটি বুকের উত্তাপ দিয়ে প্রেম নিয়ে রাত্তির রাত্তির তাকে অস্তিত্বের সাথে এক করে ফেলেছিল। তখন সেই স্পর্শে গন্ধে তো পদ্ম কোনো ভেদ পায়নি? এটাও জীবন? এ-কী জীবনের রূপ?' ('পদ্ম কন্যা', KvV‡cPv : ৫৯) কেবল তাই নয়, পদ্মকে জব্দ করতেই যেন পাত্রপক্ষ পাশের গ্রামের খাঁ বাড়িতে ছেলেকে বিয়ে করিয়েছে। বৌ না নিয়ে তারা আজ ঘরে ফিরে যাবে না। পদ্মদের বাড়ির কাছে এসে পাত্রপক্ষ আরও জোরে ব্যান্ড বাজাতে থাকে। পদ্মর স্বপ্নভঙ্গের

Dhaka University Institutional Repository

বেদনায় আরও গভীরতর ক্ষত সৃষ্টি করে পাত্রপক্ষের এহেন অমানবিক আচরণ। নারীর মানবাধিকার এভাবেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজবাস্তবতায়। এ-ও এক প্রকার নির্যাতন। কেননা : 'মানুষকে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা না দেওয়ার চেয়ে বড় নির্যাতন ও নিপীড়ন আর কি হতে পারে?'[৫৮] আলোচ্য গল্পে নারীর প্রতি নির্যাতনের এই বিশেষ রূপটি শিল্পিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'মেয়েটা খারাপ' এবং 'কাঠপেঁচা' গল্পদ্বয়ে নারী-জীবনের বহুবিধ বঞ্চনার বাস্তবচিত্র মূর্ত হয়েছে। নাগরিক জীবনের বিকারগ্রস্ততা, শহরের বস্তিজীবন, ব্যক্তিমানুষের অন্তঃসারশূন্যতা, আত্মকেন্দ্রিকতা সর্বোপরি : 'ব্যক্তির প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা, তার হতাশা ও পীড়ন, তার জটিল মনোজগতে পরিপার্শ্বের নানাবিধ ঘটনাবলির অভিঘাতে সৃষ্ট সংকটসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়'[৫৯] গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে। 'মেয়েটা খারাপ' গল্পে কনা ও দীপ নব দম্পতি। কনা গান গায়, দীপ কলেজে পড়ায়। তাদের বাড়িতে প্রচুর মানুষের আনাগোনা। দীপের আত্মীয়রা, কনার গানের বন্ধুরা— সবাই তাদের বাসায় প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি— কী নেই সেইসব আড্ডার আলোচনায়। কিন্তু রাতের গভীরে এ বাড়িতেই জেগে ওঠে কাজের মেয়েটিকে কেন্দ্র করে অভিনব আরেক সংস্কৃতি। কেননা :

> কনা অবাক হয়ে লক্ষ করে কাজের ফাঁকে চলার পথেই আচমকা কেউ মেয়েটির চুল ধরে টানছে, সন্তর্পণে তার বুকে হাত ঢোকাচ্ছে ... আর তারাই— এসে ভালোমানুষী মুখ নিয়ে দীপ আর কনার সামনে বলছে, মেয়েটা খারাপ! সর্বনাশের শেষ করে ছাড়বে। ... বাড়িতে আসা বিভিন্ন পুরুষ, যারাই মেয়েটির শরীর স্পর্শ করার সুযোগ পায়, বলে— মেয়েটা খারাপ! ('মেয়েটা খারাপ', KvV‡cPv : ৭৩)

রাগে ক্রোধে দিশেহারা কনার কান দপদপ করে। সে দীপের সামনে এসে ভেঙ্গে পড়লে দীপ কনাকে এই বলে বোঝায় যে, পরিবেশ মানুষকে তৈরি করে এবং পৃথিবীতে কোনো মানুষই খারাপ হয়ে জন্মায় না। মেয়েটাকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে আলোর পথে চালিত করার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো সাহসী হয়ে উঠবার আহ্বান জানায় দীপ কনার প্রতি। অথচ এরই অন্তরালে তখন রচিত হয় ভিন্ন মাত্রার এক প্রহসন। কেননা :

> এরপর ফের রাত্তির ... গভীর গভীর রাত্তির ... খুট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলে কনা শূন্য ঘরে দাঁড়ায়। ওর হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে। এরপর পথ ... আকৃষ্ট আঁধার পথ ... কী আশ্চর্য আলোছায়া। শীত কুয়াশায় কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটির ঘরে গিয়ে কনা দেখে প্রকট এক ছায়া ... মুখে আলো পড়ায় দীপ চমকে ওঠে এবং কনাকে নিঃসাড়-বধির করে দিয়ে সে হতচকিত কণ্ঠে বলে ওঠে— মেয়েটা খারাপ ...! ('মেয়েটা খারাপ', KvV‡cPv : ৭৩-৭৪)

গল্পের কাহিনির এখানেই সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু পাঠকের বোধ জাগরিত হয় সমাজ-সত্যের কঠোর বাস্তবচিত্রের এহেন উন্মোচনে। একথা স্বীকার্য যে : 'গল্পের অন্তে চমক তৈরির এই কায়দাগুলো নাসরীনের খুব বড় গুণ বলা যায়। সেটা চমকের খাতিরে চমক নয় বরং আখ্যানের একটা দর্শনায়ন ঘটান বলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।'[৬০]

আলোচ্য গল্পের পটভূমে সমাজবাস্তবতার নির্মম পেষণে নারী-জীবনের অধস্তন অবস্থার করুণ চিত্রায়ণ ঘটেছে। নিজের পদস্খলনের দায়ভার পুরুষ এভাবেই সুকৌশলে নারীর উপর চাপিয়ে দেয়। পুরুষতন্ত্র এ ধারণার জন্ম দেয় যে : 'পুরুষের যৌন আচরণের জন্য নারী দায়ী এবং নারী বিশ্বাসযোগ্য নয়।'[৬১] 'কাঠপেঁচা' গল্পেও নারী-জীবনের নানাবিধ চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। জনৈক লেখিকা তার রচনায় সত্যিকার জীবনবোধের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন জীবনের স্বরূপ প্রত্যক্ষণে। 'আপনার লেখায় জীবন নেই' পাঠকদের এ জাতীয় মন্তব্যই প্রকারান্তরে আলোচ্য গল্পে বর্ণিত লেখিকাকে পথে টেনে আনে। তার ভাবনার আবর্তে গল্পের পরিসর বিস্তৃত হতে থাকে এবং একে একে উন্মোচিত হয়ে পড়ে সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গে নারী-জীবনের বহুবিধ জীবন-অভিধার বাস্তবচিত্র। গল্পটির কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

> ক. হেঁড়েগলায় গান গাইতে গাইতে কে একজন এই জগতের বৃত্তান্ত দেয়। এ এক আজব জগৎ, এখানে চুরি হয়, ডাকাতি হয়, খুন হয়, এখানের লোকেরা সব খায়, গু খায়, ভাত খায়, মদ খায়, পোলাও খায়; আবার ফি-দুপুর উপোস থাকে। এখানে সবচেয়ে বেশি হয় শরীরের মচ্ছব ... জীবন আছে ... এ ... এ ... জীবন! ('কাঠপেঁচা', KvV‡cPv : ৭৫)

> খ. ঝনঝন গুলতির শব্দ। এক দূরন্ত ফর্শা কিশোর নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপাশের জানালার গ্লাস ভাঙে। লেখিকা চেতনালোকে ফিরে এসে দেখেন, ভাঙা জানালার মধ্যে সুন্দরী নারীমুখ। মদে টাল বাচ্চাগুলোর পাশে বসে এক সাংঘাতিক সুন্দরী মেয়ে সেই জানালার মুখ দেখে আহা আহা করে, আমি যদি ঐ মতন হইতাম? ... গ্লাসভাঙা বাড়ির সুন্দরীকে এম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কে একজন বলে, ডায়েট কন্ট্রোল করতে করতে শেষ অব্দি মরতে বসেছিল। ('কাঠপেঁচা', KvV‡cPv : ৭৬-৮০)

> গ. মেয়েটি সশব্দে কেঁদে উঠে। আমারে রাস্তার লোক চোখ টিপে দেয়, আমার বুকে হাত দেয়।
> তাই বইল্যা ভদ্রলোকের গায়ে? ছেনাল মাগী। বলতে বলতে মহিলা মেয়েটির চুল খাঁমচে, শাড়ি ছিঁড়ে খুঁড়ে প্রায় রক্তপাত ঘটাতে থাকে। মেয়েটি দু'হাত জড়ো করে মিনতি জানায়, আমি চিনি নাই দিদি, চিনি নাই, পাঁচতারা হোটেলে কাল রাত্তিরে যে আমারে কলার খোসার মতো ন্যাংটো করলো, আমি বেহেড মাতাল হইয়া সকালে ভাবলাম এ সেই লোক। ('কাঠপেঁচা, KvV‡cPv : ৭৭)

> ঘ. লেখিকা দেখেন, সন্ধ্যার আগমুহূর্তের রাঙা আলোয় পিছনের ঘুপচি ঘরগুলো থেকে ঝুলোঝুলি করতে করতে বেড়িয়ে আসছে রঙমাখা মেয়েরা। তাদের দেহের কসরত, বুনো শিস, স্ফিত উন্নত কিংবা ঠেকা দিয়ে রাখা ঝুলন্ত স্তন নর্দমার ওপারের পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যস্ত। সেমিজ পরা একটি ছোট খুকী পর্যন্ত কোমর বাঁকিয়ে, চোখ টিপে, তার শরীরে যা যা এখনো ফুটে উঠেনি, সেই শূন্যতা পুরণের জন্য জিভ বের করে এমন কায়দা করতে থাকে, মদ খাওয়া ছোট শিশুটিও সেই আকর্ষণের মায়াজালে পড়ে যায়। তারা দুজন কাদাবালুর ওপর ঘিরে ঘিরে নাচতে থাকে। ('কাঠপেঁচা', KvV‡cPv : ৭৮)

ঙ. মেয়েটি ডুকরে কেঁদে ওঠে, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। রাজপুত্রের মুখ বিষরঙে পূর্ণ হয়ে উঠে। সে বলে, এ রাজ্যের সবাই আমাকে চেনে। বলতে বলতে খাপ থেকে ছোরা বের করে, আমি তোমার জন্য এই মুহূর্তে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু জনতার কাছে আমি এতো অসহায়, তোমাকে নিয়ে একবেলাও হাঁটতে পাররো না।... মেয়েটি কেঁদে ওঠে, তোমার রাজত্ব থাকুক, রানী থাকুক, ঐশ্বর্য, সন্তান সব থাকুক, আজীবন আমি এক নিষিদ্ধ নারীর মতো লুকিয়ে তোমাকে নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবো। ('কাঠপেঁচা', KvV‡cPv : ৭৯-৮০)

চ. পাশের লোকটি ফিসফিস করে বলে, লেখিকার লেবাস তো ভালো এঁটেছেন। অনেকক্ষণ দেখছি আপনাকে, একদম বিকোচ্ছিলেন না। ওইভাবে ওরকম বসে থাকলে ব্যবসা হয়? চলুন, পাঁচতারা হোটেলে চলুন। বলেই ছায়া-ধোঁয়াশায় হো হো শব্দে হেসে ওঠে লোকটি। ... কমলারঙের মৃদু আলোয় তার মুখ আঁধারে গণগনে দেখায়, সে লেখিকার কোমরে খোঁচা দিয়ে ছায়াকণ্ঠে বলে, ওখানেও জীবন আছে। ('কাঠপেঁচা', KvV‡cPv : ৮০)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে নারী-জীবনের নানামাত্রিক সামাজিক অনুষঙ্গের বাস্তব রূপায়ণ লক্ষণীয়। এখানে পতিতা রমণী আছে, আছে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া অবাঞ্ছিত নারীর উপায়হীনতার নগ্ন-রূপ। নিজের জন্য নয় বরং পুরুষের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করতে উদগ্রীব নারীর আত্ম-প্রবঞ্চনার বাস্তব সমাজচিত্রটিও এখানে উন্মোচিত হয়েছে। পরের সন্তুষ্টি সাধনে নিবেদিত নারীরা :'ত্বকের সৌন্দর্য মলিন হবার ভয়ে ঘরের বাইরে যায় না; ফলে এরা স্বাস্থ্যহীন। কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এদের অধিকার নেই; ফলে এরা পরাধীন। এদের একমাত্র কর্ম, আরাম আয়েশে থাকা এবং পুরুষের মনোরঞ্জন করা।'[৬২] এহেন ব্যক্তিত্বহীন নারীর চিত্রটি 'খ-সংখ্যক' উদ্ধৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এহেন ব্যক্তিত্বহীন নারী পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজ সৃষ্ট। এর পশ্চাতেও রয়েছে পুরুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা। এভাবেই :'নারীকে পুরুষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রেখে নারীর উপর পুরুষের সর্বময় প্রভুত্ব কায়েম করা হয়।'[৬৩] আর নারী হয়ে পড়ে সমাজের দৃষ্টিতে অপাঙ্‌ক্তেয় ও ক্ষমতাহীন পরজীবী চরিত্র বিশেষ।

A¨v‡jb‡cvi weovj

আমেরিকার প্রাচীন লেখক অ্যাডগার অ্যালেনপো নানা বিষয়ে লেখালেখি করলেও মূলত গল্পস্রষ্টা হিসেবে তিনি পৃথিবী বিখ্যাত। তাঁর লেখা প্রচণ্ড ছায়াময় এবং রহস্যে আবৃত। এক সময় বোদলেয়ার এবং পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লেখকের ওপর তাঁর লেখার খুব প্রভাব পড়েছিল। অ্যালেনপোর একটি বিখ্যাত গল্পের নাম 'কালো বিড়াল'; যেখানে রূপকভাবে একটি বিড়ালের পতনের বিষয় এসেছে। এই গল্পটি এক সময় সারা বিশ্বের সাহিত্য মহলে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। অনেকে ভুল বুঝে তাঁর গল্পকে হরর, অথবা ভুতুরে গল্প হিসেবে আখ্যায়িত করত। নাসরীন জাহানের সৃজনী-চেতনা অ্যালেনপোর প্রভাবে আলোড়িত হয়েছিল যা তার জবানী থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে : 'অ্যালেনপো আমার গল্প লেখার প্রারম্ভ চৈতন্যকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং সেই বিস্ময়ের জগৎ থেকে আমার মুক্তি মেলে নি বলেই আমি লিখতে শুরু করি। অ্যালেনপোর গল্পের সাথে আমার

গল্পের আর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও চেতনা জগতের অন্তরালে আমার অজান্তেই তাঁর লেখার সাথে একটি যোগাযোগ ঘটে গেছে।'[৬৪] সেই যোগাযোগের অনবদ্য শিল্পরূপ নাসরীন জাহানের A¨‡jb‡cvi weovj[৬৫] গল্পগ্রন্থ। বলবার অভিনবত্বে, ভাবনার গভীরতায় এবং বিন্যাসের সৌকর্যে গল্পগ্রন্থটি ভিন্ন মাত্রার আমেজ সৃষ্টি করেছে। অ্যালেনপোর বিড়াল একটি সিরিজ গল্পগ্রন্থ। গল্পগ্রন্থে 'অ্যালেনপোর বিড়াল : এক', 'অ্যালেনপোর বিড়াল : দুই', 'অ্যালেনপোর বিড়াল : তিন' থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে 'অ্যালেনপোর বিড়াল : তেইশ' পর্যন্ত মোট তেইশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। যদিও : 'এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্পের বিষয় আলাদা। মিল শুধু একটিই— প্রতিটি গল্পের একটি 'কমন' শেষ লাইন— 'একটি রক্তাক্ত কালো বিড়াল মরে পড়ে আছে'।'[৬৬] গল্পগুলোর বিচিত্র অবয়বে সামাজিক সঙ্কট, বিকারগ্রস্ততা, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংশয়, ক্রন্দন, দ্বিধা, ক্লেদ, অস্থিরতা, জীবনযাপনের গ্লানি, মনোপীড়ন এসবের বিপুল উপস্থাপন লক্ষণীয়। এরই সমান্তরালে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক নারীজীবনের চালচিত্র। একক কোনো গল্প নয়, একটিমাত্র কাহিনি নয়— টুকরো টুকরো নানা কাহিনির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীর পূর্ণাঙ্গ দেশচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য গল্পগ্রন্থের বিস্তৃত পরিসরে। বাংলাদেশের নারীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে আলোচ্য গল্পগ্রন্থটি যেন তারই বাস্তব শিল্পভাষ্য। গল্পগুলোর মধ্য দিয়েই পাঠক তাঁর নারীবিষয়ক আত্মসচেতন ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবেন। যদিও এ প্রসঙ্গে স্বীকার্য যে : 'পুরুষের সামাজিক রূপ আঁকতে গিয়ে আক্রোশে নাসরীন কখনোই অন্ধ হয়ে যান না, তাঁর সমাজ-চেতনার শক্তিটা প্রকাশ পায়।'[৬৭] নাসরীন জাহান চরিত্র বা মানুষকে সমাজ-আর্থ-রাজনীতির পটভূমিতে বিন্যস্ত করে তার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। ফলে গল্পগুলো হয়ে ওঠে সমাজবাস্তবতার অনবদ্য দলিল। সমাজে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্ক মূলত কীভাবে নারীর জীবনকে বিপন্ন করে তোলে, নারীর শরীরের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণহীনতা কীভাবে তার সঙ্কটকে ঘনীভূত করে তোলে, সঙ্কটের সেই প্রসঙ্গই আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'অ্যালেনপোর বিড়াল : এক' ও 'অ্যালেনপোর বিড়াল : তিন' গল্পদ্বয়ের উপজীব্য। পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজব্যবস্থায় নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনার প্রসঙ্গটি লক্ষণীয় আলোচ্য গল্পগুলোর অবয়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি পাসের যাবতীয় সনদের মূল্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে প্রচলিত সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতার ফলে। তাই 'অ্যালেনপোর বিড়াল : এক' গল্পের মেয়েটিও তার ব্যক্তিত্বের প্রবল কাঠিন্যকে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয় জনৈক পেইন্টারের নিকট কেবল একটি কাজ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। তার ব্যক্তিত্বের কাঠিন্যের কারণে যে রূপের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে কুঁকড়ে গেছে বহু পুরুষের হাত, দারিদ্র্যের নির্মম অসহায়ত্ব ও উপায়হীনতা মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত এতটাই বিপন্ন করে তুলেছিলো যে, মেয়েটির বিপন্নতাকে পুঁজি করে লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে পুরুষের লোভাতুর হাত। দেহকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত নারীর সঙ্কটের বাস্তবচিত্রটি গল্পে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

মেয়েটির দেহ শিরশির করে ... ভদ্রলোক কথা ঘুরান, তুমি টিভি মডেল হলে শাইন করবে।

এইবার মেয়েটি তাজ্জব। রূপ! এই ভদ্রলোকের চোখেও পড়েছে? মেয়েটি টানটান হয়ে ওঠে। আশ্চর্য। কাল থেকে আজ অবধি ভদ্রলোককে দেখে এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় নি, মেয়েটির দিকে তিনি মুহূর্তের জন্যও তাকিয়েছেন। ঘাই দিয়ে ওঠে মেয়েটির নিজের ঘরের ছ্যাতলাপড়া দেয়াল। ঘরের উপোস বাতাসের ফরফরানি।

যা-ই হোক, ... যা-ই ... মরিয়া মেয়েটি নিজের ব্যক্তিত্বের কাঠিন্যকে লুকাতে লুকাতে টের পায়, তার চুল সরানো ঘাড়ের ওপর ভদ্রলোকের উষ্ণ ঠোঁট। ... কার্পেটের ওপর যখন মুহূর্তগুলো ধাপের পর ধাপ এগোচ্ছে, তখন মেয়েটি প্রাণপণে ভুলে যেতে চাইছে, সে একটা কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত কোথাও আপস করছে। ভেতর ঠেলে কান্না উঠছে। (‘অ্যালেনপোর বিড়াল : এক’, A¨v‡jb‡cvi weovj : ১০)

নারীকে মানুষ নয়, নিছক ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনার প্রথাবদ্ধতার কারণেই ‘অ্যালেনপোর বিড়াল : তিন’ গল্পে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ মহুয়াকে নিয়ে তার মায়ের আতঙ্কের শেষ থাকে না। কেননা :

হঠাৎ এক ধলপ্রহরে, যখন চিল্লিয়ে মোরগ গলা ফাটাচ্ছে, পায়ের পাতা বেয়ে জলের নহর, ঘুমের বিভ্রম কাটিয়ে, ছিঃ পেশাব? কী শরম ...? কেমনে? এই ঘোর গেলে দেখে, তার আসমানের মতো বিশাল স্বাধীনতার প্রান্তর ভেঙে ফ্রকের নিচে লাল রক্ত পায়ের পাতা স্পর্শ করছে।

টের পেয়ে যে-কোনো কারণেই সারাক্ষণ ভীত মা বাজপাখির মতোন কিশোরী কন্যাকে দুডানার নিচে ঢুকিয়ে ফেলে। ... এই সম্পোক্যের মইদ্যেই দুনিয়ায় পুলাপান আহে, বিবাহের পরে আইলে হেই বাচ্চা লক্ষী ... আগে আইলে ... মাইয়াগো এই রক্ত আইলেই সাবধান হওনের বয়স। (‘অ্যালেনপোর বিড়াল : তিন’, A¨v‡jb‡cvi weovj : ১৩)

তাছাড়া মহুয়ার ভাবনায় আলোড়িত হয় : ‘মানুষের ক্যান সব খাইতে ইচ্ছা হয়? মহুয়া ভেবে আকুল, পশু, ঠোঁট-রঙ, দেহ? ক্যান মানুষ কয়, তোর গাল আপেলের ... ঠোঁট কমলার কোয়া ...? একদিন ওই জান্তব মরদ কুদ্দুসটা পর্যন্ত চোখ বুঁজে— আহা, মহুয়ার ঘেরান! খায়া ফালাইতে ইচ্ছা হয়। ক্যান?’ (‘অ্যালেনপোর বিড়াল : তিন’, A¨v‡jb‡cvi weovj : ১৪) মহুয়ার ভাবনা, তার মায়ের আতঙ্ক প্রকারান্তরে সমাজে নারীর নিরাপত্তাহীন অবস্থাটিকেই মূর্ত করে তোলে। বয়োঃবৃদ্ধির সময়কালীন মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন প্রত্যেক নর-নারীর জীবনে যদিও একটি স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষণীয় নারীর জন্য জীবনের এ পর্যায়টি তার সামূহিক সঙ্কটকে যেন আরো ঘনীভূত করে তোলে। এ সবই মূলত পুরুষতন্ত্রের ফল। কেননা : ‘পুরুষ তার স্বার্থে নারীর জীবনকে এরকম করে তুলেছে। ... নারীর শরীর যে নারীর নয়, ওই শরীরের ওপর যে তার নিয়ন্ত্রণ নেই।’[৬৮] এহেন অমানবিক সমাজপ্রসূত আচরণের শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে গল্পদ্বয়ের পটভূমিতে। সমাজে পুরুষ এভাবেই নারীর শরীরকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে নারীর মানসিক মূল্যবোধের অবমাননা করে চলেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এহেন ধারণাও বলবৎ যে, নারীকে বশে রাখতে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যদি নির্যাতনের প্রয়োজন পড়ে, তবে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে, সমাজের সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনে নির্যাতন

অপরিহার্য। নারী-ধর্ষণ, নারী-নির্যাতনেরই এক বিশেষ রূপ মাত্র। ধর্ষণ প্রক্রিয়ায় কেবল নারীদেহ ভোগের পাশবিক লোলুপতারই প্রকাশ ঘটেনা বরং এর মধ্য দিয়ে পুরুষের ক্ষমতা ও ক্রোধেরও যৌন বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 'অ্যালেনপোর বিড়াল : তিন' গল্পে মহুয়াকে ধর্ষণের আড়ালেও সুপ্ত ছিল পুরুষতান্ত্রিক পাশবিকতার সহিংস মনোবৃত্তি। লক্ষণীয় :

> কুদ্দুস নিঃশব্দে মহুয়ার মুখ চেপে ধরে। চারপাশে সটান চোখ যায়, মনার ছুটন্ত পালাতে যাওয়া দেহ। প্রথমে দুই বিষফোঁড়া গলাতে থাকা কুদ্দুসের আঙুল ... না ... না চাঁদ নয়, মৃত্যুর আগের পিশাচ লাল রক্ত দিয়ে পাহাড়, মাটি, মহুয়ার কানে নিজ গোঙানির শব্দ। কুদ্দুস বলে, কথা কইলে কল্লা ফাঁক। প্রথমে মনে হয় মাটির ওপর নিজের দেহটাকে দোমরানোর শব্দ পেয়ে পাতাগুলো হিসহিস করছে, ওরা বাতাসকে বলছে, হায়! হায়! এইসব কী ... না, মা-কে ডাকছে কোনো শিশু, আর প্রাণান্তকর নিঃশ্বাস ফেলছে আমার পায়ে দড়ি বান্দো ... মা, দাদিগো, পুলসেরাত পার হইতে পারি নাই ... দোযখ-আগুনের কড়াই-তেলে পইড়া গেছি ...। সামনে ইয়া বড় বড় সাপ বুড়ো মহুয়া গাছটাকে খাবলে ধরেছে ... মা'র ফিসফিস সাবধান বাণী ... বাচ্চা হইয়া যাইবো ... চন্দ্র-আলোয় মহুয়ার সদ্যভূমিষ্ঠ বাচ্চাটাকে আসমানে তুলে ধরেছে কেউ ... পৃথিবীতে যন্ত্রণা কাকে বলে ...? ('অ্যালেনপোর বিড়াল : তিন', A¨v‡jb‡cvi weovj : ১৬)

সমাজ বিনির্মিত পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য বা পুরুষসুলভ সুবিধা জাহির করার সুতীব্র বাসনা থেকেই ধর্ষণের মতো নির্মম ও অমানুষিক নির্যাতনের জন্ম। গল্পটিতে সেই সমাজসত্যই প্রতিবিম্বিত হয়েছে মহুয়ার ওপর ঘটে যাওয়া মর্মন্তুদ নির্যাতনের প্রতিকল্পে। দৈহিক ও মানসিকভাবে নারী নির্যাতনের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। নারীও মানুষ; পুরুষও মানুষ। কিন্তু নারীর মানবাধিকার যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, নিজ জীবনের উপর অধিকার কিংবা নিজস্ব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারে যদি অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করা হয় তথাকথিত সামাজিকীকরণের অজুহাতে, তাহলে অবশ্যই তা নারীর ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, আমাদের সমাজবাস্তবতায় প্রতিনিয়তই নারীকে এহেন প্রতিবন্ধকার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নারীর মতামত বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার যথাযথ মূল্যায়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। পরিবারে, সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে— সর্বত্রই নারীর ব্যক্তিসত্তার অবমাননার চিত্রটি সুস্পষ্ট। এভাবেই প্রকারান্তরে : 'পুরুষ নারীকে পুরুষ-আধিপত্য মেনে নিতে এবং পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে।'[৬৯] নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার বাস্তবচিত্রটি আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'অ্যালেনপোর বিড়াল : দুই', 'অ্যালেনপোর বিড়াল : নয়' এবং 'অ্যালেনপোর বিড়াল : চৌদ্দ' গল্পগুলোতে শিল্পিত হয়েছে। গল্পগুলোর কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> ক. শীতরাতে প্রায়ই বিড়ালের কান্না শোনা যায়। বিশেষত স্ত্রীর উষ্ণ সান্নিধ্যে স্বামীটির ওম যখন গাঢ় হয়। এডগার অ্যালান পো স্ত্রীর প্রিয় লেখক। সে স্বামীকে তাঁর নানা গল্প শোনালে স্বামী রীতিমতো চিন্তিত, বলে এসব অসুস্থ মস্তিষ্কের ভুতুরে লেখা। আমি এসব শুনতে চাই না। স্ত্রী আর শোনায় না। ('অ্যালেনপোর বিড়াল : দুই', A¨‡jvb‡cvi weovj : ১২)

খ. অন্ধকার প্রিয় মেয়েটির। ... কালো রঙ ভীষণ প্রিয় তার। কালো, যে-কোনো কিছু। ঘরভর্তি কালো পোষাক, কালো আসবাব ... নিজের ফর্সা রূপ প্রায় আয়নায় দেখতে ভালো লাগেনা বলে, মাঝে মধ্যেই সে সারা দেহে কালো রঙ মাখে। এটা বাড়াবাড়ি, ছেলেটি বলে, যদি কষ্ট না পাও, তবে বলব এ তোমার একরকম মানসিক রোগ। ... প্রেমের প্রথম মুহূর্তগুলি ধেয়ে ধেয়ে আসে। কালো রঙের প্রতি মেয়েটির মোহ দেখে ছেলেটি বরং অভিভূত হয়েছিল, বলেছিল, সত্যিই তুমি অন্যরকম। ... মেয়েটি আহত— তাহলে তুমি আমাকে খুশি করতে একগাদা কালো টি-শার্ট পরতে? একদমই অপছন্দ করে? মেয়েটি কিছুক্ষণ ভাবে— আচ্ছা, আমরা যেমন দুজন দুজনকে ভালোবাসি, সেইভাবেই আমরা দুজন দুজনের দুটি পছন্দের রঙকে এক করতে পারি না? ('অ্যালেনপোর বিড়াল : নয়', A¨v‡jb‡cvi weovj : ৩৪-৩৫)

গ. এ বাড়ির শিশু বিড়ালটিকে বড় মমতায়
আদরে ঘিরে কিশোরীতে রূপান্তরিত
করেছে।
প্রথম দিকে এ নিয়ে স্বামীটি মাথা
ঘামায় নি। পাঁচ বছরের দাম্পত্যে
বেচারির সন্তান হচ্ছে না। বিড়ালটিকে
স্নেহের মধ্যে স্বামীটি এক আশ্চর্য
মাতৃরূপ দেখে।
তার বরং স্বস্তিই লাগে।
তাই বলে কালো বিড়াল? গ্রাম
থেকে আসা শাশুড়ি প্রথমে বিষয়টির
বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কালো বিড়াল সংসারের শনি।
...
কিন্তু কদ্দিন ধরে বাড়ির বাস্তবতা
পাল্টে গেছে।
ব্যবসার যে কাজেই হাত দিচ্ছে,
স্বামীটি ধরা খাচ্ছে। ...
এইরকম অবস্থায় অসহায় স্ত্রীর মধ্যে
চলতে থাকে নির্মাণ আর ক্ষয়ের
দ্বন্দ্ব। দিন রোদ্দুরের রক্তমাংস
আহার করেছে রাত। ('অ্যালেনপোর বিড়াল : চৌদ্দ', A¨v‡jb‡cvi weovj : ৪৫-৪৬)

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলোতে সমাজবাস্তবতায় নারীর অবরুদ্ধ অসহায় অবস্থার বাস্তব দেশচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে। নারীর নিজস্ব কোনো পছন্দ-অপছন্দ থাকতে নেই। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর নিজস্ব ভাবনার বলয়টিতে পুরুষের অযাচিত হস্তক্ষেপের পরিচয় সুস্পষ্ট। স্ত্রীর পছন্দের লেখক ও এ-সম্পর্কিত ভাবনাকে

স্বামীটির কাছে নিতান্তই ভুতুরে ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, স্ত্রীর স্বকীয়তাকে স্বীকার করে নেয়ার ক্ষেত্রেই স্বামীটির রয়েছে উন্নাসিকতা ও দ্বিধা যা প্রকারান্তরে নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাবসত্যটিকেই প্রতীয়মান করে তুলেছে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়, যে কালো রঙের প্রতি আসক্তির কারণে মেয়েটিকে ভালোবাসে ছেলেটি, সেই কালো রঙই এক পর্যায়ে ছেলেটির ভেতরে ক্রোধের জন্ম দেয়। সে কারণেই কালো বিড়ালটিকে, যেটি বিয়ের সময় মেয়েটিকে দেবার কথা ছিলো, হত্যা করতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপেনি ছেলেটির। কালো বিড়ালটিকে নয় প্রকারান্তরে মেয়েটির নিজস্বতাকেই যেন উপেক্ষা করেছে ছেলেটি। একই কারণে গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় যে, স্বামীটি সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের সামূহিক ক্ষতির জন্য স্ত্রীর পোষা প্রিয় কালো রঙের বিড়ালটিকে প্রকারান্তরে স্ত্রীকেই দোষী সাব্যস্ত করে বসেছে। সন্তানহীন নারীর সন্তানতুল্য প্রিয় কালো বিড়ালটিকে হত্যার মধ্য দিয়ে অব্যক্ত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে স্বামীটি। এ-বিষয়ে স্ত্রী কতটা মর্মাহত হতে পারে সে ভাবনা মুহূর্তের জন্যও স্বামীকে বিচলিত করে নি। আলোচ্য গল্পগুলোর অবয়বে নারীর ব্যক্তিসত্তার অবমূল্যায়নের সমাজচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে যেখানে : 'নিজের জন্য নারী কিছু করবে না; করার অধিকার তার নেই। সংসারের সেবায় নিবেদিত প্রাণ নারী স্বামী-সন্তানের পরিচর্যায় নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দেবে। নারীর নিজস্ব সত্তা কিংবা চিন্তার স্বাধীনতা— কোনোটাই সমাজ ভালোভাবে মেনে নেয় না।'[৭০] নারীর স্বকীয়তা বা ব্যক্তিসত্তার মূল্যায়ন তো দূরের কথা বরং নারীকে হীন করে পুরুষের অধীনে অধস্তন করে রাখার জন্য কৌশলে সামাজিকীকরণের অজুহাতে নারীর গতিবিধি গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়। কেবল তাই নয় : 'নারীর কয়টি সন্তান হবে, কখন হবে, পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা হবে কি-না ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কোনো অধিকার নেই; যদিও প্রজননে নারীর মুখ্য ভূমিকা; কিন্তু প্রজনন সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পুরুষের।'[৭১] এহেন সমাজবাস্তবতার করুণ চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'অ্যালেনপোর বিড়াল : ছয়' গল্পের বিস্তৃত পরিসরে। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত ছয় ভাই বোনের বিশাল পরিবারের বড় ছেলে ফিচকা সারাক্ষণ মেজাজ গরম করে থাকে। বাবার অতি প্রিয় কালো বিড়ালটিকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। এমন কি দাদীর রেখে যাওয়া এই কালো বিড়ালের প্রতি তার বাবার অপরিসীম ভালোবাসা ফিচকাকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ করে তোলে। এর কারণও অবশ্য আছে। এমনিতেই অভাবের সংসার, এর মধ্যেই আবারো তার মা গর্ভধারণ করেছে। পরিবারে আগত নতুন মুখ কোনো আনন্দের বার্তা বয়ে আনে না, আসে তাদের পোড়া রুটিতে ভাগ বসাতে। কালো বিড়ালটিও তাই হয়ে ওঠে তাদের অভাব-অনটনের সংসারের দারিদ্র্যের বোঝাটিকে আরও ভারবাহী করার এক নির্মম প্রতিপক্ষ। ফিচকার ক্রোধ এবং সন্তান জন্মদান প্রসঙ্গে তার মায়ের ভাবনার আবর্তে প্রজননে নারীর অজ্ঞতা, উপায়হীনতা তথা নারীর মতামতের গুরুত্বহীনতার প্রসঙ্গটি আলোচ্য গল্পে সমাজবাস্তবতার আলোকে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

Dhaka University Institutional Repository

> এর মইধ্যে পেডের মইদ্যে আরেক রাক্ষস আনছে— বাক্যটি বিন বিন করে মন্টুর মগজ কচলে খায়। অথচ মা বলেছে, পেটের মধ্যে রাজকন্যা রাজপুত্র আল্লাহ পাঠান, এতে মানুষের কোনো হাত নেই। ... গর্ভে সন্তান আসার খবরটি মা মন্টুর সামনেই বাবাকে দিয়েছিল, অন্য সন্তানেরা কাছে ছিল না, পিচ্চি মন্টুকে আমলে না এনে বাবা বিরক্তি ঝেড়ে দিয়েছিলেন, আবারো আরেকটা? বড়ি খাওনা ঠিকমতো? বড়ি খাইলে আমার মাথা ঘুরে, মা বলেন, কামের দিশা পাই না, থাকিই বা কয়দিন? এর লাইগ্যা হারা মাস কষ্ট ... এরপর মার ধৈর্যময় মধুর হাসি, আল্লায় পাঠাইছে ...। ফিচকা সহজ ভাষায় খুলে বলতে থাকে। ... কথার লাগাম নেই ফিচকার, বাবায় আমাগোরে ঘুমে থুইয়া মা'র সামনে লুঙ্গি খোলে। এই যে, আরেকটা আইতাছে, আমাগো পোড়া রুটিতে ভাগ বসাইতে, বাপ মায়ের লগে অমন ফুর্তি করে বইল্যাই, বিশ্বাস না অইলে এক রাইতে দেখামু। মন্টুর প্রশ্ন, দোষ তো তাহলে মা'রও, ফিচকার ধমক, আরে মা তো বাপের দাসী, বাপ যা করতে কয়, তাই তো হেয় করে। ('অ্যালেনপোর বিড়াল : ছয়', A¨v‡jb‡cvi weovj : ২৫-২৬)

বস্তুত আমাদের সমাজে এভাবেই নারীকে অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের মতোই যৌনতা ও প্রজনন বিষয়ে নির্বাক ও নির্লিপ্ত করে রাখার সমাজসত্যটি আলোচ্য গল্পের অবয়বে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নারী কেবল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত হতে পারে না। প্রত্যেক নারীর জীবনে নিজ নিজ উদ্দেশ্য আছে; নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার মধ্যে তার মানবিক মর্যাদা নিহিত। একজন মানব সন্তানকে উদ্দেশ্য পূরণের উপায় বা মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা মানে তার মানব সত্তাকে অগ্রাহ্য করা, অবজ্ঞা করা। আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর পৃথক অস্তিত্ব প্রায়শই স্বীকার করা হয় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই :

> স্বামী স্ত্রীকে গৃহের সৌন্দর্যবর্ধক গুল্ম মনে করে; স্ত্রী স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য লালিত বস্তুতে পরিণত হয়। নিজেকে গুল্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেয়া নারীর মানবিক সত্তা লোপ পায়। নিজের বিকাশ এবং নিজেকে মহীরূহে পরিণত করার সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পরিবর্তে এহেন সত্তা বিবর্জিত নারী প্রতিবন্ধী ক্ষীণজীবী লজ্জাবতী লতায় পর্যবসিত হয়।[৭২]

এহেন সমাজবাস্তবতায় স্বভাবতই নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্যকে নারীর মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনার বিষয়টি একেবারে বিরল কোনো ঘটনা নয় বরং এটিই প্রকৃত সত্য। মেয়েরা চটকদার পোশাক পরিধান করবে, প্রসাধনে নিজেকে আবৃত করবে, সুগন্ধি মেখে দেহের স্বাভাবিকতা ঢেকে রাখবে। এভাবে পুরুষের পছন্দ মোতাবেক তারা নিজেদের কৃত্রিম জড় পদার্থে পরিণত করবে। আর এর অন্তরালে হারিয়ে যাবে নারীর পৃথক স্বাধীন মানবিক অস্তিত্বের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, নারী-জীবনের এহেন অবরুদ্ধ, উপায়হীনতা ও মানবিক সত্তার অবমূল্যায়নের জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'অ্যালেনপোর বিড়াল : চার', 'অ্যালেনপোর বিড়াল : বিশ' ও 'অ্যালেনপোর বিড়াল : একুশ' নামক গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে। এ প্রসঙ্গে গল্পগুলোর কতিপয় উদাহরণ অনুধাবনযোগ্য :

> ক. 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি ...।'
>
> ঝাউবনের আলুথালু বাতাসের নিচে শুকনো পাতার ফরফরানি, তারই চিলতে চিলতে ফাঁকে বসে ছেলেটি তার কড়া ফর্সা আঙুলগুলো দিয়ে মেয়েটির ছায়াগাল স্পর্শ করে। ভাগ্যিস রবিঠাকুর কালো মেয়েদের কিছুটা রক্ষা করেছেন।

মানে তোমার পাশে আমার গায়ের রঙ নিয়ে যখন খচখচ শুরু হয়, মেয়েটি অস্ফুটে বলে, তখন তোমার মুখে এই লাইনটা সমস্ত রক্তে শাদা স্রোতের আগুন লাগিয়ে দেয়।... তোর আর আমার রঙের কী মিল ... বলতে বলতে মেয়েটি তলিয়ে যায়, একটা ডোরাকাটা বিড়াল এই হুলো কালোটার প্রেমিকা ছিল। একদিন একটা ফটফটে শাদা বিড়ালের সঙ্গে সেই প্রেমিকা ভেগে গেলে দাঁত-নখ দিয়ে নিজের শরীর ছিঁড়ে মরতে বসেছিল এ। ... আশ্চর্য স্থিরতা ছেলেটির, কেবল নিজের শৈশব-কৈশোরের গল্প বলতে বলতে মেয়েটির আঙুল নিয়ে খেলছে, আসলে যা হয়, এক সন্তান, ভীষণ একা বড় হয়েছি, বাবা-মা চাকরিতে, তোমার কাছে এলে বড্ড আশ্রয় পাই। মেয়েটি নিজের বরফ হৃৎপিণ্ডে ধেয়ে উঠতে থাকা আগুনের ফুলকি নিভিয়ে ধীরকণ্ঠে বলে, সেই জন্যই তো বড্ড ভয় হয়, একমাত্র সুদর্শন পুত্রের জন্য এই কালো মেয়েকে তোমার ফ্যামিলি ...? ('অ্যালেনপোর বিড়াল : চার', A¨v‡jb‡cvi weov j : ১৭-১৮)

খ. শোনো, আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা হারিকেনের অন্ধকার আলোয়। সারাক্ষণ মাকড়সার জাল লটকে থাকত সিলিং জুড়ে। ক্ষীণ হাড্ডিসার মা'কে দেখেছি পয়সা দেখলেই কেবল চকচক করে উঠতে। এবং আমাকে, বালিকা বয়স থেকেই আত্মীয় পুরুষরা নিভৃতে কেবল পয়সা দেখিয়ে ...। সেই আমি অনেক চালাকি, অনেক বুদ্ধির বিনিময়ে তোমরা যাকে পঞ্চাশোর্ধ নির্মম বুড়ে বলো, তার অর্থ প্রতিপত্তিতে মুগ্ধ হয়ে ...। বুঝতেই পারছ এই নিরাপত্তা সহজে আমি ছাড়ছি না। ... এর আগে ঠিক আজকের মতো আমি এমন বেহিসেবি হই নি। কী এক সংস্কার ছিল। তীব্র অতৃপ্তির যন্ত্রণা নিয়েও নিজেকে বেঁধে রাখতাম। ... হাত বাড়িয়ে একটা কালো বিড়াল এগিয়ে দেয় আমার দিকে। মনে পড়ে? ছেলেবেলায় শাদা বিড়াল খুব প্রিয় ছিল তোমার? আর যে তোমার শাদা রঙ দেখে তোমার স্বামী তোমাকে বিয়ে করেছিল তাকেই পোড়াচ্ছো। বিড়ালটি আমিই পাঠিয়েছিলাম? বাঁচালে না? ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই শাদার প্রতি তোমার ঘৃণা আসার কথা? ('অ্যালেনপোর বিড়াল : বিশ', A¨v‡jb‡cvi weov j : ৭৬-৭৮)

গ. লেকের হাওয়া ধেয়ে ধেয়ে এসে নারীটির মুখ জলার্দ্র করে তোলে। ভদ্রলোক মানে ওর স্বামী মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকালে সে হতচকিত হয়ে নিজের মধ্যে না-তরঙ্গ না-শীতলতা কিচ্ছু অনুভব না করে আঙুল দিয়ে শাড়ির আঁচল পেঁচাতে থাকে। ... ভদ্রলোকের দীর্ঘশ্বাস প্রলম্বিত হয়, তোমার বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ না হলে নিশ্চয়ই আমার মতো জোয়ান মেয়ের পিতা, বিপত্নীক এক লোককে বিয়ে করতে না। ... নারী অস্ফুটে বলে, অথবা ভাবে, এ বাড়ির কিচ্ছুর সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার যন্ত্রণায় নারীটি যেমন সারাক্ষণ বিষণ্ন ঘরে কাঁদতে কাঁদতে চোখে জলহীন হাসে, তেমনই বিড়ালটিও। তবে পার্থক্য আছে, মেয়ে দু'টির নিষ্ঠুর আচরণে একদিন স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বিড়ালটির চোখে সে জল দেখেছিল। ('অ্যালেনপোর বিড়াল : একুশ', A¨v‡jb‡cvi weov j : ৭৯-৮০)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছে সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রতি পুরুষের পণ্যসুলভ হীন মানসিকতার পরিচয়টি সুস্পষ্ট। নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্যের আড়ালে চাপা পড়ে যাওয়া অন্তরের মানবিক শক্তির স্ফুরণ কীভাবে পদদলিত হয়ে চলেছে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজ-সংসারে— তারই জীবনঘনিষ্ঠ চিত্রায়ণ ঘটেছে গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে। সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে খোলসবন্দি নারী নিজেকে আবিষ্কার করে সবার কাছে উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত সর্বোপরি অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত কালো বিড়ালের অবয়বের সঙ্গে। বাহ্যিক সৌন্দর্যের মোড়কে নিজের ব্যক্তিসত্তার বিলোপ সাধন করে নারী ক্রমশ ডুবতে থাকে হতাশার গভীরতায়।

নারীর মানবিক সত্তার সেই অবরুদ্ধ, উপায়হীন অপমৃত্যুর বাস্তব নির্মম জীবনালেখ্যই আলোচ্য গল্পগুলোর মূল উপজীব্য। পিতৃতন্ত্র পুরুষ প্রভুত্ব সংরক্ষণের জন্য নারীকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, নারী স্বভাবগতভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে, পুরুষের চেয়ে বুদ্ধিমত্তা ও দৈহিক শক্তিতে খাঁটো। পিতৃতন্ত্র নারীর মধ্যে আবিষ্কার করেছে, অমায়িকতা, বিনয়, বিনম্রতা, সহনশীলতা, সংবেদনশীলতা, পরনির্ভরশীলতা তথা অপেক্ষাকৃত কোমল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা প্রকারান্তরে সমাজে পুরুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব তথা কর্তৃত্বের অধিকারকে জোরদার করে তোলে। সব কিছু মেনে নেয়া ও মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতাকে নারীর ভালোত্বের পরিসীমায় ফেলে নারীর স্বাধীন মানবিক সত্তার পরিসরটিকে সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করা হয়। এভাবেই সমাজে নারী-পুরুষের অসম-সামাজিক অবস্থানটি মূর্ত হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের ‘অ্যালেনপোর বিড়াল : তেরো’ গল্পে নারী-জীবনের এই বিশেষ সমাজবাস্তবতার আলোকে রূপায়িত হয়েছে। নারীকে অবদমনের একটি কৌশল হিসেবে নারীকে হেয় জ্ঞান করার সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় গল্পটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। গল্পে বিধৃত হয়েছে : ‘নারী মানে আলতার রঙ, রঙধনুর আলো, আলোর কোমলতা ... নারী মানে’ (‘অ্যালেনপোর বিড়াল : তেরো’, A¨v‡jb‡cvi weovj : ৪৩) নারী-সম্পর্কিত এহেন ভাবনায় নিমজ্জিত ছেলেটিকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি যখন বলে : ‘নারী মানে পুরুষের সমান্তরালে চলা একজন মানুষ’ (‘অ্যালেনপোর বিড়াল : তেরো’, A¨v‡jb‡cvi weovj : ৪৩) তখন স্বাভাবিকভাবেই ছেলেটি যেন স্নায়ুতে নিজের মধ্যে ক্রমশ রোমাঞ্চহীনতা টের পায়। মেয়েটির কোনো কিছুকে ভয় না-পাওয়ার প্রবণতা ও কাউকে পরোয়া না-করার দৃঢ়তা ছেলেটিকে যেন বিব্রত করে তোলে। তাছাড়া বিয়ের প্রসঙ্গে মেয়েটি যখন ছেলেটিকে জানায় যে, সামনের মাসে তার প্রমোশনটা হয়ে গেলেই সে বিয়ে করতে রাজি, তখনও ছেলেটির বিস্ময় প্রকারান্তরে তার আতঙ্ককেই প্রকটিত করে । কেননা মেয়েটি ছেলেটির চেয়েও বেশি বেতন পাবে— ছেলেটির এহেন বিস্ময়বোধ, আশঙ্কা ও সংশয় প্রকারান্তরে সমাজে নারী-পুরুষের প্রথাবদ্ধ অসম-অবস্থাটিকেই প্রতিবিম্বিত করেছে। পুরুষ চায় নারী ভীত থাকবে, অবলম্বনহীন হয়ে পুরুষের কাছে সহায় খুঁজবে, নারীকে উপায়হীন দেখতে অভ্যস্ত ছেলেটি তাই একরকম স্বস্তিবোধ করে যখন :

> ছেলেটির ঘর থেকে তার পোষা কালো বিড়ালটি ছুটে এসে ছেলেটির প্যান্টের প্রান্ত কামড়ে আদুরে হয়ে উঠতে থাকে। এ আমার নিঃসঙ্গ ঘরের বন্ধু বলতে বলতে মহাবিস্ময়ে ছেলেটি দেখে, অলক্ষে মেয়েটির চোখে এই প্রথম ভয় খেলে যাচ্ছে। তুমি ভয় পাচ্ছ? শিরশিরে আনন্দে ছেলেটির কণ্ঠে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাসন। হা হা তুমি যাকে ভয় পাও, আমি হবো তার রাজা ...। (‘অ্যালেনপোর বিড়াল : তেরো’, A¨v‡jb‡cvi weovj : ৪৩-৪৪)

ছেলেটির ভাবনার অবয়বে আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত অবস্থানটি উন্মোচিত হয়েছে। এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট : ‘পুরুষ শাসিত মূল্যবোধ সমাজে প্রচলিত থাকায় সমাজ এটাই জানে ও শিখে যে নারী দুর্বল ও হীন। ... বাস্তবিক সমাজে নারী আত্ম-সম্মানের অভাবে আত্ম-নির্ভরশীল না হয়ে পরনির্ভরশীল

হয়ে সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, অন্যদিকে অধিকার বঞ্চিত হয়ে বাস করছে।'[৭৩] আত্ম-সম্মান না থাকাটা যে কোনো মানুষের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। অথচ মানব সমাজে প্রতিনিয়ত এমন দুর্ভাগ্যের শিকার হচ্ছে নারীসমাজ। সমাজের অবরোধ ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীর আত্ম-জিজ্ঞাসারও কোনো সুযোগ থাকে না— এহেন সমাজবাস্তবতার শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য গল্পের অবয়বে। নারীর স্বাধীন সত্তার অবমূল্যায়ন করে তার মানবিক অধিকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়াও যৌন জীবনেও নারীকে পুরুষের অধস্তন করে রাখার সমাজচিত্রটি আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'অ্যালেনপোর বিড়াল : দশ' ও 'অ্যালেনপোর বিড়াল : বাইশ' গল্পদ্বয়ের আঙ্গিকে বিধৃত হয়েছে। নারীর মত পুরুষও পারিবারিক জীবন যাপন করে কিন্তু পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম সমাজ নির্দিষ্টভাবে কতগুলো নারীর জন্য ও কতগুলো পুরুষের জন্যে বণ্টন করেছে। তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারী ও পুরুষের অভিজ্ঞতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। বিবাহিত একজন পুরুষের পরনারীতে আসক্তির বিষয়টিকে সমাজে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখার যে প্রবণতা রয়েছে একই বিষয়ে নারীর ক্ষেত্রে একদম বিপরীত মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজে এহেন নারীর খেতাব জোটে 'নষ্টা মেয়েমানুষ' হিসেবে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় একজন পুরুষের পরদার গমন ক্ষমার চোখে দেখা হয়; কিন্তু নারীর পদস্খলন গুরুতর শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়। সমাজে, সংসারে স্বামীর পরনারীতে আসক্তি ও অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত মূল্যবোধের কারণে নারী একরকম মেনে নিতে বাধ্য । ফলে মানসিকভাবে নারী বিপর্যস্ত ও বিব্রতবোধ করে। অন্যদিকে সমাজের আপাত সম্মতি নিয়েই যেন পুরুষ তার হীন ও বিকৃত কামনার পরিবৃত্তি ঘটায়। এভাবেই : 'সমাজে নারী-পুরুষের জন্যে দুরকম মূল্যবোধের জন্যে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়। নারীকে সমাজ একপেশে দৃষ্টিতে বিচার করে বলে নারী হীন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।'[৭৪] অবদমিত, অবহেলিত ও অসহায় নারী তথাকথিত সামাজিকীকরণের বলি হয়ে পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ককে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেনে নেয়; এমনকি পুরুষের এহেন কার্যকলাপের জন্য নারী কখনো-বা নিজেকেই দায়ী ভাবতে শেখে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির এমন কুটিল জাল বুনে রেখেছে যে পুরুষের অনৈতিক সম্পর্কে জড়ানোর ক্ষেত্রে সমাজ আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে : 'নারী পুরুষকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি কিংবা পুরুষ জৈবিক নিয়ম দ্বারা চালিত হয়েছে অথবা তাকে প্রলোভন দেওয়া হয়েছে।'[৭৫] অর্থাৎ কৌশলে পুরুষের অপরাধের দায়ভারটুকু পর্যন্ত নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। সমাজবাস্তবতার এহেন অসম অবস্থানে নিপতিত নারী-জীবনের মর্মন্তুদ দিকটি আলোচ্য গল্পগুলোর মূল উপজীব্য। গল্পগুলোর কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> ক. দাঁতে দাঁতে ঠোক্কর। মেঝেতে ঘুমায় বুয়া। সন্তর্পণে তাকে এড়াতে গিয়ে টের পায় শূন্য। কোথায় গেল? ধুর, নেহাতই বয়স কম, আমি কি পুরুষ না নাকি? কিসের ডর? ... স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় চাপিয়ে ওঠা বীরত্বের অর্গল ভেঙে ছেলেটির মনে হয়, দৌড় দিয়ে মায়ের ওমের মধ্যে গিয়ে পড়ে। বাঁক ঘুরতেই আবার ফিসফাস। নিজেকে টান করে,

একদম হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে ঘরের পেছনে দম বন্ধ করে সে দাঁড়ায়। আব্বার ঘরের পেছনের দু'জানালার এক জানালায় ঘাপটি মেরে বিড়ালটি বসে আছে। অন্য জানালায় উঁকি দিতেই আব্বা এবং এই বাড়ির কোনো রমণীর জড়াজড়ি ফিসফাসে সে মানুষ নয়, অবচেতনে বিড়ালের মতো শব্দ করে ওঠে। আব্বার মাথা ঘুরতেই ছেলেটি এক দৌড়ে ঝোপের পেছনে গিয়ে পালায়। যন্ত্রণা, বিষাক্ত চেনা-অচেনা ক্লেদে বুকটা হু হু করে। ('অ্যালেনপোর বিড়াল : দশ', A¨v‡jb‡cvi weovj : ৩৬-৩৭)

খ. স্বপ্নের ঘোরে দিনেও স্ত্রী কেমন যেন আচ্ছন্নের মধ্যে থাকে। নিজের ঢেঁকিতে পারা দেবার শব্দে নিজেই আচমকা চমকে ওঠে ... সে দেখে, স্বামীর দেহের ওপর মানুষের মুখ নয়, কালো বিড়ালের কল্লা। এক হাহা ভয় পিপাসার ঢেউ তাকে কিছুক্ষণ লাশের মতো করে রাখে। ... গতকাল ঠাঠা রোদে দেখা দৃশ্যটি তাকে নিথর করে তোলে। এ পাড়ারই রঙিলা মেয়ে ফুলবানু লাল নীল সজ্জিতা হয়ে উঠোনের ওপর রগড়াচ্ছিল স্বামীর চোখের সামনে, স্বামী কী একটা বলায় হি হি হাসিতে ভূমণ্ডল কাঁপিয়ে প্রশ্ন করেছিল, সাহস আছে? স্বামী ঠোঁট উল্টালো, তগো মাইয়াগো সাহস আমার দেহা আছে। মেয়েটির হাসি ততধিক উপচানো, বেবাকেরই তুমার বউ পাইছো নাকি? খোয়াব দেইখ্যা ডরায়। ... আজ দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকে সে, যতক্ষণ না স্বামী নাক না ডাকে। ... হাত দিয়ে মুখ চেপেও সে স্বামীর পাশে নিজের আর্তনাদ ঠেকাতে পারেনা। ('অ্যালেনপোর বিড়াল : বাইশ', A¨v‡jb‡cvi weovj : ৮২-৮৩)

গ. নারীটি এখন বাপের ভিটায়। স্বামীটি কিছুদিনের জন্য বেড়ানোর জন্য দিয়ে গেছে, যদি, মাথা ঠিক হয়। খাঁখাঁ চরাচরে শূন্য বাড়িতে ঠিকঠিকে এক বৃদ্ধা দাদি ছাড়া ত্রিসীমানায় নারীটির কেউ নেই। ঠোঁটে ছিটকিনি এঁটে বুক বেদনায় মিহি কেঁদে কেঁদে নারীটি বেড়াল নয়, দেখে ঝকঝকে উঠোনে রঙিলা কন্যা আর তার স্বামীর পাগল নাচন। ('অ্যালেনপোর বিড়াল : বাইশ', A¨v‡jb‡cvi weovj : ৮৩)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ ও নারীর উপায়হীনতা ও মেনে নেয়ার প্রবণতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি বৈষম্যমূলক সমাজবাস্তবতায় এহেন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া নারীচিত্তের বিকারগ্রস্ত আচরণের স্বরূপ-সন্ধানের প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত । পুরুষের অনৈতিক আচরণের যাঁতাকলে পিষ্ট নারীর অবদমিত চিত্তের বিভ্রান্তিকে সমাজ মনোবৈকল্য আখ্যা দিয়ে প্রকারান্তরে পুরুষের হীন স্বার্থসিদ্ধির পথটিকেই সুগম করেছে যা সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলে।

Avðh †'ewk ï

সাহিত্য করবেন এই ছিল নাসরীন জাহানের সারাজীবনের আরাধ্য। সম্ভবত বাংলাসাহিত্যে তিনি : 'সেই দুর্লভ লেখকদের একজন, যিনি উপন্যাস এবং ছোটগল্প— এই দুটি ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতায় উৎকর্ষিত।'[৭৬] যদিও গল্প-উপন্যাস এর মধ্যে তিনি আশৈশব গুরুত্ব দিয়েছেন গল্পকেই। কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর সেই তৃষ্ণা থেকেই তিনি তাঁর লেখা সবচাইতে প্রিয় গল্পগুলোকে Avðh †'ewk ï[৭৭] গল্পগ্রন্থে স্থান দেন। গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলো যথাক্রমে 'হত্যাকারী', 'অন্যরকম', 'আশ্চর্য দেবশিশু', 'ইচ্ছাশক্তি', 'প্রতিপক্ষ

শকুনেরা', 'পরপুরুষ', 'এক রাতে, রেস্তোরাঁয়', এবং 'মাকড়সা শিশু দৈত্য ও সম্মিলিত কণ্ঠ'। প্রতিটি গল্পকেই সমকালীন বাংলাদেশের দর্পণ বলা যায়। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে বিধৃত আখ্যানভাগে ও চরিত্রসমূহের আচরণ ও কথায় যেমন গল্প আছে তেমনি কথাহীনতায়ও গল্প পরিলক্ষিত হয়। জীবনের গল্পই গল্পগুলোর উপজীব্য। প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়েই কথাসাহিত্যের কারবার। জীবনের রূপ তাতে অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিত। স্বাভাবিকভাবেই তাই আলোচ্য গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো নিছক নির্জলা কোনো গল্প হয়ে থাকে না, আমাদের বোধ আর আবেগের কাছে তীব্র আবেদন তৈরি করে। প্রাসঙ্গিকভাবেই যেন গল্পগুলোতে কথার পিঠে আরেকটি কথা চলে আসে— চলে আসে জীবনের বাস্তবতাকে মূর্ত করার প্রয়োজনেই। বাস্তবতার অনুষঙ্গেই গল্পগুলোতে রূপায়িত হয়েছে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবন-অভিধা। বাংলাদেশের নারীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে, নাসরীন জাহানের গল্পগ্রন্থ যেন তারই রূপভাষ্য। বলা যেতে পারে গল্পে : 'নাসরীন সবচেয়ে কুশলী চোখে নারীর চোখে বিশ্বকে দেখেছেন, সেই দেখায় নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ আছে বটে, কিন্তু তা উচ্চকিত নয়। কোনো মতবাদকেই তিনি শিল্পের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে দেননি।'[৭৮] আলোচ্য গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'হত্যাকারী'। গল্পে নারীর রূপ তথা বাহ্যিক সৌন্দর্য কীভাবে তার সঙ্কটকে ঘনীভূত করে তোলে, নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার বাস্তব চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর পৃথক মানবিক অস্তিত্ব অবমূল্যায়িত হয়। নারীকে ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে বিবেচনার প্রবণতা পুরুষশাসিত সমাজবাস্তবতায় নৈমিত্তিক চিত্র। সে-কারণেই গল্পের লোকটি স্ত্রীর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও লোভাতুর পুরুষের অযাচিত আচরণের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের স্ত্রীকেই হত্যা করেছিল। যদিও স্ত্রীর প্রতি লোকটির ভালোবাসায় কোনো কমতি ছিল না কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত জীবনে ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় স্ত্রীর উপায়হীন পদস্খলনকে মেনে নেয়ার মতো মনোবল ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব লোকটিকে হিংস্র করে তোলে। স্ত্রীর ছিল ভয়ঙ্কর খিদে। একবেলা উপোস করতে হলে তার আত্মহত্যার ইচ্ছে জাগত। শেষ পর্যন্ত যদিও লোকটি :

> বাঁদি খাটবার জন্য একবার স্ত্রীকে সে ঘরের বাইরে পাঠিয়েছিল, কিন্তু শত্রু হয়েছিল রূপ। যেদিকেই হাঁটে সর্বত্রই সস্তা হাতের হাতছানি। ... একদিন ছুরি দিয়ে লোকটি বুকের বাঁ পাশটা ছিঁড়ে ফেলেছিল। সেই ক্ষতস্থান দেখিয়ে বাঁশি বাজানোর ফলে কিছু আয় বেশি হলে সে স্ত্রীর জন্য বোরখা কিনে নিয়ে এসেছিল। বোরখা পরেই মহিলা কিছু দূরে ইট ভাঙার কাজ নিল। ... মনে পড়ে, বোরখার নিচেও আবিষ্কৃত হয়ে পড়েছিল রূপ। ইট ভাঙত যেখানে, সেখানকার মালিক সেই ঝলক রূপ অবলোকন করে পাগল প্রায় হয়ে ওঠে নারীর মাংস স্পর্শের জন্য। ('হত্যাকারী', Avðh †'ewkï : ১১-১২)

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য বর্ণনায় সমাজে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনার সমাজ-প্রসূত ধারণার জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষণীয়। আলোচ্য গল্পে বর্ণিত লোকটির স্ত্রীর মতো নিম্নবর্গের অসহায় দরিদ্র নারীই কেবল এহেন সঙ্কটের মুখোমুখি হয় না বরং যে কোনো শ্রেণি-পেশার নারীর জন্যই স্বীয় কর্মস্থলে যৌন হয়রানির বিড়ম্বনায় পড়া নিতান্ত মামুলি বিষয়। গল্পের স্ত্রীলোকটি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়েই জীবিকার সন্ধানে ইট ভাঙার কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় পুরুষ শাসিত সমাজবাস্তবতা। যদিও এর জন্য : 'নারী কর্মজীবীকে দোষ দেওয়া যায় না; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় নারীকে। ... যৌন হয়রানির কারণ, জেন্ডার বৈষম্য যা নারীকে ক্ষমতাহীন ও পুরুষের পদানত করে রেখেছে। ... পুরুষের মধ্যে এহেন মনোভাব কাজ করে যে, নারী গৃহে যে ভূমিকা পালন করে, কর্মস্থলেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে।'[৭৮] সে কারণেই আলোচ্য গল্পে স্ত্রীটির জন্য বোরখা পরিধান করার পরেও সম্ভবপর হয়নি পুরুষের নগ্ন পাশবিকতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। শরীরকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত সঙ্কট শেষ পর্যন্ত তার প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ চিত্র কেবল সমাজের নিম্নবর্গের উপায়হীন নারীর জন্যই নির্ধারিত নয় বরং ব্রাত্যনারী থেকে অভিজাত নারী, নিম্নবর্গের থেকে উচ্চবর্গের নারী, সাধারণ সরল গ্রাম্য নারী থেকে প্রখর রাজনীতি-সচেতন নারী— সবার ক্ষেত্রেই কর্মস্থলে যৌন হয়রানির প্রবণতা অনেকটা একই পর্যায়ের। মাত্রাগত ভিন্নতা থাকলেও প্রকৃতিগত সাযুজ্যে সকল নারীর জন্যই নিপীড়নের পটভূমি একই সমান্তরালে পরিব্যপ্ত— এ সমাজসত্যটিই আলোচ্য গল্পের বিচিত্র পরিসরে শিল্পিত হয়েছে। পরবর্তী গল্প 'অন্যরকম'-এ বর্ণিত হয়েছে মা-মেয়ের জীবনালেখ্য। নিজ গর্ভে জন্ম নিলেও সময়ের পরিক্রমায় একটা পর্যায়ে নিজের আত্মজাও কেমন অচেনা হয়ে পড়ে, একজন মা তার মাতৃত্বের সমস্ত নির্যাসটুকু উজাড় করে দেয়ার পরেও দেখা যায় জীবনের একটা পর্যায়ে বাৎসল্য আর সন্তানের সব অনুভবকে আগের মতো স্পর্শ করতে পারছে না। সন্তান যখন বড় হতে থাকে তখন মায়ের সঙ্গে এক পর্যায়ে আর যোগাযোগ পূর্বের মতো থাকে না। যে মায়ের ওপর সন্তান দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিল একসময়, এক পর্যায়ে সে মায়ের সঙ্গেই লক্ষণীয় সন্তানের সব কষ্টের আর যোগাযোগ ঘটে না। দুজনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা হয় না, এটা দুজনের জন্যই খুব বেদনাদায়ক। তবু এটাই সত্য। নিজের আত্মজার মধ্যে মা তার অপূর্ণ ইচ্ছার বাস্তবায়ন করতে চান। নিজের অতৃপ্ত, অসম্পূর্ণ স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটাতে চান কন্যার অবয়বে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময়ই সেই ইচ্ছার পরিপূর্ণতা ঘটে না— এরকম একটি ভাবানুষঙ্গে 'অন্যরকম' গল্পের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে। এক মা তার মেয়ের মধ্যে নিজের জীবনের ব্যর্থতার, তার অসম্পূর্ণ স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন দেখতে উন্মুখ। মা ও মেয়ের কথোপকথনের সূত্রে গল্পের কাহিনি যেমন অগ্রসর হয়েছে তেমনি এরই সমান্তরালে মায়ের নানা স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় উন্মোচিত হয়েছে নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সমাজবাস্তবতা। গল্পের কতিপয় উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

ক. ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি, দুটো সমান পা নিয়ে আমি দৌড়চ্ছি। আমার বয়স দশ-বারো, আমার মেয়ের চেয়েও অনেক কম। এমন স্বপ্ন আমি এই জীবনে কমই দেখেছি। অথচ খুব বেশি দেখাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তাহলে মানতে হবে দুটো অসম পা নিয়ে আমার কোনো বিকার নেই? অনেক ভেবেছি, হয়তো বিকার ঠেকাতে সচেতনতা এত বেশি, সেই লোহার দেয়াল ফুঁটো করে স্বপ্নও প্রবেশ করতে পারে না। তবুও দেখেছি, সহজ পায়ে হাঁটছি। সেসব স্বপ্নে সহজ পায়ে হাঁটতেই কেমন আড়ষ্ট লাগত। (‘অন্যরকম’, Avðh †‘ewkï : ২০)

খ. আমার বেড়ে ওঠা, বাবার অপার্থিব স্নেহ, আমার দিকে তাকিয়ে মা’র কান্না—। মা-বাবার মৃত্যু, ভাইদের বিচ্ছিন্নতা, এই বাড়িটি আমার নামে লিখে দেয়া, এ বাড়ির লোভে এক অপদার্থ লোকের আমাকে বিয়ে করা, তার মৃত্যু—। নিচের তলা ভাড়া দিয়ে আমরা মা-মেয়ে দিব্যি বেঁচে আছি, জীবনে সংগ্রাম কোথায়? দুটি স্বাভাবিক পায়ের, একজন সুন্দর পুরুষের জন্য কতটা কাল বুভুক্ষু হয়ে আছি!... কতদিন সুন্দর দেখি না। ... আমি বহু বছর পর আমার মায়ের কষ্ট অনুভব করি। কেন গর্ভেই তোর মৃত্যু হলো না— মায়ের এ জাতীয় আহাজারির কারণে চিরকাল তাকে শত্রু ভেবেছি। আসলে একেক জনের যন্ত্রণা প্রকাশের ধরন একেক রকম। ... আমি এক সময় মায়ের তেমনই অসহ্য যন্ত্রণাকর একটা সম্পত্তি ছিলাম। মা আমাকে ফেলতে পারতেন না বলে নিজের মতো উল্টাপাল্টা ব্যবহার করতেন। আমার মেয়ের সামান্য স্বকীয়তা এই জন্যই আমাকে ভীত করে। (‘অন্যরকম’, Avðh †‘ewkï : ২৩-২৭)

গ. সেদিন আমার এক পরিচিত লেখিকা-বান্ধবী বলেছিল, সে এক নারীর পরকীয়া বিষয়ে গল্প লিখেছিল। সেটা ছাপানোর আগে স্বামীকে পড়তে দিলে স্বামীর সে কী রাগ! এরপর থেকে লেখিকা স্ত্রীকে তার স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে আসছে। (‘অন্যরকম’, Avðh †‘ewkï : ২৫)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে জীবনের নানামুখী বাস্তবতায় নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থানের চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। শারীরিক ত্রুটির কারণে একজন মানুষের মানবিক সত্তার বিপর্যস্ত অবস্থার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে। নারীও মানুষ, পুরুষও মানুষ। কিন্তু শারীরিক ত্রুটির বিষয়ে সমাজে একজন পুরুষের প্রতি যে বিবেচনাবোধ, একই পরিস্থিতিতে নারীর ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সোনার আংটি বাঁকা হলেও দামী— পুরুষের শারীরিক ত্রুটির বিষয়টিকে এভাবেই দেখবার প্রবণতা আমাদের সমাজে সাধারণ চিত্রপট। অথচ এহেন পরিস্থিতিতে নারী হয়ে ওঠে পণ্যস্বরূপ। তাই লক্ষণীয়, আলোচ্য গল্পে বর্ণিত দুটো অসম পায়ের অধিকারী নারীটিকে কেবল একটি বাড়ি লিখে দেয়ার মাধ্যমেই এক অপদার্থ লোকের সঙ্গে সংসার করতে হয়। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে নারীর মধ্যে জন্ম নেয় মনোবিকার যা প্রকারান্তরে বৈষম্যমূলক সমাজবাস্তবতাকেই প্রতিবিম্বিত করে। তাছাড়াও লক্ষণীয় যে সমাজে একই বিষয়ে পুরুষের যে অভিগম্যতা নারীর ক্ষেত্রে পরিসরটি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত। তাই গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে জনৈক নারী লেখিকার পরকীয়া বিষয়-সম্পর্কিত লেখা গল্পপাঠের পরিণতিতে তার স্বামীর সন্দেহের কবলে পড়তে হয় লেখিকা-বান্ধবীকে। এতে এই বাস্তবতাই মূর্ত হয়ে ওঠে যে : ‘নারী ও পুরুষকে পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, অনুশাসন একদৃষ্টিতে দেখে না।’[৭৯] আলোচ্য গল্পে মা ও মেয়ের নানামুখী অভিব্যক্তিতে এই সমাজসত্যের শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'আশ্চর্য দেবশিশু' একটি অসাধারণ শিল্পসৃষ্টি। গল্পে ইঙ্গিতময়তায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে নারীর নানামাত্রিক বঞ্চনার জীবনালেখ্য। চন্দ্রমুখী এক অপয়া রমণী। কেননা বছর বছর তার যদিও-বা সন্তান জন্মে কিন্তু সে সন্তান হয় মৃত। এহেন অপয়া, অশুভ নারীর প্রতি নেমে আসে নানামাত্রিক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার অমানবিক বর্বরতা। স্বামী ও শাশুড়ির নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত চন্দ্রমুখীকে শায়েস্তা করতে এগিয়ে আসে সমাজ— তার যাবতীয় প্রথাবদ্ধ সংস্কার নিয়ে। সামাজিক সংস্কারের সূত্রে বাড়িতে আগমন ঘটে পীরবাবার। চন্দ্রমুখীর ভাগ্য নির্ণিত হয় পীরবাবার পরামর্শ মোতাবেক। সমাজে নারী-সম্পর্কিত ভাবনার স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়ে পড়ে কথিত পীরবাবার কৌশলময় বিশ্লেষণে। অবশেষে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিগৃহীত চন্দ্রমুখী একাকী বেরিয়ে আসে রাস্তায়। আশ্রয় প্রার্থনা করে গ্রামের সহমর্মী প্রতিবেশি বিধবা অপেরা দিদি নামক আরেক অসহায় নারীর কাছে। এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু গল্পের রেশ কাটে না। পাঠকের সচেতন বোধ হতচকিত হয়ে পড়ে চন্দ্রমুখীর জীবন-বৃত্তান্তের মর্মন্তুদ পটভূমে। এরই সমান্তরালে সমাজে নারীর যথার্থ অবস্থান ও নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজবাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে। আলোচ্য গল্পের কতিপয় উদাহরণ থেকে সমাজবাস্তবতায় নারী-জীবনের বহুমাত্রিক লাঞ্ছনার মর্মান্তিক দৃশ্যপটটি প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে জীবনঘনিষ্ঠ চেতনার আলোকে ;

> ক. সন্তান মরে যায় অপুষ্টিতে। দূর গাঁয়ের ডাক্তার আরো বলেছে, এই শিশু-মহিলা কি করে ধারণ করবে আরেকটি শিশুকে? প্রস্ফুটিত পেট নিয়ে বছর বছর কচ্ছপের মতো হাঁটে চন্দ্রমুখী। বছর বছর— কম কথা!
> এ কী ধরণের বাক্যি গো? বছর বছর গেলেও মেয়ের গর্ভিণী হওয়ার বয়স হয় না? তারপর দেখ না, নিতম্বের বাহার। ইচ্ছে হয় গরম খুন্তি দিয়ে ছাঁকা দেয়। এইভাবে চন্দ্রমুখীর চারপাশে সারসার মুখ আবর্তিত হয়। বর্শার ফলার মতো আসমান বিদ্ধ করে মন্দিরের চুড়ো। রক্তস্রোতে ঘোর শোরগোল তুলে মাজারের কোরাস বাড়তে থাকে। ('আশ্চর্য দেবশিশু', Av›ðh †'ewkï : ৩০)

> খ. শাশুড়ি তো নয়, ঠাকুরমার ঝুলির রাক্ষুসী। ... গর্ভভারাক্রান্ত দেহে স্বামী যখন বিদঘুটে মজা নিয়ে ঝাঁপাতে থাকে, শোণিত স্রোতে শিরশির গড়াতে থাকে কালিজিরার দানা, যখন গরম খুন্তি দৃষ্টির সামনে নানা কায়দায় ঝুলতে থাকে, যখন দশপাণ্ডবের ত্রাসের রাজত্বে দাঁতকপাটি লাগার উপক্রম হয়, গর্ভের শিশু ক্ষুধায় চিৎকার করতে থাকে। চন্দ্রমুখীর চারপাশে তখন দ্রুত রাত্রি নেমে আসে। ('আশ্চর্য দেবশিশু', Av›ðh †'ewkï : ৩২)

> গ. দশ চক্ষু বিস্ফারিত করে গণগনে কণ্ঠে সেই আজব পীর জানায়— নারীর মইধ্যে আছে দুই জাত। সুজাত। কুজাত। এরপর সে সুজাত নারীর বিশ্লেষণে বসে। এতো হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা, যেন নারী নয়, ডানাওয়ালা ফেরেশতার বর্ণনা চলছে। সেই নারী যেন মলমূত্র কিছু ত্যাগ করে না। সারা শরীরে সারাক্ষণ গোলাপ ফুলের গন্ধ। পদক্ষেপে শব্দ নেই, কম খায়, কম ঘুমায়। তার হৃদয় উৎসারিত কর্পূরের গন্ধে বাতাস আমোদিত। সে নারী কখনো প্রেয়সী, কখনো দাসী, কখনো মাতা, যার শান্তির জন্য যে ভূমিকা প্রয়োজন, সেই নারী সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।
> শেষে আসে কুজাত নারীর প্রসঙ্গ।

সেই বর্ণনায় চন্দ্রমুখী ফাঁপা তুলো হয়ে বাতাসে ওড়ে। এ জাতের নারী দেখতে কুৎসিত হয়, মরা ইঁদুরের মতো গন্ধ ছড়ায়, এদের গর্ভে কখনোই সুসন্তান হয় না। অনড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রমুখী। ('আশ্চর্য দেবশিশু', A\ðh †'e\kï : ৩৪)

ঘ. পরদিন সন্ধ্যায় তুমুল বৃষ্টি। চারপাশে মেঘের তীক্ষ্ণ গর্জন। এর মধ্যে ভেসে আসছে সেই নেশালু ঘ্রাণ। চন্দ্রমুখী অবসন্ন পায়ে বেরিয়ে আসে। ... ঘোর অন্ধকারের বৃষ্টির পথে নেমে পড়ে সে। ঠাণ্ডা বরফের টুকরো বুক ফুঁড়ে আত্মায় প্রবেশ করে। তার কঠিন হাত অপেরা দিদির দরজা স্পর্শ করে— দিদিগো, ওই পুরুষদের ঘর আর করবো না। দরজা খোলো, আজ থেকে আমি তোমার ঘর করব। ('আশ্চর্য দেবশিশু', A\ðh †'e\kï : ৩৮)

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলোতে নারী-জীবনের নানামাত্রিক জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তবতার প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। বছর বছর সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে চন্দ্রমুখীর প্রজনন স্বাস্থ্যের অপুষ্টিজনিত অবয়ব সমাজবাস্তবতায় অগণিত নারীর অবদমিত বঞ্চনার চিত্রটিকেই প্রতিবিম্বিত করে তোলে। নারীর কয়টি সন্তান হবে, কখন হবে, পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা হবে কি-না ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কোনো অধিকার নেই; যদিও প্রজননে নারীর মুখ্য ভূমিকা; কিন্তু প্রজনন সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পুরুষের— এহেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রতি উন্নাসিকতা ও নিগ্রহের মর্মন্তুদ চিত্রটি ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রূপায়িত হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের কারণে নারীর ভাবনা মূলত হয়ে পড়ে পুরুষেরই ভাবনা। নারী হয়ে ওঠে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী। কেবল তাই নয় : 'পুরুষের ভাবনার ছকেই তখন নারীর জীবন আবর্তিত হয়। ... আমাদের গ্রামীণ নারী এভাবেই পুরুষকেই ধ্যানজ্ঞান মনে করেছে। তার ভেতরে গড়ে উঠেছে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বোধ।'[৮০] নারী-জীবনের এ-ও এক মাত্রা। পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে নারী এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে নারীর দ্বারা নারী নির্যাতিত হয়। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে নারী-জীবনের এই বিশেষ দিকের যেখানে চন্দ্রমুখী সর্বদা তার শাশুড়ির নির্যাতনের আতঙ্কে ভয়ের মধ্য দিয়ে চলতো। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর প্রতি সমাজের স্বার্থান্বেষী হীন মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, নারী স্বভাবগতভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে, পুরুষের চেয়ে বুদ্ধিমত্তা ও দৈহিক শক্তিতে হীন ও দুর্বল। পুরুষ ও নারীর মধ্যে : 'জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং পুরুষকে নারীর উপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে পিতৃতন্ত্র ভ্রান্ত বিশ্বাস সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, পুরুষ সমাজের কর্তা এবং নারী পুরুষের অধীন, বশীভূত।'[৮১] পুরুষের সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই নারীকে অবদমনের যাবতীয় বিধান তথাকথিত সামাজিকীকরণের অজুহাতে নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর সুজাত ও কুজাত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই সমাজসত্যেরই প্রকৃত চিত্রটি শিল্পিত হয়েছে। প্রত্যেক নারীর মধ্যে যদি এ ধারণা, এ সত্য, জাগ্রত করা না যায় যে, নারীর এহেন অধস্তন অবস্থার জন্য নারীর অক্ষমতা, অপারগতা বা ত্রুটি দায়ী নয়; এ অবস্থা স্বাভাবিক বা জৈবিক নয়; বরং সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট লালিত ব্যবস্থা— তাহলে নারীর মানবিক সত্তার মূল্যায়ন

সম্ভবপর নয়। কেননা : 'জাগ্রত নারী এ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে; পুরুষের অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে পারে।'[৮২] তাই সর্বাগ্রে নারীর স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। নিজের মানবিক দাবি আদায়ে সোচ্চার হতে হবে নারীকেই— এহেন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে। পুরুষতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করার সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আলোচ্য গল্পের চন্দ্রমুখী তাই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য করে আত্মমুক্তির আর আনন্দের পথ খুঁজে নিতে গ্রামের বিধবা প্রতিবেশি অপেরা দিদির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। এভাবেই : 'নারীই হয়ে উঠবে নারীর আশ্রয়, যৌথ জীবনযাপনের অংশ'[৮৩]— এই দৃঢ় অভিপ্রায়ের শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'পরপুরুষ' গল্পেও নারী-জীবনের বঞ্চনা ও প্রতিবাদের সমাজচিত্রটি অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে। গল্পের শুরুটাই অনন্য আর যাদুকরী। অসাধারণ অভিনবত্বে গল্পের শুরুটা হয়েছে এভাবে :

> কুসুম দেখল, সারা চরাচর নীল করে ধেয়ে আসত যেসব জালালি কবুতর, কী এক ধাক্কা খেয়ে সেগুলো ক্ষুদ্র পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে মুহূর্তে সব শূন্য করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। পায়ের তলায় কুটকুট কামড় দিচ্ছে বিষ পিঁপড়ে, এর মধ্যেই গাছপালার ওপর তখন ভর করছে সন্ধ্যা।
>
> কুসুমের তালাক হয়ে গেল। ('পরপুরুষ', A\ðh †'e\kï : ৫৩)

অসাধারণ ভাবকল্পের মধ্য দিয়ে, নির্লিপ্তির সৌন্দর্যে গল্পটি নারী-জীবনের এক বিশেষ মাত্রার পরিচয়বাহী। যে-স্বামী দশজনের সামনে চিৎকার করে কুসুমকে তালাক দিয়েছে সে-ই লুকিয়ে এসে জোর জবরদস্তি করে কুসুমের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে মিলিত হয়। বলে যে, ইমাম সাহেবকে বলে সে আবার কুসুমকে ঘরে তুলবেই। কেননা : 'হাফিজের কণ্ঠ এবার আর্দ্র হয়ে আসে, বিরাট সর্বনাশ কইরা ফালাইছিরে। আমি অহন অক্ষরে অক্ষরে বুঝতাছি, তরে ছাড়া আমার জুইৎ লাগে না।' ('পরপুরুষ', A\ðh †'e\kï : ৫৭) এই জুইৎ না-লাগাটা শরীরের আকর্ষণে বা বিশেষ অনন্যতায় নয়, এটা দীর্ঘসহবাসে রচিত মায়া-টান-আবেগ। স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া জীবনের প্রথম স্বীকৃতির ধাক্কা সামলে কুসুমের মনে নতুন ভাবনা সঞ্চিত হয়। কুসুমের ব্যক্তি সত্তা জেগে ওঠে। যে কুসুম এতদিন নিজেকে ভারবাহী পশু ব্যতিত আর বেশি কিছুই মনে করতে পারে নি, সে-ই হিল্লাবিয়ার এক রাতের স্বামীকে টেনে নিয়ে তার এতদিনকার বঞ্চিত-জীবনের প্রতিশোধ নেয়। যে কুসুম সমাজ-পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে ভাঙতে উন্মুখ, সে তার স্বামীর দাস-মেরুদণ্ডহীন-সব মেনে নেয়া স্বভাবকে আর শরীরের টানের বিচারেও গ্রাহ্য করে না। স্বামীর কাছ থেকে নিজের স্বীকৃতি কুসুমকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে যেমন সচেতন করে তোলে তেমনি তার ওপর নেমে আসা পরিবার, সমাজ তথা প্রতিষ্ঠান-প্রসূত অমানবিক গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ও অবহেলা-উপেক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থার বাস্তবচিত্রটিকেও উন্মোচিত করে। গল্পের কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে অনুভবযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

ক. হৃৎপিণ্ডের কাজ ফুরোলে কুসুম সব স্পর্শ করতো চামড়া দিয়ে।
শাশুড়ি বলত কান কাটা বেহায়া।
স্বামী বলত গাছের গুঁড়ি।
সেই পাট চুকে যাওয়ার পর সুড়সুড় করে বাড়িতে এসে পা রাখতেই মা রূপান্তরিত হলো শাশুড়িতে। ... কুসুম বুঝল, সে চিরজীবনের জন্য তার অতিচেনা বাপের বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছে। ('পরপুরুষ', A\ðh †'e\kï:৫৩)

খ. খাঁ-দের বাড়িতে ঠিকা ঝি'র কাজ নিয়ে ক'দিন পরই কুসুম তার চির জীবনের জের টানতে থাকে। পার্থক্য একটাই, রাত এলে যন্ত্রণাময় শরীরটা থেকে কেউ মাংস খুবলে নিতে চায় না। এ যে সৃষ্টিকর্তার দেয়া কী আজব শাস্তি কুসুম বুঝে পেত না। এই রকম যন্ত্রণার সম্পর্ক ছাড়া নাকি সন্তানও হয় না। সন্তান তাদের হয়েওছিল। দুটো ছেলে সন্তান জন্ম দেয়ায় ও বাড়িতে তার অবশ্য আলাদা এক রকম কদর ছিল। সেই ছেলে দুটোকে আজরাইল যে কী ইশারা করল! এক দুপুরে গলা জড়াজড়ি করে কোনো এক ফাঁকে অথৈ পানিতে তারা অন্তিম ডুব দিল। ('পরপুরুষ', A\ðh †'e\kï : ৫৫)

গ. কুসুমের নির্দিষ্ট ছকের জীবনের মধ্যে আবার একটা উল্টোপাল্টা লেগে যায়। তার যন্ত্রচালিত পা ঢেঁকির গোড়ায় বিরামহীন চাপ দেয়, কিন্তু সম্মুখের পিষ্ট ধানের মতো তার বুকের ভেতরটার যাবতীয় খোসা অনর্গল ভাঙতে থাকে। বহুদিন পর কুসুমকে কী এক কষ্ট গ্রাস করে। খোসা খুলে পড়তে থাকায় মৃত্যুর মতো হুহু শীত ঢোকে ভেতরে। আবার তাকে ফিরে যেতে হবে— বেহায়া, গাছের গুঁড়ির জীবনে? ওই লোকের যদি আবার জুৎ নষ্ট হয়ে যায়? ('পরপুরুষ', A\ðh †'e\kï : ৫৭)

ঘ. হাফিজ চাপা কণ্ঠে বলে, কিন্তু নিয়ম যে এইডাই। আমার যদি হিল্লা দেওন লাগতো তয় কি আমি অত চিন্তা করতাম? এক বেডিরে এক রাইতের লাইগ্যা বিয়া করন, বিষয়ডা কী এমুন খারাপ! তুই আরেক বেডারে বিয়া কইরা হের বাদে আমার কাছে আইবি, আরেক বেডার জুডা কইরা দেওয়া শরীল লইয়া আমার ঘর করবি, বিষয়ডা বুঝ।
আফনের যুদি হিল্লা অইত তয় আফনে জুডা অইতেন না?
পুরুষ মাইনষের শইল কুনোদিন জুডা অয়? ('পরপুরুষ', A\ðh †'e\kï : ৫৮)

ঙ. এতসব কবিরা গুনাহের ধাক্কায় বিক্ষিপ্ত কুসুম মাঝখানের কুপি সরিয়ে তার এক রাত্রির জন্য নির্ধারিত স্বামীর সামনে গিয়ে বসল। এই লোকটি একটি লুঙ্গি, দুই কুচি চাল আর একটি নতুন ডুগডুগির বিনিময়ে তাকে এক রাতের জন্য বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। কুসুমের বুকের দলা দলা বিষ ওপরে উঠে তার জিভ তেতো করে তোলে। এর মধ্যেই বিচিত্র কণ্ঠে পাশের ঝোপে শেয়াল ডেকে উঠলে কুসুমের গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে যায়। কুসুম তার চামড়া দিয়ে অনুভব করে, বেড়ার ফাঁকে দু'টি চোখ শত শত চোখে রূপান্তরিত হয়েছে। এর মধ্যে জলে ডুবে যাওয়া ছেলে দুটোর মাথা এমন ভুস করে ভেসে ওঠে যে, কুসুমের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। সে বলল, আফনে আমার স্বামী। আইজ থাইক্যা আমি এইডাই বুঝি, আর কুনো পরপুরুষের কাছে আমি যাইমু না। ... রাত গভীর হয়। এরপর কী এক প্রচণ্ড জেদে, কী এক উদগ্র কান্নায় কুসুম নতুন শাড়ির আঁচলের ঝাপটায় দপদপ জ্বলতে থাকা কুপির শিখা নিবিয়ে দিল। ('পরপুরুষ', A\ðh †'e\kï : ৬১-৬২)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে বিধৃত হয়েছে সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত অবস্থান ও সমাজে নারীর প্রতি নিগ্রহ ও বঞ্চনার নানামাত্রিক অনুষঙ্গ। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কুসুমের প্রতি শাশুড়ি, স্বামী হাফিজ এবং কুসুমের মায়ের আচরণের অবয়বে সমাজে নারীর প্রতি নির্যাতন ও অবজ্ঞার বাস্তব চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। নারীর যেন নিজস্ব কোনো ভুবন বা পরিচয় থাকতে নেই। সমাজবাস্তবতায় লক্ষণীয় যে নারী কখনো পিতার, কখনো স্বামীর এবং তারপরে পুত্রের জীবনযাপনের অংশ হয়ে ওঠে। এভাবেই নারীর স্বাধীন মানবিক সত্তার অস্তিত্ব ভূলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে আমাদের প্রচলিত সমাজবাস্তবতায়। নারীর ঠিকানাবিহীন সত্তাহীন অস্তিত্বের স্বরূপটি কুসুমের অবয়বে গল্পে শিল্পিত হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারী নয়, পুরুষকে প্রাধান্য দেয়, পুত্রসন্তান কামনা করে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দু'টো পুত্রসন্তানের জন্মের পরে শ্বশুর বাড়িতে কুসুমের আলাদা কদর ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত ছেলে দুটোর অকাল মৃত্যু হয়। তবুও এই ‘আলাদা কদর’ থাকার বিষয়টি প্রকারান্তরে সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপটিকে উদ্ভাসিত করেছে। যদিও সন্তান ছেলে অথবা মেয়ে হবে কি-না— এ বিষয়ে নারীর কোনো ভূমিকা নেই; বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এর পুরো দায়ভার বর্তায় পুরুষেরই উপর; তবু এর জন্য নারীকেই মুখোমুখি হতে হয় বিরূপ-কঠোর সমাজবাস্তবতার। এ সমাজসত্যেরই প্রকাশ ঘটেছে খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সমাজে নারী-পুরুষের অসম বিভাজন রেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। তাই হিল্লা বিয়ের বিষয়ে হাফিজ এবং কুসুম— উভয়ের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যা ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়। তথাকথিত সংস্কার বা সামাজিকীকরণের অজুহাতে সমাজ নারী-পুরুষের মধ্যে জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে নারীর অধস্তন অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। বলা যেতে পারে যে : ‘এরকম বৈষম্য সমাজের দ্বৈত নীতির জন্যেই ঘটেছে, সমাজ পুরুষের জন্যে উৎকৃষ্ট নীতি এবং নারীর ক্ষেত্রে নিম্নমানের নীতিকে অবলম্বন করে। নারীকে সমাজ একপেশে দৃষ্টিতে বিচার করে বলে নারী হীন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।’[৮৪] একই রকম কাজের ক্ষেত্রে সমাজে নারী-পুরুষের জন্যে দুরকম মূল্যবোধের কারণে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়— এ সমাজসত্যটিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে ঘ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে। ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কুসুমের হাফিজকে প্রত্যাখ্যান এবং এক রাতের জন্য হিল্লা বিয়েতে রাজি হওয়া স্বামীকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর চিত্রটি লক্ষণীয়। পুরুষতন্ত্রকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে আত্মজাগরণসূত্রে কুসুমের আত্মমুক্তির পথ খুঁজে নেয়ার অভিব্যক্তিটি ঙ-সংখ্যক উদ্ধৃতির মধ্যে শিল্পিত হয়েছে। সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ উপেক্ষা করে : ‘ভিক্ষুক অথর্ব স্বামীকেও কী শক্তিতে যে কুসুম তার ভালোবাসার অ-প্রথার জগতে নিতে কাতর তা আর আমাদের জানতে বাকি থাকে না। হাফিজরা পরাজিত হয় এ কুসুমের কাছে।’[৮৫] প্রেম প্রতিষ্ঠান বা প্রথার শাসন থেকে বাইরে গিয়ে এভাবেই নারী আত্মমুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে। আত্মজাগরণসূত্রে পরাভব নয়, পুরুষবশ্যতা নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানবিক সত্তার যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারীর নিজেকে চেনা ও এগিয়ে আসার দৃঢ়

অভিব্যক্তির রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে কুসুমের ভাবনার গভীরতা ও চিন্তার প্রাগ্রসরতায়। বয়ানভঙ্গি, দর্শন, বাক্যালঙ্কার— সব মিলিয়ে গল্পটি নাসরীন জাহানের অনবদ্য শিল্প কুশলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

Z_¨wb‡`©k

১. নাসরীন জাহান, ¯^ei †hŠeb, অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা, ১৯৮৪। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আলোচ্য গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ উক্ত সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।
২. শুভাশিস সিনহা, 'নাসরীন জাহানের গল্প : গ্লানিতে উত্থানে গড়া জীবনাখ্যান', nvjLvZv, (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত) , বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২
৩. নাসরীন জাহান, ¯^ei †hŠeb, অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১ম ফ্ল্যাপ
৪. আজহার ইসলাম, evsjv‡`‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯^i/c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৯৪
৫. মাহমুদা ইসলাম, bvixev`x wPšÍv I bvix Rxeb, জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৩৫
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৯. মাসুদুজ্জামান, 'নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন', nvjLvZv , (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, পৃ. ৪৩২
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮
১১. শুভাশিস সিনহা, 'নাসরীন জাহানের গল্প : গ্লানিতে উত্থানে গড়া জীবনাখ্যান', nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৬
১২. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
১৫. নাসরীন জাহান, wePY Qvqv , অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা, ১৯৮৫। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আলোচ্য গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ উক্ত সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে।
১৬. শুভাশিস সিনহা, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭২
১৭. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

১৯. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩
২০. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, iPbvmgM-1, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১ম ফ্ল্যাপ
২১. রাশিদা আখতার খানম, bvixev' I 'vkwbK †cÿvcU, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, কক্ষ নং ১১০৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৯
২২. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
২৩. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯
২৪. ইরাবান বসুরায়, 'মা-মেয়ের সংসার : প্রত্যাখ্যানের গল্প', MíK_v, (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬৬
২৫. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮
২৬. আবু জাফর, nvmvb AwRRj n‡Ki M‡íi mgvRev¯ÍeZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
২৮. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
২৯. নাসরীন জাহান, c_, †n c_, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১ম ফ্ল্যাপ
৩০. নাসরীন জাহান, c_, †n c_ , আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আলোচ্য গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ উক্ত সংস্করণ থেকে উৎকলিত হয়েছে।
৩১. নাসরীন জাহান, c_, †n c_, পূর্বোক্ত, পৃ. ১ম ফ্ল্যাপ
৩২. মোস্তফা তারিকুল আহসান, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প : বৈভব ও বিভূতি', nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩
৩৩. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৩৪. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
৩৫. শুভাশিস সিনহা, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩
৩৬. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
৩৭. শুভাশিস সিনহা, হvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮
৩৮. প্রাগুক্ত
৩৯. প্রাগুক্ত
৪০. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪২. নাসরীন জাহান, KvV‡cPv , অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা, ১৯৯৯। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আলোচ্য গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ উক্ত সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে।
৪৩. শুভাশিস সিনহা, হvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮
৪৪. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
৪৫. মাসুদুজ্জামান, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯
৪৬. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
৪৭. শুভাশিস সিনহা, হvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮
৪৮. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৫১. রাশিদা আখতার খানম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৫২. মাসুদুজ্জামান, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩

৫৩. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৫৫. শাহনাজ পারভিন, evsjv‡‘‡ki ¯vaxbZv h‡× bvixi Ae‘vb , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৬২

৫৬. মাসুদুজ্জামান, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

৫৭. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৫৮. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮

৫৯. আহমাদ মোস্তফা কামাল, ‘বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার’, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

৬০. শুভাশিস সিনহা, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩

৬১. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৬৪. নাসরীন জাহান, A¨v‡jb‡cvi weovj , অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা ২০০৬, পৃ. ১ম ফ্ল্যাপ

৬৫. নাসরীন জাহান,A¨v‡jb‡cvi weovj, অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-কবাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা, ২০০৬।বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আলোচ্য গল্পগ্রন্থেরউদ্ধৃতিসমূহ উক্ত সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৬৬. নাসরীন জাহান, A¨v‡jb‡cvi weovj , পূর্বোক্ত, পৃ. ১ম ফ্ল্যাপ

৬৭. শুভাশিস সিনহা, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩

৬৮. মাসুদুজ্জামান, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

৬৯. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৭৩. রাশিদা আখতার খানম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৭৫. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৭৬. নাসরীন জাহান, Avðh †‘ewkï, বাংলাপ্রকাশ, ৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০০৯, পৃ. ২য় ফ্ল্যাপ

৭৭. নাসরীন জাহান,Avðh †‘ewkï, বাংলাপ্রকাশ, ৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশে বইমেলা, ২০০৯। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আলোচ্য গল্পগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ উক্ত সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে।

৭৮. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্, পৃ. ৫১

৭৯. মাসুদুজ্জামান, nvjLvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯
৮১. মাহমুদা ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৮৩. মাসুদুজ্জামান, nvj LvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১
৮৪. রাশিদা আখতার খানম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৮৫. শুভাশিস সিনহা, nvj LvZv , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৬

Dhaka University Institutional Repository

lô Aa¨vq

PviRb MíKv‡ii iPbvq bvix-Rxeb : Zjbvg jK we‡ePbv

নারীর মন ও মানস, অস্তিত্ব ও সত্তা, ব্যক্তিত্ব ও সক্রিয়তা এককথায় বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনের পরিপ্রেক্ষিতে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান রচিত ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের স্বরূপ-সন্ধানের আলোকে প্রকারান্তরে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবনঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গের সমাজবাস্তবতা উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষণীয়। বর্তমান অধ্যায়ের মূল বিবেচনা যেহেতু আলোচ্য চারজন গল্পকারের রচনায় রূপায়িত নারী-জীবনের তুলণামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতার স্বরূপ-সন্ধান সেহেতু এক্ষেত্রে নারীবাদ-বিষয়ক প্রধান প্রধান নারীবাদী-মতবাদ সম্পর্কিত ধারণা ও নারী-জীবনের স্বরূপ-সন্ধানের উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

নারীবাদ একটি অভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদ নয়। নারীবাদী গবেষকদের মধ্যে মত ও পথের বিভিন্নতা আছে। নারীবাদী গবেষকগণ নারী ও সমাজকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতার ফলে নারীবাদের বিভিন্ন থিয়োরী সৃষ্টি হয়েছে। তবে মোটের উপর নারীবাদের চারটি সংজ্ঞার্থ উল্লেখ করা যায় :

১. সাধারণভাবে নারীবাদের সংজ্ঞার্থ— সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় আগ্রহ।
২. নারীবাদ হচ্ছে নারীর জন্য উদ্বেগ এবং নারীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ প্রত্যক্ষ করতে দৃঢ় সংকল্প।
৩. সমাজে, কর্মস্থলে ও পরিবারের অভ্যন্তরে নারী-নির্যাতন ও শোষণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং ঐ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নারী ও পুরুষের সজ্ঞান কর্মকাণ্ড।
৪. নারীবাদ একটি দিকনির্দেশনা যা আজকের দুনিয়ায় জেন্ডারকে একটি মৌলিক বিন্যাসকারী নীতি মনে করে, যা নারীর অস্তিত্ব নিরূপণ ও জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায়গুলোকে মূল্য দেয় এবং যা জেন্ডার ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষমতার পরম্পরাগুলোর রূপান্তরকে পরিবর্তন করে।

সমস্ত সংজ্ঞার্থের আলোকে সংক্ষেপে বলা যায়, নারীবাদ নারীর প্রতি রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক অঙ্গীকার। নারীমুক্তি সকল নারীবাদী গবেষক ও সংগ্রামীর অভিন্ন লক্ষ্য। তবে লক্ষ্য অর্জনে মত ও পথের বিভিন্নতার কারণে তাদের মধ্যে থিওরীর বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। নারীবাদী তত্ত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম :

১. উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal feminism)
২. উগ্রপন্থী বা রেডিক্যাল নারীবাদ (Radical feminism)

৩. মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Marxist and Socialist feminism)

উদারপন্থী নারীবাদ : উদারপন্থীরা নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য নিরাকরণের জন্য সমাজ সংস্কারকে যথেষ্ট মনে করেন। নারীর বিদ্যমান অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও সংশোধন করে বৈষম্য ও অসমতা দূর করা যাবে বলে তারা বিধান দেন। এরা সংস্কারক। এ মতবাদ অনুসারে : 'ঐ সমাজ ন্যায়ভিত্তিক, যে সমাজে প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রয়োগ করার এবং আত্ম-সংসিদ্ধি লাভ করার সুযোগ পায়।'[১] বিচারবুদ্ধি বা বিচার-বিবেচনা শক্তি মানবজাতির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে প্রাণিকুল থেকে পৃথক সত্তা দান করেছে। একমাত্র মানুষ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন; অন্য প্রাণীর এ বৈশিষ্ট্য নেই। একজন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের স্বাধীনভাবে কাজ করার শক্তি ও জীবনে সিদ্ধিলাভ করার ক্ষমতা থাকে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ বা অসমতা সৃষ্টি করে নারীর মানবিক সত্তাকে অস্বীকার করার বিরোধিতা করেন এ মতবাদে বিশ্বাসী নারীবাদীগণ। উদারপন্থী নারীবাদ নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈষম্যের বিলোপ সাধনে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্যকরী ভূমিকা ও দায়িত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে।

উগ্রপন্থী বা রেডিক্যাল নারীবাদ : উগ্রপন্থীরা মনে করেন, নারীর অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর শিকড় বহুধা বিস্তৃত ও দৃঢ়মূল; তাদের সমূলে উৎপাটন বা ধ্বংস না করলে নারী মুক্তি পাবে না। বৈষম্যমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন সমতা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যার ভিত্তি হবে নারী ও পুরুষের সাম্য ও ন্যায্যতা। এরা বিপ্লবী। রেডিক্যাল নারীবাদ সংস্কারে বিশ্বাসী নয়। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচলিত অসম ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা উৎপাটিত করে একটি সুষম, সমতাপূর্ণ, সহযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন রেডিক্যাল নারীবাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। রেডিক্যাল নারীবাদী প্রবক্তারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষত বিদ্যমান সেক্স/জেন্ডার ব্যবস্থা বহাল রাখার ঘোরতর বিরোধী; কারণ, তাদের মতে, এ ব্যবস্থা নারী নির্যাতনের প্রধান ও মৌলিক হাতিয়ার। কেননা : 'নারী ও পুরুষের শরীরতত্ত্বের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের উপর বিভেদমূলক নারীসুলভ ও পুরুষসুলত আচরণ ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সমাজ পুরুষকে শক্তিশালী ও নারীকে শক্তিহীন পদানত করে রাখে।'[২] এই তথাকথিত বিভেদ কার্যকর করার প্রক্রিয়ায় এভাবে সমাজ সেক্সকে জেন্ডারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে জৈবিক সেক্সকে সামাজিক জেন্ডারের ভিত্তি নির্ধারণ করে নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদ জন্মিয়ে নারীকে হেয় করে এবং তার উপর পুরুষের শাসন চাপিয়ে দেয়। রেডিক্যাল নারীবাদ সেক্স (নারী ও পুরুষের) এবং জেন্ডার (নারীসুলভ ও পুরুষসুলভ) এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বীকার করে না; জেন্ডার সেক্স থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক বলে দাবি করে।

মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ : এদের মধ্যে মূলগত প্রভেদ নেই; প্রভেদ প্রধানত, বক্তব্যের গভীরতা ও দৃঢ়তায়। উভয়েই মনে করে, বর্তমানে সমাজে প্রচলিত বুর্জোয়া ব্যবস্থা নারীর অধস্তন অবস্থার মূল কারণ। যে শ্রেণি-সমাজে ক্ষমতাহীন সংখ্যাধিক্য লোকজন সম্পদ উৎপাদন করে, কিন্তু গুটিকয়েক শক্তিধর তা অধিকার করে নেয়, সে সমাজে কেউ, বিশেষ করে নারী, সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। কাজেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ধ্বংস না করে, নারীমুক্তি সম্ভব নয়; বুর্জোয়া ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের মধ্যে নারীমুক্তি নিহিত। মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী প্রবক্তাগণ বিশ্বাস করেন যে, নারী নির্যাতন ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডের ফল নয়; বরং ব্যক্তি যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বাস করে, সেই কাঠামোর ফলশ্রুতি। মার্কসবাদীরা যৌন ভেদাভেদ নয়, শ্রেণি-বৈষম্যকে নারী-নির্যাতনের চূড়ান্ত কারণ বলে চিহ্নিত করেন। অপরদিকে, সমাজবাদীরা শ্রেণিভেদ বা যৌনভেদ নয়, ধনিকতন্ত্র (Capitalism) ও পিতৃতন্ত্রের জটিল পারস্পরিক ক্রিয়াকে নারী নির্যাতনের কারণ বলে গ্রহণ করেন। মার্কসীয় নারীবাদ শ্রমিকের নির্যাতনকে নারী নির্যাতন অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকে; কারণ এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, নির্যাতিত নারী শোষিত শ্রমিক-শ্রেণিরই অংশবিশেষ এবং শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে নারী নির্যাতন স্বতঃসিদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। মার্কসীয় নারীবাদীরা নারী-পুরুষের সম্পর্ককে 'বুর্জোয়া পলিতারিয়া' শোষণমূলক সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করেন। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা বিশাস করেন যে, কেবল ধনিকতন্ত্র নারী নির্যাতনের একক কারণ নয়; তাদের মতে, ধনিকতন্ত্রের সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নারী নির্যাতনের জন্য দায়ী। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ স্বীকার করে যে, ধনিকতন্ত্রের পতন না হলে নারীর মুক্তি নেই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী প্রবক্তারা দাবি করেন যে, পিতৃতন্ত্রের উৎখাত না করলে ধনিকতন্ত্র ধ্বংস হতে পারে না। কজেই নারী মুক্তির জন্য ধনিকতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র উভয়েরই উচ্ছেদ অপরিহার্য। কেননা : 'জনগণের জড় বা অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো পরিবর্তন করতে হলে জনগণের মতাদর্শগুলোকে আগে বদলিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ নির্মূল না করলে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্মূল করা যাবে না।'[৩] মোটকথা, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ বিশ্বাস করে যে, যতক্ষণ ধনিকতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি, ততক্ষণ নারী মুক্তি সুদূর পরাহত।

আমাদের সমাজবাস্তবতায় বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরে নানামাত্রিক অসমতা বিরাজমান। নারী ও পুরুষের মধ্যে যেমন বৈষম্য আছে তেমনি বিভিন্ন নরগোষ্ঠী, বর্ণ ও শ্রেণির মধ্যেও বৈষম্য রয়েছে। নরগোষ্ঠী, বর্ণ ও শ্রেণি-বৈষম্যের পাশাপাশি নারী-পুরুষ বৈষম্য সমাজের অন্যতম গুরুতর সমস্যা যা সমাজের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়কে নিয়ে সমাজ গঠিত। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়-বিচার, সামাজিক সমস্যা— এ সবের মূলে নারী-পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

উভয়েই। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুষম সমাজ গঠন এবং সমাজের নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। অথচ লক্ষণীয় যে, জৈবিক পার্থক্যকে পুঁজি করে জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্টি করে সমাজ নারীকে পুরুষের পায়ের তলে দাবিয়ে রেখেছে, নারীর মানবিক অস্তিত্ব ও সত্তা অস্বীকার করে তার মেধা, মনন ও বুদ্ধির বিকাশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে; নারীকে ন্যূনতম মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এ সবই হয়েছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নামে, একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায়, সমাজের সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের মিথ্যা অজুহাতে। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি বহুব্যাপক এবং এর শিকড় বহুধা বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠানটির নাম Patriarchy; যদিও : 'বাংলায় বলা হয় পিতৃতন্ত্র; আসলে এটা হল পুরুষতন্ত্র। এই পুরুষতন্ত্র সমাজে নারী ও পুরুষের জেন্ডার বিভক্তি এবং নারী নির্যাতনের হাতিয়ার।'[৪] সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য এমনই প্রকট এবং গভীর শিকড়বদ্ধ যে তা মোচন করা একটি দুরুহ কাজ। যদিও আমরা : 'রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মাদিতে 'মানুষ জাতি', 'মানব জাতি' ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করি কিন্তু 'মানুষ' শব্দটি নারীর ক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগ করা হয় তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। নারীকে পুরুষতন্ত্র মানব সত্তা হিসেবে কতটুকু স্বীকৃতি দিচ্ছে তা বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।'[৫] খবরের কাগজের পাতায় নারী ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের জন্য নিগ্রহ এমনকি হত্যা ইত্যাদি খবর নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে যা প্রকারান্তরে সমাজের সকল স্তরে নারীর মানবিক সত্তার অবমূল্যায়ন ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। লক্ষণীয় যে, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে স্বাধীনতার ৪২ বছরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। দেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, পুলিশ ও সেনাসদস্য, বৈমানিক, বিচারক, উদ্যোক্তা, ক্রিকেটার তো বটেই; বাংলাদেশের নারীর বিজয় পতাকা উড়েছে এভারেস্ট চূড়ায়ও। কিন্তু এটিই শেষ কথা নয়, কেননা : 'সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর অগ্রগতি ভূমিকা রাখলেও এখনও নানামাত্রিক বৈষম্যের শিকার নারীরা। ... নারী ঘোরাচ্ছেন অগ্রগতির চাকা কিন্তু নারীর মর্যাদা ও মানবাধিকার এখনও পুরুষের চেয়ে কম সুরক্ষিত।'[৬] নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ প্রণীত হয়েছে বহুবিধ আইন ও বিধি-বিধান, গঠন করা হয়েছে প্রতিরোধ সেল, বিশেষ দিবসে : 'নারী-অধিকার নিয়ে গলা ফাটান মন্ত্রী-এমপি-রাজনীতিক-সুশীলরা— তা সত্ত্বেও, প্রবাদের 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি'র মতো দেশে নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে।'[৭] যদিও পাল্টাচ্ছে নির্যাতন ও নিগ্রহের প্রকরণ কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে নৃশংসতার মাত্রা। এ মর্মান্তিক তথ্য উঠে এসেছে খোদ সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপ প্রতিবেদনে। নারী নির্যাতন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত এটিই প্রথম জরিপ। 'ভায়োলেন্স অ্যাগইনস্ট উইমেন সার্ভে ২০১১' নামের এ জরিপের তথ্য হলো :

> দেশের ৮৭ শতাংশ বিবাহিত নারী আপন গৃহেই নির্যাতনের শিকার। ৬৫ শতাংশ স্বামীর মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতন, ৩৬ শতাংশ যৌন নির্যাতন, ৮২ শতাংশ মানসিক এবং ৫৩ শতাংশ স্বামীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ... বিস্ময়কর আরও তথ্য হচ্ছে, এসব নারীর ৭৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা বিগত এক বছরেও একই ধরনের নির্যাতন ভোগ করেছেন।'[৮]

এসব তথ্য উপাত্তের মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতায় নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক দেশচিত্রটি উন্মোচিত। বর্তমান সময়ে বিরাজমান যাবতীয় সামাজিক অনাচার, কুসংস্কার তথা নানামাত্রিক অঙ্গতির স্বরূপ-উন্মোচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন সমাজদর্পণের ভূমিকা পালনে সক্ষম। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিলোপসাধন কেবল নারীর মানবিক মুক্তির প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক নয়; কেননা : 'নারীর সম-অধিকারের প্রশ্নটি কেবল নারীসমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বস্তুত, এতে রয়েছে নারী-পুরুষের মিলিত বিশ্বে সর্বজনীন প্রগতির প্রতিশ্রুতি।'[৯] স্বাভাবিকভাবেই তাই বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী জীবনের যথাযথ স্বরূপ-সন্ধানের মধ্য দিয়ে সমাজচিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হতে পারে। সে-কারণে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের তুলনামূলক বিবেচনায় একদিকে যেমন নারীজীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতার সার্থক চিত্রায়ণ লক্ষণীয়, অন্যদিকে এরই মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য গল্পকারদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ, স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা।

ষাটের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের যে নবযাত্রা ঘটেছিল তার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন হাসান আজিজুল হক। তাঁর হাতে বাংলা ছোটগল্পের বাঁকবদল ঘটেছে। জীবন ও পরিবেশের অভিজ্ঞ রূপভাষ্যকার তিনি। জীবনকে তিনি দেখেছেন সৃষ্টির নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে। এ কথা স্বীকার্য :

> 'কল্পনাসর্বস্ব জীবনানুভূতি তাঁর মননে কোনো প্রভাব সঞ্চার করতে পারে নি। ফলে তাঁর গল্পগুলো বস্তুবাদী জীবন চেতনায় ভাস্বর। বস্তুবাদী চেতনার প্রকাশ-কল্পে হাসান আজিজুল হক ছোটগল্পে সমাজ-জীবনের হতাশা, অবক্ষয়, দারিদ্র্য এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতায় নিষ্পিষ্ট নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আর্তি, বিক্ষোভ ও প্রতিরোধকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন।[১০]

নরম কাদা-জলে যে অবয়ব নির্মাণ করা হয় তাকে ভলোভাবে না পোড়ালে সেটি যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু কেউ কেউ আছেন যিনি পোড়ামাটি দিয়েই আকার বা প্রতিকৃতি নির্মাণে নৈপুণ্য দেখান এবং এটি এরকম পোড়ামাটি যে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করলেও ভাঙতে চায় না। হাসান আজিজুল হক হলেন সেইসব পোড়ামাটির শিল্পীদের একজন যাঁদের জীবনের পাটাতনে লুকিয়ে আছে ভূমিচ্যুত মানুষের বেদনা, লুকিয়ে রয়েছে উদ্বাস্তু অভিবাসী মানুষের গভীর মর্মযন্ত্রণা। বলা যেতে পারে :

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর বাংলার গ্রামীণ জনপদের ভাঙন, সামাজিক শোষণ, কখনো প্রতিবাদ, বাঁচার সংগ্রাম— এইসব কথা নিয়ে হাসানের গল্পজগৎ। তাঁর সব গল্পেরই মূলে আছে বাঁচা, জান্তবভাবে বাঁচা, শিশ্নোদরপরায়ণভাবে বাঁচা, স্থূলতম শারীরিকভাবে বাঁচা এবং সেই বাঁচার ন্যূনতম অস্তিত্বের নানান চেহারা, আর তার থেকে মুক্তির রূপও হরেক রকম। আর তা থেকে পরাজয়ের রূপও হরেক রকম। টিকে থাকার, বাঁচার, হেরে যাওয়ার বিস্বাদ, কটু, প্রায় নিয়তিবাদী উপলব্ধি, শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায় 'নিরুচ্ছ্বাস আর্তি' নিয়ে গড়ে উঠেছে হাসানের ধ্রুপদী বিশাল গল্পভুবন।[১১]

হাসান আজিজুল হকের গল্পে আছে তিনটি পর্ব। প্রথমত, প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ যখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামের বাসিন্দা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ পর্ব, যে সময়ে লেখক তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন আর শেষ পর্বটি তাঁর বর্তমান পর্ব বা উত্তরকাল পর্ব— যে পর্বে এখন তিনি নতুন করে আবার তাঁর আখ্যানশৈলীর ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। ঐতিহাসিক উত্তেজনা-আবেগ, সংকট এবং ভিন্ন দুই রাষ্ট্রের ব্যাপক মানুষের অনিশ্চিত মানবেতর জীবনের কালো অন্ধকার হাসান আজিজুল হকের গল্পে যেমন নির্মম আবেগহীনতায় রূপায়িত হয়েছে তেমনি রাঢ় মৃত্তিকার রুক্ষ আঞ্চলিক জীবন, সামন্ত জীবনের নিগড় ছিঁড়ে গোষ্ঠী জীবনের উদ্বাস, সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় ক্ষতবিক্ষত সংখ্যালঘু মানুষের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিসরে শিল্পিত হয়েছে। উত্তরকালে তাঁর গল্পে বহুভাবেই জন্মান্তর ঘটেছে কিন্তু সবসময়েই লক্ষণীয় হাসান আজিজুল হকের গল্পের এক কেন্দ্রীয় টান তৈরি হয়েছে ১৯৪৭-এর দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ তাঁর গল্পের এক মৌল দিক হলো দেশভাগ। হাসান আজিজুল হকের গল্পে : 'পূর্ণাঙ্গ অবয়বের মানুষ নয়, ব্যবচ্ছেদ করা মানুষের দেখা পাওয়া যায় বেশি। নিপাট বাস্তবতার খরখরে পাটাতনে রেখে তিনি মানুষের মজ্জা আর কাঠামোকে আলাদা করে সাজিয়েছেন এবং চৈতন্যের নানা কলকবজা নিয়ে নির্মাণ করেছেন মনুষ্যত্বের অন্য রূপ।'[১২] জীবনের কর্কশ অভিজ্ঞতার ওপর প্রলেপ বুলিয়ে চলতে অনভ্যস্ত ছিলেন হাসান আজিজুল হক, একারণেই প্রতারক সৌন্দর্যবিলাসী জীবনের বান্ধব ছিলেন না তিনি। তাঁর বিশ্লেষণে : 'উঠে এসেছে আগুনপোড়া রাঢ়ের ঝলসানো তাপ, লাল কঙ্করের রূঢ়তা। বিশ্লেষণের এই তীক্ষ্ণতা অব্যাহত থাকে তাঁর সত্তর-পরবর্তী গল্পসমগ্রেও। নিরাপদ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি, সময় ও সমাজের ব্যবচ্ছেদ করা হাসানের শিল্পস্বভাবের নিগূঢ় দিন।'[১৩] রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণে লেখক যেমন প্রবেশ করেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনমূলে তেমনি নির্মোহ তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন পরিবর্তিত সমাজ ও সময়স্বভাবকে। সময় ও সমাজ-বিধৃত নর-নারীর দুর্মর অস্তিত্ব এবং তার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় হাসান আজিজুল হক অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন, কখনো-বা সরল বর্ণনার অনবদ্য আবেদনে উন্মোচন করেছেন মানবচরিত্রের বহুমাত্রিকতা। কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমতটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> শিশুর হিংসা কতখানি সরল আর অবুঝ, কতখানি নিষ্পাপ আর হিংস্র— তাও তাঁর অজানা নয়। পৃথিবীর ভেতরকার অনন্ত আগুনের মতোই যে বয়স ও শারীরিক বৃদ্ধি বেসামাল তার পরিণতি যে কতখানি অমোঘ এবং সেখানে মৃত্যু যে বৃক্ষপতনের মতোই ভয়াবহ ও মহৎ সে কথা তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান। তার পাশাপাশি তিনি বলেছেন, নারী তুমি দুর্জ্ঞেয়। সেখানে প্রমত্ত পুরুষও শিশু, নিরুপায়, দিকহীন। আবার এই নারীর পাশেই কৈশোর একটি তীক্ষ্ণশলার মতো নিজেকে বাঁচিয়ে চলার জন্যে আমূল বিদ্ধ করে সেই নারীকেই। এসবের সঙ্গে মিশে আছে নিসর্গ। তার রং। তার বীর্য। তার অন্ধ নিস্পৃহ দিকটিও। অন্ধ প্রকৃতি, দুর্জ্ঞেয় নারী, শিশুর সারল্য, কোটি কোটি বছরের জন-জীবন— তার বিশ্বাস, ভীতি, পাগলামো কী নয়? ... তাই বলে হাসান আজিজুল হক দেশকাল সম্পর্কে আদৌ অনবহিত নন। দেশ ভেঙে খান খান করার পর ভাঙা টুকরোগুলো এদিকওদিক ছড়িয়ে পড়লেও তাদের হদিশ লেখকের নখদর্পণে।[১৪]

হাসান আজিজুল হকের গল্প ধারণ করে আছে দুই বঙ্গের দুই ভিন্নতর ভূগোল— একদিকে আছে ধূসর, রুক্ষ, বৃক্ষবিরল রাঢ় এবং অন্যদিকে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে সজল-শ্যামল নরম পলির দেশ খুলনা এলাকা। মানুষ তো বটেই, সেই সঙ্গে সহজীবী নিসর্গ, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য, আলো-আঁধারি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিশে আছে তাঁর গল্পে যে, বর্ণিত চরিত্রাবলি থেকে তাকে কোনোভাবেই আলাদা করে ভাবা যায় না। বরং বলা যেতে পারে যে, তাঁর গল্পের চরিত্রাবলি এবং প্রকৃতি যেন একে অপরের পরিপূরক। জীবনকে আপন অভিজ্ঞতার জারক রসে জারিত করে নির্মোহ-নির্বিকার ও ক্ষমাহীন-নিষ্ঠুরতায় চিত্রিত করেছেন তিনি গল্পের বিচিত্র পরিসরে। অভিজ্ঞতার নানামাত্রিক অনুভবজ্ঞানের জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে হাসান আজিজুল হকের গল্পের পরতে পরতে। লেখার মধ্য দিয়েই যেন হাসান আজিজুল হক জনসাধারণের অধিকার আদায়ের পক্ষে আপন ভূমিকা ও করণীয় নির্ধারণ করেছেন গভীর দায়িত্ববোধের আলোকে। তাঁর গল্পভূমে কোথাও সমাজের অধিকার বঞ্চিত, অবহেলিত দরিদ্র-শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা, করুণা, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা এরকম কোনো কথা বলে আত্মতৃপ্তি লাভের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। বরং তিনি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন যে, এরকম কোনো কথা বলবার তাঁর কোনো অধিকার নেই— ও-সব বুদ্ধিজীবী, নাগরিক সুবিধে-আরামে থাকা সুশীল সমাজের নিজস্ব ব্যাপার। এমনকি, তাঁর গল্পে নৈতিকতার জায়গা থেকেও কোনো কথা তিনি উপস্থাপন করেন নি। লক্ষণীয়, লেখার মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের বিচিত্র অবয়বে বঞ্চিত-অবদমিত অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকারই ব্যক্ত করেছেন হাসান আজিজুল হক। সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সমান্তরালে স্বাভাবিক বা অনিবার্য প্রভাবেই হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চিত্রায়ণ ঘটেছে। তাঁর গল্পের পরিসরে নারীচিত্রণ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নারী চরিত্ররা খুবই বাস্তব ও জীবনসংলগ্ন। আমাদের চেনাজানা পরিধির বহু নারীচরিত্র সব একটা বিশেষ আবেদনে বাস্তবতার অনুষঙ্গে পরিণতি বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছোটগল্পের পটভূমিতে। তাঁর গল্পমালায় যেন নারীচরিত্র বর্ণময় মিছিল। কূলটা বাগদি বৌ থেকে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহিণী, অসহায় দুঃসাহসী গ্রাম্য-প্রেমিকা থেকে শহরের বিষণ্ন উদ্বাস্তু

ছাত্রী, নিঃসঙ্গ শিক্ষিকা থেকে বিকারগ্রস্ত পতিতা, স্বামী পরিত্যক্তা রমণী থেকে মুক্তিযোদ্ধার ক্ষুধাভীতা পলাতকা ঘরণী— ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে এরা নির্মিত হলেও এদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিচিত্র ব্যক্তিসত্তা আছে, আছে ব্যক্তিত্বও। এরা এদের মতো করে ভাবে; জীবনের জটিল অঙ্কে এইসব ভাবনা যদিও প্রায়শই কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না তবু তারা অসম্ভব জীবন্ত, তাদের নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাঠকেরা পেয়ে যায় এবং পাঠকের বোধের দরজা খুলে সেখানে সমাজবাস্তবতায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের জটিলতা, পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজে নারী-জীবনের নানামাত্রিক ছবি উন্মোচিত হয়ে পড়ে সমাজ বাস্তবতার অনুসঙ্গে। ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসর ও আঙ্গিকে হাসান আজিজুল হক পৃথকভাবে কেবল নারীদের নিয়েই তাঁর ভাবনাকে জারিত করেন নি, এবং সেটা সম্ভবও নয়; বরং লক্ষণীয় যে, সমাজ-বাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ-উন্মোচনের নিরিখেই তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিমণ্ডলে রূপায়িত হয়েছে নরী-জীবনের বহুমাত্রিক চালচিত্র। ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গি এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য :

> আমার এসব লেখা নারীবাদী লেখা নয়, নির্বিশেষে নারীকেন্দ্রিকও নয়। সব নারীই নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাঁধা। এদের নিয়ে কেউ তত্ত্বের ছাঁচে ফেলুক তা আমি চাই না, বরং নাকের নিচে বাস্তবটা দেখুক— এই আমি চাই। সমাজ-সংসার-রাষ্ট্র-অর্থনীতি-রাজনীতি কাদের উপর তীব্রতম প্রহার চালায় তা যে-সব লেখায় দেখাতে চেয়েছি সেগুলোই বোধহয় নারীকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। আমার ধারণা এটাই বাস্তব যে, অন্তত আমাদের এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় (নিজের দেশের কথাই বলছি) নারীরাই সবচেয়ে উপদ্রুত, সবচেয়ে নিঃস্ব, সবচেয়ে বঞ্চিত, অপমানিত, অধিকারচ্যুত। গোটা সমাজের বঞ্চনা দেখাতে গেলে এটাকেই সামনে আনা দরকার। এখানে হাহাকার, মারণাহতের আর্তনাদ, তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্র শাসকদের রাজনীতি-অর্থনীতি-ক্ষমতার উপর ধিক্কারের থুথু পড়ে।[১৫]

মূলত হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোকে প্রকারান্তরে ঘুণে ধরা, অবক্ষয়পীড়িত সমাজের রুগ্ন ভঙ্গুর দেশচিত্রই জীবনঘনিষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের নিজস্ব অভিমতের মধ্য দিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় : 'আমার কাছে বার বার মনে হয়েছে আমাদের এই অসম্ভব সমাজের চেহারাটা যদি লেখায় তুলে ধরতে পারি তাহলে যাঁরা সুস্থতার সন্ধান করছেন তাঁদের বলতে পারবো— না, এই অবস্থাটা চলতে দেয়া যায় না। এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের পুরোপুরি নিরাময় হওয়া দরকার।'[১৬] হাসান আজিজুল হক সমাজের বিদ্যমান নিম্নবিত্ত, শোষিত মানুষের পক্ষ অবলম্বন করেছেন, শোষণ-পীড়ন অবসানে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করেছেন। ফলে হাসান আজিজুল হকের গল্পের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ— কেবল নারী বা কেবল পুরুষ নয়। তাঁর বহুমাত্রিক গল্পটানে উঠে এসেছে বাঙালির ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি, লোকাচার, প্রকৃতি, ঘটনাবিধৃত ইতিহাস, গর্বিত স্বাধীনতার জন্য জীবনযুদ্ধ, গণচেতনা, পতন, পাপ, মানবতা, জাগরণ, বিকাশ, সম্ভাবনা ইতিবাচক পৃথিবীর

স্বপ্ন দিক। সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণে ব্যক্তির অধঃপতন, মধ্যবিত্তের হঠকারিতা, বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী রীতিনীতি একাকার হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। বলা যেতে পারে হাসান আজিজুল হকের :

> গল্প হওয়ার পথটি নির্মিত হয় বিপুল জীবনের মাহাত্ম্যে, কার্যকারণ সম্পর্কের ভেতর দিয়ে। উঠে আসে যাবতীয় সংস্কার-কুসংস্কার-সংগ্রাম-প্রতিরোধের ছায়াচিত্র। তাঁর উপমা-নির্বাচন কর্কশ, মর্মচিহ্নিত, তীক্ষ্ণধী। বর্ণনায় সামূহিত বাস্তবতা শ্রেণিস্তর অবলম্বী হয়ে ওঠে। তাঁর সংলাপের দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হয় শ্রেণি-চেতনার মর্মে, রচিত পটরেখায় থাকে জীবনবাদী প্রণোদনা।[১৭]

তাঁর আত্মগত ভাবনা-সূত্রেই গল্পের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত নারী-জীবনের যৌক্তিক পারম্পর্য তাই পরিবর্তিত সময়-সমাজ ও দেশ-কালের পটভূমিতে বিচার্য।

ষাটের দশকের উন্মাতাল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দীপ্র আবির্ভাব বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে ষাটের দশকের উন্মাতাল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি ও বিক্ষুব্ধ সময়ের তরঙ্গাঘাত দারুণভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি নগরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবন, মধ্যবিত্তের কৃত্রিমতা, অতৃপ্তি, আত্মদ্বন্দ্ব, অসহায়ত্ব, রাজনৈতিক নেতাদের হঠকারিতা, মনোবিকার ও স্বার্থপরতার বাস্তব চিত্র উন্মোচন করেছেন তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিসর ও পটভূমে। সমাজ ও রাজনীতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় মানুষের যে মনোবিকৃতি তা বিশ্লেষণের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ছোটগল্পে বিধৃত কাহিনি ও চরিত্রের নানামাত্রিক অনুষঙ্গ। তিনি যেভাবে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন, তাকে বাস্তবানুগ করে তোলার প্রয়াসে নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র ভাষা প্রকরণ-সৌন্দর্য। ১৯৪৩ থেকে ১৯৯৭ প্রায় ৫৪ বছরের জীবনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাঁচটি গল্পগ্রন্থ, দু'টি উপন্যাস এবং একটি প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং মৃত্যুর পর তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে AMšZ AvLZvi"¾vgvb Bwjqvm (২০০৩) নামে প্রকাশিত গ্রন্থখানি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনাসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। এদিকে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে সাতচল্লিশের দেশভাগ, বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসন, বাষট্টির শিক্ষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের যুদ্ধ, পচাঁত্তরের হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সামরিক শাসন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ঘটে গেছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের বিশ্লেষণে লক্ষণীয় যে, সময় ও সমাজের প্রতিটি স্পন্দন, তার তীব্র আলোড়ন, বিকার, হতাশা ও নৈরাশ্য সবই গল্পের বিচিত্র বিন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। অসহ সময়-প্রতিবেশের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পের পরতে পরতে মনস্ক পাঠক অনুভব করেন। যদিও : 'সেই অনুভূতি মুগ্ধতা আনে না, ভাবাবিষ্টও করে না, তা পাঠককে বাংলাদেশের

জলবায়ু-মাটি-মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়; এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-সূত্রে তার আত্মপরিচয়ের সন্ধানও করে।’[১৮] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বহুপ্রজ লেখক নন, প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্য সাধনায় তিনি লিখেছেন মোট তেইশটি গল্প— এমনই স্বল্পপ্রজ এই শিল্পী। কিন্তু : ‘তাঁর রচনার স্বল্পায়তন তীরভূমি এক ঝাঁক সবুজের প্রাণময় স্পর্শে শিল্পসুন্দর, উজ্জ্বল ও সজীব। বাংলাদেশের আদি ও অকৃত্রিম বিষয়গুলোই গদ্যের নতুন ধারায় ও নতুন রচনাকৌশলে উজ্জীবিত হয়ে তাঁর লেখায় প্রাণ পায়।’[১৯] হাতে গোনা যায় এমন সংখ্যক স্বল্পায়তন গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে :

> ফুটে উঠেছে জীবনের বিচিত্র প্রান্ত, উপলব্ধির বহুবর্ণিল জগৎ। তাঁর Ab¨ N‡i Ab¨ ¯'i (১৯৭৬) গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে মানবিক সম্পর্কের আন্ত্যন্তিক বিনষ্টি, †Lvqvwi-তে (১৯৮২) যুব-মানসের নির্বেদ; ‘afv‡Z DrcvZ-এ (১৯৮৫) নিরন্ন মানুষের জীবনে অমোঘ নিয়তিশাসন, আর †'vR‡Li Ig (১৯৮৯) গ্রন্থে নেতি থেকে ইতিতে উত্তরণের কথকতা।[২০]

লেখকের পঞ্চম ও শেষ গল্পগ্রন্থ Rvj ¯c, ¯‡ci Rvj-এ অন্তর্ভুক্ত গল্প-পাঠের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে একজন স্বপ্নভঙ্গের কথাকার বলা যায়। স্বপ্নের ঘোর সহজে কাটে না। গল্পগুলো স্বপ্নভঙ্গের।’[২১] পুরোনো ঢাকার ক্ষয়িষ্ণুতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা এবং জীবনসংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পভুবন। তাঁর গল্পের মানুষজন রাজধানী ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত অট্টালিকাবাসী থেকে শুরু করে রিক্সাচালক, ট্রাক ড্রাইভার, কবরখোদক, পাগল, নেশাখোর এবং গ্রামের সাধারণ মানুষজন, চাষি, কলু, নাপিত, মাঝি, রাজনীতিবিদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নগরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনের বঞ্চনা-অসহায়ত্ব, মধ্যবিত্তের কৃত্রিমতা, অন্তঃসারশূন্যতা, অতৃপ্তি, আত্মদ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক নেতাদের হঠকারিতা, মনোবিকার ও স্বার্থপরতার চিত্রটি সমূলে উন্মোচিত করে তুলেছেন ছোটগল্পের বিচিত্র ক্যানভাসে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে রূপায়িত নারী-চরিত্র তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই অসহ সময়-প্রতিবেশ ও সমকালের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বাস্তবতার জীবনঘনিষ্ঠ উন্মোচন-সূত্রেই বিবেচনাযোগ্য। বলা যেতে পারে যে, সমাজবাস্তবতার একজন অন্যতম রূপকার হিসেবে ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রকারান্তরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : ‘ছোটগল্পের পটভূমিতে অ্যান্টি-রোমান্টিক দৃষ্টিকোণে প্রাত্যহিক ভাষায় নির্মাণ করেন যাপিত-জীবনের চালচিত্র। পুরোনো ঢাকার ভাষা, কুট্টিদের খিস্তি খেউড়, আর বাখরখানি-সংস্কৃতি ইলিয়াসের গল্পে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত।[২২] আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রায় প্রতিটি গল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের পটভূমিতে যে জীবন ও সমাজবাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায় সে সব মোটেই সুখের বা আনন্দের নয়; সরল তো নয়ই। সেখানেও আমরা মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা, মনোবৈকল্য, সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক অধঃপতন, ক্ষমতাসীন পক্ষসমূহের নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীন আধিপত্য, আভিজাত্যের ফাঁকা আস্ফালন, এগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনচর্চা, মানুষের আদিম মনোবাস্তবতা, জীবনের প্রতি

নিরাসক্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করি। বলা যেতে পারে যে, আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই এমন অনেক ঘটনাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের বিষয়; সে সব আমাদের নিদারুণ বাস্তবতার সন্ধান দেয়। আমরা আহত হই, কিন্তু সেগুলোকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারি না; ধীরে ধীরে সে সব আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। তাঁর নির্মোহ-নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ও নিরাবেগ ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি কতিপয় নির্মম-নিষ্ঠুর সমাজসত্যকে যেন নির্মমতম করে তোলে। মানুষের প্রকৃত জীবনই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আরাধ্য। সেখানে নারী কিংবা পুরুষ— এ জাতীয় বিবেচনা তাঁকে তেমন প্রভাবিত করে না যতটা করে নির্মম ও বাস্তব অসহ সময়-পটভূমে বেদনা ও বিবমিষায় আক্রান্ত ও বিভ্রান্ত মানবচৈতন্য। গল্পের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত নারী-জীবন তার আপন রূপে উন্মোচিত; গল্পের নারীরা সমবেত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্বরূপ। কেউ নায়ক বা নায়িকা নয় তাঁর গল্পে। কোনো নারী-চরিত্র আলাদা গুরুত্ব পেলেও সমষ্টির একজন হয়েই পায়, তার ওপর প্রথাগত কোনো 'নায়কোচিত' মহত্ব বা গুরুত্ব আরোপিত হয় না। যে জীবন একজন মানুষকে, সে নারী কিংবা পুরুষ যেই হোক না কেন, অসুস্থ-অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে, সে জীবনে খননকার্য চালিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত প্রেক্ষণভূমি থেকে গল্প-উপন্যাসের পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে। অতীতের দেখা অস্পষ্ট অতীত সেখানে বাণীরূপ লাভ করেনি। সম-সাময়িক সময়, দ্রোহ-বিক্ষোভ, সমাজের বিচিত্র দ্বান্দ্বিক পরিসরই তাঁর গল্পের বিভিন্ন নারী-চরিত্রের অবয়বে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিকে : 'যুগপৎ তার সামাজিক ও মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে দেখা ইলিয়াসের স্বভাব।'[২৩] ফলে স্বাভাবিক প্রবণতায়ই ছোটগল্পে রূপায়িত নারীরা বিশেষ কোনো ভালো বা বিশেষ কোনো মন্দের প্রতিভূ হয়ে উপস্থাপিত হয়নি, উপস্থিত হয়েছে সমগ্রতা নিয়ে। নারী-জীবনের নানামাত্রিক বাস্তবতার উন্মোচন ঘটাতে গিয়ে প্রকারান্তরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে :

> স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ, সামরিক শাসন, শ্রেণিশোষণ, ব্যক্তিমানুষ সংকটে উঠে আসে। ভূমি-মাটি-অনুবর্তী প্রান্তিক মানুষ চিত্রিত হয় শক্তিশালী প্রকরণে। বুর্জোয়া সমাজ কাঠামোর প্রতিক্রিয়াশীল রূপ তাঁর মধ্যবিত্ত বা বিত্তবান চরিত্রের মাঝে তটস্থ বা বিস্রস্ত থাকে। অপবিকশিত মধ্যবিত্তের অন্তর্যন্ত্রণা রাষ্ট-কাঠামোর অপহারী পরিবৃত্তে বন্দি। গল্পচরিত্রেরা সে কাঠামোতেই ভাষা পায়। সেখানেই জীবনের যাবতীয় সংক্ষুব্ধতা চঞ্চল হয়ে ওঠে।[২৪]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের আধারে বাংলাদেশের নিচুতলার মানুষের জীবনের সামগ্রিক রূপের যেমন প্রতিফলন লক্ষণীয় তেমনি মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণির চারিত্র্যলক্ষণও সুস্পষ্ট। তাদের খিদে আর যৌনতা, তাদের জীবনযাত্রা, পুরুষ-নারীর যাপিত-জীবন, তাদের কর্ম ও কর্তৃত্ব আর জৈবিক তাড়নার ইতিউতিকে পাঠকের সম্মুখে নিপুণ অনুপুঙ্খে উদ্ভাসিত করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। খুঁটিনাটির ভেতর থেকে গল্পে তিনি নিতান্ত ক্ষুদ্র কোনো বিষয়কেও হঠাৎ প্রতীকিত করে তোলেন অনেক বড়ো সত্যের সংকেত মূল্যে। মানুষের পেটের খিদের সংবাদ যেমন তিনি দিতে জানেন, তেমনি পুরুষ আর নারীর

শরীরের খিদের গল্পকে রূপায়িত করতে গিয়ে কোথাও লাজলজ্জা, সংকোচ বা রাখঢাকের পরোয়া করেন না তিনি। বলা যেতে পারে : 'ইলিয়াসের কাহিনি ও চরিত্রের অবয়বে কোন বিষয়ই যেমন আরোপিত নয় তেমনি যৌন উত্তেজনায় রংচড়ানো ব্যাপারও এতটুকু নেই। তাঁর অবলোকন নির্মোহ, সমাজ মনস্তত্ত্ব-প্রসূত এবং জীবনঘনিষ্ঠ ভাবনাকে উজ্জীবিত করে।'[২৫] আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ-সন্ধানের ক্ষেত্রে তাই সময়জ্ঞান ও সমকালের প্রভাব-প্রতিবেশের বিবেচনা অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। গল্পের আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন জীবনের নানামাত্রিক বাস্তব অনুষঙ্গের অন্তর্ভুক্তি লক্ষণীয় তেমনি এরই সমান্তরালে দেশ-কালের পটভূমিতে সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত অবস্থানটিকেও নিরূপণ করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চেতনার আলোকে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে ব্যাপক পরিসরে কিংবা বিস্তারিতভাবে কেবল নারীকেই প্রতিবিম্বিত করে তোলার অথবা শুধুই নারী-জীবনের নানামাত্রিক জীবন-অভিধা রূপায়ণের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। তবে কখনো কাহিনির অবয়বে, কখনো-বা চরিত্রের আত্মপ্রকাশের চকিত আভাসের মধ্য দিয়ে কিংবা সংলাপের ভেতর দিয়েও নারী-চরিত্র তার প্রকৃত সত্তার সাবলীল উন্মোচন ঘটাতে সক্ষম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, পুরো গল্পের কোথাও কোনো নারী-চরিত্রের সক্রিয় উপস্থিতি বা অংশগ্রহণ নেই, হয়তো-বা অন্য কোনো চরিত্রের কল্পনাসূত্রে গল্পে নারী-চরিত্রের চকিত আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু একটু সচেতন দৃষ্টিতে অভিনিবেশ সহকারে গল্পপাঠে লক্ষণীয় যে, সেই খনিক বা চকিত উদ্ভাসনে রূপায়িত নারী-চরিত্রই প্রকারান্তরে গল্পের মূল ভাবপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে যেন আলোকসম্পাত করে কোনো বিশেষ সমাজ-সত্যের মর্মমূলে। সার্বিক বিচারে বলা যেতে পারে যে, ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর সচেতন সমাজ-মনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিতে সময়-সমাজের দগ্ধদহনের কালবেলাকেই প্রমূর্ত করেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে নারী-জীবন বিষয়ক অনুধ্যানে তাই অনিবার্যভাবে সময়-সমকাল-সমাজের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসেবেই প্রাসঙ্গিক।

'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পে ওজুফা অন্যের সন্তানের মা হতে বাধ্য হলেও মাতৃত্ব নষ্ট করে না। 'বৈশাখী গান' গল্পে ইকতির কাছে মানবিক সম্পর্কটাই প্রধান। এ অনুভবই ইকতিকে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজনীতির অসার অবস্থানের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে। 'আকালির স্টেশনের জীবন' গল্পে সমাজের চোখে 'তুচ্ছ কাজের মেয়ে' আর 'বেশ্যা' উপাধি প্রাপ্ত মেয়েটি রাজপুত্রের মতো দেখতে বাড়ির মালিকের ছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। নারীর অধিকার মর্যাদার জন্য তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সমশক্তি অর্জন করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের গল্প-সংকলনের 'আমিনা ও মদিনার গল্পে' পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারীধর্ষণের মর্মন্তুদ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। 'বাড়ি ফেরা' গল্পে আঠারো বছর বয়সের মেঘলাকে গণধর্ষণের মতো ভয়াবহ ও বীভৎস অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কয়েক দশকের কথাকার হিসেবে সেলিনা হোসেনের

Dhaka University Institutional Repository

গল্পে ঘুরে ফিরে এরূপ বিষয়ই বিচিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা, রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংকট ও অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ে জর্জরিত ব্যক্তিজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের নানামাত্রিক জটিলতা ও দ্বান্দ্বিক-পরিসরের বাস্তবনিষ্ঠ রূপটি গভীরভাবে সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পের বিচিত্র বিন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পের পটভূমিতে সেলিনা হোসেনের বিশেষ প্রবণতা ও লক্ষ্য : 'বাংলাদেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছে, সেই সম্পর্কের ভেতরকার অসংগতিগুলো কী— পাঠকের দৃষ্টি, ভাবনা আর বোধের সীমায় এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আসা।'[২৬] ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসর ও বিন্যাসে সেলিনা হোসেন নিরন্তর এই কাজই করে চলেছেন। সেলিনা হোসেনের মানস-প্রবণতা গঠনে অবাধ প্রকৃতি এবং পারিবারিক পরিমণ্ডল ও পরিপার্শ্বের প্রভাব গভীরভাবে ছায়াপাত করেছে তাঁর ছোটগল্পের আখ্যানভূমে বিচরণকারী নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে। লেখকের জবানীতেই তা সুস্পষ্ট :

> আমার শৈশব-কৈশোর হচ্ছে সোনালি সময়ের শৈশব-কৈশোর; সেখানে আমার দুই ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল। এক, অবাধ প্রকৃতি দেখা; মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, খাল-বিল, নদী, ধানক্ষেত, আকাশ— ঘুরে বেড়ানোর অবাধ স্বাধীনতা ছিলো। প্রকৃতি দেখেছি দু'চোখ ভরে। আর দ্বিতীয়, দেখেছি মানব-মানবীর সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণ যে কতো বিচিত্র হতে পারে সেটা শৈশব-কৈশোরে দেখতে পেয়ে সম্পর্কের জটিলতার ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিলাম। মানবসমাজের কথা, প্রকৃতির বিচিত্র কথা— এসব প্রকাশের জন্য বড় ক্যানভাসের প্রয়োজন অনুধাবন করেছিলাম। সে জন্যেই কথাসাহিত্য চর্চা।[২৭]

শৈশবেই সেলিনা হোসেনের এই উপলব্ধি হয়েছিল যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলো সহজ নয়। মানুষের স্বভাব ও ক্রিয়াকর্ম বিচিত্র; এই ক্রিয়াকর্মই মানুষের সম্পর্কগুলোকে জটিল করে দেয়। শৈশবে তিনি দেখেছিলেন অভাবের কাছে মানবিক মূল্যবোধ কেমন করে হারিয়ে যায়। সেই দেখাটা এখনও চলছে; এখনও শেষ হয় নি; সেই শৈশবের অভিজ্ঞতা এখনও তাঁর শিল্পসত্তায় ক্রিয়াশীল— যার নিদর্শন ছোটগল্পে রূপায়িত বহুমাত্রিক নারী-জীবনের নানামাত্রিক সমাজবাস্তবতা। সেলিনা হোসেনের সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজসচেতনতা এবং বস্তুবাদী জীবনপ্রত্যয়। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। গত দু-তিন দশকে বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজ আরও দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, মেরুকরণ, সীমাহীন লুণ্ঠন আর দুর্বৃত্তায়নে জর্জরিত বাংলাদেশ যে নৈরাজ্য আর অবক্ষয়ের কবলে পড়ে, তাতে সামাজিক সংকট আরও তীব্রতর ও জটিল আকার ধারণ করে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিজীবনেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কেও দেখা দেয় নতুন মাত্রা। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের টানাপোড়েনের বিচিত্র পরিসর ও নেপথ্য-সূত্রকে সমাজসত্যের আলোকে সেলিনা হোসেন গল্পে বিধৃত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে

রূপায়িত করেছেন শৈল্পিক পটভূমিতে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সঙ্কটের ভেতরেও ছোটগল্পে রূপায়িত নারীরা ইতিবাচক জীবনদৃষ্টিতে আত্মপ্রত্যয়ী ভূমিকায় অবতীর্ণ। জীবনের প্রতি গভীর আস্থা ও দৃঢ়মূল বিশ্বাসে সেলিনা হোসেন নির্মাণ করেছেন তাঁর গল্পের নারীদের। তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিসর ও পটভূমিতে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক নারী-জীবনের বাস্তব চিত্রায়ণ। একক কোনো গল্প নয়, একটিমাত্র কাহিনি নয়— টুকরো টুকরো নানা কাহিনির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীজীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ভাসিত ছোটগল্পের পটভূমে। বাংলাদেশের নারীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে— সেই যাপিত-জীবনের নানামাত্রিক চালচিত্রই সেলিনা হোসেন গল্পের পটভূমি ও উপজীব্য করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই বলা যায় : 'তাঁর গল্প মানেই নারীর গল্প, বাংলাদেশের নারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনের গল্প।'[২৮] সাধারণ দৃষ্টিতে কোনো কাহিনিকে সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখে, সেইভাবে দেখা নয়, গল্পের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে যে জীবন, সেই জীবনের বৌদ্ধিক দিকটিকে পাঠকের বোধের সীমায় প্রতিবিম্বিত করে তোলেন সেলিনা হোসেন গল্পে বর্ণিত নারী-জীবনের বিচিত্র আধারে। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের সমান্তরালে লেখকের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্মোচিত বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা, মানুষের জীবন-সংকটের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের অসমতা ও আত্মসংকটে ক্ষত-বিক্ষত মানবিক অবচয়ের নিদারুণ বাস্তবচিত্র। ছোটগল্পের বিচিত্র অবয়ব ও পরিসরে সেলিনা হোসেন একজন দক্ষ জীবনশিল্পীর ন্যায় : 'ব্রাত্যনারী থেকে অভিজাত নারী, নিম্নবর্গের নারী থেকে উচ্চবর্গের নারী, সাধারণ-সরল-গ্রাম্য নারী থেকে প্রখর রাজনীতি-সচেতন নারী, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সব স্তরের নারীকেই গল্পের চরিত্র ও ন্যারেটিভের অংশ করে তুলেছেন তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতা ও পরিপার্শ্বের পটভূমিকায়।'[২৯] সৃষ্টিশীল জীবনের শুরু থেকেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য। প্রথম পর্যায়ে সচেতনভাবে নয়, অনেকটা অসচেতন অথচ লেখকের সংবেদনশীল অনুভূতি দিয়ে তিনি ছোটগল্পে নারীর বহুমাত্রিক জীবনচিত্রের উন্মোচন করেছেন। আর এখন তিনি নারীবাদ সম্পর্কে সচেতন হয়েই গল্প লিখছেন। বলা যেতে পারে যে : 'নারী অধিকার, মুক্তিযুদ্ধ, গ্রাম-কিংবা শহরের মধ্যবিত্ত, প্রচ্ছন্ন রাজনীতি, আর্থনীতিক ভাবনা-চিন্তা তাঁর গল্পের মৌল কাঠামো নির্মাণ করেছে।'[৩০] নারী ইস্যুকে কেন্দ্র করে লেখা gwZR‡bi †g‡qiv গল্পগ্রন্থ সেলিনা হোসেনের শিল্পসত্তার অনবদ্য স্বাক্ষর। এটি দশটি গল্পের সংকলন। নামগল্পের মূল চরিত্র মতিজান। নারীর জৈবিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়শক্তি অর্জন করে তাঁর চরিত্ররা। 'লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর' গল্পে নারীর ব্যক্তিত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনচেতা ও প্রকৃত মানুষ হওয়ার সংকল্পের কথা বিবৃত হয়েছে লিপিকা চরিত্রের অবয়বে। 'আকালির স্টেশনের জীবন', 'মেয়েলোকটা', 'পারুলের মা হওয়া', 'হৃদয় ও শ্রমের সংসার' ইত্যাদি গল্পে নারীর অধিকার, আত্মবোধ ও আত্মচেতনা, লৈঙ্গিক শোষণ মুক্তিভাষ্য শিল্পিত মাত্রা পেয়েছে। এ গ্রন্থের গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে সেলিনা হোসেন নারীবাদী ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে

নারীকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন। একই সঙ্গে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও প্রথাগত ইমেজকে করে তুলেছেন প্রশ্নবিদ্ধ। লেখকের অন্যান্য গল্পের ক্ষেত্রেও নারী-জীবনের রূপায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর নারীবাদী ভাবনা তথা সমাজসচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নারী-জীবনের বিচিত্র অভিধাকে গল্পে রূপায়ণের নেপথ্যে প্রকারান্তরে সেলিনা হোসেনের গভীর জীবনভাবনা ও সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> আমি নিজেকে সে রকম বড় মাপের নারীবাদী মনে করি না। নারীবাদী ভাবনাকে প্রকাশ করার তাগাদা থেকে কখনো লিখিওনি। যদিও নারীরা পুরুষতন্ত্রের শিকার, তারপরও বলবো— জনজীবনের দিকে যখন তাকাই দেখতে পাই শ্রেণি দুটি এমনভাবে বিভক্ত যে সাধারণ মানুষের জীবন কথা তুলে ধরার জন্য নারী-পুরুষকে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।[৩১]

বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের নারী-জীবনের বাস্তবধর্মী জীবন-অভিধা। তাঁর গল্প তাই কেবল সাহিত্য সৃষ্টি নয় বরং হয়ে উঠেছে নারীর জীবনবোধ, দর্শনচিন্তা, বেঁচে থাকার পরিসর, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন এভাবেই মানবিক বোধের জায়গা ছুঁয়ে যায়। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন কখনো কখনো পাঠককে এই ভাবনায় তাড়িত করে যে, এই নারী আমাদের সমাজবাস্তবতায় স্বাভাবিক কোনো নারী-চরিত্র কী-না; কখনো কখনো এটাও মনে হতে পারে, তাঁর গল্পে রূপায়িত নারী যে এভাবে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের সমাজ সেইভাবে গঠিত কী-না। কোনো সন্দেহ নেই, সেলিনা হোসেন তাঁর গল্পের নারীকে প্রজ্ঞা আর সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পের নারী তাই অধিবাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। তাঁরা : 'পুরুষতন্ত্রকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে, আত্মমুক্তির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়।'[৩২] মানুষের অন্তর্জগৎ খুঁজে ফেরে লেখক, তার সঙ্গে মূল বাস্তব চরিত্রের মিল না থাকলেও কিছু এসে যায় না। বাস্তব এবং কল্পনা দিয়েই তৈরি হয়েছে সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-চরিত্রের অবয়ব। এ প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিমতে ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবন প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় :

> এখনও আমি ভাবি যে এই আচরণ তো সামাজিক বাস্তবতা নয়। তবে আমি কেন করলাম? সিদ্ধান্তে এভাবে পৌঁছাই যে, একদিন নারী-পুরুষের সম্পর্ক এভাবে সমান হবে। আমি তো এমন স্বপ্ন দেখতেই পারি। মানুষের জীবনের ভালোবাসার পরিমাপ থাকবে না। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সাহিত্যের বাইরে এনে এক সমান্তরালে স্থাপন করলে একদিন সাহিত্যের গল্প জীবনের গল্প হবে।[৩৩]

ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতার প্রকৃত অবয়বের স্বরূপ-সন্ধান বা উন্মোচন— দৃষ্টিভঙ্গির এহেন স্বকীয়তাই সেলিনা হোসেনের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা-শক্তি।

নাসরীন জাহান আশির দশকের অন্যতম বহুপ্রজ লেখক। তাঁর রয়েছে প্রচুর ও বহুমাত্রিক গল্পলেখার প্রবণতা। প্রতারক সময়ের সর্পিল চেহারা, বিশৃঙ্খল ও জটিল বহুমাত্রিক সংঘাত ও সংঘর্ষে ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায়, দেশ বিপন্ন। এই সমাজ ও সময়ের একজন সচেতন লেখক বলেই নাসরীন জাহান তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিসর ও পটভূমিতে পরিহার করেছেন সরল প্লট, বর্ণনার বাহুল্য, ঘটনার ঘনঘটা। সময় যেহেতু সর্পিল, সনাক্তহীন তাই গল্পে রূপায়িত নারী-চরিত্রগুলো উদ্ভট, রহস্যময়, ঝাপসা, নাম পরিচয়হীন। নাসরীন জাহানের গল্পের বিষয় হিসেবে এসেছে ব্যক্তিমানুষের ক্ষয়, ক্লেদ, মনোবিকলন, নারীর নিজস্ব পৃথিবী, একই সমাজে বাস করা একজন পুরুষের আর একজন নারীর ভিন্ন— প্রায় বিপরীতধর্মী— বাস্তবতা, এই সমস্তকিছু। বলা যেতে পারে : 'নাসরীন জাহান ইতোমধ্যে তাঁর শিল্প-অন্বেষণার পথ খুঁজে নিয়েছেন। গল্প বা উপন্যাস কোথা থেকে শুরু করবেন, কোথায় গিয়ে শেষ করবেন, কিভাবে বিন্যাস করবেন, সেখানে বাস্তববোধ ও রূপক, প্রতীকের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি রচনাকে শিল্পময় করে তোলার কৌশল রপ্ত করেছেন।'[৩৪] মানুষের মনের অন্ধগলিতে বিহার করে তাঁর চিন্তার বিচিত্র প্রকাশকে নাসরীন জাহান বেশ কুশলতার সঙ্গেই উপস্থাপিত করেছেন গল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে। শিল্পচৈতন্যের এরূপ প্রকাশে বাস্তব কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজেকে জাহির করে না; পরাবাস্তব এরূপ ক্ষেত্রে তার রহস্যঘন প্রকাশে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নাসরীন জাহানের গল্পের বিচিত্র পরিসর ও বিন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে : 'বাস্তব জীবনকে তিনি তাঁর কল্পনার রসে জারিত না করে কিংবা রহস্যের স্পর্শ না এনে প্রকাশ করা থেকে প্রায়শ বিরত থাকেন।... তবে তা কোনোক্রমেই কল্পনাসর্বস্ব বাস্তব-জীবন হয় না।'[৩৫] বরং রহস্য ও কল্পনার ঘেরাটোপে বাস্তব জীবনের নতুন অবয়ব নির্মাণ করেন নাসরীন জাহান গল্পের জমিনে। সেই অবয়বে সময়, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচিত্র স্বরূপের যেমন উন্মোচন ঘটে তেমনি এরই সমান্তরালে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তব ও জীবনঘনিষ্ঠ দিকেরও প্রতিফলন ঘটে। নারী-হৃদয়ের গুহায়িত রহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে সময়, সমাজ ও পরিপার্শ্বের যথার্থ বাস্তবতা। 'পরগাছা' গল্পে নিছক জীবিকার সন্ধানে, বেঁচে থাকার ঐকান্তিক ইচ্ছায় কাজ করতে আসা মেয়েটি রক্ষা পায় না গৃহকর্তা নামক নরপশুর বিকৃত লালসার হাত থেকে। 'জনক' গল্পে বর্ণিত কথক নারী নিজের গর্ভে ধারণকৃত সন্তানের পিতৃ-পরিচয়ের সঙ্কটে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে এবং নিজেকে প্রকাশ করতে না-পারার ব্যর্থতায় এক বিচিত্র টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। 'সুন্দর লাশ' গল্পে বিরূপ প্রতিবেশে বেড়ে ওঠা জিনাত নামের তরুণীটি পুরুষদের, মানুষের কঠিনভাবে চিনতে চিনতে এক পর্যায়ে এমন হয়ে ওঠে যে, কোনো পাখি কিংবা চন্দ্রালোকিত জ্যোৎস্না রাত তাকে এক

মুহূর্তের জন্যও আর স্পর্শ করতে পারে না। এক অব্যক্ত গ্লানিময় দাম্পত্যজীবনের বোঝা বয়ে ক্রমাগত নিজেকে রিক্ত-নিঃস্ব করে তোলে জিনাত। 'পথ, হে পথ' গল্পে মইন ও খুকির অপ্রেম-সংসারের একঘেয়ে টবপ্রতীম জীবনের সজ্জায় কৃত্রিমতায় হাঁসফাস করা যাপিত-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে নারী-জীবনের অন্তর্গত জটিলতার দ্বান্দ্বিক স্বরূপটি সময়-প্রতিবেশের নিরিখে বিবেচ্য। 'ছেলেটি, শিশুটি, তার অনুভব' গল্পে বর্ণিত ছেলেটির অনুভবের দ্যোতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রতি সহিংসতার বর্বরোচিত জীবনাখ্যান। 'যুদ্ধে যে মেয়ে প্রতারিত হয়েছিলো' গল্পে প্রবঞ্চক প্রেমিক-পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতারিত হওয়ার সমাজবাস্তবতা যুদ্ধকালীন পটভূমিতে নীলু নামক মেয়েটির নারকীয় পাশবিকতার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনার আবর্তে রূপায়িত হয়েছে। নাসরীন জাহানের বেশিরভাগ গল্পের বিষয়-আশয় এসবই। মূলত কিছুটা রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে নাসরীন জাহান বর্তমানের অসহিষ্ণু জীবনাচরণ, অস্থির সমাজ-ব্যবস্থা এবং দিন দিন বেড়ে ওঠা জন্ম-সমস্যার চাপে নুয়ে পড়া সমাজ-জীবনের নানামাত্রিক অনভিপ্রেত দিকগুলো জীবনঘনিষ্ঠতার আলোকে শিল্পিত করেছেন গল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে। নষ্ট সময়ের ভিটের উপর দাঁড়িয়ে নাসরীন জাহান গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবনের আলোকে প্রকারান্তরে সমাজ সংসারের জীর্ণশীর্ণ চালচিত্র ও হতাশায় নিমজ্জিত মানুষের কুৎসিত দিকগুলো কার্যকারণের ন্যায়সঙ্গত সম্বন্ধ যোজনা করে তার সমাজবাস্তব চিত্রের উন্মোচন করেছেন। নাসরীন জাহানের গল্পে প্রধানত দুটো ধারা প্রবাহিত। নাগরিক জীবনের নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্লান্তি-অবিশ্বাস-টানাপোড়েন-সন্দেহ-পুরুষাধিপত্যের ফল ইত্যাদি রয়েছে এক ধারায়। আর অন্য ধারাটি গ্রামীণ-জীবনের আর্থ-সাংস্কৃতিক বলয়ে নারীকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে খেতে চমৎকার স্রোতসৌন্দর্য নিয়ে এগিয়েছে। তবে লক্ষণীয়, গ্রামীণ পটভূমিতে বলতে নাসরীন জাহান এটা করতে চান নি যে : 'গ্রামের বিশাল ক্যানভাসে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের ডকুমেন্টশন।'[৩৬] বরং উভয় ধারাতেই গল্পের অবয়বে কিছু সিম্বল, কিছু আলো-অন্ধকারের খেলার মধ্যে সে মানুষগুলোর ভেতরকার দ্বন্দ্ব ও সত্যের রূপ চিনে নেয়া ও চেনানোর কাজটিই করেছেন নাসরীন জাহান অসাধারণ শিল্প কুশলতায়। ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক জীবন-অভিধার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নাসরীন জাহানের দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে স্বীকার্য যে, বাংলার নারী লেখকদের সমাজপিষ্ট মানসের উল্লম্ফনে যে পুরুষ-বিরোধী চিন্তার একরৈখিকতা আমরা দেখে থাকি বহুলখ্যাত নক্ষত্রউপম ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেখান থেকে দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় নাসরীন জাহান স্বতন্ত্র। কেননা ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-চরিত্রকে তিনি সমাজ-আর্থ-রাজনীতির বাইরে নিয়ে শূলে চড়াতে যান না। বরং সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থাপন করেন বলেই গল্পে রূপায়িত নারী-জীবন হয়ে ওঠে বাস্তব-জীবনেরই গল্প। বলা যেতে পারে তাঁর গল্প জীবনবাস্তবতারই অনবদ্য শিল্পভাষ্য। নাসরীন জাহানের গল্পে নারী-জীবনের রূপায়ণ-সূত্রে তাঁর নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই তাই আরোপিত বা

Dhaka University Institutional Repository

নিছক তাত্ত্বিক হয়ে পড়ে না। বরং নাসরীন জাহান গল্পের ভেতরে এমনভাবে নিজস্ব ভাবনাকে নিজস্ব অন্বিষ্টকে রূপায়িত করে তোলেন যে গল্পের কাহিনি বা চরিত্রের অবয়ব স্বাভাবিকতার পথ ধরে সঞ্চরণশীল থেকে পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। সমাজের অগ্রগতির মূলে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ জৈবিক পার্থক্যকে পুঁজি করে জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্টি করে সমাজের সকল স্তরে নারীকে অধঃস্তন ও অবদমিত করে রাখা হয়। অতএব, সমাজের প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচনে সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানের স্বরূপ-সন্ধান অত্যন্ত জরুরি ও অনিবার্যভাবেই প্রাসঙ্গিক। নাসরীন জাহানের ছোটগাল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছে নারী-জীবনের নানামাত্রিক সামাজিক অসমতার বাস্তব দৃশ্যপট। সমাজের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবন-অভিধার বাস্তব চিত্রায়ণ ঘটেছে নাসরীন জাহানের ছোটগল্পের পটভূমে। ছোটগল্পে নারী-জীবনের রূপায়ণ প্রসঙ্গে নাসরীন জাহানের নিজস্ব অভিমতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য :

> এটা স্পষ্টত যে, এই পৃথিবীটা পুরুষশাসিত। তুমি একটা অফিসে কাজ করো, তোমার বস যদি তোমাকে ডমিনেট করে, তোমার ভেতর থেকে প্রতিবাদ আসবে না? প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করলে হয়ত তোমার চাকরি চলে যাবে, কিন্তু প্রতিবাদ কিন্তু আসবেই— যদি তোমাকে অহেতুক ডমিনেট করে। এখন একটা ছেলে ও মেয়ে সমান কাজ করার পরেও যদি শোষিত হয় একটা মেয়ে, এটা বলা হয়— একজন শ্রমিক যেমন শ্রমিকবাদী তেমনভাবে একজন নারী নারীবাদী। ... নারীবাদী ভাবনার জন্য শুধু নারী হওয়ার দরকার নেই। আর আমাদের দেশে হয় কী— ছেলেমেয়ে কাজ করে ফেরে, বাবা-মা বলে— আহারে, আমার ছেলেটা সারাদিন খেটে আসলো। পানি এগিয়ে দে ইত্যাদি। আর বউটা যখন একই কাজ করে, লোকে বলে, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন কত ভালো, তোমাকে কাজ করতে দেয়। তোমার হাজব্যান্ড কত ভালো, তোমাকে কাজ করতে দেয়। যেন মেয়েটা প্রমোদ-বিহার করতে গেছে, চাকরি করতে যাচ্ছে না। দুজনে একই কাজ করে। তবু মেয়েটা ঘরে ফিরে দৌড়ে রান্না করতে যায়, যাতে কথা শুনতে না হয়। এই দুটো বিষয় তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে কি তোমার মনে হয় না— নারীরা তাদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরবে না তাদের লেখায়? প্রতিবাদ করবে না?[৩৭]

মানুষকে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা না-দেওয়ার চেয়ে বড় নির্যাতন ও নিপীড়ন আর কিছুই হতে পারে না। নারীবাদী ভাবনায় উজ্জীবিত সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের প্রকৃত বাস্তবতার স্বরূপ-উন্মোচনের লক্ষ্যে নাসরীন জাহানের ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত হয়েছে নারী-জীবনের নানামাত্রিক চালচিত্রের খুঁটিনাটি দিক।

আলোচ্য চারজন গল্পকারের রচনায় রূপায়িত নারী-জীবনের তুলনামূলক বিবেচনায় প্রতীয়মাণ হয় যে হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁদের ছোটগল্পের জমিনে নারী-জীবনের রূপায়ণ প্রসঙ্গে নারীবাদী ভাবনার দ্বারা উজ্জীবিত হন নি। সমাজ-মনস্ক চেতনার রূপায়ণ-সূত্রেই প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁদের রচনায় নারী-

জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সার্থক চিত্রায়ণ ঘটেছে। নিরাপদ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, সময় ও সমাজের ব্যবচ্ছেদ করার প্রত্যয়ে ছোটগল্পে হাসান আজিজুল হক নারী-জীবনকে উপজীব্য করেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বহুমাত্রিক আয়োজন অসহ-সময়-প্রতিবেশ ও সমকালের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জীবন-বাস্তবতার উন্মোচন-সূত্রেই প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে লক্ষণীয়, ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমিতে সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের জটিলতা ও দ্বান্দ্বিক পরিসরে নারী-জীবনের নানামাত্রিক জীবন-বাস্তবতার উন্মোচন ঘটিয়েছেন নারীবাদী ভাবনার দ্বারা উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত সমাজসচেতনতার আলোকে। নাসরীন জাহানের গল্পের বিশিষ্টতা এই যে, বাংলার প্রচল আধুনিক নারীবাদী সাহিত্য রচনার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বহুমাত্রিক বিন্যাসে লক্ষ করা যায় না। নারীকে কেন্দ্র করে রাখার একটা প্রবণতা যদিও স্বভাবতই তাঁর ছোটগল্পে পরিলক্ষিত হয়, সত্যের ইশারাগুলো মেলে দেয়ার জন্য তার নিজস্ব একটা প্রয়োজনে। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, কখনো ব্যক্তিক কখনো সামষ্টিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে আখ্যানকে বিন্যস্ত করেন তিনি। সে পরিপ্রেক্ষিতেই ছোটগল্পের বিচিত্র পরিমণ্ডলে উপস্থাপিত হয়েছে নারী-জীবনের নানাবিধ জীবনালেখ্য। পুরুষের সামাজিক রূপ আঁকতে গিয়ে আক্রোশে নাসরীন জাহান কখনোই অন্ধ হয়ে যান না বরং এরই সমান্তরালে তাঁর সমাজ-চেতনার শক্তিটা প্রকাশ পায়। নারী-জীবনকে সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থাপনের অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তায় নাসরীন জাহানের ছোটগাল্পিক দক্ষতা অনস্বীকার্য।

Z_¨wb‡'k

১. মাহমুদা ইসলাম, bvixev'x wPšÍv I bvixRxeb, জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৫৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৫. রাশিদা আখতার খানম, bvixev' I 'vkwbK †cÿvcU, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, কক্ষ নং ১১০৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৭৩

৬. শামীমা মিতু, 'তবুও এগিয়ে যাচ্ছে নারী', mgKvj, বর্ষ ৯ সংখ্যা ৩৪২, ৮ মার্চ ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১৫ : কলাম ১

৭. শাহজাহান আকন্দ শুভ ও ইউসুফ সোহেল, '১২ হাত আইন, ১৩ হাত নারীনির্যাতন', Avgv‡`i mgq, বর্ষ ৯ সংখ্যা ৩৩৬, ০৮ মার্চ ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১ : কলাম ১

৮. মানসুরা হোসাইন, 'নারী ঘরেই বেশি নির্যাতিত', c_g Av‡jv, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৭৯, ২৩ জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১ : কলাম ২

৯. সম্পাদকীয়, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস / নারীর সম-অধিকার সর্বজনীন প্রগতি', c_g Av‡jv, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১২৩, ৮ মার্চ ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১০ : কলাম ২

১০. আজহার ইসলাম, evsjv‡`‡ki †QvUMí : welq-fvebv, ¯i¦c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৬

১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡`‡ki mvwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ২৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮৪

১২. চঞ্চলকুমার বোস, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা', MíK_v (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাজান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮৮

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১৪. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক), nvmvb AwRRj n‡Ki wbewPZ Mí, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. দ্রষ্টব্য : ভূমিকা

১৫. হায়াৎ মামুদ (সম্পাদক), D‡b¥wPZ nvmvb, (হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা), ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১১৩-১১৪

১৬. হাসান আজিজুল হক, 'আমার লেখালেখি', evPwbK AvZ¥RewbK, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, মে ২০১১, পৃ. ৯০

১৭. শহীদ ইকবাল, evsjv‡`‡ki mvwn‡Z¨i BwZnvm, আলেয়া বুক ডিপো, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৭৬

১৮. আলাউদ্দিন মণ্ডল, AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm : wbgv‡Y-wewbgv‡Y, মাওলা ব্রাদাস, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৪৮

১৯. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৯

২০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

২১. জাফর আহমদ রাশেদ, AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi †QvUMí : Rxe‡bvcjwäi ¯i¦c I wkí ; শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ১০০

২২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

২৩. জাফর আহমদ রাশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

২৪. শহীদ ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

২৫. শহীদ ইকবাল, K_wkíx AvLZvi‡¾vgvb Bwjqvm, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ.৯৪

২৬. মাসুদুজ্জামান, ‘নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন’, nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ঢাকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, পৃ. ৪২৭

২৭. মারুফ রায়হান, †jLv bq K_v (১০ আলোচিত লেখকের সাক্ষাৎকার), সূচীপত্র প্রকাশনী, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৬৪

২৮. মাসুদুজ্জামান, nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. শহীদ ইকবাল, evsjv‡`‡ki mwn‡Z¨i BwZnvm, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫

৩১. মারুফ রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৩২. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৩৩. পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক), †jL‡Ki K_v, রাইটার্স. ইনক, ঢাকা, জুলাই ২০১৩, পৃ.৯৪

৩৪. আহমেদ মাওলা, ‘বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ও আঙ্গিক চেতনা’ nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

৩৫. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৪

৩৬. শুভাশিস সিনহা, ‘নাসরীন জাহানের গল্প : গ্লানিতে উত্থানে গড়া জীবনাখ্যান’, nvjLvZv, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৭২

৩৭. নাসরীন জাহান, ‘অর্থহীনতা মানুষকে দ্রুত ব্যক্তিত্বহীন করতে পারে’, Míc Î (সম্পাদক : মাসউদ আহমাদ), বর্ষ ২ সংখ্যা ৪, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

শিল্প-বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোল্যুশনের পর ইউরোপে যে জীবনধারা তৈরি হয় তাকে কেন্দ্র করেই জন্মলাভ করে ছোটগল্প। সামন্ত-প্রথার অবলুপ্তির ফলে যে নতুন সামাজিক বিন্যাস ঘটেছে তার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ছোটগল্পের জন্ম দিয়েছে। ব্যক্তি এখন আগের মতো আর গতানুগতিক জীবনপ্রবাহে ব্যক্তিত্বহীন বা একছকে গড়া মানুষ নয়। নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মানুষ এখন অনেকটা নিজের অধিকার অর্জনে সক্ষম। ব্যক্তি বড় বড় পরিবার থেকে বেরিয়ে নিজের একক পরিবার গড়ছে। অনেকটা লাভ করছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিটি মানুষ যে আলাদা, ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সে বোধ জাগছে এবং এই বোধকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির ভালো লাগা না-লাগা, তার মানস-স্বাস্থ্য ও বিকলন, তার চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব ও উপরে ওঠার প্রক্রিয়া নানা অবস্থান তৈরি করছে, তৈরি করছে নানা সিচুয়েশন— এইসব বিষয়-আশয় ছোটগল্পের বিকাশকে করছে বিস্তৃত। ব্যক্তি-জীবনের হাজারো ক্যালেইডস্কোপিক বিচ্ছুরণ ছোটগল্পের আধেয়কে করেছে বলিষ্ঠ। পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্যন্তর সীমাবদ্ধতার চাপে, অসহ সময়-প্রতিবেশের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে ও সময়ের শাসনে মানুষ যতই যান্ত্রিক হয়েছে, ছোটগল্প-সাহিত্যের বিকাশ ততই হয়েছে সমৃদ্ধ। কেননা একথা অনস্বীকার্য যে, শিল্পীমনে যুগের প্রভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখকদের অনুভবে ক্রমাগত আবর্তিত হয় যুগধর্ম, সেই অনুভব-বলে লেখকের রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে একটি যুগ তার যাবতীয় চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার ভয়াবহ পরিণতিতে বাংলার জনজীবন যখন বিপর্যস্ত ও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ধ্বংসের মুখোমুখি, তখন লেখকদের সৃষ্টিকর্মে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো সমকালীন দেশ ও মানবতার বিধ্বস্ত প্রতিচ্ছবি। তারপরে দেশ যখন একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ নেয় এবং সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মর্মান্তিক পরিণতি শুরু হয়, তখন কথাসাহিত্যিকদের রচনায় সেই সব জীবন-বাস্তবতার রূপায়ণই প্রধান হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে ইতিহাস অধিকতর নতুন দিকে বাঁক পরিবর্তন করে। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পাকিস্তানের পতন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাঙালির জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ ও ব্যর্থ-স্বাধীনতার তিক্ত অনুভূতি— এ সব কিছুই যুগের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধারণ করেছেন ছোটগাল্পিকগণ ছোটগল্পের জমিনে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে পূর্ব-বাংলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পর তৎকালীন পূর্ব-বাংলা তথা পরবর্তী সময়ের পূর্ব-পাকিস্তানে যে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল তাকেই বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যের সূচনা নির্দেশক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। সেই সময় হতে বর্তমান কাল-পরিসরে রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমিতে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভাসিত হয়েছে সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গ। সময়, সমাজ ও যুগধর্মের অনিবার্য প্রবহমানতায় আধুনিক সমাজ-জীবনে নিয়ত সংঘটিত নানামাত্রিক অস্থিরতা ও অরাজকতায় যেন—

> বৈষম্যের ধস নেমেছে, তার জন্যে যন্ত্রণাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে মানুষকে। বিংশ শতাব্দীর ভাবাদর্শই হচ্ছে প্রাচীন মূল্যবোধের বদলে জীবন-চিন্তায় নতুন ভাবনার আরোপ। আজকের মানুষ বুঝেছে প্রেমের কোনো শাশ্বত মূল্য নেই, প্লেটনিক প্রেম অর্থহীন, একটা বুর্জোয়া চালাকি মাত্র; গুরুজনকে ভক্তি করাও কার্যকর ব্যবস্থা নয়। ধনী যে আর পাঁচজনের ভাগ মারছে— পূর্ব সুকৃতির জন্যে সে রাজা, আর অন্যে গরীব, এই অন্তঃসারশূন্য ধাপ্পাবাজি আজ বেশ ভালোভাবেই ধরা পড়েছে, ফলে সমাজে অসন্তোষ বেড়েছে। জীবনের বিভিন্ন দিকেই অস্থিরতা ও অবক্ষয়। সুস্থ সংহত উচ্চাসনের বা লক্ষ্যের হদিস মেলে না, কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাসের সিঁড়িভাঙ্গার কাজ শুরু হয়েছে, এর ফলে এবং মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্যেই প্রাচীন আদর্শের লেখা আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। কেননা আজকের লেখক জানেন যে তিনি একা, তাঁর জীবন ঘিরে যন্ত্রণার পরিমণ্ডল।*

বলা বাহুল্য, নানা সমস্যায় জর্জরিত এই সংক্ষুব্ধ-জীবনই অনিবার্যভাবে বাংলাদেশের ছোটগল্পের পটভূমি ও আধারে শিল্পিত ব্যঞ্জনায় নির্মাণ পেয়েছে।

নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজের সার্বিক গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়-বিচার, সামাজিক সাম্য— এ সবের মূলে নারী-পুরুষের সম্মিলিত ভূমিকার তাৎপর্য অনস্বীকার্য। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুষম সমাজ গঠন এবং সমাজের নারীপুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। লক্ষণীয় যে, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে স্বাধীনতার ৪২ বছরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। দেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সিটি করপোরেশনের মেয়র, পুলিশ ও সেনাসদস্য, বৈমানিক, বিচারক, উদ্যোক্তা, ক্রিকেটার তো বটেই; বাংলাদেশের নারীর বিজয়-পতাকা উড়েছে এভারেস্ট চূড়ায়ও। কিন্তু এটিই শেষ কথা নয়। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর অগ্রগতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও এখনও নারীরা নানামাত্রিক বৈষম্যের শিকার। নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে বহুবিধ আইন ও বিধি-বিধান প্রণীত হলেও নারীর মানবাধিকার নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। যদিও পাল্টাচ্ছে নির্যাতন ও নিগ্রহের প্রকরণ কিন্তু ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা। প্রকৃতপক্ষে, সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার আসন ও নারীর মানবাধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনও ঘরে-বাইরে নারী দারুণভাবে উপেক্ষিত, বঞ্চিত

* শুদ্ধসত্ত্ব বসু, evsjv mwwn‡Z¨i bvbv i/c, কলকাতা, ১৩৮৫ ব. পৃ. ১৭৯

ও অবহেলিত। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের প্রকৃত মুক্তি কখনোই নারীর অবদানকে অস্বীকার বা অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে নারীর ভূমিকা ও অবদান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সময়, সমাজ ও সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে সে-কারণেই সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত অবস্থান ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ তাৎপর্যের স্বরূপ-সন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিটি স্পন্দন ধারণ করে জীবনবাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, সে-কারণে বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন আমাদের দৈনন্দিন যাপিত-জীবনের মধ্যেও যে আরও নানান দেখবার ও বুঝবার দিক আছে, আমরা তা নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি তেমনি এর মধ্য দিয়েই অতীত থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিতে সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটি মূর্ত হয়ে উঠবে। সমাজে নানা ধরনের অসমতা বিদ্যমান তবে নরগোষ্ঠী, বর্ণ ও শ্রেণি-বৈষম্যের পাশাপাশি নারী-পুরুষ বৈষম্য বা অসমতা অন্যতম সামাজিক সমস্যা যা সমাজের সুষ্ঠু বিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কাজেই বাংলাদেশের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই প্রকারান্তরে উন্মোচিত হতে পারে সমাজের যথার্থ বাস্তবতা।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাসে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান-এর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচিত ছোটগল্পের পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোকে প্রকারান্তরে ঘুণে ধরা, অবক্ষয়পীড়িত সমাজের রুগ্ন-ভঙ্গুর দেশচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে। ছোটগল্পলেখক হিসেবে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও সেলিনা হোসেন ষাটের দশকের বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। পুরো ষাটের দশক একটি অনিশ্চয়তার দশক, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দশক, নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের দশক। এ সময়কালে 'একদিকে সামরিক শাসনের পেষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অবাঙ্গালী পুঁজির বিকাশ; অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই সময়কে অস্থির করে তোলে।'* পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে তাই পুরো ষাটের দশক এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়কাল হিসেবে বিবেচিত। অস্থিতিশীল, সংগ্রামমুখর অসহ সময়-পটভূমিতে মানুষের মধ্যে বিশেষত মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সামূহিক অনিশ্চয়তার জন্ম হয়েছিলো স্বাভাবিকভাবেই তার গভীর প্রভাব পড়েছে এ দশকের বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর। হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের মধ্য

* আহমদ কবির, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্ড়র : বিষয় ও প্রকরণ : প্রসঙ্গ– ছোটগল্প', GK‡ki ceÜ 88, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল, বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে ষাটের দশকের বাংলাদেশের উন্মাতাল, সংক্ষুব্ধ স্বরূপটি প্রকৃত অর্থেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সামাজিক-রাজনীতিক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অস্থিতিশীলতা, বিদেশি সাহিত্য পাঠের প্রভাব, মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের নৈঃসঙ্গ্য ও অবক্ষয়, সংশয় ও দুরাশা, সংকল্প ও অন্তঃসারশূন্যতা— এরকম একটি অসহনীয় পটভূমিতে ষাটের দশকের আলোচ্য গল্পকারগণ যে সব গল্প লিখেছেন তা বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে নানাভাবে স্বতন্ত্র হলেও তার মূল স্রোত চেতনার দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। অন্যদিকে আশির দশকের অন্যতম বহুপ্রজ লেখক নাসরীন জাহান। আশির দশকের গল্পকারগণ সম্মিলিতভাবে যে কাজটি করেছেন তা হচ্ছে মধ্যবিত্ত জীবনের হালকা কাহিনিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পণ্যে পরিণত করার বদলে তাঁরা জীবনমুখী গল্প রচনার চেষ্টা করেছেন। আশির দশকের ছোটগাল্পিকগণ নষ্ট সময়ের বিরুদ্ধ স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালেন তারুণ্যের দ্রোহ নিয়ে, প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে। বলা যেতে পারে : 'স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বোধ করি এই যে, এ সময় আমাদের ছোটগাল্পিক-চেতনা হয়ে উঠে অনেক বেশি রাজনীতিসচেতন ও জনজীবনমূল-অন্বেষী। বস্তুত, আশির দশকের গল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা সমধিক প্রযোজ্য।'* আশির দশকের গল্পকারগণ ষাটের দশকের গল্পের উত্তরাধিকারকে বহন বা পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সমকালীন সংকট, চাপ, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অভিঘাত স্বীকার করেও নাসরীন জাহান ছোটগল্পের শরীর তৈরি করেছেন নিরাসক্ত বাস্তবতা দিয়ে। তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চিত্রায়ণে প্রমূর্ত হয়েছে অসহ সময়-প্রতিবেশের তরঙ্গাঘাত, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও সমকালের অভিজ্ঞান। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় ষাটের দশক ও আশির দশক স্বাভাবিকভাবেই তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল-পরিসর হিসেবে বিবেচিত। হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান— প্রমুখ ছোটগাল্পিক এই দুর্মর কালবেলার কথকতাকেই শিল্পিত করে তুলেছেন ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে।

ষাটের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের যে নবযাত্রা ঘটেছিল তার অন্যতম প্রাণপুরুষ এবং জীবন ও পরিবেশের অভিজ্ঞ রূপভাষ্যকার হাসান আজিজুল হক। জীবনকে তিনি দেখেছেন সৃষ্টির নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে। ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমিতে বস্তুবাদী জীবনপ্রত্যয়ে হাসান আজিজুল হক সমাজজীবনের হতাশা, অবক্ষয়, দারিদ্র্য এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতায় নিষ্পিষ্ট নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আর্তি, বিক্ষোভ ও প্রতিরোধকে সমাজবাস্তবতার আলোকে শিল্পিত করেছেন। সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা, নারী-পুরুষের অসম সামাজিক পটভূমি, সম্পর্কের বহুতলিক বিন্যাস, নারীর প্রতি সামাজিক

* বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/4 বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৯৪

দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত স্বরূপ— এককথায় যাপিত-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বিচিত্র আধারে তাঁর গল্পে একদিকে যেমন নারীর গুহায়িত জীবন-রহস্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, তেমনি এরই সমান্তরালে ব্যক্তি, সময় ও সমাজের জটিল-মিশ্র জীবন-অভিধানের বহুমাত্রিক স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজসত্যের আলোকে। হাসান আজিজুল হকের আটটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত মোট পঞ্চান্নটি গল্প লেখকের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, প্রখর মেধা ও সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সার্থক শিল্পভাষ্য। 'শকুন' গল্পে সময় ও সমাজের অবক্ষয়পীড়িত অসহ পটভূমিতে নিম্নবর্গের অসহায়, ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের মধ্যে নারীর অবস্থান যে আরো শোচনীয় ও মর্মন্তুদ সেই সমাজসত্য উচ্চকিত হয়েছে। যে অবৈধ ও সমাজ-গর্হিত সম্পর্কের সূত্র ধরে কাদু শেখের বিধবা বোনের নবোজাত শিশুর মৃতদেহের স্থান হয় মৃত শকুনের পাশে, সে-অবৈধ সম্পর্কের দায়ভার সম্পূর্ণতই আরোপিত হয় কাদু শেখের বিধবা বোনের উপর, ফলে দিনের আলোয় তাকে দেখা যায় না। মৃত শকুনের মতোই সে ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে। 'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী' গল্পে রাহেলার অবয়বে বঞ্চিত-অতৃপ্ত নারী-জীবনের হতাশা ও অচরিতার্থতাজনিত যৌন-বাসনার শিকার নারীর সামাজিক অবক্ষয় এবং দেশবিভাগজনিত মানবিক বিপন্নতার সমান্তরালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজবাস্তবতায় নারীর অধিকতর অবমাননা ও লাঞ্ছনার দেশচিত্তের উন্মোচন ঘটেছে। 'মা-মেয়ের সংসার' গল্পে মা ও মেয়ের যৌথ-জীবনযাপন প্রত্যাখ্যান করে প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সমাজের অচলায়তনকে, এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করা হয় চাপিয়ে দেওয়া নানা মূল্যবোধকে। যে মূল্যবোধের পাকে পাকে জড়ানো থাকে নানা ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা এবং আত্মপ্রতারণা। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক পরিসর ও পটভূমিতে ঘুরে ফিরে এরূপ বিষয়ই বিচিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গল্পের পরিসরে নারীচিত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নারীরা খুবই বাস্তব ও জীবন-সংলগ্ন। তাঁর গল্পমালায় যেন নারীচরিত্র বর্ণময় মিছিল। কূলটা বাগদী বৌ থেকে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহিণী, অসহায় দুঃসাহসী গ্রাম্য প্রেমিকা থেকে শহরের বিষণ্ন উদ্বাস্তু ছাত্রী, নিঃসঙ্গ শিক্ষিকা থেকে বিকারগ্রস্ত পতিতা, স্বামী পরিত্যক্তা রমণী থেকে মুক্তিযোদ্ধার ক্ষুধাভীতা পলাতকা ঘরণী— ছোটগল্পের স্বল্পায়তনে এরা নির্মিত হলেও এদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিচিত্র ব্যক্তিসত্তা আছে, আছে ব্যক্তিত্বও। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবনের রূপায়ণ ঘটেনি। তাছাড়া কোনো নারীচরিত্রই লেখকের আরোপিত ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বরং সমাজবাস্তবতা ও অসহ সময়-প্রতিবেশের যথাযথ স্বরূপ-উন্মোচনের নিরিখেই হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের বিচিত্র পরিমণ্ডলে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবন-অভিধার রূপায়ণ ঘটেছে।

ষাটের দশকের উন্মাতাল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দীপ্র আবির্ভাব। ১৯৪৩ থেকে ১৯৯৭ প্রায় ৫৪ বছরের জীবনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাঁচটি

গল্পগ্রন্থ, দু'টি উপন্যাস এবং একটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন। প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্য-সাধনার কৃতিত্ব হিসেবে তিনি মাত্র তেইশটি গল্প লিখেছেন। কিন্তু প্রসারতা দিয়ে যেমন গভীরতা মাপা যায় না তেমনি সংখ্যাগত মূল্যে নয় বরং গুণগত উৎকর্ষে তাঁর রচনার স্বল্পায়তন তীরভূমি এক ঝাঁক সবুজের প্রাণময় স্পর্শে শিল্পসুন্দর, উজ্জ্বল ও সজীব। হাতে গোনা যায় এমন সংখ্যক স্বল্পায়তন গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে—

> ফুটে উঠেছে জীবনের বিচিত্র প্রান্ত, উপলব্ধির বহুবর্ণিল জগৎ। তাঁর Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i (১৯৭৬) গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে মানবিক সম্পর্কের আত্যন্তিক বিনষ্টি, †Lvqvwi-তে (১৯৮২) যুব-মানসের নির্বেদ; 'af\v‡Z DrcvZ-এ (১৯৮৫) নিরন্ন মানুষের জীবনে অমোঘ নিয়তিশাসন, আর †'vR‡Li Ig (১৯৮৯) গ্রন্থে নেতি থেকে ইতিতে উত্তরণের কথকতা।*

লেখকের পঞ্চম ও শেষ গল্পগ্রন্থ Rvj ¯^c, ¯^‡ci Rvj-এ (১৯৯৭) স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও এরই সমান্তরালে নতুন করে স্বপ্ন দেখার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে। পুরোনো ঢাকার ক্ষয়িষ্ণুতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা এবং জীবনসংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পভুবন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের বিশ্লেষণে সময় ও সমাজের প্রতিটি স্পন্দন, তার তীব্র আলোড়ন, বিকার, হতাশা ও নৈরাশ্য সবই গল্পের বিচিত্র বিন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাঁর গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক বিন্যাস অনিবার্যভাবেই অসহ সময়-প্রতিবেশ ও সমকালের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ-সন্ধান সূত্রেই বিবেচনাযোগ্য। 'উৎসব' গল্পে বর্ণিত সালেহা, মিসেস পারভেজ, মিসেস ইশরাত হোসেন চৌধুরী, ইকবাল সাহেবের পাঞ্জাবি স্ত্রী— প্রমুখ নারী চরিত্র নবোদিত স্বপ্নাহত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তাদের অন্তঃসারশূন্যতা এবং একই সঙ্গে শ্রেণি ব্যবধানজনিত বিবমিষার প্রকৃত বাস্তবতার উন্মোচন-সূত্রে পটভূমি বা প্লট হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে উজ্জ্বলতর করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর-কালে ক্রমশ পরিবর্তমান জীবনের ভেতর বেঁচে থাকা পূর্ব-প্রজন্মের একজন পিসিমাকে, যিনি সমকালের জীবন-প্রতিবেশে হয়তো অনেকাংশেই বাহুল্য, কিন্তু বেঁচে আছেন পূর্ববর্তী নানা ঘটনা-অনুভূতির সাক্ষ্য হয়ে। পিসিমা হয়ে উঠেছেন দুই প্রজন্মের যোগসূত্রের ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিমানুষের ক্রমবিচ্ছিন্নতা ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিভূ প্রতীকে। 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে বৃদ্ধা আতমন্নেসা চরিত্রের অবয়বে বাংলাদেশের অগণিত নারীর ভাগ্য-বিড়ম্বিত অসহায়-বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভ-প্রবঞ্চনা, শঠতা, তাদের অন্তর্গূঢ় সংঘাতের বাস্তবচিত্র উন্মোচিত। মানুষের জীবনে ন্যায্য অধিকার ব্যাহত হওয়ায় যে চাপা-অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভ স্বাভাবিক জীবন-প্রবাহকে দুর্বিষহ করে তোলে, আতমন্নেসার বঞ্চিত-জীবনের নানামাত্রিক অভিক্ষেপে তারই জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষণীয়। সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-জীবনের অতলান্ত ব্যর্থতা, হতাশা, ক্ষোভ,

* বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡`‡ki mvwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮৮

অবমাননার শৈল্পিক প্রতিবেদন ‘তারাবিবির মরদ পোলা’ গল্পটি। আজীবন বঞ্চনা ও অতৃপ্তির কারণে যারা পরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য করতে পারে না— তাদের মনোবিকৃতির স্বরূপ ও কারণ পারিবারিক জীবনের আবহে রূপায়িত করে এই গল্পে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে নারীর চিরন্তন বঞ্চনা, বেদনা ও হতাশাকেই মূর্ত করে তুলেছেন তারাবিবি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অধিকাংশ গল্পে নানাভাবে সময় ও সমাজের প্রতিটি স্পন্দন এভাবেই রূপায়িত নারী-জীবনের অনুষঙ্গে শিল্পিত হয়েছে। ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসরে নারী-জীবনের নানামাত্রিক চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ-মনস্ক সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যুগপরিবেশ, সময় ও সমকালের দগ্ধদহনের কালবেলাকেই প্রমূর্ত করেছেন।

বাংলাদেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছে, সেই সম্পর্কের ভেতরকার অসংগতিগুলো কী— পাঠকের দৃষ্টি, ভাবনা আর বোধের সীমায় এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আসা— ছোটগল্পের বিচিত্র পরিসর ও বিন্যাসে রূপায়িত নারী-জীবনের অনুষঙ্গে সেলিনা হোসেন নিরন্তর এই কাজ করে চলেছেন। ‘উৎস থেকে নিরন্তর’ গল্পে ওজুফা অন্যের সন্তানের মা হতে বাধ্য হলেও মাতৃত্ব নষ্ট করে না। ‘বৈশাখী গান’ গল্পে ইকতির কাছে মানবিক সম্পর্কই প্রধান বিবেচ্য। এ অনুভবই ইকতিকে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজনীতির অসার অবস্থানের বিপক্ষে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। ‘আকালির স্টেশনের জীবন’ গল্পের ‘তুচ্ছ কাজের মেয়ে’ ও ‘বেশ্যা’ উপাধি প্রাপ্ত অসহায় দরিদ্র মেয়েটি রাজপুত্রের মতো দেখতে বাড়ির মালিকের ছেলের সঙ্গে শরীরিক সম্পর্কে জড়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। ‘হৃদয় ও শ্রমের সংসার’ গল্পে ফুলবানু তার সমস্ত মনোবল ও সাহসিকতায় সমাজ-সংসারের প্রচলিত অন্যায় বিধি-বিধানের বিপক্ষে অবস্থান নিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না। কেবল পিতা নয় বরং স্বামী কাশেম খানের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ফুলবানু তার ওপর নেমে আসা সমাজ-প্রসূত পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার দেয়াল অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর। সে অনুভব করেছে এই সামাজিক সত্য যে, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি যদি নাই থাকে, তবুও না-বলার শক্তি থাকা নারীর জন্য প্রয়োজনীয়। ‘লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর’ গল্পে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে লিপিকা চরিত্রের অবয়বে। ‘পারুলের মা হওয়া’ গল্পে পারুলের কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চকিত হয়েছে প্রথাবদ্ধ সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার অর্জনের দীপ্ত অঙ্গীকার। পারুল নিম্নবর্গের অসহায়-বঞ্চিত নারীর আসন থেকে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের অগণিত নারীর আত্মমুক্তির প্রেরণা-উৎসে। কয়েক দশকের কথাকার হিসেবে সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে ঘুরে ফিরে এসব বিষয়ই বিচিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টিশীল জীবনের শুরু থেকেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য। প্রথম পর্যায়ে সচেতনভাবে নয়, অনেকটা অসচেতন অথচ লেখকের সংবেদনশীল অনুভূতি দিয়ে তিনি ছোটগল্পে নারীর

Dhaka University Institutional Repository

বহুমাত্রিক জীবনচিত্রের উন্মোচন করেছেন। আর এখন তিনি নারীবাদ সম্পর্কে সচেতন হয়েই গল্প লিখছেন। বলা যেতে পারে যে, নারী অধিকার, মুক্তিযুদ্ধ, গ্রাম কিংবা শহরের মধ্যবিত্ত, প্রচ্ছন্ন রাজনীতি, অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তা তাঁর গল্পের মৌল কাঠামো নির্মাণ করেছে। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পের পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের বিচিত্র অবয়বে নারীর মানবাধিকার, আত্মবোধ ও আত্মচেতনা, লৈঙ্গিক-শোষণ, মুক্তিভাষ্য শিল্পিত মাত্রা পেয়েছে। গল্পের পটভূমিতে সেলিনা হোসেন নারীবাদী ভাবনায় উচ্চকিত হয়ে নারীকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন। এরই সমান্তরালে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও প্রথাগত ইমেজকে করে তুলেছেন প্রশ্নবিদ্ধ। সেলিনা হোসেনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় ছোটগল্পে রূপায়িত নারীর অবয়ব। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পের নারী তাই অধিবাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। তারা পুরুষতন্ত্রকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে আত্মমুক্তির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে বদ্ধ পরিকর। ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোকে প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ-উন্মোচন— দৃষ্টিভঙ্গির এহেন স্বকীয়তাই সেলিনা হোসেনের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা-শক্তি। একটিমাত্র কাহিনি নয়, একক কোনো গল্প নয়— টুকরো টুকরো নানা কাহিনির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারী-জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ভাসিত ছোটগল্পের পটভূমে। বাংলাদেশের নারীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে— সেই যাপিত-জীবনের নানামাত্রিক চালচিত্রকে সেলিনা হোসেন গল্পের পটভূমি ও উপজীব্য করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই একথা বলা যেতে পারে যে, সেলিনা হোসেনের গল্প মানেই নারীর গল্প, বাংলাদেশের নারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনের গল্প।

নাসরীন জাহানের গল্পের বিষয় হিসেবে এসেছে ব্যক্তি মানুষের ক্ষয়, ক্লেদ, মনোবিকলন, নারীর নিজস্ব পৃথিবী, একই সমাজে বাস করা একজন পুরুষের আর একজন নারীর ভিন্ন— প্রায় বিপরীতধর্মী-বাস্তবতা, এই সমস্তকিছু। মানুষের মনের অন্ধগলিতে বিহার করে তাঁর চিন্তার বিচিত্র প্রকাশকে নাসরীন জাহান বেশ কুশলতার সঙ্গেই উপস্থাপন করেছেন ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে। শিল্পচৈতন্যের এরূপ প্রকাশে বাস্তব কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজেকে জাহির করে না; পরাবাস্তব এরূপ ক্ষেত্রে তার রহস্যময় প্রকাশে বাস্তবতার ঘনিষ্ট সহচর হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নাসরীন জাহানের গল্পের বিচিত্র পরিসর ও বিন্যাসে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। রহস্য ও কল্পনার ঘেরাটোপে বাস্তব জীবনের নতুন অবয়ব নির্মাণ করেন নাসরীন জাহান গল্পের জমিনে। সেই অবয়বে সময়, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচিত্র স্বরূপ যেমন উন্মোচিত, তেমনি এরই সমান্তরালে নারী-জীবনের গুহায়িত রহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে সময়, সমাজ ও পরিপার্শ্বের প্রকৃত বাস্তবতা। 'পরগাছা' গল্পে নিছক জীবিকার সন্ধানে, বেঁচে থাকার দুর্মর আকাঙ্ক্ষায় কাজ করতে আসা অসহায় দরিদ্র মেয়েটি রক্ষা পায়না গৃহকর্তা নামক নরপশুর বিকৃত লালসার হাত থেকে। 'জনক' গল্পে বর্ণিত কথক নারী নিজ গর্ভে ধারণকৃত সন্তানের পিতৃ-পরিচয়ের আত্ম-সঙ্কটে ক্ষত-

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষত। নিজেকে প্রকাশ করতে না-পারার ব্যর্থতাজনিত আত্মগ্লানি ও বিচিত্র টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই নারী। 'সুন্দর লাশ' গল্পে বিরূপ প্রতিবেশে বেড়ে ওঠা জিনাত নামের তরুণীটি পুরুষদের, মানুষদের কঠিনভাবে চিনতে চিনতে এমন হয়ে ওঠে যে কোনো পাখি, কোনো জ্যোৎস্না-রাত তাকে এক মুহূর্তের জন্য আর স্পর্শ করতে পারে না। এক অব্যক্ত গ্লানিময় দাম্পত্য-জীবনের বোঝা বয়ে ক্রমাগত নিজেকে রিক্ত-নিঃস্ব করে তোলে জিনাত। 'পথ, হে পথ' গল্পে মইন ও খুকির অপ্রেম সংসারের একঘেয়ে টবপ্রতিম জীবনের সজ্জায় কৃত্রিমতায় হাঁসফাস করা যাপিত-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে নারী-জীবনের অন্তর্গত জটিলতার দ্বান্দ্বিক স্বরূপ সময়-প্রতিবেশের নিরিখে বিবেচ্য। 'ছেলেটি, শিশুটি, তার অনুভব' গল্পে বর্ণিত ছেলেটির অনুভবের দ্যোতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজ-বাস্তবতায় নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার বর্বরোচিত জীবনাখ্যান। নাসরীন জাহানের অসংখ্য গল্পের বিষয়-আশয় এসবই। মূলত কিছুটা রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে নাসরীন জাহান বর্তমানের অসহিষ্ণু জীবনাচরণ, অস্থির সমাজ-ব্যবস্থাপনা এবং দিন-দিন বেড়ে ওঠা জন্ম-সমস্যার চাপে নুয়ে পড়া সমাজ-জীবনের নানামাত্রিক অনভিপ্রেত দিকগুলোর জীবন-ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে শিল্পিত করে তুলেছেন গল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গে। নষ্ট সময়ের ভিটের উপর দাঁড়িয়ে নাসরীন জাহান গল্পের বিচিত্র পটভূমিতে নারী-জীবনের আলোকে প্রকারান্তরে সমাজ-সংসারের জীর্ণশীর্ণ চালচিত্র ও হতাশায় নিমজ্জিত মানুষের কুৎসিত দিকের কার্যকারণের ন্যায়সঙ্গত সম্বন্ধ যোজনা করে তার সমাজবাস্তবতা উন্মোচন করেছেন। লক্ষণীয়, বাংলার নারী লেখকদের সমাজপিষ্ট মানসের উল্লম্ফনে যে পুরুষবিরোধী চিন্তার একরৈখিকতা আমরা লক্ষ করি, বহুলখ্যাত নক্ষত্র উপম ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেখান থেকে দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় নাসরীন জাহান স্বতন্ত্র। কেননা ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-চরিত্রকে তিনি সমাজ-আর্থ-রাজনীতির বাইরে নিয়ে শূলে চড়াতে যান না। বরং সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থাপন করেন বলেই গল্পে রূপায়িত নারী-জীবন হয়ে ওঠে বাস্তব-জীবনেরই অনিবার্য অনুষঙ্গ। নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে নারী-জীবনের রূপায়ণ-সূত্রে তাঁর নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ তাই আরোপিত বা তাত্ত্বিক হয়ে পড়েনা বরং গল্পের ভেতরে এমনভাবে তিনি নিজস্ব ভাবনাকে, নিজস্ব অন্বিষ্টকে রূপদান করেন যে, গল্পের কাহিনি বা চরিত্রের বিকাশ স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে সঞ্চরণশীল থেকে পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন ও সংশোধনকল্পে নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের উন্মোচন তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

সামগ্রিক আলোচনায় হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক বিশ্লেষণে একথা মনে হতে পারে যে, নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষ খলচরিত্র, সকল নষ্টের গোড়া। আদপে এ ধারণা ভ্রান্ত ও সত্য-বিবর্জিত। নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রিক তথা সামূহিক দুরবস্থার জন্য ব্যক্তিগতভাবে পুরুষ দায়ি নয়; দায়ি

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। সমাজ নারী-পুরুষকে যেমন ছাঁচে ফেলে ঢালাই করেছে, তারা তেমনিভাবে গড়ে উঠেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সকল পুরুষ যেমন জালিম বা স্বৈরাচারী নয় তেমনি সকল নারীও কর্তব্য ও কঠোর শ্রমের যথার্থ উদাহরণ নয়। কিন্তু পুরুষসুলভ ও নারীসুলভ সামাজিক ভূমিকা সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও পুরুষকে ঐ দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। মত ও পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আলোচ্য গল্পকারগণ একমত যে, নারী নির্যাতিত, সামাজিক কাঠামোর প্রান্ত সীমায় তার অবস্থিতি এবং এই অবস্থান থেকে সামাজিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে উত্তরণ সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। বিভিন্নতা থেকেই পরিবর্তনের আবশ্যকতা প্রস্ফুটিত হয় এবং অর্থপূর্ণ, কার্যকর দিকনির্দেশনা উন্মোচিত হয়— চিন্তাধারা থেকে কর্মপন্থায় উত্তরণ ঘটে। আলোচ্য গল্পকারদের ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমি ও পরিসরে রূপায়িত বহুমাত্রিক নারী-জীবনের যথার্থ সমাজবাস্তবতা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে কেবল সমাজের প্রকৃত চেহারাই প্রতিবিম্বিত হয় না বরং এরই সমান্তরালে নারীর প্রকৃত অবস্থানটিও সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে; একই সঙ্গে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যথার্থ পথ-পরিক্রমারও নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। নারীমুক্তি না-ঘটলে যে বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়, সে-কথাই প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়েছে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন ও নাসরীন জাহান রচিত ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে। তাঁদের গল্পে গল্প আছে ঠিকই কিন্তু পরিণামে তা থিতু হয়েছে বৌদ্ধিক স্তরে এসে, যা সার্বিকভাবে কেবল নারী-জীবনের প্রকৃত সমাজসত্য-উন্মোচনের পরিসীমায় সীমাবদ্ধ থাকে না বরং নারীর আয়নায় উদ্ভাসন ঘটে সময়, সমাজ ও বিরূপ-প্রতিবেশের সার্বিক চালচিত্র। ফলে তাঁদের রচিত গল্পগুলো একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সমাজ-বাস্তবতার দালিলিক প্রমাণ ও নারীর মানবিক মুক্তির অনন্য শিল্পভাষ্য।

MšcwÄ

K. gjMš

nvmvb AwRRj nK (1939-)

mg‡'i ¯c kx‡Zi AiY¨ (১৯৬৪) : হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-1, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১ পৃ. ১৩-১২৫

AvZ‡Rv GKwU Kiex MvQ (১৯৬৭) : হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-1, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯--২০৬

Rxeb N‡l Av¸b (১৯৭৩) : হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-1, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯-২৯২

bvgnxb †MvÎnxb (১৯৭৫) : হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-1, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫-৩৭৪

cvZv‡j nvmcvZv‡j (১৯৮১) : হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-2, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ, ১৩-৭৫

Avgiv A‡cÿv KiwQ (১৯৮৮) : হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-2, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-১৬০

†iv‡' hv‡ev (১৯৯৫) : হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-2, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-২২৯

gv-‡g‡qi msmvi (১৯৯৭) : হাসান আজিজুল হকের iPbvmsMn-2, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩-২৮৯

AvLZvi¾vgvb Bwjqvm (1943-1997)

Ab¨ N‡i Ab¨ ¯^i (১৯৭৬) : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbvmgM-1, (সম্পাদিতঃ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস), মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৩-৯০

†Lvqvwi (১৯৮২) : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbv iPbvmgM-1, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-১৬০

'afv‡Z DrcvZ (১৯৮৫) : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbv iPbvmgM-1, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-২৩০

†'vR‡Li Ig (১৯৮৯) : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbv iPbvmgM-1, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩-৩১৮

Rvj ¯^c, ¯^‡ci Rvj (১৯৯৭) : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের iPbv iPbvmgM-1, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১-৪০৪

†mwjbv †nv‡mb (1947-)

Drm †_‡K wbišÍi (১৯৬৯) : সেলিনা হোসেনের MímgM, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, বইমেলা ২০০২, পৃ. ১১-৫৯

RjeZx †g‡Ni evZvm (১৯৭৫) : সেলিনা হোসেনের MímgM, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-১০৭

†Lvj KiZvj (১৯৮২) : সেলিনা হোসেনের MímgM, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯-১৫৭

ciRb¥ (১৯৮৬) : সেলিনা হোসেনের MímgM, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯-২০৬

gvbIwU (১৯৯৩) : সেলিনা হোসেনের MímgM, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭-২৯০

gwZRv‡bi †g‡qiv (১৯৯৫) : সেলিনা হোসেনের MímgM, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১-৩৪৭

Abpv cwYgv (২০০১) : সেলিনা হোসেনের MímgM, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯-৪২২

GKv‡ji cvšÍvewo (২০০২) : সেলিনা হোসেনের MímgM, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩-৫০৪

bvmixb Rvnvb (1964-)

¯wei †hŠeb : অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা ১৯৮৪

wePY Qvqv : অন্যপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, একুশের বইমেলা ১৯৮৫

c_, †n c_ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

KvV‡cPv : অন্যপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, একুশের বইমেলা ১৯৯৯

A¨v‡jb‡cvi weovj : অন্যপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, একুশের বইমেলা ২০০৬

Avðh †‘ewkï : বাংলা প্রকাশ, ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা, একুশের বইমেলা ২০০৯

L. mnvqK-Mš

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : evsjv mwn‡Z¨i m¤úY BwZeË, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : Kv‡ji cÖZgv, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : K‡jøvj hM, ৭ম সং.এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৮।

অলোক রায় : K_vmvwnZ¨ wRÁvmv, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯২।

আজহার ইসলাম : evsjv‡`‡ki †QvUMí : welq-fvebv, ¯^iƒc I wkíiƒc, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

: evsjv mvwn‡Z¨i BwZnvm : cÂvk AvaywbK hM, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৮।

আবু জাফর : nvmvb AwRRj n‡Ki M‡íi mgvRev¯ÍeZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

আলাউদ্দিন মণ্ডল : AvLZvi æ¾vgvb Bwjqvm : wbgv‡Y-wewbgv‡Y, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

আলেয়া বেগম : AvLZvi æ¾vgvb Bwjqv‡mi †QvUMí, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

আনু মুহাম্মদ : Bwjqvm I c‡ki kw³, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

আনোয়ার পাশা : iex›`ª †QvUMí mgxÿv, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

আসাদ চৌধুরী : evsjv‡`‡ki gyw³hy×, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

আলাউদ্দিন আল আজাদ : wkíxi mvabv, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৮।

ক্ষেত্র গুপ্ত : evsjv mvwn‡Z¨i mgM BwZnvm, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

খালেদা হানুম : evsjv‡`‡ki †QvUMí, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৭।

গোপাল হালদার : evOjv mvwn‡Z¨i iƒc‡iLv, ঢাকা, ১৯৭৪।

জাফর আহমদ রাশেদ : AvLZvi æ¾vgvb Bwjqv‡mi †QvUMí : Rxe‡bvcjwäi ¯^iƒc I wkí, শ্রাবণ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০১।

দীপ্তি ত্রিপাঠী : AvaywbK evsjv Kve¨ cwiPq, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৭৪।

নীহাররঞ্জন রায় : iex›`ª-mvwn‡Z¨i fywgKv, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট

লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৯।

: evOvjxi BwZnvm (আদিপর্ব), কলকাতা, ১৩৫৬।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, বইমেলা ২০০৯।

: evsjv K_vmvwnZ¨ cvV, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২।

: e×‡'e emi Dcb¨v‡m ˆbtm½¨‡PZbvi i/cvqY, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৭।

ভূদেব চৌধুরী : evsjv mvwn‡Z¨ †QvUMí I MíKvi, কলকাতা, ১৩৬২।

মাহবুবুল আলম : evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

মাহমুদা ইসলাম : bvixev'x wPšÍv I bvix-Rxeb, জে.কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২।

মাসুদুল হক ও খালেদ হোসাইন : †mwjbv †nv‡mb Gi mvÿvrKvi, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯।

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান : evsjv‡'‡ki †QvUM‡í ga¨weË Rxe‡bi i/cvqY, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৯।

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন : evsjv‡'‡ki †QvUMí : Rxeb I mgvR, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭।

মোবার্‌রা সিদ্দিকা : AvawbK evsjv mvwn‡Z¨ gwnjv‡'i Ae'vb : nvbv K¨v_wib g¨‡jÝ †_‡K †iv‡Kqv mvLvIqvZ †nv‡mb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৭।

মোস্তফা মোহাম্মদ : AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi K_vmvwnZ¨ I mvwnZ¨‡KvI, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

: AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi K_vmvwn‡Z¨ wfbgvÎv Ab¨ mi, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, মার্চ ২০০৩।

রফিকুল ইসলাম : fvlv Av‡›'vjb I gy³h‡×i mvwnZ¨, ঢাকা ১৯৯৩।

রাশিদা আখতার খানম : bvixev' I 'vkwbK †cÖ¶vcU, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, কক্ষ নং ১১০৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

রূপরাজ ভট্টাচার্য : Bwjqv‡mi mvó feb, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২।

শহীদ ইকবাল : evsjv‡'‡ki mvwn‡Z¨i BwZnvm, আলেয়া বুক ডিপো, ৩৮/২-ক,

বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

: K_wkíx AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

শাহনাজ পারভিন : evsjv‡‘‡ki ¯vaxbZv h‡× bvixi Ae‘vb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৭।

শিশিরকুমার দাশ : evsjv †QvUMí, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৩।

শোয়েব শাহরিয়ার : Bwjqvm I LwÐZ †PZbvi bv›‘xcvV, wbmM, বগুড়া, একুশে বইমেলা ২০০৪।

ড. সায়েদা বানু : evsjv‡‘‡ki †QvUM‡í ev¯ÍeZvi ¯i/c (1972-88), হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা ২০০০।

সানজিদা আখতার : evsjv †QvUM‡í †‘kwefvM, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০২।

সুকুমার সেন : ev½vjv mvwn‡Z¨i BwZnvm, চতুর্থ খণ্ড, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬।

হাসান আজিজুল হক : K_vmvwn‡Z¨i K_KZv, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১।

: mvÿvrKvi I Ab¨vb¨ iPbv, একুশে বাংলা প্রকাশন, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০০৮।

: wd‡i hvB wd‡i Awm, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, বইমেলা ২০০৯।

: DwK w‘‡q w‘MšÍ, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

: evPwbK AvZ¥RewbK, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, মে ২০১১।

M. mnvqK-m¤úvw‘Z Mš

নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পাদক) : mgKv‡ji †Pv‡L wPiKv‡ji iex›‘bv_, সময় প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

পাপড়ি রহমান, জ্যাকী কবীর (সম্পাদক) : †jL‡Ki K_v, রাইটার্স ইনক, ঢাকা, জুলাই ২০১৩।

ড. ফজলুল হক সৈকত (সম্পাদক) : evsjv‡`‡ki mvwnZ¨, কল্লোল প্রকাশনী, ঢাকা, জুন ২০০৮।

মারুফ রায়হান (সম্পাদক) : †jLv bq K_v (১০ আলোচিত লেখকের সাক্ষাৎকার), সূচীপত্র, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পাদক) : wd‡i †`Lv mvivRxeb (১ম খণ্ড), স্মারক গ্রন্থ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ম্যাগনাম ওপাস, ১২ আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পাদক) : wd‡i †`Lv mvivRxeb (২য় খণ্ড), স্মারক গ্রন্থ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ম্যাগনাম ওপাস, ১২ আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১।

সমীরণ মজুমদার (সম্পাদক) : AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm ¯§viKMÖš', অমৃতলোক, সাহিত্য পরিষদ, টি/৪, বিধাননগর, মেদিনীপুর-৭২১১০১, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৭।

সুশান্ত মজুমদার (সম্পাদক) : mvÿvrKvi nvmvb AwRRyj nK, সন্দেশ, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, বইমেলা ১৯৯৩।

হায়াৎ মামুদ (সম্পাদক) : D‡bœwPZ nvmvb (হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা), ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

N. mnvqK-ceÜ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : 'আমার প্রথম বই', ZYgj (সম্পাদক : আনু মুহাম্মদ), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৮।

আবু হেনা মোস্তফা এনাম : 'মৃত্যুচিহ্নিত জীবনের বর্ণমালা', MíK_v (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

আহমাদ মোস্তফা কামাল : 'বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার', nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২।

ইফতেখারুল ইসলাম : 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'afv‡Z DrcvZ̈', wbišÍi (সম্পাদক : নাঈম হাসান), ৩য় সংখ্যা ১৩৯৪।

ইরাবান বসুরায় : Ôgv-‡g‡qi msmvi : প্রত্যাখ্যানের গল্প', MíK_v (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

এজাজ ইউসুফী : ‘চন্দ্রালোকের হন্তারক : মানবিক বোধের যুগলবন্দি’, wjwiK (সম্পাদক : এজাজ ইউসুফী) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৩৯৯।

চঞ্চলকুমার বোস : ‘হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা’, MíK_v (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

দেবশ্রী ভট্টাচার্য : ‘অবক্ষয়ের আখ্যান : হাসান আজিজুল হকের গল্প, MíK_v (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

ফজলুল হক সৈকত : ‘হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের পরিবেশন ˆkjx’, MíK_v (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : ‘ছোটগল্পের শিল্পরূপ : হাসানের আত্মজা...’, MíK_v, (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

বিকাশ রায় : ‘দেশভাগের গল্প : হাসান আজিজুল হকের সৃজনী চৈতন্য’, MíK_v, (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

মাহবুবুল আলম : ‘ইলিয়াসের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত পর্যালোচনা’, ZYgj (সম্পাদক : আনু মুহাম্মদ), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৮।

মাসুদ রহমান : ‘হাসান আজিজুল হকের গল্প : প্রাণিপ্রসঙ্গ’, MíK_v, (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

মাসুদুজ্জামান : ‘নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন’, nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২।

মোস্তফা তারিকুল আহসান : ‘বাংলাদেশের ছোটগল্প : বৈভব ও বিভূতি’, nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২।

শাহাদুজ্জামান : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার’, wjwiK (সম্পাদক : এজাজ ইউসুফী), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৩৯৯।

শুভাশিস সিনহা : ‘নাসরীন জাহানের গল্প : গ্লানিতে উত্থানে গড়া জীবনাখ্যান’, nvjLvZv (সম্পাদক : শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘দেশভাগ-দেশত্যাগ’, Abóc (সম্পাদক : অনিল আচার্য), কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০।

সরিফা সালোয়া ডিনা : ‘হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে ‘উত্তরবঙ্গ’ ’, MíK_v, (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

সুশান্ত মজুমদার : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দ্বৈরথ সমর’, ˆkjx (সম্পাদক : কায়সুল হক), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১ জানুয়ারি ১৯৯৭।

সুশান্ত মজুমদার : ‘মৃত্যু প্রসঙ্গ ও স্বপ্নের জাল’, ZYgj (সম্পাদক : আনু মুহাম্মদ), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১ জানুয়ারি ১৯৯৮।

সুশান্ত মজুমদার : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : নতুন স্বর, সুর ও আস্বাদ’, ˆkjx (সম্পাদক : কায়সুল হক), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১ জানুয়ারি ১৯৯৭।

হাসান আজিজুল হক : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ’, K_vmwn‡Z¨i K_KZv, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

হাসান ফেরদৌস : ‘AvZ¥Rv I GKwU Kiex MvQ : ফিরে দেখা’, MíK_v (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার), হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

O. mnvqK-cwÎKv

(সম্পাদক নামের বর্ণানুক্রমে)

অনিল আচার্য (সম্পাদক) : Abóc, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০।

আনু মুহাম্মদ (সম্পাদক) : ZYgj (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা) ৬৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৮।

আনু মুহাম্মদ (সম্পাদক) : ZYgj, ৬৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ৫ম সংখ্যা, মার্চ ২০০১।

ইমদাদুল হক মিলন (সম্পাদক) : Kv‡ji KÉ, বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ৫৭, ঢাকা, ৮ মার্চ ২০১৪।

এজাজ ইউসুফী (সম্পাদক) : wjwiK (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), সংখ্যা ৮, পহেলা বৈশাখ তেরশ নিরানব্বই/১৪ এপ্রিল ১৯৯২।

কায়সুল হক (সম্পাদক) : ˆkjx (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), রহমান ম্যানশন (৪র্থ তলা) ১৬১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ২য় বর্ষ ২২ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৭।

গোলাম সারওয়ার (সম্পাদক) : mgKvj, বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪২, ঢাকা, ৮ মার্চ ২০১৪।

চন্দন আনোয়ার (সম্পাদক) : MíK_v (হাসান আজিজুল হক সংখ্যা), বর্ষ ২ সংখ্যা ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

নাঈম হাসান (সম্পাদক) : wbiš̂i (সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক পত্রিকা), ২/৪ সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, পঞ্চম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

ড. পৃথ্বিলা নাজনীন (সম্পাদক) : fvlv-mvwnZ¨ cÎ, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, সংখ্যা ৩৩, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪/জুন ২০০৭।

মতিউর রহমান (সম্পাদক) : c_g Av‡jv, বর্ষ : ১৬, সংখ্যা : ৭৯, ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি ২০১৪।

মাসউদ আহমাদ (সম্পাদক) : MícÎ, ৫ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, বর্ষ ২ সংখ্যা ৪, ডিসেম্বর ২০১১।

শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পাদক) : nvjLvZv (বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা), বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২।

সিদ্দিকা মাহমুদা (সম্পাদক) : mvwnZ¨ cwÎKv, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বর্ষ : ৫০॥ সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪১৯ ॥ অক্টোবর ২০১২।

সিদ্দিকা মাহমুদা (সম্পাদক) : mvwnZ¨ cwÎKv, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বর্ষ : ৫০॥ সংখ্যা : ২-৩ ॥ আষাঢ় ১৪২০॥ জুন ২০১৩।

ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পাদক) : DËiwaKvi, (বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮।

ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পাদক) : DËiwaKvi, (বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ৩৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮।